রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী*

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ

বন্ধুগণ,

আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের স্থানীয় কেন্দ্রের সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব উদ্বোধনের জন্য—যে কেন্দ্র রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী নিয়মিতভাবে প্রচার করে আসছে, বহুবিধ সমাজকল্যাণকর সেবাকার্যের মাধ্যমে এই বাণীকে কর্ম-রূপায়িত করে আসছে। সে বাণী আসলে কি ? একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতায় তার বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়, কাজেই আমি তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যমাত্র উল্লেখ করব।

স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মমহাসভার পর পাশ্চাত্য হতে প্রত্যাবর্তন করে কলম্বো থেকে আলমোড়া-র অধিকাংশ বক্তৃতায় এই বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন যে, এদেশের জাতীয় আদর্শ ধর্ম। প্রত্যেক জাতিরই একটা আদর্শ আছে, যা তার জীবন নিয়ন্ত্রণ করে ; যখন সে আদর্শ বিপন্ন হয় সে জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারতে আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি ধর্ম। এই চিরাচরিত আদর্শের পরিবর্তে আমাদের কোন নতুন আদর্শ গ্রহণের চেষ্টা করার অর্থ হবে জাতির ধ্বংস। বহু সহস্র বৎসর পূর্বে আমাদের জাতি এই আদর্শ বেছে নিয়েছে, এখন তা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়—যেমন সম্ভব নয় গঙ্গানদীর স্রোতকে বিপরীতমুখী করে হিমালয়ে ফিরিয়ে নিয়ে নতুন কোন খাতে প্রবাহিত করানো। স্বামীজী বলেছেন, মোটের ওপর, আমাদের জাতি কোন খারাপ আদর্শ বেছে নেয় নি, আর সম্পদে-বিপদে বহু শতাব্দী ধরে সে আদর্শকে আঁকড়েও রয়েছে। যদি ভারতকে আবার উঠতে হয়, তবে ধর্মের মাধ্যমেই তা করতে হবে, অন্য কোন আদর্শের মাধ্যমে নয়। অবশ্য রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতির ন্যায় অন্য বিষয়ের স্থানও তাতে থাকবে, কিন্তু সে-সবই থাকবে ধর্মের কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে। সেজন্যই স্বামীজী বলেছেন, "ভারতকে সামাজিক বা রাজ-নীতিক ভাবে প্লাবিত করার আগে প্রথমে দেশকে আধ্যাত্মিক ভাবে প্লাবিত কর।" তিনি এ-ও চেয়েছিলেন যে, "আমাদের উপনিষদে, আমাদের পুরাণে, আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রে যে সকল অপূর্ব সত্য নিহিত আছে, সেগুলি ঐ সকল গ্রন্থ হইতে, মঠ হইতে, অরণ্য হইতে, সম্প্রদায়-বিশেষের অধিকার হইতে বাহির করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া দিতে হইবে," যাতে প্রত্যেকে ঐ সত্য জানতে পারে।

স্বামীজীর মতে ভারতের অধঃপতনের কারণ-গুলির অন্যতম হল এই যে, উচ্চবর্ণের লোকেরা আধ্যাত্মিক সত্যগুলির একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত, নিজেদের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ রাখত—জনসাধারণকে তার অংশভাগী করত না। কাজেই এই স্বার্থপরতার জন্য কখন কখন স্বামীজী উচ্চ-বর্ণের লোকদের ওপর কঠোর মন্তব্য করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "আর্য বাবাগণের জাঁকই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা দিনরাতই কর, আর যতই কেন তোমরা 'ডম্‌ম্‌ম্‌' বলে ডম্ফই কর, তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ ? তোমরা হচ্ছ দশ হাজার বছরের মমি !! যাদের 'চলমান শ্মশান' ব'লে তোমাদের পূর্ব-

---

* বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ আশ্রমে ৪.৫.৭৪ তারিখে আশ্রমের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন-সভায় ইংরেজীতে প্রদত্ত আশীর্বাণী-ভাষণের অনুবাদ।—সঃ

পুরুষরা ঘৃণা করেছেন, ভারতে যা কিছু বর্তমান জীবন আছে, তা তাদেরই মধ্যে। আর 'চলমান শ্মশান' হচ্ছ তোমরা। ··· তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলিতে পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত কতকগুলি অমূল্য রত্নের অঙ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্বকালের অনেকগুলি রত্ন-পেটিকা রক্ষিত রয়েছে। ··· (সেগুলি) উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধ'রে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।" পরে তিনি নিশ্চয় করে বলেছেন, যখনই এই সব ভাব জনসাধারণের কাছে পৌঁছুবে, তখনি ভারতের নবজাগরণ ঘটবে।

ধর্ম বলতে কিন্তু পুরোহিত বা প্রচলিত প্রথা দ্বারা অনুমোদিত কতকগুলি বিশ্বাস, মতবাদ বা কুসংস্কার প্রভৃতি প্রচলিত ধারণাগুলি বোঝায় না; চরম সত্যকে উপলব্ধি করাই হল ধর্ম। স্বামীজী বলেছেন, "প্রত্যেক আত্মায় দেবত্ব অন্তর্নিহিত। বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া এই অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ সাধন করাই জীবনের লক্ষ্য। কর্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান—ইহাদের যে কোন একটি অবলম্বন করিয়া অথবা একাধিক বা সকলগুলির সাহায্যে এই দেবত্ব বিকাশ কর ও মুক্ত হও। ইহাই তো ধর্মের আদি-অন্ত।" শ্রীরামকৃষ্ণের মতে বিভিন্ন ধর্মগুলি ঈশ্বরোপলব্ধির বিভিন্ন পথ মাত্র; নিজ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। এমন কি বুদ্ধি দিয়ে বিভিন্ন ধর্মগুলিকে পরীক্ষা করলেও দেখা যায়, সেগুলির প্রত্যেকটিই এই চারটি যোগের কথাই বলে—হয়তো একটি বা অপরটির ওপর প্রাধান্য দেয় মাত্র। কাজেই ধর্মান্তরিতকরণকে নিরুৎসাহ করতে হবে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ ধর্ম অনুসরণ করেই আধ্যাত্মিকতার উচ্চ থেকে উচ্চ-তর ভূমিতে উন্নীত হয়ে ঈশ্বরোপলব্ধি করতে হবে।

রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজজীবন প্রভৃতি জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধর্মকে অনুস্যূত করতে হবে। শিক্ষা এমন হওয়া উচিত, যাতে জাতির বংশধর তরুণদের ভেতর জাতীয় কৃষ্টি অনুপ্রবিষ্ট হয়, যার ফলে তারা জাতির যথার্থ প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারে,—এর সঙ্গে অবশ্য যাবতীয় ঐহিক-বিদ্যাকেও সাদরে গ্রহণ করতে হবে। এভাবে না হলে শিক্ষা নিষ্ফল হবে।

অধুনা আমরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়তে চেষ্টা করছি। জগতের সম্পদ কয়েকজনের হাতের মুঠিতে, বাকী সবাই অজ্ঞান, দারিদ্র্য, বুভুক্ষা ও স্বাস্থ্যহীনতায় নিমজ্জিত। কতিপয় মহাপ্রাণ ব্যক্তি এরূপ অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তোলেন এবং তার ফলে সামাজিক সংঘর্ষের উদ্ভব হয়। সমাজের সম্পদ দেহের রক্তের ন্যায়। দেহের সর্বত্র রক্ত প্রবাহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। দেহের কোন অংশে যদি রক্ত না পৌঁছয়, তবে সেই অংশ শুকিয়ে যায়, এমনকি পচনশীল ক্ষতে পরিণত হয়ে সে ব্যক্তির জীবনসংশয় ঘটাতে পারে। সেরূপ সমাজের বা রাজনৈতিক সংগঠনের কোনও অংশে সম্পদ যদি সঞ্চালিত না হয় তবে সেই অংশ নির্জীব হয়ে পড়ে এবং পরিণামে ঐ সমাজের মৃত্যু ঘটে। যদিও বর্তমান পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্র বাঞ্ছনীয় তথাপি তা হবে একটা অর্ধাঙ্গ ব্যবস্থা মাত্র, আমাদের সব সমস্যার সমাধান তাতে হবে না। স্বামীজী তাঁর পত্রাবলীর একটিতে লিখেছিলেন, "আমি যে একজন সমাজতন্ত্রী, তার কারণ এ নয় যে, আমি ঐ মত সম্পূর্ণ নির্ভুল মনে

করি, কেবল 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল'—এই হিসেবে।" পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে তিনি বলেছেন, "ভাবগতিক দেখে মনে হয় যে, সোশ্যালিজম্ বা অন্য কোনরূপ গণতন্ত্র, তার নাম যাই দিই না কেন, শীঘ্র প্রচলিত হবে। লোকে অবশ্য তাদের সাংসারিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির আকাঙ্ক্ষা মেটাতে চাইবে। তারা চাইবে—যাতে তাদের কাজ পূর্বাপেক্ষা কমে যায়, যাতে তারা ভাল খেতে পায় এবং অত্যাচার ও যুদ্ধবিগ্রহ একেবারে বন্ধ হয়। কিন্তু যদি এদেশের সভ্যতা বা অন্য কোন সভ্যতা ধর্মের ওপর, মানুষের সাধুতার ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে তা যে টিকবে তার নিশ্চয়তা কি? এটি নিশ্চয় জানবেন যে, ধর্ম সকল বিষয়ের মূলদেশ পর্যন্ত গিয়ে থাকে। যদি এটি ঠিক থাকে, তবে সব ঠিক।" বর্তমান সমাজতন্ত্রবাদের ধারণা জড়বাদের সৃষ্টি। কিন্তু বর্তমান সঙ্কট শুধু বহির্জগতে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরাত্মায়ও,—যার সমাধান শুধু ধর্মের দ্বারাই করা সম্ভব—যে ধর্ম মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে। কোনরূপ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক নিপুণ পরিচালনায় এর সমাধান আসবে না। তাছাড়া সমাজতন্ত্র স্থাপন করতে গিয়ে আমরা মানুষের স্বার্থপরতার সম্মুখীন হই। বিধানসভার কোন আইন দ্বারা মানুষকে নিঃস্বার্থ করা যায় না। সুতরাং সরকার যখন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে তখন স্বার্থপর মানুষেরা তাদের অর্থ-গৃধ্নুতা চরিতার্থ করার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করে—যেমন পণ্য মজুত করে রাখা, খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধে ভেজাল দেওয়া, তহবিল আত্মসাৎ করা ইত্যাদি। এই স্বার্থপরতা, যা মানুষকে সমাজ-বিরোধী করে, তার প্রতিকার সম্ভব শুধু উচ্চতর, অধিকতর কার্যকরী স্বার্থপরতা দ্বারা—যা মানুষকে জীবনের যাবতীয় অশুভ থেকে উদ্ধার করে সেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দ্বারা। এই সমাজতন্ত্র গ্রহণ-কালে যদি আমরা তাকে গীতার উপদেশ বা মানুষকে ভগবান জেনে তার সেবা (শিবজ্ঞানে জীবসেবা)-রূপ বিবেকানন্দ-প্রচারিত উপদেশ অনুযায়ী আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, তবেই সমাজতন্ত্র গণতান্ত্রিক প্রথায় অবাধে দৃঢ়মূল হতে পারে। এইজন্য সমাজ-তান্ত্রিক ভাবতেও ধর্মকে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দিতে হবে; যাতে আমাদের দেশবাসীরা স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে তা গ্রহণ করে এবং তদনুযায়ী কাজ করে। এ বিষয়ে পদক্ষেপের এই ধর্মীয় দিকটি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন জাতির সম্মুখে উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করছে।

সব ধর্মপ্রচারক ও মহান আচার্যগণই দরিদ্রদের ভালবাসতেন। তাঁরা সকলের জন্যই এসেছিলেন, কেবল ধনীদের জন্য নয়। আমাদের সমাজও গঠিত হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতেই। এই জন্য আমাদের বিধিনিষেধের প্রবর্তকগণ কখনো অধিকারের কথা বলেন নাই, শুধু কর্তব্যের কথাই বলেছেন। রাজা থেকে পথচারী পর্যন্ত সকলের জন্যই কর্তব্য নির্ধারিত ছিল, চতুর্বর্ণে বিভক্ত লোকের জন্যও ছিল,—নিজ নিজ বর্ণানুযায়ী কাজের জন্য কোন অধিকার দাবী না করে প্রত্যেককে নিজ সামর্থ্যানুযায়ী সমাজের সেবা করতে হত। ঐরূপ চতুরাশ্রমের—জীবনের চারটি বিভাগের—প্রত্যেকটিতে অবস্থিত মানুষের জন্যও কর্তব্য নির্ধারিত ছিল। এ সব ক্ষেত্রেই কর্তব্যের কথাই রয়েছে, কোন অধিকারের কথা নয়। আশা করা হত, প্রত্যেকে স্বীয় নির্দিষ্ট কর্তব্যানুযায়ী জাতির জন্য কাজ করবে। বর্তমান কালের দৃষ্টিভঙ্গী কর্তব্যের ওপর জোর না দিয়ে অধিকারের ওপরই জোর দেয়; এটা আমাদের কৃষ্টি-বিরোধী। আন্তরিকভাবে কর্তব্যপালনের দ্বারা ব্যক্তি যে শুধু জাতির সেবা করতে পারে তা নয়, নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতিও করতে পারে; কিন্তু অধি-

কারের জন্য লড়াই করে তা হবে না। স্বামীজী বার বার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, "ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ"।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণীর কয়েকটি দিক আমি এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করলাম—যা আমরা পৃথিবীময় প্রচার করতে এবং ভারতে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত মিশনের সেবাকার্যের মাধ্যমে কর্ম-রূপায়িত করতে চেষ্টা করছি। আমাদের বিশ্বাস—অজ্ঞান, অভাবগ্রস্ত ও দুস্থদের ভগবানজ্ঞানে সেবা ঐহিক কর্মকে উপাসনার পর্যায়ে উন্নীত করে এবং পরিশেষে ঈশ্বরোপলব্ধি করায়।

দেশে বিদেশে সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী পৌঁছবামাত্র সাদরে তা গৃহীত হচ্ছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, বর্তমান যুগে এ বাণী মানুষের প্রয়োজন সিদ্ধ করে। সব বড় সভ্যতারই প্রবর্তক কোন আধ্যাত্মিক অনুভূতিবান পুরুষ, যাঁদের জীবন ও বাণী সে-সব সভ্যতার মূল। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সম্বন্ধেও একই ব্যাপার ঘটছে; তাঁর জীবন ও বাণী একটি নব যুগ বা নব সভ্যতা প্রবর্তন করছে।

বন্ধুগণ, গত পঞ্চাশ বছর ধরে আপনাদের সকলের সহৃদয় সহযোগিতায় আমরা বোম্বেতে এই কাজ চালাতে পেরেছি এবং আমি আশা করি ভবিষ্যতেও আমরা এই সহযোগিতা লাভ করব, যাতে আমরা দিনের পর দিন ক্রমে অধিকতর সংখ্যক মানুষের সেবা করতে পারব। শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ আমাদের সকলের ওপর বর্ষিত হোক যাতে আমরা দেশ-বিদেশে তাঁর বাণী প্রচারের উপযুক্ত যন্ত্রে পরিণত হতে পারি।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ

শ্রীধনেশ মহলানবীশ

ভোগে তৃপ্তি পেতে চাও! কি ভোগ করিবে?
চিরকাল কোন বস্তু অম্লান রহিবে
তোমারে করিতে তৃপ্ত! জীবন যৌবন
জলের বুদ্‌বুদ মাত্র—এরা কতক্ষণ!
ধন জন মান, হায়, কত না ক্ষণিক
ক্ষণপ্রভা সম আলো করি দশ দিক
যায় যে বিলীন হয়ে! যতক্ষণ মন
কামনায় বাসনায় রহে নিমগন
ততক্ষণ ভোগে তৃপ্তি কভু কি সম্ভবে?
মলিন দর্পণ মাঝে কখনো কি হবে
উদ্ভাসিত সেই সত্য যাহা অবিনাশী!
এ বিশ্ব জগৎখানি তাঁরি রূপরাশি।—
আসক্তিবিহীন চিত্তে প্রতি রূপে রূপে
ভোগ করে তৃপ্ত হও আনন্দ-স্বরূপে।

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা

স্বামী সারদেশানন্দ

১

জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্‌গুরুম্।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥

মা,

প্রাণের আকাঙ্ক্ষায় মনের সাধে লিখিত তোমার 'সুখ-স্মৃতি'-কথার মূল খাতা হস্তান্তরিত। জনৈক বন্ধুকে পড়িতে দিয়া দেশান্তরে ছিলাম, কয়েক বৎসর খোঁজ করি নাই, ফিরিয়া আসিয়া পাইলাম না। এজন্য বন্ধুবর দুঃখিত কিন্তু আমার মনে বিশেষ আঘাত লাগে নাই। কেন? ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমারই ত খেলা সব। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিশক্তি দুর্বল, চিত্তপট ম্লান হইয়া পড়িতেছে, তোমার স্নেহের ডাক প্রাণে জাগে না, করুণার ছবি অন্তরে ভাসে না পূর্বের মত। তাই স্মৃতি আরও দুর্বল, আরও ম্লান হইয়া গেলে, একেবারেই দিশেহারা হইয়া পড়িবার ভয়ে দুর্বল স্মৃতির সহায়েই আবার সংক্ষেপে লিখিবার ইচ্ছা করিলাম। পূর্বের খাতা নিজের দৃষ্ট, শ্রুত বিচ্ছিন্ন ঘটনাবহুল ছিল। এবার তোমার মানবীলীলার আদি-মধ্য-অন্ত ঘটনার নামমাত্র উল্লেখে পূর্ণাঙ্গ ছবি আঁকিবারই প্রয়াস পাইয়াছি নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া। অন্যের নিকট হাস্যোদ্রেককর হইলেও সন্তানের উত্তম বাপ-মায়ের আদরণীয়।

শ্রীশ্রীমার জন্মতারিখ ২২শে ডিসেম্বর ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ, ৮ই পৌষ ১২৬০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা সপ্তমী, রাত্রি ২ দণ্ড ৯ পল, উত্তরভাদ্র নক্ষত্র। বিবাহ ১৮৫৯ খ্রীঃ মে মাস, ১২৬৬ বাং বৈশাখের শেষাংশ। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে দেবী ত্রিপুরসুন্দরী ষোড়শী মহাবিদ্যারূপে পূজা করেন—সম্ভবতঃ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ ৫ই জুন, ১২৭৯ বাং ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, অমাবস্যা ফলহারিণী কালিকাপূজা রাত্রে।

লীলাসংবরণ—২১শে জুলাই, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ, ৪ঠা শ্রাবণ ১৩২৭ সাল।

শ্রীশ্রীমা বাল্য কৈশোর এবং যৌবনের প্রারম্ভে পিত্রালয়েই বাস করেন। বিবাহের পর সময় সময় অল্পদিনের জন্যই কামারপুকুরে শ্বশুরালয়ে গমনাগমন হইয়াছিল। তৎপরে যৌবনে দক্ষিণেশ্বর গমন ও শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসংবরণের কাল পর্যন্ত তাঁহারই সহিত একত্রে দক্ষিণেশ্বরে বসবাস এবং মধ্যে মধ্যে দেশে কামারপুকুর জয়রামবাটীতে আসা যাওয়া করিতেন। ঠাকুরের অসুখের সময় শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরে ভীষণ অসুবিধার মধ্যেও বাস করিয়া পতিসেবায় নিরতা ছিলেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের পর দেওঘর কাশী দর্শন করিয়া বৃন্দাবন যান এবং তথায় কালাবাবুর কুঞ্জে প্রায় একবৎসর বাস করেন। সেই সময়ে পদব্রজে ব্রজ-পরিক্রমা, লীলাস্থানসমূহদর্শন, কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে হরিদ্বার, হৃষীকেশ দর্শনেও গিয়াছিলেন। বৎসর খানেক পরে, জয়পুর, পুষ্কর ও প্রয়াগ দর্শনানন্তর বাংলাদেশে ফিরিয়া কামারপুকুরে বাস করেন। পরবর্তী সময়ে কখন কলিকাতায়, কখন কখন কামারপুকুরে এবং শেষকালে উদ্বোধন ও জয়রামবাটীতেই অবস্থান করিয়াছিলেন। কোঠারে ও কৈলয়ারে ভক্তাগ্রণী ৺বলরামবাবুর পুত্র রামবাবুর ভক্তি ও প্রার্থনায় কিছুদিন বায়ু পরিবর্তনে গিয়াছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের ভক্তি-আগ্রহে দাক্ষিণাত্যেও গমন করতঃ রামেশ্বর, মীনাক্ষী, গোদাবরী দর্শন এবং মাদ্রাজ ও বেঙ্গালোরে অবস্থান করিয়া বহু

ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। দক্ষিণে যাওয়ার পূর্বে কিছুদিন পুরীতে বাস ও জগন্নাথ দর্শন করিয়া পরমানন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।

নাহি চাহি চতুর্বর্গে, কিম্বা স্বর্গ-অপবর্গে,
একমাত্র সাধ মনে শুনহ জননি !
তোমার কোলেতে শুয়ে তব মুখপানে চেয়ে,
স্নেহস্তন্যসুধা পিব দিবস রজনী !

শ্রীসারদা—মা ও মেয়ে

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর লীলাকথার আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রকাশিত পুস্তকসমূহে সেই অদ্ভুত মানবীলীলার বড়ই বিচিত্র, অতীব হৃদয়-গ্রাহী দৃশ্যেও তাঁহার চরিত্রমাধুর্য—বিশেষভাব 'একাধারে মা ও মেয়ে'—সম্যক্ পরিস্ফুট করিতে পারা গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না, যদিও শ্রীশ্রীমায়ের কথা ও জীবনচরিতে এখানে সেখানে,—চকিত চপলার ন্যায়, সেই সব চিত্রে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় মাত্র। শ্রীশ্রীঠাকুরের বালকভাব—পরমহংস অবস্থার কথা, শিশুর ন্যায় দিগম্বর হইয়া পরনের কাপড় বগলে করিয়া বেড়ানর কথা পর্যন্ত সকলেই দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন কিন্তু অত্যন্ত লজ্জাশীলা কুলবধূ, রত্নগর্ভা চন্দ্রমণিদেবীর আদরের পুত্রবধূ—যাঁহার সম্বন্ধে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের খাজাঞ্চি বিস্মিতভাবে বলিয়াছিলেন, "তিনি এখানে আছেন বটে শুনিতে পাই, কিন্তু কখনও দেখিনি !"—সেই অসূর্যম্পশ্যা দেবীর চাক্ষুষ দর্শন, বহু পুণ্যের ফলে—তাঁহারই কৃপায়, অতি অল্প-সংখ্যক সৌভাগ্যবানেরই লাভ হইয়াছে সন্দেহ নাই। তাঁহারই সুসন্তান ঘাটালের উকিল শ্রদ্ধেয় ৺শিবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে জয়রামবাটীতে পূঃ কালীমামার বৈঠকখানার বারান্দায় বসিয়া বলিয়াছিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসংবরণের অল্পকাল পরেই তাঁহার সন্তানগণের সঙ্গে পরিচয়, বরাহনগর-আলমবাজার মঠে যাতায়াত, তাঁহাদের স্নেহ-ভালবাসা লাভ হইয়াছে, তাঁহাদের বিশেষ অনুগ্রহে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে দর্শন ও প্রণাম করিতে গিয়াছি সত্য, কিন্তু সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃতা দেবীর পদাঙ্গুলের অগ্রভাগ নখমণি ভিন্ন কখনও অপর কিছু দর্শনলাভ ভাগ্যে ঘটে নাই। একবার মহারাজগণের সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে গিয়াছিলাম, তাঁহাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিতে, মা (কামারপুকুর জয়রামবাটী) দেশে যাইবেন। গাড়ীর দেরি হওয়ায় ওয়েটিং রুমে বসিয়া তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করেন, সেই সময় ঘটনাচক্রে দরজা ঈষৎ উন্মুক্ত হওয়ায়, বালিকার ন্যায় পূজাসনে উপবিষ্টা মাতৃমূর্তির দর্শন পাইয়া বিমোহিত হইয়াছিলাম। তৎপরে আর একবার মহারাজ-গণের সঙ্গে কামারপুকুরে আসি। শ্রীশ্রীমাও তখন সেখানে উপস্থিত। আমরা সকলে বারান্দায় বসিয়া প্রসাদ পাইতেছি, ভক্তবর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও বসিয়াছেন, মা ঘরের ভিতর বসিয়া দরজার ফাঁক দিয়া সন্তানদের আহার দেখিতেছেন। কথাবার্তা কহিতে কহিতে আনন্দে সকলে ভোজন করিতেছি, হঠাৎ আমার দৃষ্টি ঘরের ভিতরে আকৃষ্ট হইল। আমি দরজার সম্মুখেই বসিয়াছিলাম, মায়ের মূর্তি দেখিয়া আমি বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া আহার ভুলিয়া সেই দিকেই তাকাইয়া রহিলাম; হঠাৎ গিরিশবাবুর উচ্চকণ্ঠের রব শুনিলাম, 'দেখেছ ! বামুনের কাণ্ড ! কোন্ দিকে চেয়ে আছে !!' হুঁশ আসিল, মস্তক অবনত হইল, আর চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিলাম না; কিন্তু ভাই, হৃদয়ে সে স্নেহময়ীর মূর্তি চিরকালের জন্য অঙ্কিত হইয়া গেল। তারপরে, বহুকাল পরে এখানে মাকে পাইয়া, কথাবার্তা বলিয়া মার হাতে প্রসাদ পাইয়া খাইয়া, স্নেহ মমতা আস্বাদন করিয়া এখন প্রাণ জুড়াইয়াছে, ভরপুর হইয়াছে। জয়রামবাটীতেই মাকে ঠিক ঠিক আপনার মায়ের মতই পাইয়াছি।"

মনে পড়ে ছোটবেলাকার কথা ; গর্ভধারিণীর সঙ্গে মাতুলালয়ে গিয়াছি নৌকাতে, নৌকা হইতে উঠিয়া মাতুলবাড়ীতে প্রবেশ করিবার সময় মা মাথার ঘোমটা খুলিয়া দিলেন, আর খোলা মাথায় গলা খুলিয়া সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন,—আমি বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। মাকে বাড়ীতে, ঘরের ভিতরও কচিৎ মাথার কাপড় সরিয়া গেলে তখনই টানিয়া দিতে দেখিয়াছি, আর কথাবার্তা, গলার স্বর অপরে শুনে কি না শুনে। কোন বিশেষ কারণে পাশের বাড়ীতে গেলে, ঘোমটা ত বুকের উপর নামিয়া আসিবেই, আবার সঙ্গে একজন সঙ্গী থাকিবে, আর গলার স্বর কেহই শুনিতে পাইবে না, কথা বলিলে কানের কাছে মুখ নিয়া, চুপি চুপি অতি মৃদুস্বরে! তাই, আমি নূতন দৃশ্যে অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতাম, আর যখনই সুবিধা পাইতাম মাথার কাপড় টানিয়া ঘোমটা পরাইয়া দিতাম। মাসীমারা হাসিতেন, মা হাসিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেন, 'আমার শ্বশুরবাড়ীর লোক, ঘোমটা খোলা দেখতে পারে না!' বাস্তবিক ঘোমটা-খোলা মাকে দেখিলে আমার কেমনতর লাগিত, মাকে ছোট মেয়ে মনে হইত! ইহার পরে দেখিলাম দিদিও শ্বশুরঘর হইতে বাপের বাড়ীতে আসিয়াই ঘোমটা খুলিয়া ফেলেন, পল্লীতে বেড়ান, স্বাধীনভাবে কথাবার্তা বলেন,—পাড়া-পড়শীর সঙ্গে আমাদের ভাইদের মতই নিঃসঙ্কোচে! তখন ধীরে ধীরে বুঝিলাম বাপের ঘরে মেয়েরা বৌমানুষ নহে, ঝিয়ারী, কন্যাভাবই তাহাদের অন্তরে সদাবিদ্যমান থাকে।

রত্ন-প্রসবিনী দিদিঠাকুরাণী শ্যামাসুন্দরীর আদরিণী মেয়ে 'সারু' 'সারি' 'সারদা' বাপের ঘরে, জয়রামবাটীতে, চিরকালই কন্যারূপে বাস করিতে ভালবাসেন। তাই মাতুলালয়ে আসিয়া ভক্তসন্তানগণ তাঁহার সেই কমনীয় বালিকাভাব ও নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারে বিস্মিত মোহিত হইত! অখিল-ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরীর কি বিচিত্র লীলাই না নরলোক প্রত্যক্ষ করিয়াছে! সরলা পল্লীবালা দরিদ্রের পর্ণকুটীর স্নিগ্ধ স্নেহচন্দ্রিমার আলোতে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছেন! যেই আসিতেছে —ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, বাল-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সেই স্নেহকিরণে প্লুত-পরিতৃপ্ত হইয়া ভাবিতেছে, কে এই বালিকারূপিণী—দেবী না মানবী! মা না মেয়ে?

যাঁহার স্নেহ-সুধায় প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় তিনিই মা। আবার পুলকিত প্রাণের স্নেহধারা যাঁহার দিকে ধাবিত হয় তিনিই মেয়ে, জয়রামবাটীতে প্রবীণ ভক্তগণের বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে এই দুই ভাবের জোয়ার ভাটা খেলিত! জগদম্বে মা! এই কর্কশ কঠিন ধরামরুর মরুস্থানে মানববক্ষে স্নেহ-মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত না রাখিলে তোমার এই সাধের খেলাঘরটি শুকাইয়া মরিয়া যাইবে; তাই বুঝি স্বয়ং তুমি 'মা' হয়ে, 'মেয়ে' হয়ে এসেছ মা! লীলাময়ি! কর নিত্য নূতন লীলা! অনাদি খেলার ঘর হোক অক্ষয়।

শ্রীশ্রীমার অপরিসীম স্নেহ-কৃপা লাভে ধন্যা, পরম সৌভাগ্যবতী 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'-পুস্তকের প্রধানা প্রথম লেখিকা শ্রীমতীর অমূল্য দৈনন্দিন লিপিতে তাঁহার সহোদরার গৃহে মাতাঠাকুরাণীর শুভ পদার্পণের মনোরম বর্ণনাতে লেখা ছিল—মা তাঁহাদের সুন্দর সুসজ্জিত বাটীতে গিয়া গৃহবাসীদের আয়োজিত সেবা-পরিচর্যা সাধারণ হইলেও পরম সন্তোষসহকারে স্বীকার করতঃ তাঁহাদিগকে পরম পুলকিত ও তাঁহাদের জীবন সার্থক করেন; বাড়ীর বাগানে মনোহর পুষ্পরাজি দেখিয়া মায়ের মন বিশেষ প্রফুল্ল হয় ও সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বালিকার ন্যায় খুব আনন্দ প্রকাশ করেন। ভক্তিমান গৃহস্বামী-স্বামিনীর

আরাধ্য দেবতা সেদিন তাঁহাদের প্রতি অপরিসীম করুণায় সম্পূর্ণ বালিকাভাবে ভাবিত হইয়া তাঁহাদের গৃহ আলোকিত, অন্তর উদ্ভাসিত করিয়া স্নেহ-প্রেমের মন্দাকিনীধারা বহাইয়াছিলেন। তাঁহাদের তপ্ত হৃদয় সুশীতল ও নরজন্ম সার্থক হইয়াছিল সন্দেহ নাই, এবং সেই বিবরণ পাঠ করিয়া আমাদের তৃষিত চিত্ত মেনকার সুরে গাহিয়াছিল—"গৌরী আমার এসেছিল !!" পরবর্তী-কালে ছাপার পুস্তকে সেই অপূর্ব বাল্যভাবের কিছু চিত্র বাদ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকীর সময় হইতে তাঁহার প্রতি জনসাধারণের অন্তরের টান দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতেছে। বহু পুস্তকে, চিত্রে, সঙ্গীতে, অভিনয়ে লোকের অন্তরের মাতৃভক্তির অসীম উচ্ছ্বাস দেখিয়া তো মনে হয়, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব-প্রচারিত যুগোপযোগী ভাব—মাতৃভাবে ভগবানের আরাধনা এবং সেই হেতু জগজ্জননীর সৌন্দর্য-মাধুর্যে কারুণ্যের পরিপূর্ণ প্রকাশ, ত্রিপুরসুন্দরীর ললিতা-ষোড়শী শ্রীসারদা-মূর্তিতে আবির্ভাব আর জগদ্বাসীর অজানা নাই। তাহারা তাহাদের মাকে-মেয়েকে চিনিয়াছে—এখন প্রাণের পিয়াস মিটাইয়া স্নেহ-বাৎসল্যরস-সুধা আস্বাদন করিতে, করাইতে অধীর, আর কোমলপদে অর্ঘ্যরূপে স্বীয় হৃদয় নিবেদন করিতে ব্যগ্র। তাই মনে হয় মা, এখন তোমার এই চপল সন্তানের বাচালতা নিতান্ত বিরক্তিকর হইবে না। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নির্দেশ, মাতৃভাবে ভগবানের উপাসনা সাধনার শেষ কথা জগদ্বাসী জানিতে চায়।

দূরাগত ভক্তগণের পক্ষে তখন মায়ের বাড়ীতে আসা কি কঠিন ব্যাপার! তাই পথ-শ্রমে পরিশ্রান্তা পূজনীয়া যোগেন মা জয়রাম-বাটীতে পূজনীয় শরৎ মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'বাপু! এখানে আসা লোকের পক্ষে গয়া কাশী যাওয়া অপেক্ষা কঠিন ব্যাপার!!' মহা-রাজও তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, 'এ কি গয়া কাশী চেয়ে ছোট তীর্থ?' অধীরহৃদয় দূরদেশাগত ভক্তগণ মাঠের রাস্তায় চলিতে চলিতে, পড়িতে পড়িতে ছুটিয়াছেন; কোথায় জয়রামবাটী, কোথায় মায়ের বাড়ী, যাহাকে পাইতেছেন পথে ঘাটে, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। প্রথমে পাড়াগেঁয়ে লোক বিস্মিত হইত, কিন্তু পরে উহা তাহাদের অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল এবং 'মায়ের বাড়ী ও মায়ের ভক্ত-সন্তান' ঐ অঞ্চলের সর্বসাধারণে পরিচিত শব্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অধিকন্তু ঐ ভক্তেরা শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, পদস্থ লোক বুঝিতে পারিয়া দিনে দিনে স্থানীয় লোকের অন্তরে তাহাদের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধার ভাবও জাগিতেছিল। অবশ্য ভাবভক্তিবিরোধী ঘোর বিষয়াসক্ত লোক সর্বত্রই দেখা যায় এবং কোন প্রকার ধর্মকর্মই তাহারা সহ্য করিতে পারে না। আর এক শ্রেণীর লোক গোঁড়া প্রাচীনপন্থিগণও মাতাঠাকুরাণীর সধবালক্ষণ দীর্ঘ আলুলায়িত কুন্তল, পাড়ওয়ালা কাপড় ও রীতিনিয়মে নিষ্ঠার অভাব দেখিয়া বিরক্ত হইতেন। বিশেষভাবে কোয়ালপাড়া আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীযুত কেদারনাথ দত্ত (পরে স্বামী কেশবা-নন্দ) ও তাঁহার অনুগামী ছাত্র বালক-ভক্তগণের সংসারাশ্রম ত্যাগ, আশ্রমে সকল জাতির একসঙ্গে থাওয়া থাকা, ও বর্ণবিভাগ ত্যাগ করিয়া সকলের সর্বপ্রকার কাজ করা, এসব স্থানীয় লোকের চিত্ত বিশেষভাবে আলোড়িত করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে কেন্দ্র করিয়া কোয়াল-পাড়া আশ্রমের পরিচালনা ও মধ্যে মধ্যে তাঁহার তথায় শুভাগমন ভক্তগণের হৃদয়ের উল্লাস বৃদ্ধি করিতেছিল। দূরদেশাগত ভক্তগণের সেবা, মায়ের বাড়ীতে আসা, থাওয়া থাকা, কৃপালাভ এবং মাতাঠাকুরাণীর সেবাপরিচর্যার জন্য কোয়ালপাড়া আশ্রমের কর্মিগণ নিজেদের সর্বপ্রকার অসুবিধা,

দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়া যে নিষ্ঠাভক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা জগতে অতুলনীয়। জগদম্বাই স্বয়ং তাঁহার প্রয়োজনে সেই অদ্ভুত সমাবেশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন মনে হয়।

প্রথমে প্রথমে দূরদেশাগত সন্তানগণের খাওয়া থাকা সুখসুবিধার জন্য মাকে কতই বেগ পাইতে, কষ্ট করিতে হইয়াছে। জয়রামবাটী অতি ক্ষুদ্র গ্রাম, কোন জিনিসপত্র পয়সা দিয়াও কিনিতে পাওয়া যায় না। দোকানপাট নাই, সামান্য জিনিসের প্রয়োজনে দূর গ্রামে যাইতে হয়। গরীব চাষী পাড়া-পড়শীর ঘরে তাহাদের চাষের জিনিস সাধারণ তরিতরকারী, চাল, ডাল, মুড়ি, গুড়, অল্প পরিমাণে দুধ সময় সময় পাওয়া যায় মাত্র। মা যখন শক্ত-সমর্থা ছিলেন, নিজেই চেষ্টা-চরিত্র করিয়া যখন-যেমন জুটে জিনিসপত্র সংগ্রহ করিয়া সংসার চালাইতেন, আর তখন আগন্তুক ভক্তসন্তানের সংখ্যাও অল্প ছিল। তাঁহার গর্ভ-ধারিণী যতদিন সমর্থা ছিলেন ততদিন তিনিও সাগ্রহে তাঁহার নাতি-ভক্ত 'সারদার সন্তান'দের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া খাওয়া থাকার সুব্যবস্থা করিতেন। তৎপরে, ভক্তসংখ্যা বাড়িয়া চলিল, দিদিমা দেহ রাখিলেন, মায়ের বয়স বাড়িয়া দেহ অপটু হইতে লাগিল, ঠিক সেই মুহূর্তে বিশেষ প্রয়োজনে কোয়ালপাড়া আশ্রমের সৃষ্টি!

মা জয়রামবাটী থাকাকালে, কোয়ালপাড়ার সেবকগণ আশ্রম হইতে দুই মাইল দূরে কোতল-পুরের সুপ্রসিদ্ধ হাটে সপ্তাহে দুই দিন বাজার করিয়া, স্বীয় মস্তকে বোঝা বহিয়া আনিয়া, পরদিন সকাল সকাল আবার বোঝা মাথায় করিয়া চারি মাইল দূরে জয়রামবাটী আসিয়া মায়ের পদপ্রান্তে রাখিয়া প্রণাম করিতেছেন; সে দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জীবনে ভুলিতে পারেন নাই। আবার দুপুরে থাইয়া গেলে মায়ের সংসারে কাজ বাড়ে, কাজেই মায়ের সঙ্গে পুলকিত চিত্তে কথা-বার্তা বলিতে বলিতে তাঁহার স্নেহে ভরে দেওয়া চারটি মুড়ি আহার করিলেন, প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের খবর নিলেন, স্নেহাশীর্বাদ পদধূলি মাথায় নিয়া অন্তর পরিতৃপ্ত করিয়া প্রফুল্ল অন্তরে আবার ফিরিয়া চলিলেন চার মাইল। সেখানে গিয়া দুপুরের আহার! বিশেষ প্রয়োজন হইলে হয়ত পরদিনই আবার আসিতে হইবে! এত পরিশ্রম, কষ্ট, আশ্রমের কঠিন কাজ, গরীব আশ্রমের খাওয়া-পরার ভীষণ কঠোরতা, কিছুই তাঁহাদের এই অদম্য উৎসাহ ও সেবাপরায়ণতাকে দমাইতে পারে নাই। কেন? কি অমৃতরস তাঁহাদের প্রাণে এই অমানুষিক বলের সঞ্চার করিয়াছিল?—অপার্থিব মাতৃস্নেহ, মায়ের অপরিসীম স্নেহ-মমতা ছিল এই প্রেরণার মূল উৎস। সেই সুধাধারায় তৃপ্ত ও বলীয়ান হইয়া মাতৃভক্তিতে তাঁহারা অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছিলেন। মা! তুমি যাহাকে স্নেহসুধা পান করাও, যে তোমার স্নেহ-স্তন্য আস্বাদন করে, তাঁর কাছে কিছু অসম্ভব থাকে না। সেই সুধাপান করিয়া তোমার বীর সন্তান বিবেকানন্দ বিশ্ববিজয়ী, রাখাল রাজা রাজ্য-সংস্থাপক, প্রেমানন্দ শিবানন্দ সারদানন্দ প্রভৃতি সুসন্তানগণ সুচারুরূপে পরিচালনা করিয়া, তোমার স্নেহপ্রেমের রাজ্য দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত করিয়াছেন – বিশ্ববাসীকে টানিয়া আনিয়া দিয়াছেন কোলে তুলিয়া। তোমার অপূর্ব মাতৃভাবের লীলা-খেলা আমাদের যাহা দেখাইয়াছ, তাহা শুনিবার জন্য আগ্রহান্বিত নবীন সন্তানকে বলিবার যোগ্যতা প্রদান কর জননি! [ক্রমশঃ]

কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী প্রভানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

গাড়ী এগিয়ে চলে। বাগবাজার পুল হতে কাশীপুর চৌরাস্তা পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে ছিল মুটে মজুরদের চালা ঘর। মুটে মজুরদের অধিকাংশই অবাঙ্গালী। ক্রমবর্ধমান কলকারখানা ব্যবসা-বাণিজ্য বহিরাগতদের আকর্ষণ করত। রাস্তার উপর ছিল ছোটখাট দোকানপত্র। তাছাড়া ছিল কয়েকটি পাটগুদাম, পাটকল, দাস কোম্পানীর লোহার কারখানা, রেলি ব্রাদার্সের কারখানা, কয়েকটি জেটি, দু'চারটি বাগানবাড়ী বা বাসাবাড়ী। চৌরাস্তার নিকটে ছিল পুলিশচৌকি, দমকল ও পোষ্টাফিস। (প্রথম চিত্র দ্রষ্টব্য)[১]

বাগবাজারে গঙ্গার পুল পার হয়ে উত্তরদিকে বরাহনগর বাজার পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তা। সেই রাস্তার উপরেই মতিঝিল—মতিলাল শীলের উদ্যান সম্মুখস্থ ঝিল। মতিঝিলের উত্তরাংশ যেখানে বরাহনগর বাজারে যাবার বড় রাস্তার সঙ্গে মিলেছে তার পূর্বে রাস্তার অপর পাশেই ৺রাণী কাত্যায়নীর জামাতা ৺গোপাল চন্দ্র ঘোষের উদ্যানবাটী। পৌর ঠিকানা ৯০, কাশীপুর রোড। মতিঝিলের পশ্চিমাংশে ছিল ৺মতিলাল শীলের মনোরম বাগানবাড়ী। তার উত্তরে বসাকদের জীর্ণ বাসভবন। তার কিছু উত্তরে ৺প্রাণনাথ চৌধুরীর স্নানের ঘাট। আরও উত্তরে ৺রাণী কাত্যায়নীর গোপালমন্দির।[২] দীর্ঘ মতিঝিলের পাশ দিয়ে বিস্তৃত রাস্তা। মতিঝিলের দক্ষিণে একটি ছোট বাজার। তার দক্ষিণে ছিল একটি মদের দোকান, একটি ডাক্তারখানা, কয়েকখানি খোলার ঘরে চালের আড়ৎ; ঘোড়ার আস্তাবল ইত্যাদি। এ সকলের দক্ষিণে সুপ্রসিদ্ধ ৺সর্বমঙ্গলা ও ৺চিত্তেশ্বরী মন্দিরে যাবার প্রশস্ত পথ[৩], ভাগীরথী পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পথ দক্ষিণে রেখে কলকাতা যেতে হত। গাড়ী করে যাবার সময় ঠাকুর ৺সর্বমঙ্গলার মন্দির দেখে সঙ্গীদের অনেকবার বলেছিলেন: "ঐ ৺সর্বমঙ্গলা বড় জাগ্রত, প্রণাম কর।' মতিঝিলের দক্ষিণাংশ যেখানে কাশীপুরের রাস্তার সঙ্গে মিশেছে তারই সম্মুখে রাস্তার অপর পাশে ছিল মহিমাচরণ চক্রবর্তীর বাটী।

গাড়ী লোহার ফটক পেরিয়ে উদ্যানে প্রবেশ করে। নূতন বাসস্থান ও তার পরিবেশ ঠাকুরের পছন্দ হয়। স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন: 'দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের

---

১ ২৪ পরগণা জেলার নির্ভরযোগ্য ম্যাপ Captain R. Smyth কর্তৃক ১৮৪৬-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পরিচালিত সার্ভের ভিত্তিতে তৈরী, Col. W. H. Wilkins ১৮৯২-৯৫ পর্যন্ত সংশোধন করে দেন। ১৮৮১ ৮৩ খ্রী: Major S. H. Cowan হুগলী নদী সার্ভে করেন। এই উপাদানের ভিত্তিতে ১৮৯৫ খ্রী: সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া এই ম্যাপ প্রকাশ করে।

২ উদ্যানবাটীর উত্তরদিকে ৩১।১ কাশীপুর রোড হতে বেরিয়েছে রুস্তমজী পার্শী রোড। সেই রাস্তা ধরে গঙ্গার ধারে পৌঁছলে পাওয়া যাবে বিশাল প্রাসাদে ৺গোপালের মন্দির। কাল কষ্টিপাথরে অপূর্বদর্শন ৺বালগোপালের মূর্তি। সেই প্রাসাদের পাশে বর্তমানে গড়ে উঠেছে ইউনিয়ন কারবাইডের কারখানা।

৩ এই পথের বর্তমান নাম খগেন চাটার্জী স্ট্রীট। চতুর্ভুজা ৺চিত্তেশ্বরী সর্বমঙ্গলার মন্দির ও দশভুজা অসুরমর্দিনী ৺চিত্তেশ্বরীর মন্দিরের বর্তমান ঠিকানা যথাক্রমে ১ ও ১৫।১ খগেন চাটার্জী স্ট্রীট।

প্রথম চিত্র

[সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মানচিত্র হইতে]

1 কাশীপুর উদ্যানবাটী
2 ৺সর্বমঙ্গলার মন্দির
3 আদি ৺চিত্তেশ্বরীর মন্দির
4 পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস
5 মহিমাচরণ চক্রবর্তীর বাড়ী

তুলনায় উদ্যানের ঐ শোভা অকিঞ্চিৎকর হইলেও নিরন্তর চারিমাস কাল কলিকাতাবাসের পর ঠাকুরের নিকট উহা রমণীয় বোধ হইয়াছিল। উদ্যানের মুক্ত বায়ুতে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি প্রফুল্ল হইয়া উহার চারিদিকে লক্ষ্য করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আবার দ্বিতলে তাঁহার বাসের জন্য নির্দিষ্ট প্রশস্ত ঘরখানিতে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে তিনি উহার দক্ষিণে অবস্থিত ছাদে উপস্থিত হইয়া কিছুক্ষণ উদ্যানের শোভা নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন।' (লীলাপ্রসঙ্গ, ৫।৩৮০)। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিকার লিখেছেন, 'ভারি খুশী হৈলা রায় দেখিয়া বাগান। ভক্তসঙ্গে চারিদিকে বেড়িয়ে বেড়ান।' (পঞ্চম সংস্করণ, পৃঃ ৬১১)।

এগার বিঘা চারকাঠার[১] কিছু বেশী জমি নিয়ে উদ্যানবাটী। জমির চারিদিক উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। বাগানের উত্তর-পূর্ব ধারে একটি বড় পুষ্করিণী, তার উত্তর-পশ্চিম কোণে দু'তিনখানি একতলা ঘর।[২] পশ্চিমে একটি ছোট পুষ্করিণী। বড় পুষ্করিণী ছোটটির প্রায় চারগুণ বড়। দুই পুষ্করিণীতে স্বচ্ছ জল, প্রশস্ত শানবাঁধানো ঘাট। দুই পুষ্করিণীর মধ্যে ইটে বাঁধানো প্রায় গোলাকার উদ্যানপথ-পরিবৃত একটি দোতলা বাড়ী। বাড়ীর নীচে চারখানি ও উপরে দুখানি ঘর। উপরে পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণদিক খোলা ঘরটি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য নির্দিষ্ট হয়। ঐই ঘরের পশ্চিমের দেয়াল অর্ধ-গোলাকার। ঘরের দক্ষিণে রেলিং-ঘেরা স্বল্পপরিসর ছাদ, সেখানে ঠাকুর কখনও কখন পদচারণ করতেন বা বসতেন। ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণের ছোট ঘরটিতে ঠাকুর স্নানাদি করতেন, অন্যসময় দু'একজন সেবক বাস করতেন। নীচে মধ্যের ঘরটি ছিল প্রশস্ত, নামকরণ হয় হল-ঘর। তার উত্তরে দুটো পাশাপাশি ঘর পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। পূর্বের ছোট ঘরটি শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর জন্য নির্দিষ্ট হয়। পশ্চিমের ঘরটির ভিতর একটি কাঠের সিঁড়ি, সেটা বেয়ে দোতলায় ওঠা যায়। নীচের হলঘর ছিল ভক্তদের বৈঠক-খানা আর তার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের বড় ঘরটি সেবক ভক্তদের বাসস্থান। শেষোক্ত ঘরটি 'দানাদের ঘর' নামে পরিচিত ছিল।

দোতলা বাড়ীর উত্তরে প্রায় মধ্যভাগে দেওয়ালঘেঁষে পাশাপাশি কয়েকটি ছোট ঘর, রান্না ভাঁড়ার ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট ছিল। বাগানের উত্তর-পশ্চিম কোণে ছোট পুকুরের পশ্চিমে আস্তাবল ছিল। দক্ষিণসীমার মধ্যভাগের সম্মুখে মালীদের জন্য দুটো ঘর ও বাগানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পশ্চিমের প্রাচীরের গায়ে দরওয়ানের ঘর ছিল। তার উত্তরে লোহার ফটক। ফটক হতে গাড়ীর রাস্তা উত্তর-দক্ষিণে অর্ধবৃত্তাকারে প্রসারিত হয়ে দোতলাবাড়ীর পরিবৃত পথটির সঙ্গে যুক্ত ছিল। আবার দোতলাবাড়ীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণ হতে একটি পথ পূর্বের পুষ্করিণীর ঘাট পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। পথের দুধারে, বিশেষতঃ দক্ষিণদিকে ছিল নানাপ্রকারের ফুলফলের গাছ। বাগানের সর্বত্র ছিল আম জাম কাঁঠাল লিচুর গাছ। ডোবা-পুষ্করিণীর পাশের জমিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় শাক-সব্জীর চাষ হতো। জমির উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব

---

১ লীলাপ্রসঙ্গমতে (৫।৩৭৫) জমির পরিমাণ 'চৌদ্দ বিঘা আন্দাজ হইবে'। প্রকৃতপক্ষে উহা ১১ বিঘা, ৪ কাঠা, ২ ছটাক, ৫০ (স্কোয়ার ফুট)।

২ এর একটি ঘরে যুবক ভক্তদের কেউ কেউ ধ্যান জপ করতেন। এখানেই নরেন্দ্রনাথ রচিত 'তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা' গানটি গেয়ে সকলে দিব্যানন্দে নৃত্য করেছিলেন। (শ্রীমদর্শন, ১০ম ভাগ, পৃঃ ১৬৮-৯)।

দিকের প্রাচীরে একটি করে খিড়কি দরজা ছিল। বাগানের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ও উত্তর-পূর্ব দিকে দুটো পায়খানা ছিল।

স্বল্পসময়ের নোটিশে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে উদ্যানবাটীতে আনা হয়েছিল। ঘরবাড়ী রাস্তা-ঘাট বাগান পরিষ্কার, খাওয়া শোবার ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি ঠাকুরের চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হন যুবক ও প্রবীণ ভক্তগণ। অন্যতম সেবকের লেখা হতে জানা যায়, 'কিঞ্চিদধিক সপ্তাহকালের মধ্যেই সকল বিষয় সুশৃঙ্খলে সম্পাদিত হইতে লাগিল।' (লীলাপ্রসঙ্গ, ৫।৩৮৮)।

কাশীপুরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আসার খবর ভক্তমহলে ছড়িয়ে পড়ে। সংবাদ পেয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও মাষ্টার মশাই সেদিনই একটি ঘোড়ার গাড়ীতে রওয়ানা হন। তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা। মনে হয় গিরিশচন্দ্রের অনুরোধে মাষ্টার মশাইয়ের যেতে এত রাত হয়েছিল। বীরভক্ত গিরিশচন্দ্রের সঙ্গ ছিল আকর্ষণীয়। স্পষ্টবক্তা গিরিশ তাঁর মনের ভাব নির্দ্বিধায় সকলের সামনে নিঃসংকোচে তুলে ধরতেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে ঈশ্বর যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। এবার তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন রামকৃষ্ণবিগ্রহে। গিরিশচন্দ্র অবতারলীলা সম্বন্ধে বলতে থাকেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের মাহাত্ম্য বলে চৈতন্যচরিতামৃত হতে উদ্ধৃতি করেন, 'কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহারই স্বরূপ।' শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি বিভিন্ন অবতারের মধ্যে অবতারীর যে লীলামাধুর্য প্রকট হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করে গিরিশ রামকৃষ্ণাবতারের নরলীলার আলেখ্য ও তাৎপর্য বর্ণনা করেন। মাষ্টার মশাই মুগ্ধবিস্ময়ে শোনেন। গিরিশচন্দ্র বলতে থাকেন যে রামকৃষ্ণা-বতারের প্রধান একটি অবদান সর্বধর্মসমন্বয়ের এক অশ্রুতপূর্ব দিগ্‌নির্দেশ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, ধর্ম-মত সব ঠিক। যত মত তত পথ। প্রয়াস আন্তরিক হলে, যে কোন পথ দিয়েই ভগবানের নিকট পৌঁছান যায়। তিনি ঠাকুরের প্রিয় উপমাটি তুলে ধরেন। একই বস্তুকে বাংলাভাষী হিন্দু বলে 'জল', উর্দুভাষী মুসলমান বলে 'পানী', ইংরেজীভাষী খ্রীষ্টান বলে 'ওয়াটার'। একই সুশীতল জল স্নান পান করে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকলেরই শরীর শীতল হয়, মন পরিতৃপ্ত হয়। নূতন যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের সুসমাচার এই অভিনব সর্বধর্মসমন্বয়।

ডিসেম্বরের শীতের রাত। সহৃদয় শ্রোতা মাষ্টার মশাইয়ের সামনে গিরিশ তুলে ধরেন তাঁর আরেকটি প্রিয় বিষয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে তাঁকে পাপপঙ্ক হতে উদ্ধারের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের অবতরণ। শ্রীরামকৃষ্ণ লোক-শিক্ষার জন্যই যেন গিরিশকে বেছে নিয়েছিলেন। গিরিশ তাঁর অতীতের সকল জঞ্জাল ঝেড়ে ফেলে শ্রীরামকৃষ্ণচরণে শরণ নিয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে তাঁকে 'বকলমা' দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। গিরিশের মধ্যে দেখা গিয়েছিল গভীর পরিবর্তন। গিরিশ একদিন নিজেই শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেন: 'মহাশয় কি বলবো! আপনাকে চিন্তা করে আমি কি ছিলাম, কি হয়েছি! আগে আলস্য ছিল, এখন সে আলস্য ঈশ্বরে নির্ভর হয়ে দাঁড়িয়েছে! পাপ ছিল, তাই এখন নিরহঙ্কার হয়েছি!' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২।২৬।৩)। নিশ্ছিদ্র গিরিশের আন্তরিকতা, হিমালয়ের মত অটল অচল তাঁর বিশ্বাস। শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গ করতে করতে তিনি মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন।

মাষ্টার মশাই বীরভক্ত গিরিশের আন্তরজীবনের গূঢ় ভাবভক্তির তথ্য সাগ্রহে চয়ন করেন। গিরিশ আরও বলেন: 'পরমহংসদেব[১] আমাকে মদ

১ তখন পর্যন্ত ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণকে 'পরমহংসদেব' বলতেন। 'ঠাকুর' বলার প্রচলন তখনও হয়নি।

ছাড়তে কখনও মুখ ফুটে বলেননি, তিনি জানেন যে আমার বীরভাব।

'আমি জানি পরমহংসদেব আমার ভার নিয়েছেন। তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। আমি দুনিয়ার কাউকে ভয় করি না, গ্রাহ্য করি না। আমি যমকেও ভয় করি না।'

গাড়ী কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে ঢোকে। রাত দশটা বেজে গেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। দোতলা ঘরের আলো জানলার খড়খড়ি দিয়ে বেরুচ্ছে। দোতলার ঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শায়িত। একটি মশারি টাঙানো। প্রচুর মশা। ঘরে একটি লণ্ঠন জ্বলছে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তখনও জেগে আছেন। গিরিশ ও মাষ্টার ঠাকুরকে প্রণাম করে আসন গ্রহণ করেন। ঠাকুর উঠে বসেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকেন, তারপর বলেন: 'কাশি কফ বুকের টান এসব নেই। তবে পেট গরম। ঘরেই পায়খানার ব্যবস্থা করতে হবে। বাইরে যেতে পারব বলে মনে হয় না।'

নিকটে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেবক লাটু। তিনি হাতজোড় করে গম্ভীরস্বরে বলেন: 'যে আজ্ঞে মশাই, হামি ত আপনার মেস্তর হাজির আছি।'

তাঁর সরল কথা শুনে উপস্থিত সকলে হেসে ওঠেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কঠোর সাধনার শেষে দীর্ঘকাল কঠিন আমাশয় রোগে ভুগেছিলেন। ঐ রোগ তাঁর কখনও সম্পূর্ণ সেরেছিল বলে মনে হয় না। তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রায়ই পেটের অসুখে ভুগতেন। প্রতি বৎসর বর্ষাকালে কামারপুকুরে গিয়ে বাস করতেন। সেই পেটের ব্যামোর জের এ সময়েও প্রায়ই দেখা যেত।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলেন: 'কবিরাজ থাকে বাগবাজারের ওদিকে। তা সে কি এতটা পথ আসবে?'

তিনি বালকের মত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। ছোট ছেলেকে শান্ত করার মত করে মাষ্টার মশাই বলেন: 'আসবেন বৈ কি! গাড়ী করে আসবেন, সময় বেশী লাগবে না।'

শ্যামপুকুরে থাকাকালীন ঠাকুরের চিকিৎসা করতেন প্রধানতঃ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। শেষদিকে ঠাকুরের রোগের উপসর্গাদি বৃদ্ধি পেলে বাগবাজারের দাড়িওয়ালা কবিরাজ কিছু ওষুধপত্র দেন। তিনি ৩০শে নভেম্বর (১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) হতে কিছুদিন নিয়মিতভাবে রোগীর দেখাশুনা করেন। ডাক্তার সরকার এই চিকিৎসা মোটা-মুটি অনুমোদন করেছিলেন।

ঘরে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছিল। ঠাকুরের নির্দেশে পূর্বদিকের জানালাটি[১] বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের মধ্যে ধীরে ধীরে পদচারণা করেন।

আরও কিছুক্ষণ থেকে গিরিশ ও মাষ্টার মশাই কলকাতায় ফিরে যান।[২]

শ্যামপুকুরে ঠাকুরের থাকাকালীন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার চিকিৎসা করছিলেন। সে সময়ে তাঁর চতুর্দিকে খ্যাতি। প্রখ্যাত হোমিও-প্যাথ বেরিগ্নি (Dr. Berigny) কলকাতা ত্যাগের সময় তাঁর নিজের সঙ্গে উদীয়মান চিকিৎসক মহেন্দ্রলালের তুলনা করে বলেছিলেন:

---

১ ঠাকুরের ঘরের পশ্চিমের অর্ধ গোলাকার দেওয়ালে তিনটি জানালা, পূর্বদিকের দেওয়ালে দুটি জানালা, দক্ষিণ ও উত্তরের দিকে দুটি করে দরজা।

২ ঘটনার বিবরণ প্রধানতঃ মাষ্টার মশাইয়ের ডায়েরী (পৃঃ ৬২৩) হতে গৃহীত।

'It is time for the moon to set, for the sun is on the horizon.'[১] ভক্ত মনমোহন মিত্র ছিলেন ডাক্তার সরকারের মামাতো ভাইয়ের ছেলে। ডাক্তার সরকারের পরামর্শেই ঠাকুরকে উদ্যানবাটিতে আনা হয়। কাশীপুরে আসার দু'চার দিনের মধ্যেই ঘটনাক্রমে চিকিৎসার না হলেও চিকিৎসকের পরিবর্তন ঘটে। তদানীন্তন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক বহুবাজারের রাজেন্দ্রলাল দত্ত ছিলেন মহেন্দ্রলালের গুরু। রাজেন্দ্রবাবু ঠাকুরের রোগের চিকিৎসা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। গিরিশ-চন্দ্রের ভাই অতুলকৃষ্ণ এই সংবাদ নিয়ে আসেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সানন্দে সম্মতি জানান। রাজেন্দ্রবাবু ঠাকুরকে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে দেখতে আসেন। তিনি লাইকোপোডিয়াম (২০০) প্রয়োগ করেন। এই ওষুধের ব্যবহারে ঠাকুর দুই সপ্তাহেরও কিছু বেশী অনেকটা উপকার বোধ করেছিলেন।

ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ অল্পদিনের মধ্যেই ঠাকুরের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধায় অনুরক্ত হয়ে পড়েন। অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল লিখেছেন : 'এমন হৃদয়বান চিকিৎসক সচরাচর পাওয়া যায় না। ইনি নিত্যই আসিতেন[২] এবং ঠাকুর যাহাতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন, তাহাতে যত্নবান হইতেন। একারণে সকলেই সন্তুষ্ট হন।...একেত্রে রোগী যেমন আশ্চর্যময়, চিকিৎসকও তেমনি শ্রদ্ধাবান। তাই তিনি আসিবার সময় কোথায় সুগন্ধি ফুলটি, কোথায় সুমিষ্ট ফলটি সংগ্রহ করিয়া ঠাকুরের জন্য আনিতেন এবং কিরূপ পথ্য রুচিকর হইবে, তাহাও জানিতেন। দুর্বল শরীরে ভারময় পাদুকা কষ্টকর ভাবিয়া, মখমল-নির্মিত কোমল পাদুকা আনিয়া স্বয়ং প্রভুর শ্রীপদে পরাইয়া দেন। ফলতঃ ইঁহার ভক্তিপূর্ণ চিকিৎসায় পীড়ার উপশম হইলে ভক্তগণ বিশেষ আনন্দ পান।' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত, পৃঃ ২০৮-৯)।

পরের রবিবার, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাশীপুর আগমনের খবর ভক্তমহলে ছড়িয়ে পড়েছিল। তার উপর ছুটির দিন। অনেক ভক্ত কাশীপুর উদ্যানবাটীতে উপস্থিত হয়েছেন।

মাষ্টার মশাই যখন আসেন, তখন বেলা দুটা। দোতলার গোলঘরে গিয়ে ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেন। দেখেন আনন্দমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরাস্য হয়ে বসে আছেন। তিনি আজ কিছুটা সুস্থ বোধ করছেন। কঠিন ব্যাধিতে তাঁর শরীর শীর্ণ দীর্ণ, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ভক্ত-কল্যাণে আযুক্ত সর্বক্ষণ তাঁর করুণাবিগলিত মন। তিনি সদাপ্রফুল্ল। তাঁর মুখকমল দেখে মনে হয় ভাবসাগরে শোভমান একটি প্রস্ফুটিত শতদল।

ঠাকুরের ঘরে উপস্থিত লাটু ও কয়েকজন ভক্ত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনজীবনের অজ্ঞাতরহস্যের দু'একটি উদ্ঘাটন করছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ : 'আগে পেটের ব্যামোর সময় রূপদর্শন হলে থু-থু করতুম। থু-থু করে বলতুম তোদের জন্যই আমার ঐরূপ অবস্থা ..। শরীরে তখন আর কিছু নেই। শুধু হাড় দুখানা—কিন্তু মুখটা ছিল।'

একটু থেমে তিনি আবার বলেন : 'একতারা নিয়ে ওঁ ওঁ করতুম।'

মাষ্টার ও অপর সকলে মুগ্ধবিস্ময়ে শোনেন ঠাকুরের দিব্যজীবনের কাহিনী।

ঠাকুরের দৃষ্টি পড়ে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে। সম্মুখে একটি পুরানো আমগাছ।

---

১ Shivnath Sastri : Men I have seen, p. 109

২ এই তথ্য বোধ করি প্রথম কয়েকদিনের জন্যই সত্য। পরে দেখতে পাব, তিনি নিয়মিত আসতেন না।

গাছের মোটা একটি ডাল নীচু হয়ে প্রসারিত রয়েছে। ছায়াঘেরা বেশ খানিকটা জায়গা। ঠাকুর দেখেন সেখানে বসে আছেন ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার। ঠাকুর মাষ্টারকে ইঙ্গিতে বলেন সেখানে যাবার জন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: 'ওরা গাছতলায় আসন পেতেছে, সন্ন্যাসীর মত আসন পেতেছে।'

মাষ্টার মশাই মৃদুকণ্ঠে বলেন: 'আজ্ঞে, শরীরটা ততো ভাল নয়। রক্ত আমাশয় হয়েছে।'

স্নেহপরায়ণা জননীর মত ঠাকুর উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন, জিজ্ঞাসা করেন: 'কার?'

মাষ্টার জানান যে তিনি নিজে অসুস্থ। ঠাকুর ইঙ্গিত করেন মাষ্টারকে ঘরে অপেক্ষা করার জন্য, তিনি ঘরের বাইরে যান মুখের থু-থু ফেলার জন্য। ঘরে ফিরে তিনি মাষ্টারকে বলেন: 'শোন, তুমি রামনেলোর কাছে যাও। তার কাছে একটা ওষুধ আছে। তিনদিনেই রোগ আরাম হবে। চিঁড়ে দিয়ে খেতে হয়। যাও তুমি ওর কাছে যাও।'

রামনেলো হচ্ছেন রামলাল চট্টোপাধ্যায়, ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র, দক্ষিণেশ্বরে ⁄ভবতারিণীর পূজারী। রবিবারে ঠাকুরকে দেখতে এসেছিলেন। মাষ্টার মশাই তাঁর সঙ্গে দেখা করে রক্ত আমাশয় রোগের ওষুধ সম্বন্ধে খোঁজখবর নেন। রামলাল-দাদার উপদেশ নির্দেশ নিয়ে মাষ্টার মশাই ফিরে আসেন ঠাকুরের ঘরে। ঠাকুরকে সব কিছু নিবেদন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন: 'ওষুধ ধন্বন্তরী। কাজ হবেই, তিনদিনে নয়ত সাতদিনে কাজ হবেই।'

ঠাকুরের শরীর এত অসুস্থ; কিন্তু তাঁর অনুক্ষণ চিন্তা ভক্তদের জন্য; তাদের কল্যাণের জন্য তিনি সর্বদাই উন্মুখ। ভক্তকল্যাণ তথা বিশ্বকল্যাণের জন্যই তাঁর শরীর ধারণ।

কিছুক্ষণ পরে মাষ্টার মশাই ঠাকুরকে প্রণাম করে বিদায় নেন। তখন বিকাল সাড়ে চারটা।[১]

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে যে সকল ছোট বড় অসুবিধা দেখা গেল তার সুষ্ঠু সমাধান করতে লাগে কয়েকদিন। কলকাতার উপকণ্ঠে কাশী-পুরের উদ্যানবাটী। এখানে ঠাকুরের সেবা-শুশ্রূষার প্রস্তুতি শ্যামপুকুরের ব্যবস্থাদি হতে কিছু ভিন্ন করতে হয়। এখান হতে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, রোগীর পথ্য সংগ্রহ করা, সেবকদের জন্য হাটবাজার করা ইত্যাদির জন্য বেশী সেবকের প্রয়োজন হয়। শ্যামপুকুরে ঠাকুরের থাকার সময় সেবকদের কেউ কেউ নিজ বাড়ীতে বাস করতেন, খাওয়া দাওয়া করতেন এবং সময়মত এসে ঠাকুরের সেবাযত্ন করতেন। কাশীপুরে ঠাকুরের স্থান পরিবর্তনের পর এই ব্যবস্থার রদবদল অবশ্যপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। সেবাকার্যের কর্মীদের সম্বন্ধে লিখেছেন অন্যতম সেবক কালী-প্রসাদ (স্বামী অভেদানন্দ): '(কাশীপুরে) প্রথম প্রথম আমরা দুই তিন জন শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাশুশ্রূষা করিতাম, শ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য পথ্য রন্ধন করিতেন। গোলাপমা ও লক্ষ্মীদিদি শ্রীমাকে সাহায্য করিতেন। গোলাপমা সেবকদিগের জন্য পাক করিতে লাগিলেন।[২] ক্রমে সেবকগণের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তখন একটি পাচকব্রাহ্মণ ও একজন দাসীও নিযুক্ত করা হইয়াছিল।' (আমার জীবনকথা, পৃঃ ৮০)।

অপর একজন সেবক শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) লিখেছেন: 'শ্যামপুকুরের বাটীতে চারি-পাঁচ জন

---

১ মাষ্টার মশাইয়ের ডায়েরী, পৃঃ ৬২৪।

২ আমার এরূপ ব্যবস্থা প্রথম কয়েকদিনের জন্যই হয়েছিল।

মাত্র জীবনোৎসর্গ করিয়া এই সেবাব্রত আরম্ভ করিলেও কাশীপুরের উদ্যানে উহার পূর্ণানুষ্ঠানকালে ব্রতধারিগণের সংখ্যা প্রায় চতুর্গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।' (লীলাপ্রসঙ্গ, ৫।৩১২)। অপর এক সেবক লাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) বলেছেন: 'ঠাকুরের সঙ্গে হামাদের কাশীপুরে যেতে হল। মা-ও গেলেন। সেখানে লোরেন ভাই, রাখাল ভাই, শরোট্ ভাই, শশী ভাই, (বুড়ো) গোপাল-দাদা, ছোট গোপাল. নিরঞ্জন ভাই, কালী ভাই, বাবুরাম ভাই—এরা সব বাড়ী ছেড়ে রয়ে গেল্লো।' (স্মৃতিকথা, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ২৩৯)। ডিসেম্বর শেষ হবার পূর্বেই তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন যোগীন্দ্র ও তারক। সারদা তাঁর পিতার নির্যাতন সহ্য করেও মাঝে মাঝে দু'একদিন এসে বাস করতেন। হরি, তুলসী, গঙ্গাধর বাড়ীতে থাকতেন, মাঝে মাঝে উদ্যানবাটীতে আসতেন। হরিশ কয়েকদিন থেকে বাড়ী ফিরে যান, তাঁর মাথার গণ্ডগোল দেখা দেয়। তাছাড়াও দুইজন নিকটবর্তী মহিমাচরণ চক্রবর্তীর বাড়ীতে এসে বাস করতেন। সেবক-কর্মীদের সংগঠন ও পরি-চালনের দায়িত্ব নেন নরেন্দ্রনাথ। নেতৃত্বশক্তি তাঁর সহজাত, সমবয়সীদের প্রতি সখ্য ও অমল ভালবাসা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। নরেন্দ্রনাথ এগিয়ে আসেন। সামনে তাঁর আইন-পরীক্ষা। তাছাড়াও জ্ঞাতি-শত্রুদের সঙ্গে সম্পত্তি-বন্টন মামলার জন্য তাঁর নিজেদের বাড়ীতে থাকা অত্যাবশ্যক ছিল। তৎসত্ত্বেও তিনি ঠাকুরের সেবার জন্য কাশীপুর উদ্যানবাটীতে বাসের সংকল্প করেন। তিনি স্থির করেন, কাশীপুরে অবসর সময়ে পরীক্ষার পাঠ তৈরি করবেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল, আইনব্যবসা অবলম্বন করে কয়েকবছরের মধ্যে বিধবা জননী ও ভাইদের গ্রাসাচ্ছাদনের একটা ব্যবস্থা করবেন এবং তারপরই সংসার ছেড়ে ঈশ্বরারাধনায় ডুব দিবেন। নরেন্দ্রের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য যুবক ভক্তেরা এগিয়ে আসেন। তাঁদের কারু ছিল পড়াশুনা বা পরীক্ষা, কারু ছিল চাকুরী, আবার অধিকাংশের ক্ষেত্রে ছিল অভিভাবকদের কড়া শাসন। সব কিছু বাধা ঠেলে তাঁরা উপস্থিত হন কাশীপুরে। তাঁদের আকর্ষণ, প্রচণ্ড আকর্ষণ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অতুলনীয় ভালবাসা। ঐ ভালবাসার জন্যই তাঁরা সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে আবার সর্বস্ব ফিরে পান। কাশীপুরে প্রথম কয়েকদিনের একটি চিত্র এঁকেছেন স্বামী সারদানন্দ। তিনি লিখেছেন: 'যুবক ভক্তদিগের অনেকেই সকল কার্যের শৃঙ্খলা না হওয়া পর্যন্ত নিজ নিজ বাটীতে স্বল্পকালের জন্যও গমন করে নাই। নিতান্ত আবশ্যকে যাহাদিগকে যাইতে হইয়াছিল তাহারা কয়েক ঘণ্টা বাদেই ফিরিয়াছিল এবং বাটীতে সংবাদটাও কোনরূপে দিয়াছিল যে, ঠাকুর সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত তাহারা পূর্বের ন্যায় নিয়মিতভাবে বাটীতে আসিতে ও থাকিতে পারিবে না। কাহারও অভিভাবক যে ঐ কথা জানিয়া প্রসন্নচিত্তে ঐ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করেন নাই, ইহা বলিতে হইবে না। কিন্তু কি করিবেন ছেলেদের মাথা বিগড়াইয়াছে, ধীরে ধীরে তাহাদিগকে না ফিরাইলে হিত করিতে বিপরীত হইবার সম্ভাবনা—এইরূপ ভাবিয়া তাহাদিগের ঐরূপ আচরণ কিছুদিন কোনরূপে সহ্য করিতে এবং তাহাদিগকে ফিরাইবার উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত রহিলেন।' (লীলাপ্রসঙ্গ, ৫।৩৮৮-৯)।

যুবক সেবকেরা কাশীপুরে এসে জুটেছিলেন হৃদয়ের টানে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের 'পরাণ-পুতলি'। তাঁদের সেবা ছিল, দরদের সেবা, প্রাণঢালা সেবা। এই সেবাব্রতীদের মধ্যে কাজকর্ম বিভাগ করে দেন ও তাঁদের তদারক করেন নেতা নরেন্দ্রনাথ। সেবাব্রতীদের কারু উপর দায়িত্ব পড়ে প্রতিদিন এক বা

একাধিকবার চিকিৎসকের কাছে যাওয়া, কারু উপর দায়িত্ব পড়ে কলকাতার বাজার থেকে রোগীর জন্য পথ্য ও ঔষধ সংগ্রহ করা, অপর কারু উপর দায়িত্ব পড়ে সেবকদের জন্য বরাহনগর হতে বাজার করা, প্রতিদিন ঘরবাড়ি পরিষ্কার করা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু প্রায় সকল সেবকের মুখ্য কর্তব্য ছিল পালাক্রমে রোগীর সেবাশুশ্রূষা করা। কিন্তু শুধুমাত্র কর্তব্যকর্মের মধ্যে তাদের দৈনন্দিন জীবন সীমাবদ্ধ ছিল না। সেবাব্রতীদের প্রত্যেকের জীবন-সরোবরে ক্রমেই বিকশিত হয়ে উঠছিল অধ্যাত্ম-পদ্ম; ক্রমেই তাঁদের জীবনাধার প্রদীপ্ত হয়ে উঠছিল রামকৃষ্ণ-ভাবাগ্নিতে। সেবাব্রতীদের প্রায় অজ্ঞাতসারে দানা বেঁধে ওঠে বিশাল সম্ভাবনাপূর্ণ এক গোষ্ঠীজীবন। সেবাব্রতী-দের তদানীন্তন জীবনের ভাবরূপটি এঁকেছেন স্বামী সারদানন্দ। তিনি লিখেছেন: 'ঠাকুরের সেবাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে নরেন্দ্র তাহাদিগকে ধ্যান, ভজন, পাঠ, সদালাপ, শাস্ত্রচর্চা ইত্যাদিতে এমনভাবে নিযুক্ত রাখিতে লাগিলেন যে পরম আনন্দে কোথা দিয়া দিনের পর দিন যাইতে লাগিল তাহা তাহাদিগের বোধগম্য হইতে লাগিল না। একদিকে ঠাকুরের শুদ্ধ নিঃস্বার্থ ভালবাসার প্রবল আকর্ষণ, অন্যদিকে নরেন্দ্রনাথের অপূর্ব সখ্যভাব ও উন্নত সঙ্গ একত্র মিলিত হইয়া তাহাদিগকে ললিতকর্কশ এমন এক মধুর বন্ধনে আবদ্ধ করিল যে এক পরিবার-মধ্যগত ব্যক্তিসকল অপেক্ষাও তাহারা পরস্পরকে আপনার বলিয়া সত্য সত্য জ্ঞান করিতে লাগিল। সুতরাং নিতান্ত আবশ্যকে কেহ কোনদিন বাটীতে ফিরিলেও ঐ দিন সন্ধ্যায় অথবা পরদিন প্রাতে তাহার এখানে আসা এককালে অনিবার্য হইয়া উঠিল।'

(লীলাপ্রসঙ্গ, ৫।৩৮৫)।

খরচপত্রের দায়িত্ব নিয়েছিলেন বলরাম, সুরেন্দ্র, রাম, গিরিশ, মহেন্দ্র প্রমুখ প্রবীণ গৃহস্থ ভক্তগণ। ঠাকুরের ইচ্ছানুসারে সুরেন্দ্র বাড়ী-ভাড়ার ও বলরাম রোগীর পথ্যের খরচপত্রের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। দক্ষিণেশ্বর ছাড়ার পূর্বে ঠাকুর বলরামকে ডেকে বলেছিলেন: 'দেখ, দশজনে চাঁদা করিয়া আমার দৈনন্দিন ভোজনের বন্দোবস্ত করিবে এটা আমার নিতান্ত রুচিবিরুদ্ধ, কারণ কখনও ঐরূপ করি নাই। ··· চিকিৎসার জন্য যতদিন দক্ষিণেশ্বরের বাহিরে থাকিব ততদিন আমার খাবারের খরচটা তুমিই দিও।' (লীলা-প্রসঙ্গ, ৫।৩৮৩-৪)। সেবক লাটুর কথাতেও পাই: 'সুরেন্দর বাবু বাড়ীভাড়া দিতেন, বলরাম-বাবু ঠাকুরের পথ্য দিতেন, রামবাবু হামাদের সব খরচখরচা দিতেন।' (স্মৃতিকথা, পৃ: ২৩৯)। কাশীপুর উদ্যানবাটীর সেবকদের ও অতিথিবর্গের খরচপত্রের জন্য গৃহীভক্তেরা চাঁদা দিতেন এবং এবিষয়ে পরস্পর আলাপ আলোচনার জন্য গৃহী ভক্তেরা বলরামভবনে বা রামচন্দ্রের বাড়ীতে মিলিত হতেন। গৃহীভক্তগণেরও আন্তরিকতা ও সেবানিষ্ঠা ছিল আদর্শস্থানীয়।[১] রামচন্দ্র ছিলেন বিচক্ষণ ও কর্মপটু। সেকারণে প্রথমদিকে 'রামদাদার নেতৃত্বেই কাশীপুরের বাগান একরকম চলিয়াছিল, যদিও সঙ্গে সঙ্গে অপর প্রধান ভক্তেরাও

---

১ গৃহীভক্তদের তখনকার মনের ভাবটি ফুটে উঠেছে ভক্ত মনমোহনের তাঁর স্ত্রীকে লেখা একটি চিঠিতে। তিনি লিখেছেন, 'এখন টাকার বড় টানাটানি, খুব হিসাব করিয়া খরচ-পত্র করিবে। একটি পয়সাও যেন বাজে খরচ না হয়। যে পয়সাটি বাজে খরচ করিবে, জানিও তাহা প্রভুর সেবাকার্যে লাগাইতে পারিলে না। এখন প্রভুর সেবার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। যুবকগণ প্রাণপণে সেবা করিতেছে, তাহাদের সেবাকার্য দেখিলে আনন্দ হয়—যাহাতে অর্থাভাবে এই সেবাকার্যটি অচল হইয়া না পড়ে তাহা আমাদের দেখা অবশ্য কর্তব্য।'

(ভক্ত মনমোহন, পৃ: ১৫৭)

থাকিতেন।' (মহেন্দ্রনাথ দত্ত : গুরুপ্রাণ রামচন্দ্রের অনুধ্যান, পৃঃ ৪১)।

শ্যামপুকুরের ন্যায় ঠাকুরের পথ্যপ্রস্তুতির দায়িত্ব শ্রীমা নিজহস্তে গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষ কোন পথ্য তৈরীর প্রয়োজন হলে বুড়োগোপাল, কালীপ্রসাদ প্রমুখ যে দু'চারজনের সঙ্গে শ্রীমা নিঃসঙ্কোচে কথাবার্তা বলতেন তাঁদের সাহায্যে চিকিৎসকের বিধান তিনি জেনে নিতেন। কাশীপুরে এসে অবধি ঠাকুর অধিকাংশ দিন স্বাভাবিক খাবার খেতে পারেননি। সামান্য কয়েকদিন তিনি দুপুরে ভাত খেয়েছিলেন। দিনের বেলা অধিকাংশ দিন তাঁর আহার ছিল ভাতের মণ্ড ও ঝোল। তিনি রাত্রে আহার করতেন সাধারণতঃ সুজি বা ভার্মিসেলি (vermicelli) সিদ্ধ দুধ। কিন্তু শ্লেষ্মাধিক্য ঘটলে এই সামান্য পথ্যও তিনি গ্রহণ করতে পারতেন না। মধ্যাহ্নের কিছু পূর্বে ও সন্ধ্যার কিছু পরে শ্রীমা ঠাকুরের ঘরে গিয়ে তাঁকে খাওয়াতেন।

এইরকম একটি দিনের মধুর স্মৃতির এক টুকরো লিখে রেখেছিলেন স্বামী সারদানন্দ তাঁর ডায়েরীতে : "ঠাকুর কাশীপুরে যখন—শ্রীমা একদিন তাঁকে খাওয়াতে উপরে গেছেন—কথায় কথায় ঠাকুর বললেন—'অষ্টা-কষ্টা' খেলেছ ? (পল্লীর একপ্রকার কড়ি-খেলা)।

শ্রীমা : না।

ঠাকুর : তাতে যুগ বাঁধলে আর সে গুটিদের কাটা যায় না, সেইরূপ ইষ্টের সঙ্গে যুগ বাঁধতে হয়, তাহ'লে আর ভয় থাকে না। নইলে পাকাগুটি হয় আর ক্যাঁচ করে কেটে দেয়। ইষ্টের সঙ্গে যুগ বেঁধে সংসারে চললে আর কাটা যাবার ভয় থাকে না।

শ্রীমা এসব কথাও শুনছেন, আবার এটা ওটা ঠাকুরের কাজও করছেন। তাই দেখে ঠাকুর ঐ সব কথা বলতে বলতে রহস্য করে বললেন : অ মাসী ! শুনচুস ? না—এইটি ?

শ্রীমা বলেন : আমি অবাক্।" (স্বামী সারদানন্দ : ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, পৃঃ ৩)।

এই সময়কার একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ পাই শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্মৃতিকথা'তে : 'কাশীপুরে গোড়াগুড়ি মা ঠাকুরের সব পথ্য আর আহার নিজের হাতে তৈরী করতেন। বাকী একদিন তিনি দুধের বাটী নিয়ে সিঁড়ি উঠতে উঠতে পড়ে গেলেন। দুধ ত গেলই, আউর মায়ের পাও মচ্‌কে গেলো। বাবুরামভাই আর লোরেনভাই দু'জনে ধরে মাকে ঘরে নিয়ে গেলো। মায়ের পা খুব ফুলে উঠলো। তখন হামাদের বড় মুশ্‌কিল হোলো। ওনার পথ্য কে রাঁধবেন ? রামবাবু একজন বামুন[১] পাঠিয়ে দিলেন ; সেই-ই ঠাকুরের পথ্য তৈরী করতে লাগলো আর হামাদের সব রান্না-বান্না করতে লাগলো।' (পৃঃ ২৪০-১)। এই ঘটনার মধ্যে রঙ্গপ্রিয় ঠাকুরের ভূমিকা উল্লেখ করে শ্রীমা বলেছিলেন : "একদিন কাশীপুরে আড়াই সের দুধশুদ্ধ একটা বাটি নিয়ে সিঁড়ি উঠতে গিয়ে আমি মাথা

১ কথামৃতকার ২২।৪।৮৬ তারিখের বিবরণীতে লিখেছেন : 'একটি পাচক ব্রাহ্মণ ও একটি দাসী সর্বদা নিযুক্ত আছে।' (কথামৃত, ২।২৭।১)। ভগিনী দেবমাতা তাঁর 'Sri Ramakrishna & His Disciples' গ্রন্থে (পৃঃ ১৫২-৩) স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর স্মৃতি অধ্যাহার করে লিখেছেন যে, পাচক ব্রাহ্মণটি ঠাকুরের গ্রামের। রান্নাবান্না প্রায় কিছুই জানত না। কিন্তু সে ছিল সরলপ্রাণ। একদিন সে ঠাকুরের ঘরে ঠাকুরের পথ্য নিয়ে গেছে। খাবার সামনে রেখেই সে পালাতে চায়। ঠাকুর তাকে বসতে বলেন, তারপর ভাবের বশে তাকে স্পর্শ করেন। রাঁধুনি বামুন গভীর ভাবস্থ হয়ে পড়ে। প্রায় দু'ঘণ্টা পরে তার ভাবের ঘোর কাটে। তখনও ভাবের ঘোরে তার চোখ রক্তবর্ণ। শশীকে জিজ্ঞাসা করেন 'আমি কোথায় ?' ঠাকুরের নির্দেশে শশী তাকে তার ঘরে পৌঁছে দেন।

ঘুরে পড়ে গেলুম। দুধ ত গেলই, আমার পায়ের গোড়ালির হাড় সরে গেল। নরেন বাবুরাম এসে ধরলে। পরে পা খুব ফুলে উঠল। ঠাকুর তাই শুনে বাবুরামকে বলছেন 'তাই ত বাবুরাম, এখন কি হবে, খাওয়ার উপায় কি হবে? কে আমায় খাওয়াবে?' তখন মণ্ড খেতেন। আমি মণ্ড তৈরী করে উপরের ঘরে গিয়ে তাঁকে খাইয়ে আসতুম। আমি তখন নথ পরতুম, তাই বাবুরামকে নাক দেখিয়ে হাতটি ঘুরিয়ে ঠারে ঠোরে বলছেন, 'ও বাবুরাম, ঐ যে ওকে তুই ঝুড়ি করে মাথায় তুলে এখানে নিয়ে আসতে পারিস?' ঠাকুরের কথা শুনে নরেন, বাবুরাম ত হেসে খুন! এমনি রঙ্গ তিনি এদের নিয়ে করতেন। তারপর তিন দিন পরে ফোলাটা একটু কমলে ওরা আমাকে ধরে ধরে নিয়ে যেত—আমি খাইয়ে আসতুম। ও-কয়দিন গোলাপ না কে মণ্ড তৈরী করে দিয়েছিল, নরেন খাইয়ে দিত।" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬-৭)।

সেবক কালীপ্রসাদ সংগৃহীত আরেক টুকরো স্মৃতি উদ্ধার করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন: 'দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীঠাকুরের গায়ে তৈল মাখাইয়া গাড়ী-বারান্দার ছাদের উপর জলচৌকিতে বসাইয়া স্নান করাইতাম। স্নানের সময় ও পরে কত কথাই না তিনি বলিতেন এবং গভীর অধ্যাত্মতত্ত্ব-সমূহ বুঝাইয়া দিতেন। একদিন একটি ছোট কাঠি লইয়া দেয়ালের বালির উপর একটি পাখী বসিয়া আছে তাহা অতি সুন্দরভাবে আঁকিলেন। পাখীটি জীবন্ত পাখীর ন্যায় দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়া রহিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন: আমি ছেলেবেলায় সব পটোকে ছবি এঁকে অবাক্ করে দিতাম।' (আমার জীবনকথা, পৃঃ ৮২)।

আরেক টুকরো স্মৃতি উপহার দিয়েছেন সেবক শশী, বইয়ের পাতায় লিখেছেন ভগিনী দেবমাতা। শয়ন ঘরের টালির মেঝেতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন দীর্ঘকাল বসে একাগ্রমনে আঁকজোক করছিলেন। দেবমাতা লিখেছেন "His attention was so fixed, his thought so abstracted, that no one dared approach or ask him what he was doing, but undoubtedly he was solving some profound problems of life. No one ever learnt what it was and Sri Ramkrishna himself never referred to it" (Sri Ramakrishna & His Disciples, p 151)।

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে আসার পাঁচ ছয়দিনের মধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অনেকটা সুস্থ বোধ করতে থাকেন। শীতের নির্মল আকাশ, কাঁচা মিঠে রোদ। বাগানে ফুল ফলের গাছ সব অপরাহ্নের আলোতে ঝলমল করছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাগানে বেড়াবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেবকদের খুব আনন্দ হয়। গরম বনাতের কোট, মাথাবন্ধ টুপি, মোজা, চটিজুতো পরে ও একটি ছড়ি হাতে তিনি সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসেন। তিনি বাগানের পথে কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়ান।[1] গাছপালা ফুল-ফল সব কিছু দেখেই বালকের মত আনন্দ প্রকাশ করেন। সেবকেরা ভাবেন, ঠাকুর এভাবে প্রতিদিন বেড়াতে পারলে তাড়াতাড়ি সুস্থ ও সবল হয়ে উঠবেন। ভক্তেরাও ঠাকুরের বেড়ানোর সংবাদ শুনে আশান্বিত হন। কিন্তু তাঁদের আশা অপূর্ণই থেকে যায়। কারণ

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩৮১ ও ৩৯২ দ্রষ্টব্য। লীলাপ্রসঙ্গ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১১৮ অনুসারে পাই ঠাকুর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারীর পূর্বে 'এখানে আসা অবধি বাটীর বিতল হইতে একদিন একবারও নীচের তলে নামেন নাই বা বাগানে বেড়াইয়া বেড়ান নাই।' পূর্বাপর ঘটনাবলী বিচার করে পঞ্চম খণ্ডে প্রকাশিততথ্য গ্রহণযোগ্য মনে হয়।

বাইরের ঠাণ্ডা লেগেই হোক্ বা অন্য কোন কারণেই হোক্ পরদিন হতে ঠাকুর বেশী দুর্বলতা বোধ করেন, তাঁর কাশি বেড়ে যায়।

ঠাকুরের ঠাণ্ডার ভাবটা দু'তিন দিনের মধ্যেই কেটে যায়, গলার অতিরিক্ত ব্যথাও কমে যায়। কিন্তু দুর্বলতা কমে না। ডাক্তারেরা নির্দেশ দেন যে, রোগীকে প্রতিদিন কচি পাঁঠার মাংসের সুরুয়া খেতে দিতে হবে। একটি সর্তে ঠাকুর এই পথ্য গ্রহণ করতে সম্মত হন। তিনি সেবকদের বলেন: 'ছাখ্, তোরা যে দোকান থেকে পাঁঠার মাংস কিনে আনবি, দেখবি সেখানে কসাই-কালী-মূর্তি[১] যদি না থাকে তাহলে মাংস কিনিস্নি। যে দোকানে কসাই-কালীর প্রতিমা থাকবে সেই দোকান থেকে মাংস আনবি।' (আমার জীবনকথা, পৃ: ৮১)। একজন সেবক প্রতিদিন সকালে গিয়ে ঠাকুরের নির্দেশ অনুযায়ী মাংস কিনে আনতেন। শ্রীমা মাংস কয়েক ঘণ্টা সিদ্ধ করে ও কাপড়ে ছেঁকে সুরুয়া প্রস্তুত করতেন।[২] মাংসের সুরুয়া ব্যবহার করে ঠাকুরের দুর্বলতা অনেকটা কমে, তিনি পূর্বাপেক্ষা সুস্থ বোধ করেন। তাঁর কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যোন্নতি লক্ষ্য করে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারও আনন্দ প্রকাশ করেন। 'পুলকিত অতিশয় মহেন্দ্র ডাক্তার। ভাবিলা সম্যগারোগ্য শ্রীপ্রভু এবার॥' (পুঁথি, পৃ: ৬১৩)।

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের রোগের চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা নিষ্ঠার সঙ্গে চলতে থাকে। সেই সঙ্গে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পাঞ্চভৌতিক দেহ ছেড়ে নির্বাচিত ভক্তদের মধ্যে অনুস্যূত তাঁর শক্তির সাহায্যে লোক-সংগ্রহের কার্যসূচী প্রসার করবেন, এরূপ সঙ্কল্প করে ব্যাপক প্রস্তুতি করতে থাকেন। 'বহুজন-হিতায় বহুজনসুখায়' অবতারপুরুষের জীবনচর্যা। তার জন্য যোগ্য কর্মী বাছাই করে তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা দিতে সুরু করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে লভিয়া জীবন জাগরিত হয় শ্রীভগবানের নির্বাচিত সেনাদল। এই ব্যাপক প্রস্তুতি-পর্ব নরেন্দ্র-কেন্দ্রিক। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে দেখিয়ে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে বলেছিলেন: 'কথায় বলে অদ্বৈতের হুঙ্কারেই গৌর নদীয়ায় এসেছিলেন; সেরূপ ওর (নরেন্দ্রর) জন্যই তো সব গো!' নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের নয়নের মণি। নরেন্দ্রের প্রশংসায় শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চমুখ। তিনি বলেন: 'এতো ভক্ত আসছে, ওর মত একটিও নাই।' 'পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল', 'অন্যেরা কলসী ঘটী এসব হতে পারে—নরেন্দ্র জালা', 'ডোবা পুষ্করিণীর মধ্যে নরেন্দ্র বড় দীঘি—যেমন হালদার পুকুর', 'মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙা চক্ষু রুই—আর সব···পোনা কাঠি বাটা ইত্যাদি।'

নরেন্দ্র ক্রমে ক্রমে বিবেকানন্দে রূপান্তরিত

---

১ পূর্বে কলকাতায় কালীস্থানের ছড়াছড়ি ছিল। কালীস্থানে মা কালীর প্রতিমার সামনে পাঁঠার মাংস বিক্রি হত। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে কলকাতা করপোরেশন বিনা লাইসেন্সে পাঁঠা-কাটা নিষিদ্ধ করে এবং কালীস্থানগুলিকে লাইসেন্স দিতে অরাজী হয়। এর বিরুদ্ধে হিন্দুরা তীব্র আপত্তি জানায়। শেষ পর্যন্ত খাঁটি কালীস্থানগুলিতে কালীপ্রতিমার সামনে বিধিপূর্বক পাঁঠাবলি দিতে ও মাংস বিক্রি করতে অনুমতি দেওয়া হয়। ভুয়ো কালীস্থানগুলি উঠে যায়। (S. W. Goode : Municipal Calcutta, 1916, pp. 308-9)

২ শ্রীশ্রীমা বলেছেন: 'আমি যখন ঠাকুরের জন্য রাঁধতুম কাশীপুরে, কাঁচা জলে মাংস দিতুম, কখনো তেজপাতা ও অল্প মশলা দিতুম, তুলোর মত সিদ্ধ হলে নামিয়ে দিতুম।' (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃ: ১০৭)

'মাংসের যুষ হত। ছুটো মরা কুকুর তার ছিবড়ে খেয়ে এই মোটা হল!'

(শ্রীশ্রীমায়ের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৩৪)

হতে চলেছেন। রূপান্তরের পথে প্রতিটি পর্যায় গুরুত্বপূর্ণ, তার শৈলী-সমীক্ষা মননযোগ্য। কাশীপুর উদ্যানবাটীর প্রাঙ্গণেই সংঘটিত হয় সেই রূপান্তরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এবং সংঘটিত হয় আলোচ্য কাশীপুরের প্রথম পর্বেই।

কাশীপুরে আসার সাত-আট দিনের মধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসা ও পরিচর্যার কাজ সুশৃঙ্খলভাবে চলতে থাকে। নরেন্দ্র স্থির করেন, দু-একদিনের জন্য বাড়ী যাবেন। তিনি তাঁর সকল সহকর্মীদের জানিয়ে ঘুমাতে যান। রাত গভীর হয়। চিন্তায় ভাবনায় তাঁর ঘুম হয় না। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন। শরৎ, গোপাল প্রমুখ কয়েকজনকে ডেকে তোলেন। তাঁরা বাগানের পথে পায়চারি করতে থাকেন, থেলো হুঁকোতে তামাক টানেন। শীতের রাত। চারিদিক নীরব। পৃথিবী যেন ধ্যানমগ্ন। তখন নরেন্দ্রনাথের গম্ভীর ভাব। কিছুক্ষণ পরে নরেন্দ্র বলেন: 'ঠাকুরের যে ভীষণ ব্যাধি, তিনি দেহ রক্ষার সংকল্প করিয়াছেন কিনা কে বলিতে পারে? সময় থাকিতে তাঁহার সেবা ও ধ্যান-ভজন করিয়া যে যতটা পারিস্ আধ্যাত্মিক উন্নতি করিয়া নে, নতুবা তিনি সরিয়া যাইলে পশ্চাত্তাপের অবধি থাকিবে না। এটা করিবার পরে ভগবানকে ডাকিব, ওটা করা হইয়া যাইলে সাধন-ভজনে লাগিব, এইরূপেই ত দিনগুলা যাইতেছে এবং বাসনাজালে জড়াইয়া পড়িতেছি। ঐ বাসনাতেই সর্বনাশ, মৃত্যু—বাসনা ত্যাগ কর্, ত্যাগ কর্।' (লীলাপ্রসঙ্গ, ৫।৩৮৯)।

নরেন্দ্রের বৈরাগ্য-নির্ধূত মনের ঝলক সঙ্গীদের মনে আলোড়ন তোলে। তাঁরা একটি গাছের তলায় বসেন; তখন তাঁদের মন অন্তর্মুখ। তাঁরা নিকটেই দেখতে পান জাম্রা শুকনো ডালপালার একটি স্তূপ। কয়েক দিন হয় বাগান পরিষ্কার করা হয়েছিল। শুকনো ডাল, ঝরা পাতা একত্র করে মাঝে মাঝে স্তূপ করা হয়েছিল। প্রত্যুৎপন্নমতি নরেন্দ্র বলেন: 'দে এতে আগুন লাগিয়ে। সাধুরা এমনি নিশুতি রাতে গাছতলায় ধুনি জ্বালায়। আমরাও ধুনি জ্বালিয়ে অন্তরের সুপ্ত বাসনাগুলি পুড়িয়ে মারব।' আগুন জ্বলে ওঠে, ঊর্ধ্বমুখী ধক্ ধক্ শিখা নবীন সাধকদের অন্তরে আগুন ধরিয়ে দেয়, তাঁদের মুখে ফুটে ওঠে দৃঢ় সংকল্পের ছাপ। তাঁরা চারপাশ হতে শুকনো ডাল-পাতা কুড়িয়ে আগুনে দেন,[১] মনে মনে ভাবেন মনবৃক্ষের বাসনাপত্রগুলিকে পবিত্র অগ্নি-কুণ্ডে আহুতি দিচ্ছেন। এক দিব্য আনন্দে সকলের মন প্রাণ হয় প্রবুদ্ধ, তাঁদের শুভ বৃত্তিগুলি হয় ঊর্ধ্বায়িত। বাসনার আবর্জনা পুড়িয়ে নির্মুক্তি এক পথ ধরে ভগবৎ-সমীপে তাঁরা অগ্রসর হচ্ছেন, এই ভাবটিতে তখন তাঁদের মন ভরপুর। ভাবের উল্লাসে তাঁদের সময়ের খেয়াল থাকে না। এক সময়ে শুকনো ডাল-পাতা ফুরিয়ে যায়, ক্রমে অগ্নি শান্ত হয়। তখন রাত প্রায় চারটা। তাঁরা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েন। পরদিন সকালে ঘটনা শুনে অন্যান্য ব্রহ্মচারী ভক্তেরা আক্ষেপ করতে থাকেন। নরেন্দ্র তাঁদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেন: 'আমরা আগে থেকে প্ল্যান করে করিনি, আর এতে এত আনন্দ পাব তাও জানতাম না। এখন থেকে অবসর পেলেই সকলে মিলে ধুনি জ্বালাব, ভাবনা কি?' সকালেই নরেন্দ্র বাড়ী চলে যান এবং একদিন পরেই কয়েকখানি আইনের পুস্তক নিয়ে কাশীপুরে ফিরে আসেন।

এর পর মাঝে মাঝে গভীর রাতে ধুনি জ্বালান হত। সেইসঙ্গে চলত জপধ্যান রাতভোর। তরুণ তাপসেরা সাধনভজনের দিকে ঝুঁকে

---

১ স্বামী অভেদানন্দের মতে তাঁরা 'অগ্নয়ে স্বাহা' মন্ত্রে আহুতি দিয়েছিলেন।

পড়েন, দিশারী শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ-নির্দেশ অনুসরণ করে সাধন-সাগরে অগ্রসর হতে থাকেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যেক তাপসের অগ্রগতির দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখেন ও প্রয়োজন মত উপদেশ-নির্দেশ দিতে থাকেন—দেহের রোগে নিজেকে আচ্ছন্ন রেখে অপর সকলের ভবরোগ নিরাময়ের জন্ম প্রগাঢ় প্রয়াস চালাতে থাকেন; ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সাধনভজন গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে। কাশীপুর উত্থান-বাটী দেহরোগের আরোগ্যভবন হতে ভবরোগ নিরাময়ের পীঠস্থানে রূপান্তরিত হয়। বাগানবাড়ী হয় সাধনপুরী, ভবরোগভঞ্জনের সাধনপীঠ।

দুইজন তাপসের নিম্নোদ্ধৃত বিবৃতি থেকে আমরা সাধকদের জীবনের রূপটি মানসপটে তুলে ধরতে পারি। তাপস কালীপ্রসাদ লিখেছেন: 'সেই অবধি প্রত্যেক রাত্রিতে আমরা আপন আপন পালা বা কর্তব্য শেষ করিয়া পূর্বের ন্যায় আগুন জ্বালাইয়া ধুনির পার্শ্বে বসিয়া ধ্যান, বেদান্তবিচার, গীতাপাঠ ও শাস্ত্রালাপ করিতে থাকিতাম। তাহার পর শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গর ও নির্বাণাষ্টকের শ্লোকগুলি আবৃত্তি ও তাহাদের অর্থের ধ্যান করিতাম। ...তখন কখনও অষ্টাবক্রসংহিতা, যোগবাশিষ্ঠ পাঠ করা হইত, কখনও বা ভাগবতের 'গোপীগীতা' আবৃত্তি করা হইত। নরেন্দ্রনাথ সুমধুর কণ্ঠে রামপ্রসাদী গান, ব্রাহ্মসঙ্গীত এবং শ্রীশ্রীঠাকুর যে সমস্ত গান গাহিতেন সেই সমস্ত গাহিয়া আমাদের সকলকে মাতাইয়া রাখিত। 'আবার কখনও বা আমরা 'জয় রাধে' বলিয়া সংকীর্তনে মাতিয়া নৃত্য করিতাম।' (আমার জীবনকথা, পৃঃ ৮৬)। অপর তাপস তারকনাথ বলেছেন: 'ঠাকুরের তখন কঠিন অসুখ, আর আমাদের প্রাণে তখন তীব্র বৈরাগ্য। ঠাকুরের শরীর এমনই অসুস্থ ছিল যে, দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁর সেবার জন্ম আমরা পালা করে থাকতুম। তাঁর সেবার সম্পূর্ণ ভারই ছিল আমাদের উপর। আর তাঁর সেবার সঙ্গে চলেছিল খুব সাধনভজন। ঠাকুরও সে বিষয়ে আমাদের খুব উৎসাহ দিতেন। পৃথকভাবে প্রত্যেককে ডেকে ভজনসাধন সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন এবং কার কেমন ধ্যান ও দর্শনাদি হচ্ছে সেসব খোঁজ নিতেন। রাত্রে স্বামীজী ধুনি জ্বালিয়ে আমাদের নিয়ে ধ্যানজপ করতেন—কখনও খুব ভজন-কীর্তনও হত। পালা করে ঠাকুরের সেবা আর ধ্যানজপাদিতে সারারাত খুবই আনন্দে কেটে যেত।' (শিবানন্দবাণী, প্রথম ভাগ, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৭২)। [ক্রমশঃ]

আদিগঙ্গা ও শ্রীচৈতন্য

শ্রীপ্রসিত রায় চৌধুরী

[পূর্বানুবৃত্তি]

আদিগঙ্গার তীরে একদিন সমৃদ্ধ সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল। ইটালীয় মহাকবি ভার্জিলের Georgics কাব্যে Gangaridae গঙ্গারিডি বা গঙ্গা-রাঢ়[৭] নামে রাজ্যের উল্লেখ আছে। আদিগঙ্গা ও বিদ্যাধরীনদীর মধ্যবর্তী স্থলে এই রাজ্যের রাজধানী 'গঙ্গে' বন্দরের অবস্থান ছিল বলে অনেকে মনে করেন। সম্প্রতি আদিগঙ্গাতীরে গোবিন্দপুরের (দঃ ২৪ পরগণা) ডাকিনীতলার কাছে 'গাঙ্গড়ে' বলে একটা জায়গার সন্ধান মিলেছে। 'গাঙ্গড়ে' গঙ্গারাঢ়ের অপভ্রংশ হতে পারে। (Gangaridae>গঙ্গারিডি>গঙ্গারাঢ়>গাঙ্গড়ে হ'তে পারে কিনা সেটি গবেষণার বিষয়)। আদিগঙ্গা-তীরের গ্রামগুলিতে, বিশেষ করে বোড়াল ও আটঘরাতে মৌর্য শুঙ্গ গুপ্ত পাল ও সেন যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। গ্রীস ও রোমের সহিত এসব অঞ্চলের ব্যবসাবাণিজ্য চলতো। বারুইপুরের কাছে আটঘরায় গড়ে উঠেছিল একটা Indo-Roman Trading Centre।[৮] মধ্যযুগেও মহারাজা প্রতাপাদিত্যের নৌবাহিনী টহল দিয়ে বেড়াতো আদিগঙ্গায়। মগ, আরাকান, পর্তুগীজ জলদস্যুদের শায়েস্তা করাই ছিল তাদের কাজ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রাচীন মঙ্গলকাব্যগুলিতে আদিগঙ্গার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। জ্যাও ডি ব্যারোসের (Jao de Barros) নক্সায় (১৫৫০) ওলন্দাজ নাবিক Vanden Broucke-এর মানচিত্রে (১৬৬০) আদিগঙ্গার চিহ্ন আছে। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে Renell সাহেবের ম্যাপে আদিগঙ্গার চিহ্ন নেই। আদিগঙ্গা তাহলে গেল কোথায়? প্রাকৃতিক কারণে নদী দিক পরিবর্তন করে। গঙ্গা পূর্বে গৌড় নগরীর উত্তর দিক দিয়ে বয়ে যেত, এখন গৌড়ের দক্ষিণ দিক দিয়ে বইছে। ত্রিবেণীর কাছে ভাগীরথী, সরস্বতী ও যমুনা নামে তিনধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। সরস্বতী প্রবল হয়ে ওঠায় তার তীরে সপ্তগ্রাম সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। পরে সরস্বতী মজে গেলে সপ্তগ্রামের অবনতি হয়। আদিগঙ্গার তীরে ছত্রভোগ সমৃদ্ধ হয়। তারপরে হুগলী ও পরে কলিকাতার সমৃদ্ধি ঘটে। নবাব আলীবর্দি বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ভাগীরথীর ধারাকে সরস্বতীর পুরাতন খাতে খাল কেটে বইয়ে দেন, ফলে আদিগঙ্গা দ্রুত মজে আসে[৯]। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল টলি গড়িয়ার কাছে আড়াআড়ি একটা খাল কেটে[১০] বিদ্যাধরীর ধারার সঙ্গে

---

৭ On the doors will I represent in solid gold and ivory, the battle of the GANGARIDAE, Georgics—(Book III)। গ্রীক পণ্ডিত টলেমীর মানচিত্রে দঃ চব্বিশ পরগণাকে গঙ্গারিডি রাজ্যের অন্তর্গত দেখানো হয়েছে—Dr. D. C. Sirkar : The City of Ganges—The Proceedings of the Indian History Congress, 1947.

৮ The Statesman, Wednesday, April 10, 1957.

৯ ডঃ নীহার রায়, বাঙালীর ইতিহাস, পৃঃ ৯১

১০ কর্ণেল টলির নামানুসারে Tolly's Nullah (টালির নালা) এবং টালিগঞ্জ যথাক্রমে এই খাত এবং বামতীরের পল্লীটির বর্তমান নামকরণ হয়েছে—ডঃ নীহার রায় : বাঙালীর ইতিহাস, পৃঃ ৯৯

আদিগঙ্গার ধারাকে মিশিয়ে দেন, ফলে গড়িয়ার দক্ষিণে আদিগঙ্গার স্রোত দ্রুত বিলুপ্ত হয়। চড়া পড়ে। ধানের ক্ষেত সৃষ্টি হয়। তবু গত শতকেও দেখা যায় আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী ভবানীপুর থেকে তাঁর পৈতৃক গ্রাম মজিলপুরে আসছেন ডিঙিতে, আদিগঙ্গার ক্ষীণ স্রোত ধরে (১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে)।[১১] আর নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁর সুরধুনী কাব্য রচনা করেন ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে। তাতে তিনি লিখেছেন—

'রাজপুর কোদালিয়া মালঞ্চ নগরে।
গঙ্গার নয়ননীরে গঙ্গা ঘরে ঘরে॥'

[বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত (১৩৫১), পৃঃ ১৪৪]।

গঙ্গাকে বাঁধ দিয়ে বেঁধে লোকে পুকুর বানিয়ে ফেলেছে—নাম হয়েছে ঘোষের গঙ্গা, বোসের গঙ্গা। সেই সব পুকুরে স্নান করেই আজও পুণ্যার্থীরা গঙ্গাস্নানের পুণ্য অর্জন করেন। বর্ষাকালে কুলপী রোড (এখন নেতাজী সুভাষ রোড) ধরে বাসে গড়িয়া থেকে দক্ষিণে বারুইপুর, জয়নগর যাবার সময় রাস্তার ধারে ধানক্ষেত আর পুকুরগুলোর দিকে চাইলে দেখা যায়—বর্ষার জলধারা একটা খালের সমান্তরাল রেখা সৃষ্টি করেছে বাস রাস্তার সঙ্গে। এটিই আদিগঙ্গার লুপ্তধারা। এই পথেই একদিন শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। প্রাচীন জনশ্রুতি ও লোককাব্যগুলি সেই কথার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

১১　আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী : আত্মচরিত (সিগনেট প্রেস), পৃঃ ৬৪

এই সেই শুভযোগ

শ্রীমতী প্রীতিময়ী কর, ভারতী

দিবানিশি নাগরিক আলো ঝলমল,
নিয়ত মানবমন করিছে চঞ্চল।
শুধু ধন, শুধু জন, শুধু ভোগ তরে
অন্তর বহিরালোক আকিঞ্চন করে।
নিশীথেও নাহি শান্তি আলো কামনায়,
দেখে না অসীমে চাহি' তারকামালায়।
হৃদয়েতে যেই দীপ জ্বলে অনির্বাণ
সময় মেলে না তার করিতে সন্ধান।
ঘটিয়াছে কালান্তর, নিভে যায় বাতি ;
ঘনাইয়া রহে এই আলোহীন রাতি।
গহন গুহার মাঝে মেলে যে আলোক
নগরী হোক্ সে গুহা, সে অমৃতলোক।

ভারতের প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ

শিবদাস

গত ১৮ই মে সকাল ৮টা ৫ মিনিটে রাজস্থানে মরুপ্রদেশের একাংশে ভারত তার প্রথম আণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এটি ভারতের কাছে একটি বিশেষ গৌরবময় ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, ভারতীয় বিজ্ঞানীদের পরমাণু-বিজ্ঞান ও তৎসংক্রান্ত প্রযুক্তি-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতার পরিচায়ক।

এ নিয়ে দেশে বিদেশে ভাল-মন্দ অনেক অভিমত আমরা শুনেছি। কাজটা কেন ভাল হয়নি, তা অবশ্য আমরা বুঝতে পারছি না এ সব অভিমত পড়েও। যেসব দেশ ভারতের পূর্বেই পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হয়েছে, তাদের কেউ যদি বলে তারা ছাড়া আর কেউ এ-শক্তির অধিকারী হতে পারবে না, তাতে মানবজাতির ভবিষ্যৎ বিপন্ন হবে, অথচ নিজেরা ইতিপূর্বেই গোটা পৃথিবীকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করার মতো পারমাণবিক অস্ত্রের যে বিপুল সম্ভার সঞ্চিত করে রেখেছে তা নষ্ট করা তো দূরের কথা ক্রমবর্ধমান করে চলে, তাহলে সে কথার অর্থ কি? তার অর্থ—আমরাই শুধু শক্তিধর থাকবো, বাকী তোমরা সবাই শক্তিহীন থেকে আমাদের ভয় করে চল। আর ইতিমধ্যে স্তূপীকৃত আণবিক অস্ত্রের উপস্থিতিতে মানবজাতি যেরূপ বিপদের আশঙ্কায় রয়েছে, ভারত বা অন্য কোন দেশ দুচারটে পারমাণবিক অস্ত্র যদি নির্মাণ করেও বা কখনো—যে ভয় হয়তো করছেন অনেকে—তাতে বিপদ আর বেশী কি বাড়বে?

পারমাণবিকবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় কেউ পারদর্শী হ'য়ো না—আজকের দিনের পৃথিবীকে বিপদের (বহু মনীষীর মতে সমূহ ধ্বংসের) হাত থেকে বাঁচাবার পথ এটি নয়। পথ হল মানুষের মনকে উন্নত করা, যাতে সে কখনো নিজের স্বার্থে অপরের মহাঅমঙ্গল—পারমাণবিক শক্তির অপব্যবহার—কখনো না করে। ভারত সেই পথই জগতকে দেখাবে। পারমাণবিক গবেষণার প্রাথমিক পরিকল্পনায় সূত্রপাত থেকে ভারত বারবার বলে আসছে, পারমাণবিক শক্তিকে সে অপর দেশ আক্রমণ করার জন্য ব্যবহার করবে না, এখনো সেই কথাই বলছে—শান্তিপূর্ণ জনকল্যাণের কাজেই তা ব্যবহৃত হবে।

আর একটা অর্থহীন অভিমত হচ্ছে, পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হওয়াও ভারতের পক্ষে অহিংসার আদর্শ থেকে সরে যাওয়া। যাঁরা একথা বলছেন, তাঁরা বোধ হয় ভুলে গেছেন যে, অক্ষমতার জন্য শক্তিমানের অন্যায় অত্যাচার সহ্য করা অহিংসা নয়, তা হল দুর্বলতা, কাপুরুষতা। অহিংসা শক্তিমানের ধর্ম; অত্যাচারের প্রতিকার করার যথেষ্ট শক্তি থাকা সত্ত্বেও নিজেকে সংযত রাখাই অহিংসা। আরো একটা কথা আছে। ক্ষত্রিয়ের কাজ করব অথচ সন্ন্যাসীর আদর্শ মুখে আওড়াবো—এটা আত্মপ্রতারণা, আদর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিরাট ভুল—যে ভুল ধর্মপ্রাণ ভারত কয়েকবার করেছে, এমনকি অর্জুনের মতো পুরুষও করতে উদ্যত হয়েছিলেন। আমরা আশা করি ভারত এ বিভ্রান্তিতে আর পড়বে না, মানবিকতা, আধ্যাত্মিকতা বজায় রেখেও শক্তিমান হবে, স্বামীজীর ঈপ্সিত 'ক্ষাত্রবীর্য ও ব্রহ্মতেজ'-এর সমন্বয় ঘটাবে—শক্তিমান দেবতা হবে, শক্তিমান অসুর নয়, দুর্বলতার আধারও নয়।

আধুনিক বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত মানুষকে যে সব শক্তির সন্ধান দিয়েছে, পারমাণবিক শক্তি হল তার

মধ্যে পরিমাণে সর্বাধিক। পরমাণুর গঠন হল, কেন্দ্রে এক বা একাধিক প্রোটন কণা থাকে, তার চারিদিকে কেন্দ্রস্থ প্রোটনের সমসংখ্যক ইলেকট্রন কণা ঘুরে বেড়ায়। একমাত্র হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে কেবল প্রোটন (একটি) আছে, অপর সব পরমাণুর কেন্দ্রেই প্রোটনের সঙ্গে নিউট্রন নামক দানাও সংযুক্ত থাকে। কেন্দ্রের প্রোটনের সংখ্যার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পদার্থটির রাসায়নিক গুণও পরিবর্তিত হয়; নিউট্রন কণার উপস্থিতি কেবল তার ওজন বাড়ায়, রাসায়নিক গুণের পরিবর্তন ঘটায় না। মোটামুটিভাবে এই হল পরমাণুর গঠন। কেন্দ্রীণে এক থেকে বিরানব্বইটি প্রোটন বিশিষ্ট বিরানব্বইটি স্বাভাবিক মৌলিক পদার্থের পরমাণু আছে।

হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বণ, লোহা, প্রভৃতি বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের কয়েকটি পরমাণু একসঙ্গে মিলে জল, মাটি, কাঠ প্রভৃতি বহু বিচিত্র যৌগিক পদার্থের অণু সৃষ্টি করে। বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুর পরস্পরের এই একত্র হওয়া বা জোট ভেঙ্গে আলাদা হওয়াকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলে। পরমাণুর বাইরে যে ইলেকট্রনগুলি ঘোরে সেগুলিই যেন নিজেরা হাত ধরাধরি করে পরমাণুগুলিকে একত্র রাখে, বা পরস্পর হাত ছেড়ে দিয়ে পৃথক করে। এই রাসায়নিক পরিবর্তন পরমাণুর কেন্দ্রকে স্পর্শ করে না। এই পরিবর্তনের ফলেই কয়লা, কাঠ প্রভৃতি পুড়িয়ে বা অন্যান্য রাসায়নিক পরিবর্তনে আমরা শক্তি আহরণ করি। বস্তুর দৈহিক পরিবর্তনেও আমরা শক্তি পাই— নদীর জলস্রোত বা হাওয়াকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করি, ইত্যাদি।

কিন্তু পারমাণবিক শক্তি এই সব শক্তির চেয়ে বহু বহু গুণ অধিক। পরমাণুর কেন্দ্রস্থ কণাগুলি থেকে দু-একটা সরিয়ে নিতে পারলে, বা তাতে কিছু কণা যোগ করতে পারলে সেই প্রক্রিয়ায় বিপুল শক্তির উদ্ভব হয়। পরমাণুর কেন্দ্রীণকে পরিবর্তিত করাই পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন।

ভারত পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে কেন্দ্রীণ ভেঙে; এই পদ্ধতির নাম 'ফিশন'। বিস্ফোরণের জন্য ব্যবহার করেছে প্লুটোনিয়াম, অবলম্বন করেছে 'ইমপ্লোশন ডিভাইস।'

কতকগুলি মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রীণ খুব বেশী ভারী, সেখানে নিউট্রন কণা দিয়ে জোরে আঘাত করলে কেন্দ্রীণের কিছু ভেঙে বেরিয়ে যায়। প্লুটোনিয়াম ও ইউরেনিয়াম ২৩৫ (কেন্দ্রীণে ৯২টি প্রোটন + ১৪৩টি নিউট্রন) এই জাতীয় ভারী মৌলিক পদার্থ। ভারতের প্লুটোনিয়াম নেই, কিন্তু ইউরেনিয়াম আছে—তবে তাতে ইউরেনিয়াম ২৩৫-এর ভাগ খুবই কম, ইউরেনিয়াম ২৩৮ই (৯২ + ১৪৬) বেশী। এই ইউরেনিয়াম ২৩৮-কে প্লুটোনিয়ামে (৯৪ + ১৪৫) রূপায়িত করা যায়। ভারত এই ভাবেই ট্রম্বের চুল্লীতে প্লুটোনিয়াম তৈরী করেছে।

পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর মধ্যে আরো একটি ব্যাপার আছে। যে পদার্থে এই বিস্ফোরণ ঘটানো হবে, তা একটা বিশেষ পরিমাণের এবং বিশেষ ঘনত্বের হওয়া চাই, যার কম হলে এইভাবে একসঙ্গে অসংখ্য পরমাণু ভেঙে (চেন রিঅ্যাকশন-এর ফল) বিস্ফোরণ ঘটবে না।

আবার, যে পরিমাণ পদার্থে বা তার যে বিশেষ ঘনত্বে বিস্ফোরণ ঘটে, সেভাবে তাকে রাখাও বিপজ্জনক। তাই দুটো পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। প্রথম পদ্ধতি, উপযুক্ত পরিমাণ পদার্থকে কয়েক ভাগ করে পৃথক রাখা হয়, প্রয়োজনের সময় সব এক করে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি, পদার্থের ঘনত্ব উপযুক্ত পরিমাণের চেয়ে কমিয়ে রাখা হয়, প্রয়োজনের সময় চাপ দিয়ে তাকে ঘন করে দেয়া হয়। এই পদ্ধতির নাম 'ইমপ্লোশন ডিভাইস'।

সমালোচনা

শ্রীশ্রীহেমচন্দ্র রায় জন্ম-শতবার্ষিকী স্মারক-গ্রন্থ। প্রকাশক : শ্রীশিবপ্রসাদ সিংহ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, ৪নং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো, কলিকাতা ২৫। ১৯৭৪, পৃঃ ১০০+৬, মূল্য ৩.৫০।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীশ্রীহেমচন্দ্র রায়ের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত এই স্মারক-গ্রন্থটিতে ৭টি প্রবন্ধ, ৪টি কবিতা, ১টি গান এবং ১টি পত্র স্থান পাইয়াছে। প্রবন্ধগুলির মধ্যে শ্রীভক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় লিখিত তথ্যসমৃদ্ধ 'শ্রীশ্রীহেমচন্দ্র স্মৃতিকথা'-প্রবন্ধটিই দীর্ঘতম—প্রায় ৪৬ পৃষ্ঠার। শ্রীশ্রীহেমচন্দ্র রচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দনা'-শীর্ষক ভক্তিভাবপূর্ণ কবিতাটি মঙ্গলাচরণরূপে গ্রন্থারম্ভে মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য ডক্টর হরিশ্চন্দ্র সিংহের 'শ্রীশ্রীহেমচন্দ্রের আত্মসমর্পণ' নামক রচনাটি গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধরূপে গৃহীত হইয়াছে। 'আমার আঁখির আগে'—এই শিরোনামে লিখিত শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসের প্রবন্ধে মহাত্মা হেমচন্দ্র রায়ের জীবনালেখ্যের সঙ্গে সঙ্গে হরিশ্চন্দ্রের গুরুগতপ্রাণতার পরিচয় পাইয়া পাঠক মুগ্ধ হইবেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন: 'জগতের সর্বত্র ঘুরিয়া আসিতে পারো, হিমালয় আল্পস্ ককেসস্ প্রভৃতি অন্বেষণ করিতে পারো, সমুদ্রের তলদেশ আলোড়ন করিতে পারো, তিব্বতের চারিকোণে অথবা গোবি-মরুর চতুর্দিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে পারো, কিন্তু যতদিন না তোমার হৃদয় ধর্ম গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হইতেছে এবং যতদিন না তুমি গুরুলাভ করিতেছ, কোথাও ধর্ম খুঁজিয়া পাইবে না। বিধাতৃনির্দিষ্ট এই গুরু যখনই লাভ করিবে, অমনি বালকবৎ বিশ্বাস ও সরলতা লইয়া তাঁহার সেবা কর, তাঁহার নিকট প্রাণ খুলিয়া দাও, তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে দেখ। যাহারা এইরূপ প্রেম ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সত্যানুসন্ধান করে, তাহাদের নিকট সত্যের ভগবান্ সত্য শিব ও সুন্দরের অতি আশ্চর্য তত্ত্ব-সমূহ প্রকাশ করেন।' যাঁহারা এই গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন তাঁহারা মহাত্মা হেমচন্দ্রের জীবন যে স্বামীজীর উপর্যুক্ত বাণীর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিবেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথকে সদ্‌গুরুরূপে পাইয়া এবং তাঁহারই চরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া ভাগ্যবান্ হেমচন্দ্র এই 'অনিত্য অসুখ' সংসারে স্বয়ং অপার শান্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুরাগী ভক্তগণকেও পরমা শান্তির পথে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিকার লিখিয়াছেন :

'রহস্য কি বুঝা যায়
ব্রজগোপী নরকায়
লয়ে শিরে ভাবের পসরা
অবতীর্ণ প্রভু সনে
লীলাঙ্গনে ধরাধামে
কৃষ্ণপ্রেমে চিত্ত মাতোয়ারা।'

হেমচন্দ্র যে শ্রীগুরুর অনুবর্তী হইয়া গুরুকৃপায় রাগানুগা ভক্তিলাভে কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন, পাঠক তাহার যথেষ্ট পরিচয় গ্রন্থান্তর্গত প্রবন্ধগুলিতে পাইবেন। কয়েকটি প্রবন্ধে একটি বিশেষ ঘটনা স্থান পাইয়াছে : "একদিন কোনও উৎসব

থেকে ফেরার পথে দেবেন্দ্রনাথ ঘোড়ার গাড়ী করে (কিঞ্চিৎ অসুস্থ) হেমচন্দ্রকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে ইণ্টালিতে নিজের গৃহে চলে গেলেন। হেমচন্দ্র শুয়ে পড়লেন। কিন্তু খানিক পরে হঠাৎ তাঁর মনে হল 'আমি তো বেশ আরাম করে শুয়ে আছি, কিন্তু গুরুদেব? তিনি বাতের রোগী কেউ সাহায্য না করলে তো গাড়ী থেকে নামতে পারবেন না। গাড়ী তো বাড়ীর সামনে যাবে না, তবে কি হবে?' এই কথা মনে হওয়ামাত্র হেমচন্দ্র শয্যাত্যাগ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ভবানীপুর থেকে ইণ্টালি ছুটলেন। তখন মধ্যরাত্রি, টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। গুরুগতপ্রাণ হেমচন্দ্র সে সব গ্রাহ্যই করলেন না। গুরুগৃহে গিয়ে তিনি দেখে নিশ্চিন্ত হলেন যে, গুরুদেব সময়মত পৌঁছে, বসে তামাক খাচ্ছেন। তাঁর এই আকস্মিক আগমনের কারণ জেনে গুরুদেব বলেছিলেন, 'তোর আজ আমার জন্য মনের মধ্যে যে রকম করছিল, রাধারাণীর মন অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণের জন্য ঐ রকম কর্‌কর্‌ করত'।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে অহেতুকী কৃপা মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথের মাধ্যমে হেমচন্দ্রে সঞ্চারিত হইয়াছিল, পরবর্তী কালে তাহাই হেমচন্দ্রের মাধ্যমে গৃহী ও ত্যাগী উভয়বিধ ভক্তগণে সঞ্চারিত হইয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছে। শ্রীশিবপ্রসাদ সিংহ তাঁহার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন: 'শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সেই আসক্তিহীন ভালবাসার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তরঙ্গ শিষ্যপরম্পরায় নিত্য প্রবহমান এবং শ্রীশ্রীহেমচন্দ্রের জীবন সেই প্রবাহেরই একটি কালজয়ী ধারা।' ইহা অতীব সত্য। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সকলেরই ভক্তিভাব বর্ধিত হইবে।

কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে গ্রন্থখানির মূল্য যথাসম্ভব কম রাখা হইয়াছে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

যুগশঙ্খ: বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির পত্রিকা, মালদহ। পৃ: ৭৫ + ৯ + ৩০।

মালদহ রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পত্রিকা 'যুগশঙ্খ'। ঊনবিংশ-বিংশ (১৯৭২-৭৩) বর্ষের এই সংখ্যাটি ২৮টি প্রবন্ধ গল্প ও কবিতায় সমৃদ্ধ। সবগুলিই বাংলায় রচিত। ছাত্রদের রচনাশৈলী ও চিন্তাশক্তির বিকাশের মাধ্যম হিসাবে আলোচ্য পত্রিকাখানি একটি সার্থক প্রয়াস।

ছাত্রদের লিখিত 'শ্রীঅরবিন্দ', 'রামমোহন ও বিবেকানন্দ', 'শ্রীম প্রসঙ্গে' শ্রদ্ধালু চিত্তের, 'প্রাণীদের চলাফেরা,' 'নীরব শব্দ', 'ভবিষ্যৎ পৃথিবীর শক্তির উৎস' বিজ্ঞান চেতনার এবং 'প্রাচীন একটি উৎসব ও লোকগীতি: গম্ভীরা' স্থানীয় সামাজিক জীবন-সম্পর্কে বাস্তব দৃষ্টির পরিচয় বহন করছে। 'মালদহ জেলার পূজা পার্বণ ও মেলা'-শীর্ষক প্রবন্ধে মালদহ জেলার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিয়েছেন শিক্ষক শ্রীসুভাষ দে সরকার। ছোটদের লেখা গল্প ও কবিতাগুলিও বিশেষ উপভোগ্য।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব

প্রার্থনাগৃহ প্রতিষ্ঠা উৎসব

মেদিনীপুর: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ২৩শে এপ্রিল হইতে ২৮শে এপ্রিল পর্যন্ত মহাসমারোহে একটি প্রার্থনাগৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দজী ও অন্যতম সহকারী সম্পাদক স্বামী চিদাত্মানন্দজী-প্রমুখ বহু সাধু ব্রহ্মচারীর সমাগম হয়। ২৫শে এপ্রিল শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজ একটি বিরাট শোভাযাত্রার মাধ্যমে পুরাতন মন্দির হইতে নবনির্মিত প্রার্থনাগৃহে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিভিন্ন দিনে নগর পরিক্রমা, মণ্ডপ-অর্চনা, বাস্তুযাগ ও অধিবাস, এবং রুদ্রযাগ ও হোমাদি সম্পন্ন হয়। ২৫শে সন্ধ্যায় ধর্মসভায় স্বামী গম্ভীরানন্দ (সভাপতি) ও স্বামী চিদাত্মানন্দ ভাষণ দেন। ২৬শে এপ্রিল পূর্বাহ্নে সপ্তশতী হোম ও মধ্যাহ্নে সাধুসেবার যথারীতি আয়োজন হয়। ৯১জন সাধু ব্রহ্মচারী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া বিশেষভাবে উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত করেন। ২৭শে এপ্রিলের সভায় স্বামী নিরাময়ানন্দ (সভাপতি) এবং স্বামী পরশিবানন্দ, স্বামী অমলানন্দ ও ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ ভাষণ দেন। শ্রীকানাই বন্দ্যোপাধ্যায় সুরসুধাকর কর্তৃক পদাবলী কীর্তন ও আন্দুলের প্রখ্যাত কালীকীর্তন হয়। স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ দুই দিবস শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ২৮শে এপ্রিল শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১০,০০০ ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয় ও ১৫,০০০ ভক্ত নরনারী বসিয়া অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

মনসাদ্বীপ: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ১৮ই হইতে ২৩শে মার্চ ১৯৭৪, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৯তম জন্মমহোৎসব বিভিন্ন স্থানে মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করে। ১৮ই মার্চ সকালে আশ্রম হইতে প্রভাতফেরী বাহির হইয়া গ্রাম পরিক্রমা করে এবং পরে গৈরিক পতাকা উত্তোলিত হয়। সন্ধ্যায় আশ্রমপ্রাঙ্গণে আশ্রমস্থ বিদ্যালয়সমূহের পারিতোষিক বিতরণী সভায় ছাত্রগণ ড্রিল, ব্রতচারী নৃত্য, আবৃত্তি, হাস্যকৌতুক এবং "মুকুট" নাটক মঞ্চস্থ করে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী শুদ্ধব্রতানন্দ এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন স্বামী উমানাথানন্দ। সভান্তে সভাপতি মহারাজ কৃতি ছাত্রছাত্রীদের পারিতোষিক বিতরণ করেন। ১৯শে মার্চ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ও ভোগারতি হয়। বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ শোভাযাত্রা বাহির হইয়া গ্রাম পরিক্রমা করে। সন্ধ্যায় ধর্মসভায় স্বামী উমানাথানন্দ (সভাপতি) এবং স্বামী শুদ্ধব্রতানন্দ বক্তৃতা দেন। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধিদানন্দ আশ্রমের বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন। তিনি আশ্রমের আর্থিক সঙ্কট ও গত বৎসরের বন্যায় ও ঝড়ে শস্যহানির ফলে স্থানীয় জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা উপস্থিত শ্রোতাদের জ্ঞাপন করেন এবং এতদ্ অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়ন ও দুর্গতদের ত্রাণকার্যের জন্য সকলকে আহ্বান জানান। সভান্তে প্রায় দেড় হাজার ভক্ত খিচুড়ি প্রসাদ ধারণ করেন। রাত্রে শিক্ষকগণ কর্তৃক "ভরত বিদায়" যাত্রা অভিনীত হয়। ২১শে মার্চ বিকালে কাকদ্বীপ 'কিশোর সংঘ'-প্রাঙ্গণে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মালোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী প্রভানন্দ (সভাপতি), স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ (প্রধান

অতিথি) এবং শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। সভার শেষে সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের জনশিক্ষা বিভাগ কর্তৃক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তিন দিনের সভায় সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীঅখিলরঞ্জন দাস। অন্যান্যবারের মত এবারও উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জে স্থানীয় উৎসাহী ভক্তগণের সহযোগিতায় বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির-প্রাঙ্গণে ২৩শে মার্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব পালিত হয়। সকালে পতাকা উত্তোলন, বেদপাঠ, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ও ভোগরাগাদি হয়। পরে বিতরণ করা হয় খিচুড়ি প্রসাদ। বৈকালে ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ (সভাপতি), ব্রহ্মচারী স্বরূপচৈতন্য এবং শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। সভান্তে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সারগাছি : গত ১২ই, ১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্যোগে বহরমপুর শহরে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। তিন দিনই সন্ধ্যায় ধর্মসভায় স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ, স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ এবং স্বামী শিবময়ানন্দ বক্তৃতা করেন। প্রতিদিন সভার পর রামায়ণ গান হয়।

১৪ই এপ্রিল উৎসবের বিশেষ দিনে মঙ্গলারতি বেদপাঠ ভজনাদি এবং বিশেষ পূজা ও হোম হয়। সকালে স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ কথামৃত পাঠ করেন। কৃষ্ণনগরের 'শ্রীরামকৃষ্ণ রাগরঙ্গম্' কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাকীর্তন হয়। অপরাহ্ণে আশ্রমের বেসিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট-এর শিক্ষার্থিগণ কর্তৃক 'স্বামী অখণ্ডানন্দ' সঙ্গীতালেখ্য পরিবেশন করা হয়।

ধর্মসভার শেষে মঙ্গলারতি ও রামায়ণ গানের পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

বরানগর : গত ৬ই এপ্রিল হইতে বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। প্রথম দিন ছিল আশ্রম পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান এবং অপর দুইদিন শ্রীশ্রীঠাকুর ও যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মমহোৎসব। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীশম্ভুচন্দ্র ঘোষ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী প্রভানন্দ, অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী ও উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন। অধ্যাপক চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার স্বরূপ এবং ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন। পূজা, হোম, প্রসাদ বিতরণ ও ধর্মসংগীত প্রভৃতি অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল।

সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব

বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ আশ্রমের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব গত ৪ঠা মে হইতে ১২ই মে পর্যন্ত নয় দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের জন্য আশ্রমপ্রাঙ্গণে নির্মিত প্রকাণ্ড একটি মণ্ডপে অধিকাংশ অনুষ্ঠানই অনুষ্ঠিত হয়। ৪ঠা মে বিকালে এই মণ্ডপে আয়োজিত সভায় শ্রী জে. সি. শাহ্-র স্বাগত-সম্ভাষণের পর রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের আশীর্বাণী-ভাষণের মাধ্যমে উৎসব আরম্ভ হয়। মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল শ্রী আলি জবর জঙ্গ উদ্বোধনী ভাষণ ও স্বামী রঙ্গনাথানন্দ সভাপতির ভাষণ দিবার পর আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ সকলকে ধন্যবাদ জানান। ইহার কিছু পরে, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ 'বেদান্ত ও আধুনিক মানুষ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। এইদিন আশ্রমের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে স্মরণিকা-পত্রিকাটিও প্রকাশিত হয়।

৫ই মে সকাল ৯-৩০ টায় আশ্রমের নাট-মন্দিরে শ্রী জে. জি. বোধে বেদপাঠ করেন; বিকালে মণ্ডপে স্বামী লোকেশ্বরানন্দের সভা-

পতিত্বে আয়োজিত সভায় 'ধর্মসমন্বয়' আলোচিত হয়। ৬ই মে বিকালে মণ্ডপে সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। সভাপতিত্ব করেন মহারাষ্ট্রের বিধান সভার চেয়ারম্যান ভি. এস. পেজ ; প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী অখণ্ডানন্দ। ৭ই মে বিকালে মণ্ডপে সভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী আলোচিত হয় ; সভাপতিত্ব করেন মহারাষ্ট্রের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডি. ডি. দাদাসাহেব, সঙ্গীত পরিবেশন করেন 'বৈতালিক'-এর শিল্পিগণ ও শ্রীমতী কুসুম সাগুণ ও সহকারিবৃন্দ। ৮ই মে সকাল ৯-৩০ টায় নাটমন্দিরে বেদপাঠ করেন পণ্ডিত এম. আর. গোপালাচার্য এবং ১০-৩০ টায় আশ্রমের 'বিবেকানন্দ হল'-এ বেদান্তগীতি ও যন্ত্র-সংগীত পরিবেশন করেন স্থানীয় সংগীত-সংস্থা 'বসন্তবাহার'-এর বালক-বালিকাগণ। বিকালে মণ্ডপে সভায় স্বামী শান্তানন্দের সভাপতিত্বে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। ৯ই মে বিকালে বোম্বাই-এর মাহিম অঞ্চলে অবস্থিত 'মাহিম কজ্‌ওয়ে গার্ডেন'-এ বোম্বাই-এর মেয়র শ্রী বি কে. বোমন-বেহ্‌রাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভি. পি. নায়েক (প্রধান-অতিথি) মাহিম কজ্‌ওয়ে গার্ডেন-এর নতুন নামকরণ করেন 'স্বামী বিবেকানন্দ উদ্যান' এবং সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের একটি আবক্ষ মর্মরমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। এইদিন রাত্রি ৯-৩০ টায় আশ্রমের মণ্ডপে 'শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত গাথা' পরিবেশন করেন শ্রীবালচাত্রে ও তাঁহার সঙ্গিগণ। ১০ই মে রাত্রি ৮-৩০ টায় মণ্ডপে পণ্ডিত ভীমসেন যোশী ভজন গান করেন। ১১ই মে মণ্ডপে 'ছাত্রদিবস' উপলক্ষে আয়োজিত সভায় মহারাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এ. এন. নামযোশী (সভাপতি) ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণ করেন ও শিক্ষাবিষয়ে সুচিন্তিত ভাষণ দেন।

উৎসবের শেষদিন, ১২ই মে সকাল ৯-৩০ টায় আশ্রম হইতে ৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সকওয়ার গ্রামে আশ্রমকর্তৃক পরিচালিত আদিবাসিগণের সেবাকার্যের সহায়তাকল্পে স্বাস্থ্য-সেবাকেন্দ্র নির্মাণের জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ৫ একর জমির কেন্দ্রে উৎসবের জন্য নির্মিত বন্য বৃক্ষের শাখা-পল্লবে আচ্ছাদিত মনোরম একটি মণ্ডপে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভানেত্রী ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন যথাক্রমে শ্রীমতী তারাবাই ভর্তক ও মহারাষ্ট্রের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ রাফিক জ্যাকেরিয়া। সভান্তে প্রায় দেড় হাজার আদিবাসীকে লইয়া নারায়ণ-সেবা অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে বোম্বাই-এর চৌপট্টি অঞ্চলে অবস্থিত 'বিড়লা ক্রীড়াকেন্দ্র অডিটোরিয়াম'-এ স্বামী শিবরূপানন্দের সভাপতিত্বে আহূত সভা-ই উৎসবের শেষ অনুষ্ঠান।

বিভিন্ন দিনের সভায় পূর্বোল্লিখিত সুধীগণসহ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন রেভারেণ্ড ফাদার অ্যান্থনি এলিনজিমিট্টাম, মাননীয় ভিক্ষু তেবা সওয়া (জাপানী), শ্রী এ এ. ফৈজী আসফ, স্বামী বন্দনানন্দ, স্বামী শিবরূপানন্দ, শ্রী ভি. জি. ওয়াংগে্‌কার, স্বামী আত্মানন্দ, শ্রী জে. জি. বোধে, শ্রীরাম মনোহর ত্রিপাঠী, ডঃ সি. এ. মেহ্‌তা, শ্রীমতী মীরা মৈত্র. স্বামী চিদাত্মানন্দ, স্বামী অকামানন্দ, অধ্যাপক শিবাজীরাও ভোসলে, স্বামী ব্যোমানন্দ, স্বামী গৌতমানন্দ, ডঃ মনুভাই কোঠারী, সকওয়ার-এর গ্রাম পঞ্চায়েৎ, স্বামী পূজ্যানন্দ, শ্রীনলিন মেহ্‌তা, শ্রী সাধু মোদক প্রভৃতি।

উৎসব উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলি হইতে ৬৩ জন সাধু এখানে সমবেত হইয়াছিলেন এবং প্রায় সকলেই উৎসবের শেষদিন পর্যন্ত আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের, বিশেষ করিয়া স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর উপস্থিতি

উৎসবের কয়েকদিন এক আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিল।

বোম্বাই আশ্রমের সূত্রপাত ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে, শান্তাক্রুজ অঞ্চলে একটি ভাড়াবাড়ীতে; ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে সেখান হইতে ঘোড় বন্দর রোড্-এ (বর্তমান বিবেকানন্দ রোড) স্থানান্তরিত হয়। আশ্রমের বর্তমান স্থায়ী আবাসের জমি কেনা হয় ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে; এই বৎসরই ৬ই ফেব্রুআরি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ আশ্রমের প্রধান ভবনের (বর্তমানে যেখানে শ্রীশ্রীমায়ের মর্মর মূর্তি স্থাপিত) ভিত্তিস্থাপন করেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ আশ্রমের নবনির্মিত সুবৃহৎ মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

অন্যান্য সংবাদ

বলরাম মন্দির (কলিকাতা): গত ১লা মে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠাদিবসের স্মরণে বলরাম মন্দিরে শ্রীসুধাংশু বসুর সভাপতিত্বে এক সভা আহূত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু ও প্রধান বক্তা ছিলেন স্বামী ভূতেশানন্দ। শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু বলেন যে, তিনি বিদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলী স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন, উহার প্রভাব সুদূর-প্রসারী, ভারতবাসীর বিশ্বকে দিবার সম্পদ আছে—রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য দেখিলে এই গর্বে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে। স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেন। সভাপতি মহোদয় মিশনের কার্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া ভাষণ দেন।

দিনাজপুর: গত ৪ঠা *এপ্রিল* রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলীর সভাপতিত্বে এক মহতী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। কানাডার ইউনিটারিয়ান সার্ভিস কমিটির এক্জিকিউটিভ্ ডাইরেক্টর ডক্টর লোট্টা হিস্‌মানোভার প্রেরিত বাণী সভায় পাঠ করা হয়। বাংলাদেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য ডক্টর কুদরত-ই-খুদা প্রধান অতিথির ভাষণে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সহ-সভাপতি জনাব আবদুর রহিম, দিনাজপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান ডঃ হাফিজুদ্দিন আহম্মদ, বেলুড় মঠের স্বামী যুক্তানন্দ, স্বামী অক্ষরানন্দ এবং অধ্যাপক শান্তিনারায়ণ চক্রবর্তী প্রমুখ সুধীবৃন্দ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শানুযায়ী জনসেবার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেন। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী কালিকাত্মানন্দ মহারাজ আশ্রম পরিচালিত রিলিফের কার্যবিবরণী পাঠ করেন। সভায় উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন কুমারী রেবা, কুমারী স্মিতা, শ্রীমতী মায়ারাণী ও শ্রীগৌরাঙ্গ ঘোষ। মিস্ শেলী দিনাজপুরের পল্লী-সংগীত গাহিয়া সকলকে আনন্দ দান করেন। বালুবাড়ী মহিলা বহুমুখী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মীরা নজরুল গীতি পরিবেশন করেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে শত শত নরনারী যোগ দেওয়ায় সভা খুবই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, গত ৩রা মে, সন্ধ্যা প্রায় ৭টায় ঝাড়গ্রামে **স্বামী পরশিবানন্দ** ৭৪ বৎসর বয়সে হৃদ্‌যন্ত্রের বিকলতাহেতু দেহত্যাগ করেন।

তিনি স্বামী অভেদানন্দজীর দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন এবং ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় রামকৃষ্ণ-বেদান্ত মঠে যোগদান করিয়া তাঁহার নিকট হইতেই ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। পরবর্তী কালে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং জলপাইগুড়ি ও মালদহ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ হন। সম্প্রতি তিনি কাশী অদ্বৈত আশ্রমে অবসর-জীবন যাপন করিতেছিলেন। তাঁহার দেহান্তে আমরা একজন শান্ত ও মধুরস্বভাব সন্ন্যাসীকে হারাইলাম।

তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

কলিকাতা: গত ৭ই এপ্রিল, তালতলা শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র কর্তৃক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ৺মহেন্দ্র কবিরাজের পুত্র শ্রীনরেন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যবহৃত কাষ্ঠপাদুকার পূজার্চনা করা হয়। অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী মহাশয় মঙ্গলসূক্ত ও বেদ পাঠ ও ব্যাখ্যার মধ্য দিয়া উৎসবের সূচনা করেন। পরে শ্রীশ্রীঠাকুর, মা এবং স্বামীজীর ষোড়শোপচারে পূজা, হোম ও ভোগারতি সম্পন্ন হয়। প্রায় পাঁচ শতাধিক ভক্ত সারাক্ষণ উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। সকালে ভক্তিগীতি ও ভজন পরিবেশন করেন সর্বশ্রী বাণীকুমার চট্টোপাধ্যায়, ধ্রুব চৌধুরী, সন্তোষ চৌধুরী, মনোজ মিত্র এবং সর্বশ্রীমতী কল্পনা দাস, জয়শ্রী বসুমজুমদার, ধীরা দত্ত, বিনতা বড়াল ও পাঠচক্রের সভ্যবৃন্দ। মধ্যাহ্নে প্রায় ৩৫০ জন ভক্ত বসিয়া প্রসাদ ধারণ করেন।

অপরাহ্নে কালীকীর্তন পরিবেশন করেন ইণ্টালির "মাঙ্গলিক"-এর সভ্যবৃন্দ। স্বামী স্মরণানন্দ (সভাপতি), শ্রীদিলীপকুমার সেনগুপ্ত (প্রধান অতিথি) ও স্বামী অমৃতত্বানন্দ ভাষণ দেন। সভান্তে শ্রীকানাই বন্দ্যোপাধ্যায় কীর্তন সুধাকর শ্রীকৃষ্ণের রূপাভিসার পালাকীর্তন পরিবেশন করেন।

চন্দননগর: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সংঘের উদ্যোগে গত ৬ই ও ৭ই এপ্রিল ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মোৎসব বিশেষ সমারোহের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ। তিনি ও অধ্যাপক বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা দেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ কীর্তন করেন। মঙ্গলারতি উষাকীর্তন গুরু-বন্দনা রামকৃষ্ণ-বন্দনা ও বেদ পাঠের মাধ্যমে দ্বিতীয় দিনের উৎসবের সূচনা হয়। সকালে স্বামী নিস্পৃহানন্দের পরিচালনায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি লইয়া কয়েকশত ভক্ত নরনারী ও ছাত্র-ছাত্রী রামকৃষ্ণ-সারদা সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে শহরের প্রধান রাস্তাগুলি পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রীদের জলযোগে পরিতৃপ্ত করেন ডাঃ সুনীতি ঘোষ। শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, ৺শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ, ভক্ত-সেবা ও দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা এবং রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দিরের সৌজন্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী উৎসবের অঙ্গ ছিল। বৈকালের ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর সম্বন্ধে ভাষণ দেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী ক্ষমানন্দ ও স্বামী নিবৃত্তানন্দ।

ডিব্রুগড়: গত ১৩ই মার্চ হইতে ১৭ মার্চ পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, আলোচনাচক্র ও জনসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি বার্ষিক উৎসব পালন করেন। ১৩ই এবং ১৪ই সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাগীতি পরিবেশিত হয়।

১৫ই দিবাভাগে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজার পর স্বামী অমলানন্দ কর্তৃক 'শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা' সম্বন্ধে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় অধ্যক্ষ ডঃ নির্মলকুমার বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে আয়োজিত মহতী জন সভায় স্বামী অমলানন্দ 'শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের' সম্পর্কে ভাষণ দেন। ১৬ই মার্চ সন্ধ্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী শ্রীঅনাদিভূষণ রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী অমলানন্দ ভাষণ দেন।

১৭ই মার্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও কথামৃত পাঠের পর সমস্ত দিবসব্যাপী কীর্তন হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী সম্পর্কিত পুস্তকাদির একটি প্রদর্শনী খোলা হয় এবং প্রায় ছয় সহস্রাধিক 'নরনারায়ণের' সেবার মাধ্যমে উৎসব সুশৃঙ্খলভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

নববারাকপুর: গত ৩১শে মার্চ ও ১লা এপ্রিল '৭৪ বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ্ কর্তৃক স্বামী বিবেকানন্দের ১১২তম শুভ আবির্ভাব উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিন প্রত্যুষে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি ও বিবেকানন্দের বাণী সম্বলিত পোস্টার সহ নববারাকপুরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। পূর্বাহ্নে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম হয়। পরে উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরিত হয়। অপরাহ্নে আয়োজিত এক ছাত্র সম্মেলনে ৮৯ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করে। সন্ধ্যায় ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী জীবানন্দ। সুর ও শিল্পি-গোষ্ঠী 'শ্রীরামকৃষ্ণ গীতি আলেখ্য' পরিবেশন করেন। দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে বিবেকানন্দের পত্রাবলী পাঠ, ভজন ও আরাত্রিকের পরে আয়োজিত ধর্মসভার সভাপতিত্ব করেন ডঃ মহেন্দ্রচন্দ্র মালাকার, প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী স্মরণানন্দ ও প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়। সভান্তে শ্রীভূপেন চক্রবর্তীর ভক্তিমূলক সংগীত হইবার পর 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন পাঠচক্র বিভাগের সদস্যবৃন্দ।

নিউ দিল্লী: গত ৩রা ও ২৩শে মার্চ সরোজিনী নগর ও দক্ষিণ দিল্লীর সংলগ্ন অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে ইংরাজী হিন্দী বাংলা ও তামিল ভাষায় আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতায় প্রায় ৩৫০ জন ছাত্রছাত্রী যোগদান করিয়াছিল। ৪৬ জন ছাত্র-ছাত্রীকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় স্বামী বন্দনানন্দের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। অধ্যক্ষা শ্রীমতী কমলরাণী মিত্র বাংলায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ দেন। ডঃ বেদপ্রতাপ বেদিক হিন্দীতে এই দুই মহাপুরুষের বাণী আলোচনা করেন। অতঃপর স্বামী বন্দনানন্দ সভাপতির ভাষণ দেন ও পুরস্কার বিতরণ করেন। সভায় প্রায় ৬০০ জনসমাগম হইয়াছিল। ছাত্রছাত্রীদের কয়েকটি আবৃত্তি ও শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজী সম্বন্ধে কয়েকটি ভজনগান সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষ আকৃষ্ট করে।

নূতন পুকুর (২৪ পরগণা): গত ৩১শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৯তম শুভ জন্মোৎসব মঙ্গলারতি, উপনিষদ্ পাঠ, কথামৃত পাঠ, বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ বিতরণ ও ধর্মসভার মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। ধর্মসভায় স্বামী অমৃতত্বানন্দ (সভাপতি) ও শ্রীকিরণ-চন্দ্র ঘোষাল বক্তৃতা করেন। সভারম্ভে ও শেষে শ্রীজীবনকৃষ্ণ মণ্ডলের ভক্তি-সঙ্গীত হয়। রাত্রে আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ যাত্রাভিনয় করে।

উৎসবে ছয় শতাধিক ব্যক্তি প্রসাদ গ্রহণ করেন।

পাঁচগ্রাম: মুর্শিদাবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে ২০-২২শে বৈশাখ, ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভ বাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

২০ ও ২১শে সভাতে শ্রীশ্রীঠাকুর, জগন্মাতা সারদাদেবী ও স্বামীজীর পূত জীবনালোচনা করেন অধ্যাপক রেজাউল করিম ও অধ্যাপক অমূল্যচরণ গুহ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

২২শে কীর্তনসহ গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয় ও

পরে এক হাজার নরনারায়ণ বসিয়া খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বনগ্রাম: গত ১০ই চৈত্র শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ কর্তৃক বনগ্রাম টাউন হল ময়দানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পরমহংসদেবের ১৩৯তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিপ্রহরে ১০০০ ভক্তকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। অপরাহ্নে স্থানীয় শিল্পিবৃন্দ শ্যামাসঙ্গীত ও ভজন গান করেন। জনসভায় সংঘের সাধারণ সম্পাদকের প্রারম্ভিক ভাষণের পর স্বামী রমানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরে কলিকাতার রামকৃষ্ণ কৃষ্টি পরিষদ্ কর্তৃক 'প্রেমের ঠাকুর রামকৃষ্ণ' গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

বড়আন্দুলিয়া: গত ১৮ই এপ্রিল হইতে ২০শে এপ্রিল লোকসেবা শিবিরে গদাধরের মন্দির সম্মুখস্থ মাঠে একাদশ বার্ষিক গদাধরের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল ধর্মীয় সভা, রাজ্য-সরকারের তথ্যবিভাগ আয়োজিত ছায়াচিত্র প্রদর্শনী, যাত্রাভিনয় এবং কবি-সম্মেলন। মেলার তিনদিনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দশ হাজারেরও অধিক লোক সমাগম হয়। ২০শে এপ্রিল সন্ধ্যায় খোলা আকাশের নীচে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে কবি-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৩০ জন কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। এই অনুষ্ঠানে মেলার প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

ভাগলপুর: গত ২৪।২।৭৪ তারিখে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র আয়োজিত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভ জন্মতিথি উৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিশেষ পূজা, ভোগ, আরতি, স্তব-স্তোত্র, গীতা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও পুঁথি পাঠ, ভজন-কীর্তনাদি, বক্তৃতা, প্রসাদবিতরণ ও দরিদ্রনারায়ণ-সেবা অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিল। সর্বশ্রী সুনীল সোম, বিশু ভট্টাচার্য, সন্তোষ মুখার্জি, কল্যাণী মুখার্জি, পূর্ণিমা চ্যাটার্জি ও কুমারী সুস্মিতা সোম প্রভৃতির সঙ্গীতানুষ্ঠান উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীসারদা মাতা ও বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের শুভ জন্মতিথি উৎসবদ্বয়ও নির্দিষ্ট দিবসে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

হাওড়া: রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমে ৬ই ও ৭ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। ৬ই এপ্রিলের সভায় ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মানবচিন্তায় স্বামী বিবেকানন্দের অবদান সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সভাপতি স্বামী মুমুক্ষানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-বার্তাকে স্বামী বিবেকানন্দ কী ভাবে বহন করিয়াছেন তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখান।

৭ই এপ্রিল শ্রীমা সারদাদেবীর জন্মোৎসব সভায় প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা, প্রব্রাজিকা অমৃতপ্রাণা ও সভানেত্রী প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা ভাষণ দেন।

পরলোকে হিমাংশু কুমার বসু

গত ১৮ই মে, উত্তর কলকাতার টালাপার্ক নিবাসী হিমাংশু কুমার বসু হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া ৭২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। হিমাংশু বাবু স্বামী শিবানন্দের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও কথামৃতকার মাষ্টার মশায়ের তিনি ছিলেন একান্ত স্নেহভাজন। তাঁর মা ছিলেন স্বামী প্রেমানন্দজীর ভ্রাতুষ্পুত্রী। বাগবাজারের বলরাম বসুরও নিকট আত্মীয় তিনি। টালাপার্কে কীর্তন, নামগান ও ভাগবত পাঠের আসরের তিনি প্রতিষ্ঠাতা।

শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

[পুনর্মুদ্রণ]

মহাভাষ্যম্।

(পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যারত্নকর্ত্তৃক অনুবাদিত।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভাষ্য-মূল।

কিং পুনরত্র জ্যায়ঃ। লঘুত্বাচ্ছব্দোপদেশাঃ। লঘীয়ান্ শব্দোপদেশঃ। গরীয়ানপশব্দোপদেশঃ। একৈকস্য শব্দস্য বহবোঽপভ্রংশাঃ। তদ্‌যথা,—গৌরিত্যস্য গাবীগোণীগোতাগোপোতলিকেত্যেবমাদয়োঽপভ্রংশাঃ। ইষ্টান্বাখ্যানং খল্বপি ভবতি।

বঙ্গানুবাদ।

অতএব এক্ষণে কোনটি শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ শব্দোপদেশের দ্বারা অপশব্দ উপদেশ করা উচিত অথবা অপশব্দোপদেশের দ্বারা শব্দ উপদেশ করা উচিত ?) শব্দোপদেশ লঘু, অতএব শব্দোপদেশই করা উচিত। শব্দোপদেশ লঘু অর্থাৎ অল্প এবং অপশব্দোপদেশ গুরু অর্থাৎ অত্যন্ত অধিক। এক একটি শব্দের অপভ্রংশ বহুসংখ্যক, যেমন, 'গৌঃ' এই শব্দটীর গাবী, গোণী, গোতা, গোপোতলিকা প্রভৃতি অপভ্রংশ। ইহাতে ইষ্টলাভও হয়। (১)

ভাষ্য-মূল।

অথৈতস্মিন্ শব্দোপদেশে সতি কিং শব্দানাং প্রতিপত্তৌ প্রতিপদপাঠঃ কর্ত্তব্যঃ। গৌরশ্বঃ পুরুষো হস্তী শকুনির্ম্মৃগো ব্রাহ্মণ ইত্যেবমাদয় শব্দাঃ পঠিতব্যাঃ। নেত্যাহ। অনভ্যুপায় এষ শব্দানাং প্রতিপত্তৌ প্রতিপদপাঠঃ। এবং হি শ্রূয়তে বৃহস্পতিরিন্দ্রায় দিব্যং বর্ষসহস্রং প্রতিপদোক্তানাং শব্দানাং শব্দপারায়ণং প্রোবাচ নান্তং জগাম। বৃহস্পতিশ্চ প্রবক্তা ইন্দ্রশ্চাধ্যেতা দিব্যং বর্ষসহস্রমধ্যয়নকালো ন চান্তং জগাম। কিং পুনরদ্যত্বে যঃ সর্ব্বথা চিরং জীবতি স বর্ষশতং জীবতি।

বঙ্গানুবাদ।

এক্ষণে এই শব্দোপদেশ কর্ত্তব্য হইলে কি শব্দসমূহের জ্ঞানলাভের নিমিত্ত প্রতিপদ পাঠ (অর্থাৎ যত শব্দ আছে, তাহার প্রত্যেক শব্দের পাঠ) করা উচিত ? 'গৌঃ' 'অশ্বঃ' 'পুরুষঃ' 'হস্তী' 'শকুনিঃ' 'মৃগঃ' 'ব্রাহ্মণঃ' প্রভৃতি যাবতীয় শব্দই পাঠ করিতে হইবে ? বলিতেছেন,—না। শব্দসমূহের সম্যক্‌প্রকারে জ্ঞানলাভবিষয়ে এই প্রতিপদপাঠ উৎকৃষ্ট উপায় নহে। এইরূপ শ্রুতি

---

(১) এই স্থলে কৈয়ট ব্যাখ্যা করেন,—"সাধুশব্দপ্রয়োগাদ্ধর্ম্মাবাপ্তেরিত্যর্থঃ। অথবা উপাদেয়োপদেশাৎ সাক্ষাৎ প্রতিপত্তির্ভবতীতি ভাবঃ॥"

সাধু শব্দ প্রয়োগ করাতে ধর্ম্মলাভ হয় ; এই হেতু। অথবা কেবলমাত্র যাহা উপাদেয় অর্থাৎ গ্রাহ্য তাহার উপদেশ করিলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্যক্‌প্রকারে জ্ঞানলাভ হয়।

আছে যে, বৃহস্পতি ইন্দ্রকে দিব্য সহস্রবর্ষ (১) প্রতিপদোক্তশব্দসমূহের শব্দপারায়ণ (২) বলিয়াছিলেন; তথাপি সম্পূর্ণ হয় নাই। বৃহস্পতি বক্তা, ইন্দ্র অধ্যেতা, দেবলোকের সহস্র বর্ষ অধ্যয়নের সময়, তথাপিও সম্পূর্ণ হইল না। ইদানীন্তন লোকের সম্বন্ধে কি বলিব, যিনি সম্পূর্ণরূপে দীর্ঘজীবী, তিনি শতবর্ষ জীবন ধারণ করেন।

ভাষ্য-মূল।

চতুর্ভিশ্চ প্রকারৈর্বিদ্যোপযুক্তা ভবতি। আগমকালেন, স্বাধ্যায়কালেন, প্রবচনকালেন, ব্যবহারকালেনেতি। তত্র চাস্যাগমকালেনৈবায়ুঃ কৃৎস্নং পর্য্যুপযুক্তং স্যাৎ। তস্মাদনভ্যুপায়ঃ শব্দানাং প্রতিপত্তৌ প্রতিপদপাঠঃ।

বঙ্গানুবাদ।

চারি প্রকারে বিদ্যা উপযুক্ত হয়। আগমকালদ্বারা অর্থাৎ বিদ্যাগ্রহণের সময় দ্বারা, স্বাধ্যায়কাল দ্বারা অর্থাৎ অভ্যাসের সময় দ্বারা, প্রবচনকাল দ্বারা অর্থাৎ অধ্যাপনের সময় দ্বারা এবং ব্যবহারকাল দ্বারা অর্থাৎ যজ্ঞাদি কার্য্যে প্রয়োগ দ্বারা (অর্থাৎ গ্রহণ, অভ্যাস, অধ্যাপন এবং ব্যবহার এই চারিটী উপায়ই অনুষ্ঠিত না হইলে বিদ্যা সম্যক্‌প্রকারে স্ফূর্ত্তি লাভ করে না।) তন্মধ্যে ইদানীন্তন দীর্ঘজীবী মনুষ্যের আগমকালদ্বারাই সম্পূর্ণ জীবন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অতএব, শব্দসমূহের সম্যক্‌প্রকারে জ্ঞানলাভের বিষয়ে প্রতিপদপাঠ উৎকৃষ্ট উপায় নহে।

ভাষ্য-মূল।

কথং তর্হীমে শব্দাঃ প্রতিপত্তব্যাঃ। কিঞ্চিৎ সামান্যবিশেষবল্লক্ষণং প্রবর্ত্ত্যং যেনাল্পেন যত্নেন মহতো মহতঃ শব্দৌঘান্ প্রতিপদ্যেরন্।

বঙ্গানুবাদ।

তবে কি প্রকারে এই শব্দসমূহে সম্যক্‌প্রকারে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে? কোন সামান্য-লক্ষণ (৩) এবং বিশেষলক্ষণ (৪) প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে, যাহাদ্বারা অল্পযত্নে মহান্ মহান্ শব্দরাশি-সকলকে সম্যক্‌প্রকারে অবগত হইতে পারা যায়।

ভাষ্য-মূল।

কিং পুনস্তৎ। উৎসর্গাপবাদৌ। কশ্চিদুৎসর্গঃ কর্ত্তব্যঃ কশ্চিদপবাদঃ। কথং জাতীয়কঃ পুনরুৎসর্গঃ কর্ত্তব্যঃ কথং জাতীয়কোঽপবাদঃ। সামান্যেনোৎসর্গঃ কর্ত্তব্যঃ। তদ্‌যথা,—"কর্ম্মণ্যণ্।" তস্য বিশেষেণাপবাদঃ। তদ্‌যথা,—"আতোঽনুপসর্গে কঃ।"

---

(১) দৈবে রাত্র্যহনী বর্ষং প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ।
অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃ স্যাৎ দক্ষিণায়নম্॥ মনু।

মনুষ্যলোকের এক বর্ষে দেবলোকের এক দিন। উত্তরায়ণ দেবলোকের দিন ও দক্ষিণায়ন দেবলোকের রাত্রি। এই হিসাব অনুসারে মনুষ্যলোকের ৩৬০ বৎসরে দেবলোকের এক বৎসর হয়।

(২) শব্দশাস্ত্রবিশেষ।

(৩) বহবো বিষয়া যস্য স সামান্যবিধির্ভবেৎ।
যে লক্ষণের বিষয় বহু, তাহাকে সামান্যলক্ষণ কহে।

(৪) অল্পঃ স্যাৎ বিষয়ো যস্য স বিশেষবিধির্ম্মতঃ।
যে লক্ষণের বিষয় অপেক্ষাকৃত অল্প, তাহাকে বিশেষলক্ষণ কহে।

বঙ্গানুবাদ।

তাহা অর্থাৎ সামান্যলক্ষণ ও বিশেষলক্ষণ কি প্রকার? উৎসর্গ এবং অপবাদ। কোনটি উৎসর্গ করিতে হইবে এবং কোনটি অপবাদ করিতে হইবে? উৎসর্গ কি প্রকার করিতে হইবে এবং অপবাদই বা কি প্রকার করিতে হইবে? সামান্যপ্রকারে উৎসর্গ করিতে হইবে। যেমন, "কর্ম্মণ্যণ্।" 'কর্ম্মপদ পূর্ব্বে থাকিলে ধাতুর উত্তর অণ প্রত্যয় হয়' (১)। তাহার বিশেষ প্রকার উক্তি দ্বারা অপবাদ করিতে হইবে। যেমন,—"আতোঽনুপসর্গে কঃ।" 'কর্ম্মপদ পূর্ব্বে থাকিলে উপসর্গবিহীন আকারান্তধাতুর উত্তর ক প্রত্যয় হয়।' (২) (এইস্থলে বিশেষ প্রকারে বলাতে ক প্রত্যয়ই হইবে, অণ্ প্রত্যয় হইবে না।)

ভাষ্য-মূল।

কিং পুনরাকৃতিঃ পদার্থ আহোস্বিদ্ দ্রব্যম্। উভয়মিত্যাহ। কথং জ্ঞায়তে। উভয়থা হ্যাচার্য্যেণ সূত্রাণি পঠিতানি। আকৃতিং পদার্থং মত্বা "জাত্যাখ্যায়ামেকস্মিন্ বহুবচনমন্যতরস্যাম্" ইত্যুচ্যতে। দ্রব্যং পদার্থং মত্বা "সরূপাণাম্—" ইত্যেকশেষ আরভ্যতে।

বঙ্গানুবাদ।

আকৃতিই পদার্থ? অথবা দ্রব্যই পদার্থ? উভয়কেই পদার্থ কহে। কি প্রকারে জানা যায়? উভয়প্রকারেই আচার্য্য (অর্থাৎ মহর্ষি পাণিনি) সূত্র সকল পাঠ করিয়াছেন। আকৃতিকে পদার্থ বিবেচনা করিয়া "জাত্যাখ্যায়ামেকস্মিন্ বহুবচনমন্যতরস্যাম্।" "জাতি বুঝাইলে এক ব্যক্তিতে বিকল্পে বহুবচন হয়।" ইহা বলিয়াছেন। দ্রব্যকে পদার্থ বিবেচনা করিয়া "সরূপাণাম্" "সমান রূপ শব্দসমূহের" (৩) একশেষ নির্ণয় করিয়াছেন।

---

(১) কর্ম্মণ্যণ্।৩।২।১।পাণিনিঃ।

কর্ম্মণ্যুপপদে ধাতোরণ্প্রত্যয়ঃ স্যাৎ। কুম্ভং করোতীতি কুম্ভকারঃ। সিদ্ধান্ত-কৌমুদী।

(২) আতোঽনুপসর্গে কঃ।৩।২।৩।পাণিনিঃ।

আদন্তাদ্ধাতোরনুপসর্গাৎ কর্ম্মণ্যুপপদে কঃ স্যাৎ নাণ্। গোদঃ। সিদ্ধান্ত-কৌমুদী।

(৩) "সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ"। ১।২।৬৪। পাণিনিঃ।

একবিভক্তৌ যানি সরূপাণ্যেব দৃষ্টানি তেষামেকএব শিষ্যতে। (এক বিভক্তিতে যে সকল তুল্যরূপ শব্দ দেখা যায়, তাহার মধ্যে একটী মাত্র শব্দ অবশিষ্ট থাকে। যথা,—'মনুষ্য এবং মনুষ্য' এইস্থলে একটি মনুষ্যমাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া দ্বিবচনে "মনুষ্যৌ" এইরূপ প্রয়োগ হয়।) সিদ্ধান্ত-কৌমুদী।

[ক্রমশঃ]

উদ্বোধন।

[১ম বর্ষ।] . ১৫ই আষাঢ়। (১৩০৬ সাল) [১২শ সংখ্যা।]

শ্রীরামানুজচরিত।

(স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ লিখিত।)

৭ম সংখ্যায় প্রকাশিতের পর।

[দ্বিতীয় অধ্যায়ের কিয়দংশ—বর্ত্তমান সম্পাদক]

ঝালোয়ার দুহিতা।

(কবিবর গিরীশচন্দ্র ঘোষ লিখিত।)

৮ম সংখ্যায় প্রকাশিতের পর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পিঙ্গলা নামে বেশ্যা, বনমধ্যে আসিয়াছে। পিঙ্গলা অতি সুন্দরী, গৌরবর্ণা, দীর্ঘাক্ষী, গুরুনিতম্বী, পীনপয়োধরা, যামিনীজাগরণে বিলাসচিহ্ন চক্ষের কোলে দেখা যায়। গণ্ডস্থলে গোলাপী আভা কিঞ্চিৎ মলিন, স্বচ্ছ সুনির্ম্মিত ললাটে কিঞ্চিৎ কালিমা আভা, অধররাগ তাম্বুল সাহায্যে রহিয়াছে। পিঙ্গলা অনেক যুবার প্রাণ হরণ করিয়াছিল, তাহার কুহকে অনেকে সর্ব্বস্ব হারাইয়াছেন, আপাততঃ একটী ধনাঢ্য যুবক তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী। যুবা অতি সুন্দর পুরুষ, পিঙ্গলা যখন যাহা চায়, তখন তাহা দেয়। পিঙ্গলার শত অপরাধ মার্জ্জনা করে। পিঙ্গলা দুর্ব্বাক্য বলে, দূর করিয়া দেয়,—অঙ্গের আভরণের ন্যায় এ সকল অপমান ধারণ করে। পরপুরুষের সহিত আলাপ করিলে সহ্য করে, পায়ে ধরিয়া কাঁদে, পিঙ্গলার নিমিত্ত যুবা উন্মত্ত; যুবার নাম সুরদাস।

মদনের আশ্চর্য্য কৌশল, পিঙ্গলা বঙ্কার নিমিত্ত উন্মত্ত, বঙ্কার নিমিত্ত যাহা অর্জ্জন করিয়াছিল, প্রায়ই নষ্ট করিয়াছে। তাড়িখানায় বঙ্কাকে ডাকিতে যায়, মার খায়, নিত্য কলহ কচ্‌কচি,—বঙ্কা নইলে বাঁচে না!

কয়দিন আর বঙ্কা আইসে না। তাড়িখানায় দেখিতে পায় না; কোথা গিয়াছে, সন্ধান পায় না। দুই তিন দিন পোষা পাখী পড়াইয়া, রাত্রি যাপন করিল। সুরদাস আসিলে দূর করিয়া দেয়, দোর দিয়া একাকী বসিয়া থাকে, দাসদাসী আহার আনিয়া দেয়, কখনও স্পর্শ করে, কখনও না। তৃতীয় দিনে বুড়ি করবী মালী আসিল। মালী বলিল, "আমর্! একটা গুণগান কর্। উপত্যকায় মানিকযোড় গাছ আছে। দুটী গাছ, পাতার পাতায়, ডাঁটায় ডাঁটায়, মেশামিশি

করিয়া জন্মিয়াছে। কাল শনিবার, অমাবস্যা, রাত্রি দুই প্রহরে যদি স্নান করিয়া, সোঁৎ চুলে সোঁৎ কাপড়ে, দুটি গোড়া শুদ্ধ তুলিয়া আনিতে পারিস্—জোড়া বাঁশের ছাল, —নিশিন্দের আগডালের পাতা, কাল গরুর দেড়ালে গোবরে যদি একটি পুতুল আঁকিয়া, টিপ দিতে পারিস্, বেটা কোথায় থাকিবে ? যেখানে থাকুক ; প্রাণের জ্বালায় ছুটিয়া আসিবে।"

শুভ্রকেশা করবী মালী, দুটো কথা বলিতে হয়, দুটো প্রবোধ দিতে হয়, একটু চক্ষের জল ফেলিতে হয়, যাহা যাহা করিতে হয়, করিয়া চলিয়া গেল। কেবল বলিল, "যদি বলিস্, আমার হাতে মানুষ আছে। এখন নয়, একটু স্থির হ, একথা আর একদিন আসিয়া কহিব।"

অমাবস্যা গভীরা যামিনী। পিঙ্গলা স্নান করিল। আকুল কেশরাশি নিতম্ব ছাইল। আর্দ্রবসনে বনে প্রবেশ করিল। তথায় দেখে, শত শত লক্ষণাবৃক্ষ, পাতা জ্বলিতেছে। বিশল্য-করণীর পত্রে আভা নির্গত হইতেছে, শালকাঁটা, বড়বিচুটিগাছে ঝোপ করিয়া রাখিয়াছে। কোনও পাতা হইতে সুগন্ধ আসিতেছে, কোনও পাতার তীব্র ঘ্রাণ, অনেক পত্রেই অন্ধকারে জ্যোতি দেখা যাইতেছে। ঔষধের বন ! কিন্তু মাণিকযোড় গাছ ত দেখিতে পায় না। আলো জ্বালিয়া অন্বেষণ করিতেছে। লতায় লতায়, পাতায় পাতায়, ডাঁটায় ডাঁটায় মিলিত, কই ত দুটী গাছ নাই। দূরে শ্বাপদের সিংহনাদ, পিঙ্গলা ভয় পাইল না। দেউটী হস্তে অন্বেষণ করিতেছে। পায়ে কাঁটা ফুটিতেছে, গায়ে কাঁটা ফুটিতেছে, বিচুটি পাতায় আর্দ্র অঙ্গ ফুলিতেছে, ভ্রূক্ষেপ নাই। হঠাৎ দেখিতে পাইল, তিলকধারী কণ্ঠিধারী, পরমসুন্দর এক যুবা শায়িত। বারবিলাসিনী দেখিতে লাগিল, সতৃষ্ণনয়নে দেখিতে লাগিল, বার বার দেখিতে লাগিল, মাণিকযোড় ভুলিয়া গেল, বন্ধা ভুলিয়া গেল, যুবার রূপকুহকে মগ্ন হইল। এখানে পড়িয়া কে ? শ্বাস বহিতেছে ! গৃহে লইয়া যাইব। যে উপায়ে বাঁচে, তাহা করিব। যুবা পীনবাহু, বিশালবক্ষ, বরদেহ, ভারবিশিষ্ট। পিঙ্গলা কোমলাঙ্গী, তথাপি বাহুদ্বয় বেষ্টন করিয়া, অলৌকিক বলে, যুবাকে বক্ষে তুলিল ! গৃহাভিমুখে চলিল। মাঝে মাঝে আর্দ্রবসনের জল, যুবার মুখে দিতে লাগিল। সংজ্ঞাহীন যুবার মস্তক স্কন্ধে রাখিয়া, যেন কুহকবলে চলিতে লাগিল। বক্ষে বক্ষঃস্থল অনুভব করিয়া দেখিতেছে। এখনও ধক্ ধক্ করিতেছে, পৃষ্ঠে শ্বাস পড়িতেছে। গুরুভার বহন করিয়া পিঙ্গলা চলিল, দৃঢ়সঙ্কল্প, যুবাকে বাঁচাইবে। গৃহে পৌছিল। উত্তম শয্যায় শোয়াইল। সুরদাসকে ডাকিল, অনুনয় বিনয় করিয়া বলিল, "আমি তোমার। এ যুবার প্রাণ বাঁচাও। অনেক মিথ্যা অনেক চাতুরী করিয়াছি, আমার চাতুরীর শেষ হইয়াছে, এ যুবার প্রাণ বাঁচাও, আমার প্রাণ বাঁচাও, দাসী করিয়া পায়ে পায়ে ঘোরাও, আমি তোমার, এ যুবার প্রাণদান দাও, ভাবিও না, আমি এ যুবার সহিত সাক্ষাৎ করিব না, তোমারই থাকিব। যুবা প্রাণ পাইয়াছে, ইহা জানিতে পারিলেই আমার স্বর্গ !" বলিতে বলিতে পিঙ্গলার কণ্ঠরোধ হইল। আবার বলিতে লাগিল, "তুমি প্রেমিক, চাতুরী করিতেছি কি সত্য বলিতেছি, অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। আমি যুবার প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছি। জীবনে মরণে যুবার সহিত আমার প্রাণ ফিরিবে। কিন্তু আমি অঙ্গীকার করিতেছি, দেহ তোমার। একবার সুস্থ শরীরে যুবাকে দেখিব, তাহার পর, জন্মের মতন বিদায় দিব, আর দেখিব না। সযতনে সুবেশ করিয়া তোমার কাছে দিবারাত্র থাকিব, মদনোদ্দীপক হাব ভাব, বিলাস বাক্যালাপে তোমায় পরিতৃপ্ত করিব, তুমি যুবকের প্রাণদাতা, তোমায় ভালবাসিব।"

সুচিকিৎসক দেশ দেশান্তর হইতে আসিয়া চিকিৎসা করিতে লাগিল। ধনবলে, জনবলে, উৎসাহবলে, যাহা হইবার হইতে লাগিল। যুবা সংজ্ঞাহীন। পিঙ্গলা শিয়রে বসিয়া কাঁদে।

দিন বহিতে লাগিল, একদিন পিঙ্গলা দেখিল, যুবা নেত্র মেলিয়াছে। স্থির নেত্রে, স্বচ্ছ হৃদয়দর্পণ নেত্রে, দেখিতে লাগিল। যেন কিছু খুঁজিতেছে, নেত্রের ভাবে অনুভব হইল, যেন কি খুঁজিতেছে, যেন কি সম্মুখে ছিল, সরিয়া গিয়াছে। বিভোরনেত্রে চাহিয়া রহিল।

—:*:—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এখনও ভেকধারী আরোগ্যলাভ করে নাই। দিন দিন বৈদ্যেরা ভরসা দিতেছে, কিন্তু সেই দৃষ্টি, যেন কি খুঁজিতেছে। চক্ষের ভাবে, উন্মত্ততার আশঙ্কা। পিঙ্গলা আর স্বয়ং সেবা করে না, চারিজন সুদক্ষ দাসী সেবায় নিযুক্তা। পরস্পর ঈর্ষা করিয়া সেবা করে,—কে অধিক পিঙ্গলার প্রিয়পাত্রী হইবে। পিঙ্গলা প্রায়ই রুগ্নগৃহে যায় না;—কখনও কখনও দ্বারের আড়াল হইতে দেখে। চাহিলেই সেই দৃষ্টি! দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যায়।

সুরদাসের যথেষ্ট আদর। সুবেশা হইয়া, নিত্য তাহার নিকট যায়, আমোদ, পরিহাস, নৃত্য, গীত, যাহাতে সুরদাসের তৃপ্তি হয়, যত্নসহকারে চেষ্টা করে। যদি পরিহাসচ্ছলে সুরদাস কখনও বঙ্কার নাম উল্লেখ করে, বলিবামাত্র বুঝিতে পারে, বঙ্কার প্রতি আর অনুরাগ নাই। কিন্তু সুরদাস অসুখী! বঙ্কার ঈর্ষায়, তাহার যে জ্বালা ছিল, সে জ্বালা সহস্রগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। মানবচিত্ত, বিধাতার আশ্চর্য্য কৌশলে গঠিত। সুরদাস এখন বঙ্কার অন্বেষণ করে। বঙ্কা যাহাতে পিঙ্গলার নিকট আসে, ইহা তাহার চেষ্টা। হাস্য, পরিহাস, প্রেমবিলাস তাহার দিন দিন তিক্ত হইতে লাগিল। মনে মনে ধারণা জন্মিল, এ একটা সুসজ্জিত শবদেহমাত্র আমার নিকট আসে, অন্তর রুগ্নশয্যায় পড়িয়া আছে। যদি পুনর্ব্বার বঙ্কার অনুরাগিণী হয়, একদিন বিচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা। প্রত্যক্ষ বিচ্ছেদ হইয়াছে। কিন্তু এ অন্তরের গাঢ় প্রবাহ, পর্ব্বতাবরোধেও বহিবে। সুরদাস দিন দিন মলিন। অর্থ, মান, সম্ভ্রম, প্রাণ বিসর্জ্জনেও পিঙ্গলা তাহার হইবার নয়। কখনও কখনও জিজ্ঞাসা করে, "তোমার রুগী কেমন আছে?" [ক্রমশঃ]

কারিষ্ট। *

(বাবু কিরণচন্দ্র দত্ত লিখিত।)

মথিলীন পঞ্চদশবর্ষীয়া একটী সুন্দরী বালিকা, চঞ্চলস্বভাবা ও অসহনশীলা। তাহার প্রকৃতি কেমন এক রকমের। সর্ব্বদাই ব্যস্ত, সর্ব্বদাই চঞ্চল? মতির স্থিরতা নাই, কোন না কোন একটী কার্য্যে ব্যস্ত। কিন্তু তাহার স্বভাব অতীব সরল। চঞ্চল অথচ সরল, তাই বলিতেছি, কেমন এক রকমের। তাহার এই বিচিত্রতাময়ী প্রকৃতিকে সকলেই ভালবাসিত। মথিলীনকে সকলে 'পাগলী মথি' বলিয়া ডাকিত।

মথিলীন বেশ বড় ঘরের মেয়ে। তাহার কিছুরই অভাব নাই। কিন্তু সে পরদুঃখকাতরা। একদা গ্রীষ্মকালে সহরে গ্রীষ্মাতিশয্যবশতঃ তাহার পিতা মাতা মথিলীনকে পল্লীগ্রামে পাঠাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মথিলীনের বড় সুবিধা বোধ হইল। সে তাহার ধাত্রীমাতার সঙ্গে এক বৃদ্ধা খুল্ল-তাত-পত্নীর আবাসবাটীতে গমন করিল। তাহার খুল্লতাতপত্নী পিরটিনামক গ্রামের পার্শ্বস্থ এক বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিকারিণী। ফ্রান্সের দক্ষিণ পশ্চিমে ল্যাণ্ডেস্ প্রদেশে এই পিরটি গ্রাম অবস্থিত। গ্রামখানি ক্ষুদ্র, মাত্র চারিশত লোকের বাস। তাহার মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্রশ্রেণীর। গ্রামের চারিদিক জলাশয়ে পরিপূর্ণ। এই সকল জলাশয়ে অধিকপরিমাণে জলৌকা জন্মায়। এদেশের অধিকাংশ লোকেরই ছোট ছোট পুকুরে জোঁক ছাড়িয়া রাখা ও উহাই ধরিয়া কেনা বেচা করাই একমাত্র উপজীবিকা। পিরটি আসিয়া অবধি মথিলীন একদণ্ডও সুস্থির নয়। পথ, হাট, ঘাট, মাঠ, বন ও উপবন কিছুরই আটক নাই; মথিলীন সমস্ত দিনই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। তাহাকে দাবিবার লোক এখানে কেহই নাই।

মথিলীনের বৃদ্ধা খুল্ল-তাত-পত্নী তাহার অদ্ভুত প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া বিস্মিতা হইলেন। মধ্যে মধ্যে তাহার চঞ্চলস্বভাবের জন্য তাহাকে প্রার্থনামন্দিরে পাঠাইতেন। সেই সময়ে একটু নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন। মথিলীনের আসা অবধি পিরটি গ্রামে যেন একটা সাড়া পড়িয়াছে। তাহার অদ্ভুত পুরুষোচিত সাহস, সদা প্রফুল্ল আনন, আর তাহার এলোমেলো অথচ মধুর বাক্যাবলী সকল গ্রামবাসীকেই মুগ্ধ করিয়াছে।

একদিন প্রাতঃকালে মথিলীন তাহার ধাত্রী-মাতার সঙ্গে প্রাতঃ-ভ্রমণ উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া হঠাৎ এক মাঠের মাঝখানে ধাত্রী-মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া এক দৌড়ে এক ঝোপের ভিতর প্রবেশ করিল। ধাত্রী-মাতা মথিলীনের স্বভাব বিশেষরূপে জানিতেন। তিনি খানিক এদিক খানিক ওদিক দেখিয়া একাকিনী গৃহে ফিরিয়া গেলেন। মথিলীন ঝোপের ভিতর কিয়দ্দূর যাইয়া এক পচা পুকুরের ধারে পঁহুছিল। পুকুরের ধারে এক বৃদ্ধ কৃষক জলে পা ঝোলাইয়া বসিয়াছিল। নীরব কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ কৃষকের ক্ষীণদেহ দেখিয়া মথিলীনের কেমন সন্দেহ হইল। কিন্তু সাহসে ভর করিয়া বৃদ্ধের নিকটে যাইয়া বলিল, "নমস্কার কর্ত্তা, তুমি ওখানে কি করিতেছ?" বৃদ্ধ কৃষক মস্তক ফিরাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "নমস্কার মা ঠাকুরাণী, আমি জোঁক ধরিবার জন্য বসিয়া আছি।"

---

* একটি ফরাসী গল্পের ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে লিখিত।

"জোঁক ধরিয়া কি করিবে ?"

"আজ্ঞে, বিক্রয় করিব।"

দুই তিনবার বৃদ্ধ বালিকার দিকে চাওয়ায় বালিকা দেখিল, তাহার চক্ষু দুইটা কেমন ঘোলাপড়া। "কেমন করিয়া জোঁক ধরে" এই প্রশ্ন করিল।

"পিরটির যে কোন পুকুরের ধারে পা ঝোলাইয়া বসিয়া থাকিলে এই সকল শোণিতপিপাসু জোঁক পা দংশন করে। ঐ সময়ে সাবধানে উহাদিগকে ধরিতে হয়।" বৃদ্ধের নিকট আসিবার কিছু পূর্ব্বেই মথিলীন ঝোপের ভিতর হইতে একটী কাঁটাগাছের ক্ষুদ্র শাখা ভাঙ্গিয়া লইয়া আসিয়াছিল। ধীরে ধীরে বৃদ্ধের পাশে বসিয়া রহস্যের উদ্দেশ্যে সেই কাঁটাগাছের ডালটী জলের মধ্যে ডুবাইয়া বৃদ্ধের পায়ে ফুটাইতে লাগিল।

কৃষক মনে করিল, এত ঘন ঘন জোঁক আসিতেছে কেন। ধরিতে চেষ্টা করে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য জোঁক পলাইয়া যায়। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ বালিকার বৃক্ষশাখা ধরিয়া ফেলিল। মথিলীন বড়ই অপ্রস্তুত, মনে করিল, পলায়ন করি। তাহার মনে বড়ই কষ্ট হইল, পলাইতে পারিল না। পকেট হইতে একটি মুদ্রা বাহির করিয়া বলিল, "এই লও, তোমাকে একটি পাঁচ ফ্রাঙ্ক দিতেছি, সমস্ত দিনে যত জোঁক ধরিতে পারিতে, তাহার মূল্য পাইলে"; এই কথা শুনিয়া দরিদ্র কৃষক উত্তেজিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। ক্রোধে তাহার পা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মাথার টুপি খুলিয়া বলিল, "মা ঠাকুরাণী!" আমার নাম কারিষ্ট। আমি এই গ্রামে স্বায়ত্ব-শাসন-সভার সদস্য, ২৫ বৎসর যাবৎ উক্ত পদে অধিষ্ঠিত। আমি দরিদ্র বটে, কিন্তু কদাপি ভিক্ষা গ্রহণ করি না।" রাগে সেই পাঁচ ফ্রাঙ্কটি বালিকার দিকে নিক্ষেপ করিল। ধীরে ধীরে পুনরায় জোঁকের জন্য স্বাধীন কৃষক পা ঝোলাইয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

মথিলীন কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিয়া গেল। সেইদিন দিবারাত্র ভাল করিয়া সে আহার করিতে পারিল না। রাত্রে ভালরূপ নিদ্রা হইল না। পরদিন প্রত্যূষে খুল্ল-তাত-পত্নীর আজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়াই প্রার্থনা-মন্দিরে চলিয়া গেল। বেলা দুইটা অবধি সরল মনে ভগবানের নিকট আপনার পূর্ব্ব দিনের অপরাধের নিমিত্ত প্রার্থনা করিল। মথিলীন আপনাকে মহা অপরাধে অপরাধিনী বিবেচনা করিয়াছিল।

প্রার্থনান্তে সেই পুকুরের ধারে যাইয়া দেখিল, পূর্ব্বদিনের মত বৃদ্ধ কৃষক বসিয়া আছে। ধীরে ধীরে তাহার নিকট যাইয়া বাষ্পাকুললোচনে গদ্গদকণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। বৃদ্ধ প্রথমে অনভিমত প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু সেই অদ্ভুত বালিকার আগ্রহে মুগ্ধ হইয়া হৃষ্টমনে তাহাকে ক্ষমা করিল। মথিলীন বৃদ্ধের সরল হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া আনন্দে নাচিয়া উঠিল। বৃদ্ধের নিকটে বসিয়া বলিল, "কারিষ্ট! আজ হইতে তুমি আমার বন্ধু। তোমার বয়স কত এবং কিরূপেই বা তুমি স্বায়ত্ত-শাসন-সভার সদস্য হইলে, সমস্ত কথা আমায় বল।" বৃদ্ধ মথিলীনের বাক্যলহরীতে মোহিত হইয়া আপনার জীবনের যথাযথ ইতিহাস বর্ণন করিল। বৃদ্ধ অশীতিপর, তাহার সদস্য হইবার কারণ—সে কিছু লেখাপড়া জানিত। গ্রামের অনেকেই মূর্খ, সেইজন্য তাহার প্রাধান্য। সে সংবাদ-পত্র পাঠ করিতে পারিত। এমন কি তদানীন্তন সমর-সচিবের নাম অবধি বিনা পরিশ্রমে বলিতে পারিত। তাহার পর কারিষ্ট আপনার দুরবস্থার বিষয় বলিতে লাগিল। [ক্রমশঃ]

দিব্য বাণী

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥
নির্বিণ্নানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু।
তেষ্বনির্বিণ্নচিত্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্নো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥

—শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১১।২০।৬-৮

(উদ্ধবের

জ্ঞানযোগ কর্মযোগ আর ভক্তিযোগ
মানব-কল্যাণ তরে এই তিন যোগ
বলিয়াছি আমি পূর্বে। এই তিন ভিন্ন
জগতে কোথাও আর পন্থা নাই অন্য।

প্রবল বৈরাগ্যহেতু সর্বকর্মত্যাগী
জ্ঞানযোগে অধিকৃত। কর্ম-অনুরাগী
কর্মাসক্ত, কর্ম করি চায় ফলভোগ
বিহিত তাদের পক্ষে হয় কর্মযোগ।

ভাগ্যবশে যে জীবের আমার কথায়
বিগ্রহে বা লীলাদিতে ভক্তিশ্রদ্ধা হয়
বিরক্তও নয় কিম্বা অত্যাসক্ত নয়
ভক্তিযোগ তার পক্ষে সিদ্ধিপ্রদ হয়।

কথাপ্রসঙ্গে

কর্ম ও উপাসনার সমুচ্চয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গের 'সাধকভাবের শেষ কথা'-অধ্যায়ে গ্রন্থকার স্বামী সারদানন্দজী লিখিয়াছেন যে, সর্বধর্মমতে সিদ্ধ হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কয়েকটি অসাধারণ উপলব্ধি হইয়াছিল। ষষ্ঠ উপলব্ধি হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে: 'কর্মযোগ অবলম্বনে সাধারণ মানবের উন্নতি হইবে।' ইহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন: 'সত্ত্বগুণী ব্যক্তির কর্ম স্বভাবতঃ ত্যাগ হইয়া যায়—চেষ্টা করিলেও সে আর কর্ম করিতে পারে না, অথবা ঈশ্বর তাহাকে উহা করিতে দেন না। যথা, গৃহস্থের বধূর গর্ভবৃদ্ধির সঙ্গে কর্মত্যাগ এবং পুত্র হইলে সর্বপ্রকার গৃহকর্মত্যাগ করিয়া উহাকে লইয়াই নাড়াচাড়া করিয়া অবস্থান। অন্য সকল মানবের পক্ষে কিন্তু ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া সংসারে যত কিছু কার্য বড় লোকের বাটীর দাস-দাসীর ভাবে সম্পাদন করার চেষ্টা কর্তব্য। ঐরূপ করার নামই কর্মযোগ। যতটা সাধ্য ঈশ্বরের নামজপ ও ধ্যান করা এবং পূর্বোক্তরূপে সকল কর্ম সম্পাদন করা—ইহাই পথ।'

এই উদ্ধৃতিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ইহাতে আমরা কর্মযোগের সংজ্ঞা ও বিশদ ব্যাখ্যা পাই। ইহা খুবই পরিষ্কার যে, ঈশ্বরকে বাদ দিয়া কর্মযোগ হয় না। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া অনাসক্ত হইয়া সকল কর্ম করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে যথাসাধ্য ঈশ্বরের নামজপ ও ধ্যান করিতে হইবে, ইহারই নাম কর্মযোগ এবং এই কর্মযোগ অবলম্বনেই সাধারণ মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে।

অসাধারণ অধিকারী কি করিবেন, না করিবেন, তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। অসাধারণ অধিকারী আর কয়জন? আমাদের প্রয়োজন সর্বসাধারণের শ্রেয়োমার্গ কি, সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়া।

শ্রীমা সারদাদেবী বলিয়াছিলেন: 'কাজকর্ম করবে বই কি, কাজে মন ভাল থাকে। তবে জপধ্যান, প্রার্থনাও বিশেষ দরকার। অন্ততঃ সকাল-সন্ধ্যায় একবার বসতেই হয়। ওটি হ'ল যেন নৌকার হাল।'

দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাইবার কিছু পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার জনৈক বন্ধুকে একদিন বলিয়াছিলেন: 'কর্ম কর্ম অনন্ত কর্ম—তার ফলের দিকে দৃষ্টি না রেখে, আর প্রাণ-মন সেই রাঙা পায়।'

বন্ধু। 'এ তো কর্মযোগ!'

স্বামীজী। 'হ্যাঁ, এই কর্মযোগ। কিন্তু সাধনভজন না করলে কর্মযোগও হবে না।'

কর্ম ও উপাসনার এই সমুচ্চয় সম্পর্কে স্বামী ব্রহ্মানন্দের উক্তি:

'কর্ম ও উপাসনা একসঙ্গেই করতে হয়।'

'মনের গোলমালের জন্য ধ্যানজপ হয় না। কাজের জন্য ধ্যানজপের সময় না পাওয়া মনে করা ভুল। Work and worship (কর্ম এবং উপাসনা) এক সঙ্গে করবার অভ্যাস করতে হবে।'

'আমি একথা পুনঃ পুনঃ বলি এবং এখনও জোর করে বলছি যে, দুর্ভিক্ষ নিবারণ কার্য ইত্যাদি যে কাজই করতে যাও, সকাল সন্ধ্যায় এবং কর্মের শেষে এক একবার ভগবানকে ডেকে নেবে—জপধ্যান করবে। স্বামীজীর মুখে প্রায়ই শুনতুম 'Work and worship'—কাজও কর,

ধ্যানজপও কর। তবে বিশেষ কোন কাজের pressure-এ (চাপে) এক আধ দিন হ'ল না, সে আলাদা কথা।'

'নাম না ক'রে যা কিছু করবে, তাতে গোলকধাঁধায় ঘুরে মরবে।'

স্বামী শিবানন্দজী বলিয়াছিলেন :

'স্বামীজী এ সংঘে সেবাদি যে সকল কাজের প্রবর্তন করে গেছেন, সে সব কাজ দৈনন্দিন সাধনভজনের সঙ্গে করতে হবে ভজন সাধনের অঙ্গজ্ঞানে, তবেই কাজও ঠিক ঠিক হবে। তা না ক'রে যদি কেউ খালি কর্মস্রোতে গা ঢেলে দেয়, তা হলে শেষ পর্যন্ত টাল সামলানো বড় মুস্কিল। অনেক সময় কাজের খুব সাফল্য দেখে উহাতে ঝোঁক বেড়ে যায়। তা কিন্তু ভাল নয়; তাতে শেষ পর্যন্ত জীবনের উদ্দেশ্য ভুল হয়ে যায় এবং সব গুলিয়ে দেয়।'

'কাজকর্মের সাথে নিয়মিত জপধ্যান থাকলে কোন গোল হয় না, আমাদের ত কাজ করতেই হবে।'

'কাজ যখন বেশী পড়ে তখন না হয় ধ্যানজপ কিছুই নাই করলে। কিন্তু কাজ কমলে আবার বেশী ক'রে ধ্যানজপ প্রাণভরে ক'রে নিও।'

'কাজকর্ম ভাল, কিন্তু যারা ঈশ্বরলাভ করতে চায়, তাদের প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই চারটে stage (অবস্থা) পেরুতে হবেই।'

স্বামী সারদানন্দজী একটি পত্রে লিখিয়াছেন :

'তোমাদের মধ্যে অশান্তি ও বিবাদ ইত্যাদির কথা যাহা লিখিয়াছ, তাহার মূল কারণ—কর্মের অত্যন্ত প্রসার হওয়ায় লোকের ধ্যান-ধারণা পূজাপাঠ ইত্যাদি উচ্চ চিন্তা ও চর্চা করিবার অবসরের ক্রমশঃ বিশেষ অভাব হইয়া দাঁড়াইতেছে। আত্মোন্নতি-সাধনের একটি পথ কর্ম, একথা নিশ্চয়; কিন্তু কর্মদ্বারা চিত্তের যে বিক্ষেপ ও চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় তাহা নিবারণের একমাত্র উপায় ঈশ্বরের বা উচ্চ বিষয়ের চিন্তা ও চর্চা... কর্মের দিকটা কিছু কমাইয়া বৈরাগ্য ও ধর্মচর্চার দিকটা একটু বাড়াইলে বিপদ ও অশান্তি অনেকটা আপনাআপনি কমিয়া যাইবে।'

কর্মযোগ বা উপাসনাশ্রিত কর্ম সম্বন্ধে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চারি জন সাক্ষাৎ শিষ্যের কিছু উক্তির উদ্ধৃতি দিয়াছি। এই বিষয়ে বহু উদ্ধৃতি দেওয়া যাইতে পারে। বাহুল্যভয়ে আমরা অতি সংক্ষেপে বিষয়টি পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে—অন্ততঃ উপনিষদ ও গীতায় এই প্রসঙ্গে কি পাওয়া যায় তাহাও আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিতে চাই। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার সন্তানগণ কোনও সাম্প্রদায়িক মতবিশেষের সৃষ্টি করিয়া যান নাই, তাঁহারা তাঁহাদের জীবন ও বাণীর মাধ্যমে সনাতন বৈদিক ধর্মেরই পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

ঈশোপনিষদের দ্বিতীয় মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে, মানুষ এই জগতে কর্ম করিয়াই যেন তাহার শতবর্ষপরিমিত আয়ু অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করে। সুস্থদেহে আলস্যে অথবা অসুস্থদেহে শয্যাশায়ী হইয়া যেন তাহার জীবন না কাটে। সে যেন আমরণ সুস্থশরীরে কর্মে ব্যাপৃত থাকে। এইরূপ করিলে সে কর্মে নির্লিপ্ত থাকিতে পারিবে। ইহা ভিন্ন নিরাসক্ত থাকিবার অন্য উপায় নাই।

কিন্তু শাস্ত্রবিহিত কর্ম করিলেই যে, মানুষ অনাসক্ত থাকিতে পারিবে সে ভরসা কোথায়? শাস্ত্রবিহিত কর্ম করিয়াও কর্তৃত্বাভিমানের বশবর্তী হইয়া ও ফলাকাঙ্ক্ষায় প্রলুব্ধ হইয়া মানুষ সহজেই কর্মে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহা তো প্রত্যক্ষসিদ্ধ ব্যাপার! সুতরাং এই মন্ত্রটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে—

ইহার অর্থপূর্তির জন্য অন্য কিছুর অপেক্ষা আছে। 'এইরূপ করিলে সে কর্মে নির্লিপ্ত থাকিতে পারিবে।' কিরূপ করিলে? এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে প্রথম মন্ত্রে ফিরিয়া যাইতে হইবে—এই জগতে জড়-চেতন যাহা কিছু আছে, তাহাতেই ঈশ্বরদর্শনের অভ্যাস করিতে হইবে, ত্যাগের দ্বারা নিজেকে পালন করিতে হইবে, কাহারও ধনে লোভ করা চলিবে না। মুখ্য কথা এই যে, সর্বত্র ঈশ্বরদর্শনের অভ্যাসরূপ উচ্চস্তরের উপাসনা করিতে হইবে। এইভাবে উপাসনা করিতে করিতে শতবর্ষ কর্ম করিলেও কর্মে লিপ্ত হইবার কোনই আশংকা থাকিবে না।

ঈশোপনিষদের একাদশ মন্ত্রেও কর্ম ও উপাসনার এই সমুচ্চয়ের কথাই বলা হইয়াছে :

বিদ্যা ও অবিদ্যা অর্থাৎ উপাসনা ও কর্মকে যিনি একই পুরুষের অনুষ্ঠেয় বলিয়া জানেন, তিনি কর্মের দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া উপাসনাসহায়ে অমৃতত্বলাভ করেন।

নবম মন্ত্রে বলা হইয়াছে, যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে অর্থাৎ উপাসনাবিহীন কর্ম করে, তাহারা অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে প্রবেশ করে। আর যাহারা কেবলমাত্র বিদ্যার অর্থাৎ কর্মরহিত উপাসনায় রত তাহারা অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। এই মন্ত্রের প্রথমাংশ আমরা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছি। উপাসনারহিত কর্মের ফল যে অশুভ তাহা মহাজনগণের বাণীসহায়ে পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। শেষাংশ সম্পর্কে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, যাহারা প্রথমে কর্ম ও উপাসনার সমুচ্চয়পূর্বক সাধন করিয়া নিজেদের যোগ্য আধারে পরিণত না করিয়া হঠকারিতার বশে প্রবর্তক অবস্থাতেই শুধু উপাসনায় রত থাকে, তাহারা ঘোরতর অশুভফল ভোগ করিতে বাধ্য হয়। এই বিষয়ে শ্রীমা সারদাদেবী স্বামী ঈশানানন্দকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা উল্লেখযোগ্য :

'কয়েকদিন একটু জপধ্যান করলেই কি সব হয়ে গেল? মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে, কিছুতেই কিছু হবার নয়। সেদিন দেখলে তো, একজন জোর করে জপধ্যান বেশী ক'রে করতে গিয়ে মাথাটি বিগড়ে এলেন! মাথাটি যদি বিগড়াল তো আর রইল কি? ইস্ক্রুপের প্যাচের একটু এধার আর ওধার। এক প্যাচ আলগা হলেই হয় পাগল হল, না হয় মহামায়ার ফাঁদে পড়ে নিজেকে বুদ্ধিমান ভেবে মনে করে, আমি বেশ আছি।··· সব সময়ে জপধ্যান করতে পারে কজন? প্রথমটা একটু করে। শেষে ··· বসে থেকে থেকে নীচের গরম মাথায় ওঠে (অহঙ্কারী হয়)। গাছপাথর ভেবে নানা অশান্তি। মনটাকে বসিয়ে আলগা না দিয়ে কাজ করা ঢের ভাল। মন আলগা পেলেই যত গোল বাঁধায়। নরেন আমার এইসব দেখেই তো নিষ্কাম কর্মের পত্তন করলে।'

স্বামী ব্রহ্মানন্দজীও বলিয়াছিলেন :

"স্বামীজী একদিন বলিলেন, 'দেখ, আজকালকার ছেলেরা যারা সব আসচে, তারা ত দিন রাত ধ্যান ভজন নিয়ে থাকতে পারবে না — তাই এই সব সেবাকার্য প্রভৃতি খোলা।' দিন রাত যদি কেউ ধ্যান ভজন পাঠ নিয়ে থাকতে পারে সে ত উত্তম কথা। কিন্তু কার্যতঃ তা হয় না, শেষে কুড়েমির আশ্রয় করে থাকে।···দেখেছি, হৃষিকেশে যারা দু-চার বছর কাটিয়ে আসছে তাদের চেয়ে যারা এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে ধ্যান ভজন কাজকর্ম নিয়ে আছে, তারা বেশ উন্নতি করছে।"

'একটা সময় আসে যখন সব ছেড়ে শুধু জপ ধ্যান নিয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়, তখন কাজ অমনি ছুটে যায়। মন যখন জাগ্রত হয়, তখনই এটা হয়। নতুবা জোর করে করতে গেলে দু চার দিন ভাল লাগে, তারপরেই আবার monotony (একঘেয়ে ভাব) আসে। কেউ কেউ হয়ত পাগল

হয়ে যায়।'

এইবার আমরা আমাদের মূল প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসিতেছি। গীতায় কর্ম ও উপাসনার সমুচ্চয়ের কথা অসংখ্য স্থলে বলা হইয়াছে। 'মাম্ অনুস্মর যুধ্য চ' (৮।৭)—ইহা তো একটি মহামন্ত্র! কর্ম ও উপাসনার সমুচ্চয়বোধক এই ভগবদ্‌বাক্যটি সর্বকালের সাধককুলের শ্রেয়োমার্গের দিগ্-নির্ণায়ক। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের স্মরণমননও করিতে বলিতেছেন। 'যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ' (৩।৩০) - ইহাও আর একটি মহামন্ত্র! 'বিগতজ্বর' হইয়া—যুদ্ধের উন্মাদনাজনিত উত্তাপ-বর্জিত হইয়া ধীর স্থির শান্ত অন্তঃকরণে যুদ্ধ করিবার উপদেশ শ্রীভগবান প্রিয় সখা অর্জুনকে দিতেছেন। কিভাবে তাহা সম্ভব, সে-কথা ঐ শ্লোকেই আছে—'ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্য,' 'অধ্যাত্মচেতসা' ইত্যাদি শব্দসমূহে। ঈশ্বরে সর্বকর্মের ফলাফল সমর্পণ না করিলে, আধ্যাত্মিক-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া কর্ম না করিলে কেহ 'বিগতজ্বর' হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে না।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম
ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব
পাবনানি মনীষিণাম্॥ (১৮।৫)

—গীতার এই শ্লোকের ভাষ্যে 'মনীষিণাম্'-পদের ব্যাখ্যায় আচার্য রামানুজ লিখিয়াছেন, 'মনীষিণাং মননশীলানাং পাবনানি। মননম্ উপাসনম্। মুমুক্ষূণাং যাবজ্জীবম্ উপাসনং কুর্বতাম্ উপাসন-নিষ্পত্তি-বিরোধি-প্রাচীন-কর্ম-বিনাশনানি ইত্যর্থঃ।' অর্থাৎ মনীষী-শব্দের অর্থ মননশীল। মননের অর্থ উপাসনা। সুতরাং যজ্ঞ দান তপঃ আদি কর্ম মুমুক্ষু উপাসকের আমরণ প্রতিদিন করণীয় (আপ্রয়াণাদ্ অহরহঃ কার্যম্)। এই সকল কর্ম উপাসনার সিদ্ধির বিরোধী যাবতীয় প্রাচীন কর্মের বিনাশক।

এইভাবে দেখা যায়, সাধারণ সাধকের জন্য কর্ম ও উপাসনার সমুচ্চয়রূপী সুগম সাধন-পন্থাই বৈদিক ধর্মে উপদেশ করা হইয়াছে।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

ডাক বিভাগের গোলমালের জন্য উদ্বোধন পত্রিকার বহু গ্রাহকের নিকট পত্রিকা সময়মতো বা কোন কোন মাসে একেবারেই পৌঁছায় না। ইহাতে গ্রাহকগণের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এখান হইতে পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয় না—সেভাবে অনুযোগ করিয়া বহুজন পত্রও দিয়া থাকেন। তাঁহাদের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, সাধারণতঃ প্রতি মাসেই ১০ তারিখের মধ্যে (ইংরেজী মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে) প্রত্যেক গ্রাহকের নামেই পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়। গ্রাহকদিগের নিকট না পৌঁছাইবার কারণ ডাক বিভাগের গণ্ডগোল, এখান হইতে পাঠাইবার গাফিলতি নয়। এরূপ ক্ষেত্রে গ্রাহক দয়া করিয়া স্থানীয় পোস্ট আফিসে খোঁজ করিলে কৃতজ্ঞ থাকিব।

—কার্যাধ্যক্ষ

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা

স্বামী সারদেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীমতী রাধুকে অবলম্বন করিয়া মায়ের মন লৌকিক রাজ্যে নামিয়া আসিবার পরই তাঁহার স্নেহশীতল মন্দাকিনীধারার অমৃতবারি পান করিয়া বহুলোকে পরিতৃপ্ত শীতল হইয়াছিলেন। তৎপূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত ও বিশেষ সুকৃতিবলে অল্পসংখ্যক স্ত্রীপুরুষেরই তাহা আস্বাদন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। রাধুর মা, পাগলী মামী আমাদিগকে বলিয়াছেন, "'রাধি' 'রাধি' করে মা ব্যস্ত ও রাধির জন্য ব্যাকুল হওয়ার পূর্বে মাকে দেখে সাক্ষাৎ এক দেবীমূর্তি মনে হ'ত, কাছে যেতে সাহস হ'ত না। তখন অন্যরকম ছিল ঠাকুরঝি, ঠাকুরুণটির মত; পূজার আসনে যখন বসত তখন কাছে যেতে সাহস হ'ত না। ভয় করত। এই রাধি রাধি করেই গেল। দেখ! রাধির জন্যই যত হাঙ্গামা সব জুটল।" তিনি স্বয়ংও বলিতেন রাধুকে দেখাইয়া, "ওর জন্যই সব কিছু, না হ'লে আমার যে মন কোথায় উর্ধ্বে চলে গিয়ে বিলীন হয়ে যায়! ঠাকুরের কি অদ্ভুত কাণ্ড, সেই মনকে নীচে নামিয়ে এনে এই রাধুর উপর রেখেছেন!" আবার রাধুর অত্যধিক আবদার উৎপীড়নে সময় সময় মৃদুহাস্যে বলিতে শুনা যাইত, "ও কি মনে করে, তাকে না হ'লে আমার চলে না। এক্ষুনি মনকে তুলে নিলে, কোথায় পড়ে থাকবে এসব!!" ঠাকুরের অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহারই কাজের জন্য মা রাধুকে নিমিত্ত করিয়া সংসারমরুতে জীবকল্যাণে স্নেহমন্দাকিনীধারা প্রবাহিত রাখিয়াছিলেন। সংসার, টাকাপয়সা, লোকসঙ্গ, লৌকিক ব্যবহার সমস্ত অঙ্গীকার করিয়া মা সংসারী সাজিয়া মানুষকে গার্হস্থ্যধর্ম শিক্ষা দিয়াছেন। মনুষ্যহৃদয়ের ভাল-মন্দ বৃত্তি ও অভিব্যক্তি বুঝিয়া তিনি স্নেহ-মমতা সহকারে সেগুলিকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতেন, তাহা দেখিয়া ধীমান্ ব্যক্তিগণও বিস্মিত হইয়াছেন।

রাধুর আবির্ভাবের পূর্বের কথা শুনিয়াছি; ধ্যানস্থ তাঁহার জড়বৎ মূর্তিকে—গোলাপ মা, যোগেন মা চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় তুলিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে বসাইতেন; দেহের হুঁশ নাই। ভক্তেরা প্রণাম করিয়া টাকা কাপড় ফল প্রভৃতি তাঁহার পদতলে রাখিতেন, তিনি খেয়ালই করিতেন না; সঙ্গিনী সেবিকা উঠাইয়া রাখিয়া দিতেন, প্রয়োজনানুসারে সকলেই ব্যবহার করিত, নিজে কখনও খোঁজ-খবর লন নাই! রাধি আসিল, মন নীচে নামিল, সংসার বাড়িল; সংসারী সাজিলেন, সংসারের দায়িত্ব কাঁধে তুলিলেন। সংসারের দুঃখকষ্ট, শোকতাপ অন্তরে অনুভব করিলেন। জীবের দুঃখে হৃদয় বিগলিত হইল, তাহাদের পরিত্রাণের জন্য নিজেকে বিলাইয়া দিলেন—আর্ত, ভীত কলির জীব মাকে পাইয়া মায়ের স্নেহসুধা পান করিয়া নবজীবন, নবীন বল লাভ করিল।

মায়ের জীবনচরিতের পাঠকগণ দেখিয়াছেন, রাধু আসিবার পর মায়ের সংসার বাড়িয়াই চলিয়াছে। কলিকাতায় মায়ের বাড়ী উদ্বোধন নির্মিত হইবার পরে কোয়ালপাড়ায় তাঁহার জন্য জগদম্বা আশ্রম, জয়রামবাটীতে স্থানাভাব দূর করিবার জন্য প্রথমে কালীমামার বাড়ী বৈঠকখানা, তারপর ক্রমশঃ মায়ের পৃথক্ বাড়ী নির্মিত হইল। দেশ-বিদেশের নানা শ্রেণীর স্ত্রীপুরুষ-ভক্তের যাতায়াত, কৃপালাভ দিনে দিনে বাড়িয়াই চলিয়াছিল। জয়রামবাটীতে মা, বাপের বাটীতে

মেয়ের মত থাকেন। এখানে পর্দার আড়াল, ঘোমটার আবরণ তেমন নাই, সকলের সঙ্গে কথাবার্তা নিঃসঙ্কোচে বলেন। তাই সন্তানেরা জয়রামবাটীতেই তাঁহাকে দর্শন করিতে চায়। উদ্বোধনে মা শ্বশুরবাড়ীর বধূটির মত থাকেন। দেখা পাওয়া, আলাপ করা কঠিন। উদ্বোধনের বাড়ী তাঁহারই জন্য নির্মিত; পূজনীয় শরৎ মহারাজ মনে করেন, তিনি মায়ের বাড়ীর দ্বারী। মা তবু জানেন এটি সাধুদের আশ্রম। তাই দলবল লইয়া আসিয়া উদ্বোধনে যখন থাকেন, আশ্রমে যাহাতে অসুবিধা না বাড়ে, সেদিকে সব সময় দৃষ্টি রাখিয়া চলেন।

উদ্বোধনে থাকাকালীন ভক্তসাধুগণই তাঁহার সেবাযত্ন করেন, আর জয়রামবাটীতে থাকার সময় মা-ই সকলের সেবাশুশ্রূষায় ব্যস্ত থাকেন। নিজে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করেন, রাঁধেন, খাওয়ান, এঁটো পরিষ্কার করেন, সন্তানদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দেন। দূরাগত ভক্ত-সন্তানগণকে দুই-এক দিন না রাখিয়া ছাড়িতে চান না। তাঁহাদের সুখসুবিধার জন্য সদা-উৎকণ্ঠিত। এমনকি, তাঁহাদের বাড়ীঘর আত্মীয় স্বজনদেরও খোঁজখবর নেন। সুখদুঃখের কথা শুনেন, সহানুভূতি-সমবেদনা প্রকাশ করেন, পরামর্শ দেন। মা তো মা, সত্যিকার মা! বিদায়কালে বিষণ্ণ হইয়া পড়েন, ছাড়িতে পারেন না। সন্তানেরা কেহ যখন চলিয়া যায়, যতদূর দৃষ্টি যায় মা রাস্তার দিকে তাকাইয়া থাকেন—চোখে অশ্রু ঝরে! সন্তানের হৃদয়ে সে স্মৃতি দৃঢ়বদ্ধ হইয়া যায়।

উদ্বোধনে মা বধূর মত থাকেন, তাঁহার দর্শন পাওয়া বড় কঠিন, প্রসাদ পাওয়া বহু ভাগ্যের কথা; মায়ের হাতে খাওয়া ত অসম্ভব ব্যাপার। উদ্বোধন হইতে গঙ্গার ঘাটে মা স্নানে যান,—শাশুড়ীর আঁচলধরা নূতন বধূটির মত গোলাপ মার পিছনে পিছনে। পূজনীয় শরৎ মহারাজ নিত্য তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিলে এমন ঘোমটা টানিয়া বসেন যে, মহারাজ অন্তরালে আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, 'আমাকে যেন মনে করে শ্বশুর!!'

লৌকিক মর্যাদা রক্ষার জন্যই প্রায় সর্বদা এইরূপ সঙ্কোচসহ ব্যবহার করিলেও মা তাঁহার প্রিয়তম সন্তান শরতের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখেন নাই। সিদ্ধপুরুষ সারদানন্দ জগজ্জননীকে মাতৃরূপে ও কন্যারূপে সেবা পূজা ভক্তি স্নেহ বাৎসল্য প্রকাশের—আস্বাদনের সুযোগ সুবিধা সময় সময় বাঞ্ছিতভাবে পাইয়া আপনার অদ্ভুত তপস্যা, ভক্তি-সাধনার ফল লাভ করিয়াছিলেন। এক সময়ে মা কোয়ালপাড়াতে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভীষণ অসুস্থ, পিত্তের প্রবল প্রকোপে শরীরে অসহ্য জ্বালা,—যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন। মহারাজ কলিকাতা হইতে সুযোগ্য ডাক্তার কাঞ্জিলাল ও বিশ্বস্তসেবক ভূমানন্দকে পাঠাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের চিকিৎসা, সেবা-যত্নে ফলোদয় না হওয়াতে পরে নিজেই আসিয়াছেন অতিশয় ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া। কন্যা দেহের জ্বালায় অস্থির! 'ঠাণ্ডা কর—ঠাণ্ডা কর' বলিতেছেন। চিকিৎসক-সেবকের চেষ্টা বিফল! স্নেহময় পিতা বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া বিষণ্ণ-বদনে কাতরনয়নে বিদীর্ণহৃদয়ে প্রত্যক্ষ করিতে-ছেন,—স্নেহপুতলী কন্যার মর্মান্তিক যন্ত্রণা! আর্ত দুহিতা পিতার গায়ে হাত দিলেন, দেহের শীতলতায় হাতের জ্বালা উপশম হইল। 'আঃ বাঁচলুম!' বলিয়া সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। পিতার প্রাণ উৎফুল্ল হইল। ভরসা পাইয়া তাড়াতাড়ি গায়ের জামা খুলিয়া ফেলিলেন, আরও কাছে গিয়া বসিলেন। অম্বিকা তাঁহার লম্বোদরের স্নিগ্ধ উদর স্পর্শ করিয়াই হউক, অথবা হৈমবতীর ন্যায় পিতা হিমালয়ের দেহের শীতল স্পর্শেই

হউক, সোয়াস্তি-শান্তি পাইলেন, দারুণ জ্বালার উপশম হইল। বাবা-মেয়ে দুজনের প্রাণ ঠাণ্ডা !! এইরূপে কচিৎ কখনও এই বিশুদ্ধ অপার্থিব বাৎসল্যরস কিঞ্চিৎ আস্বাদন করাইলেও, মা-মেয়ে শেষ অসুখের সময় নরবপু অপ্রকট করার পূর্বমুহূর্তে 'বাবার হাতে খাইয়া'* সারদানন্দের অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন বিশেষভাবে।

মা তাঁহার অপর কোন কোন দীন সন্তানকেও কৃপা করিয়া স্বহস্তে খাওয়াইয়াছেন মায়ের মতই; আবার খাইয়াছেনও মেয়ের মতই।

অতীন্দ্রিয়লোকে বিচরণশীল, সদা ভাব-ভাস্বর রাজা মহারাজের মন মাতৃ-সন্নিধানে ক্ষুদ্র শিশুর আকার ধারণ করিত।

তাঁহার সন্তানগণ যে এক মায়ের ছেলে, ভাই-বোনের মত, সে কথা তাহাদের অন্তরে দৃঢ় করাইবার জন্য মা সচেষ্ট থাকিতেন। আবার স্ত্রী ও পুরুষ ভক্তগণ যাহাতে পরস্পর হইতে সর্বদা দূরে থাকেন, একে অপরের সঙ্গে কথাবার্তা মেলামেশা বেশী না করেন—সে বিষয়েও মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিত। জয়রামবাটীর ছোট বাড়ীতে একত্র থাকা খাওয়ার মধ্যেও মা ছেলেদিগকে মেয়েদের নিকট হইতে সর্বদা দূরেই রাখিতেন। বিশেষ কাজের প্রয়োজন ভিন্ন, ছেলেদের বাড়ীর ভিতরে যাওয়া কিংবা মেয়েদের সঙ্গে কথা বলা নিষেধ ছিল। জল-খাবার খাওয়া অথবা অন্য প্রয়োজনে তিনি নিজেই তাহাদের ডাকিতেন, কাছে বসিয়া খাওয়াইতেন, প্রয়োজনীয় কথা বলিতেন—এমনকি তাঁহার নিকটেও বেশীক্ষণ থাকিতে দিতেন না, বলিতেন, 'আর কিছু না হোক বাবা, আকারটা ত মেয়েমানুষের !'

সন্ন্যাসী-সন্তানগণের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য মার কি চেষ্টা! কত উপদেশ! কখনো আবার একটু হালকা সুরে বলিতেন, "বাবা, সংসার কর নাই- ঘুমিয়ে বাঁচবে!" পূজনীয় যোগানন্দ স্বামীর নাম করিয়া বলিতেন, "যোগীন বলত—'মা, সাধু হয়েছি, এবার ঘুমিয়ে বাঁচবো।'" সংসারী সন্তানদেরও সংসারে ডুবিয়া না গিয়া ঠাকুরের চিন্তা ও সংযত জীবন যাপন করিবার জন্য কতভাবে উপদেশ দিতেন। বলিতেন, "দু-একটি ছেলেমেয়ে হবার পর ভাই-বোনের মত সংসার করবে, আলাদা থাকবে। সম্ভব হলে স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে দূরে থেকে তাদের মানুষ করবে, স্বামী রোজগার করে তাদের ভরণপোষণ করবে।"

মা তাঁহার ভাই-ভাইঝিদের ভোগতৃষ্ণা, সংসারজ্বালার বিশেষ দুঃখ অনুভব করিয়া সময় সময় অন্তরের বিরক্তি বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিতেন। সংসারে জীবনধারণ করিতে গেলে, টাকাকড়ির সম্পর্ক ষোল আনা ত্যাগ করা যায় না, মাকেও টাকাপয়সা রাখিতে হইত—বুঝিয়া শুনিয়া খরচও করিতেন। কিন্তু নির্লিপ্ত ভাব! অর্থের প্রধান মাদকতা—সঞ্চয়-লালসা ও অহমিকাভাব—কেহ কস্মিন্ কালেও মায়ের ব্যবহারে দেখিতে পায় নাই। প্রথম দিকে তো টাকাকড়ি স্পর্শই করিতেন না। শেষের দিকে সংসার বাড়িলে যখন অর্থের প্রয়োজন হইল, তখন অর্থ আসিতে লাগিল যথেষ্ট, কিন্তু সে যেন স্রোতের জল—আসিতেছে, চলিয়া যাইতেছে—মায়ের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিতেছে না।

জয়রামবাটীতে ডাকপিয়ন মনিঅর্ডারের টাকা লইয়া আসিল। মা টিপসই দিলেন, অপর একজন লিখিল—'শ্রীসারদাদেব্যার টিপসই …।' পিয়নই টাকা গণিয়া দেখাইয়া দিল। মা মুঠো করিয়া লইয়া ঘরে রাখিয়া দিলেন। পিয়নকে প্রসাদ দিয়া, মিষ্টকথা বলিয়া বিদায় করিলেন। কেহ জানিতে পারিল না, কত টাকা আসিয়াছে, কে পাঠাইয়াছে। পরে অবসরমত কাহারও দ্বারা পত্র লিখাইয়া ভক্তগণকে প্রাপ্তিস্বীকার ও আশীর্বাদ জানাইলেন। সেবক কেহ উপস্থিত থাকিয়া

মনিঅর্ডার গ্রহণ করিলেও টাকা বেশী নাড়াচাড়া গণাবাছা করা নিষেধ করিয়া বলিতেন, "বাবা, টাকার শব্দ শুনলেও গরীবের মনে লোভ জন্মে; টাকা এমন জিনিস, দেখলে কাঠের পুতুলও হাঁ করে।"

ভক্তেরা কত জিনিস, ভাল ভাল মিষ্টি, ফল, কাপড়-চোপড় লইয়া আসিতেন। মা প্রসন্ন অন্তরে গ্রহণ করিয়া আশীর্বাদ করিতেন। সে শুধু সন্তানদের পরিতৃপ্তির জন্যই, এই সকল জিনিসের প্রতি তাঁহার টান কখনও কেহ দেখে নাই।

নিজে যেসকল বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতেন, তাহা সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকেরই উপযোগী এবং যতদিন ব্যবহার করা চলিত তাহা ত্যাগ করিতেন না; এমন কি ব্যবহৃত বস্ত্রাদি সেলাই করিয়াও পরিতেন যতদিন চলিত। নূতন মূল্যবান বস্ত্রাদি অকাতরে বিলাইয়া দিতেন। তাঁহার প্রিয় সন্তান সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত আসামে চাকরী করা কালে তাঁহাকে তথাকার সুপ্রসিদ্ধ একখানি মূল্যবান এণ্ডী বস্ত্র দিবার জন্য অনেক অনুনয় করেন। মা যখন শুনিলেন উহার দাম ৮০৲ টাকা (তখনকার দিনে) তখনই জিভ কাটিয়া বাঁকিয়া বসিলেন, কিছুতেই উহা লইতে রাজী হইলেন না। ভক্তের সেবার জন্য ব্যাকুলতা বুঝিয়া বলিলেন, "যদি নিতান্তই টাকা খরচ করতে চায় তবে বরং একখণ্ড জমি কিনে দিতে বল, সাধুভক্তের সেবা হবে।"

তাঁহার সাধু ও ভক্ত সন্তানেরা জয়রামবাটী আসিয়া যাহাতে একদিন থাকিতে পারে, পেট ভরিয়া মুড়ি ভাত খাইতে পারে, তাহার জন্য মায়ের কী আগ্রহ! দেহত্যাগের কয়েক বৎসর পূর্বে বাড়ী-ঘর জমির ব্যবস্থা করাইয়া, স্বয়ং ৺জগদ্ধাত্রীর নামে দেবোত্তর করাইয়া সন্তানগণের সুখসুবিধার স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। পূজনীয় রামলালদাদার মুখে শুনিয়াছি, শ্রীশ্রীঠাকুরও শেষবার কামারপুকুরে থাকাকালে শিহড়ে জমি সংগ্রহ করাইয়া ৺রঘুবীরের নামে দেবোত্তর করিয়া দেন।

জয়রামবাটীতে দেখা যাইত, সব পুরুষভক্তদের খাওয়াইয়া পরে স্ত্রীভক্তদের সঙ্গে লইয়া নিশ্চিন্তে মা আহার করিতে বসিতেন। দৈবাৎ কাজের গতিকে কোন ছেলে বাহিরে গেলে, সে না ফেরা পর্যন্ত, যতই বেলা হউক, মা অপেক্ষা করিতেন। রাস্তার দিকে চাহিতেন, আগাইয়া গিয়া দাঁড়াইতেন। 'বাছা এত বেলা পর্যন্ত খায় নাই, ক্ষিদেয় কষ্ট পাচ্ছে' ভাবিয়া অস্থির হইতেন।

উদ্বোধনে কিন্তু মুশকিলের ব্যাপার! ছেলেদের না খাওয়াইয়া মা খাইবেন না, আর গুরুগতপ্রাণ নিষ্ঠাবান ভক্ত সারদানন্দ ইষ্টদেবীর আহারের পূর্বেই বা কিরূপে ভোজন করেন! সেজন্য ব্যবস্থা হইয়াছে মা মেয়েদের লইয়া একটি ঘরে আহারে বসেন, আর শরৎ মহারাজ ছেলেদের সঙ্গে বসেন অন্য একটি ঘরে, একই সময়ে। মা পল্লী-গ্রামের মেয়ে, দেরীতে খাওয়া অভ্যাস; সেজন্য শরৎ মহারাজেরও হাতের কাজ শেষ হইতে হইতে বেলা হইয়া যায়! শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ মায়ের পাতে পরিবেশন করা হইল প্রথমে, মা তাড়াতাড়ি মুখে দিয়া শরতের জন্য মহাপ্রসাদ করিলেন. গোলাপ মা চুপি চুপি আনিয়া দিলেন মহারাজকে, ভাগ্যবান সঙ্গীরাও সে প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইল না। সন্তানদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি; ছেলেদের শুকনো মুখ, দীন বেশ, ক্ষীণ শরীর দেখিতে পারেন না। তাই উদ্বোধনে ভাল খাওয়া থাকার ব্যবস্থা। নিত্য মাছ হইবে—বাঙ্গালী ছেলেদের মাছ না হইলে পেট ভরে না। আহারের পরে সকলেই পান খাইবে; তাই মা নিজেই পান সাজিয়া রাখেন। আবার, যাহারা পান ভালবাসে তাহারা বেশী পায়। সাদা থান ধুতি ছেলেদের পরনে ভাল লাগে

না; ভক্তেরা অনেক সরু পাড়ওয়ালা কাপড় দেন তাঁহাকে, তাঁহার নিজের সামান্যই প্রয়োজন, সেইসব অকাতরে বিতরণ করেন ছেলেমেয়েদের। ছেলেদের কেহ কেহ সৌখিন, মা সব জানেন—তাহাকে মিহি সুন্দর পাড় কাপড় দেন, আর যে মোটা ভালবাসে তাহাকে সেরূপ দেন। কাহারো কাহারো কাপড় শীঘ্র ছিঁড়িয়া যায়,—মা তাহাকে বেশী কাপড় দেন। খাওয়া, জল খাওয়া সব ব্যাপারেই সর্বদা যে যেমন চায়, যার পেটে যেরূপ সয়, মা তাকে ঠিক সেরকমই দেন।

কি আশ্চর্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল মার, ভাবিয়া অবাক্ হই! জয়রামবাটীতে বিভিন্ন স্থানের ভক্ত সমাগত হইলে মা রাঁধুনী মাসীকে ঠিক বলিয়া দিবেন, কে কি খাইবে, কত পরিমাণ; এমনকি রুটির সংখ্যা পর্যন্ত! তাই, মায়ের বাড়ীতে মায়ের কাছে খাইয়া সন্তানদের এত তৃপ্তি! ঠাকুরের কথায় 'মা ঠিক জানে, কোন্ ছেলের পেটে কি সয়!' [ক্রমশঃ]

স্বামী অখণ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য বিনোদেশ্বর দাশগুপ্তকে লিখিত]

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়

আশ্রম সারিগাছী
২১শে জ্যৈষ্ঠ

পরমশুভাশীর্ব্বাদমস্তু—

তোমাদের উৎসব নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গিয়াছে জানিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। আমরা চিন্তাকুল হইয়া ত বরাবরই দেখিয়া আসিতেছি যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের মহিমায় সর্ব্বত্রই তাঁহার উৎসবে কোন বিঘ্ন ঘটে না। আবার মজা এই যে, আপাতদৃষ্টিতে প্রথমতঃ যাহা বিঘ্ন বলিয়া মনে হয় তাহাই পরে শুভ-ফল-প্রদ হইয়া থাকে!

তোমাদের ঐ দেশে এইবার আম কেমন? এদিকে একেবারেই নাই। আমার শুভাশীর্ব্বাদ তোমরা সকলে জানিবে। ইতি

আঃ শ্রীঅখণ্ডানন্দ

কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী প্রভানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

পূর্বদিকের পুষ্করিণীর পশ্চিমপাড়ে[1] ছিল একটি খেজুর গাছ। (দ্বিতীয় চিত্র দ্রষ্টব্য)। সেই গাছ নিয়ে খুব সম্ভবতঃ এই সময়েই একটি ঘটনা ঘটে। একদিন যুবক ভক্তেরা স্থির করে যে সন্ধ্যার সময় ঐ খেজুর গাছ থেকে জিরেনের রস খাবেন। ঠাকুরকে তাঁরা কিছুই জানালেন না। সন্ধ্যাবেলা নিরঞ্জন প্রভৃতি দল বেঁধে গাছের দিকে এগিয়ে যান। এমন সময় শ্রীমা অকস্মাৎ দেখেন, ঠাকুর তীরবেগে নীচে নেমে গেলেন। তিনি চমকে ওঠেন। ঠাকুরের ঘরে গিয়ে দেখেন যে ঠাকুর সেখানে নেই। তিনি ঠাকুরকে কোথাও দেখতে না পেয়ে এবং ব্যাপার কি বুঝতে না পেরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নিজের ঘরে ফিরে আসেন। আবার একটু পরেই দেখেন যে ঠাকুর তীরবেগে নিজের ঘরে ফিরলেন। পরদিন শ্রীমা ঠাকুরকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চান, বলেন 'ও রেঁধে তোমার মাথা গরম!' শেষকালে তিনি খুলে বলেন, "ছেলেরা সব এখানে এসেছে; সকলেই ছেলেমানুষ। তারা আনন্দ করে এই বাগানের একপাশে একটা খেজুর গাছ আছে, তারই রস খেতে যাচ্ছিল। আমি দেখলাম ঐ গাছতলায় একটা কালসাপ রয়েছে। সে এত রাগী যে সকলকেই কামড়াত। ছেলেরা তা জানত না। তাই আমি অন্যপথে সেখানে গিয়ে সাপটাকে বাগান থেকে তাড়িয়ে এলাম। বলে এলাম, 'আর কখনও ঢুকিস নে'।" মা শুনে অবাক্ হন। ঠাকুর তাঁকে তখন ঐ ঘটনা প্রকাশ করতে নিষেধ করেন।[2] সহজেই অনুমান করা যায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কতভাবেই না তরুণ তাপসদের জননীর ন্যায় স্নেহপক্ষপুটে আগলিয়ে রাখতেন।

ক্রমে উপস্থিত হয় ২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ, বুধবার, ৯ই পৌষ, ১২৯২ বঙ্গাব্দ,[3] রামকৃষ্ণাবতারলীলায় দিনটি গুরুত্বপূর্ণ। সেদিনের বিবরণীর প্রাক্-কথনে শ্রীম লিখেছেন, 'আজ বারো দিন হইল। ছোকরা ভক্তেরা ক্রমে কাশীপুরে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন—ঠাকুরের সেবার জন্য। এখনও বাটী অনেকে যাতায়াত করেন—মধ্যে মধ্যে রাত্রেও থাকেন।'

মাষ্টার মশাই কাশীপুর বাগানে উপস্থিত হন সন্ধ্যা ছটায়। তিনি ভক্ত কালীপদ ঘোষের নিকট শোনেন সেদিনকার শ্রীরামকৃষ্ণলীলার দিব্য কাহিনী। সকালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমের হাট বসিয়েছিলেন। প্রেমের হাটে খুব বেচাকেনা হয়েছে। কলসে কলসে প্রেম ঢেলেছেন গোরা

---

১ স্বামী গম্ভীরানন্দকৃত 'শ্রীমা সারদা দেবী' গ্রন্থে পাওয়া যায় (পৃঃ ১৩২) যে, খেজুর গাছটি ছিল বাগানের দক্ষিণ পাশে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি (পৃঃ ৬১৬) অনুসারে বাগানে একটিই খেজুরের গাছ ছিল। যুবকেরা গভীর রাতে রস নামাতে যান। পরবর্তী কালে উদ্যানের সংস্কারের সময় গাছের গুঁড়ি দেখতে পাওয়া যায়, জানা যায় গাছটির সঠিক অবস্থান।

২ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, দ্বিতীয় ভাগ, ১৭৪ পৃষ্ঠা এবং ১৫৪-৫৫ পৃষ্ঠার ফুটনোট দ্রষ্টব্য। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথির বিবরণ ভিন্ন।

৩ এই দিনের বিস্তৃত ঘটনাবলী কথামৃত, চতুর্থ ভাগ, একত্রিশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। বাড়তি তথ্য প্রধানতঃ মাষ্টার মশাইয়ের ডায়েরী (পৃঃ ৭৭৯-৮১) হতে গৃহীত।

দ্বিতীয় চিত্র

কাশীপুর উদ্যানবাটী

১ ঠাকুরের দোতলা বসতবাটী
২ রান্নার ও ভাঁড়ার ঘর
৩ এই বাড়িতে নরেন্দ্র গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে শিবরাত্রি পালন করেন
৪ মালিদের বাসস্থান
৫ এই স্থানে ঠাকুরের কল্পতরুলীলা
৬ দারোয়ানের বাসস্থান
৭ আস্তাবল
৮ খেজুর গাছ
৯ মেন গেট
১০ তিনটি খিড়কী দরজা
১১ দুটি পায়খানা
১২ দুটি পুকুর
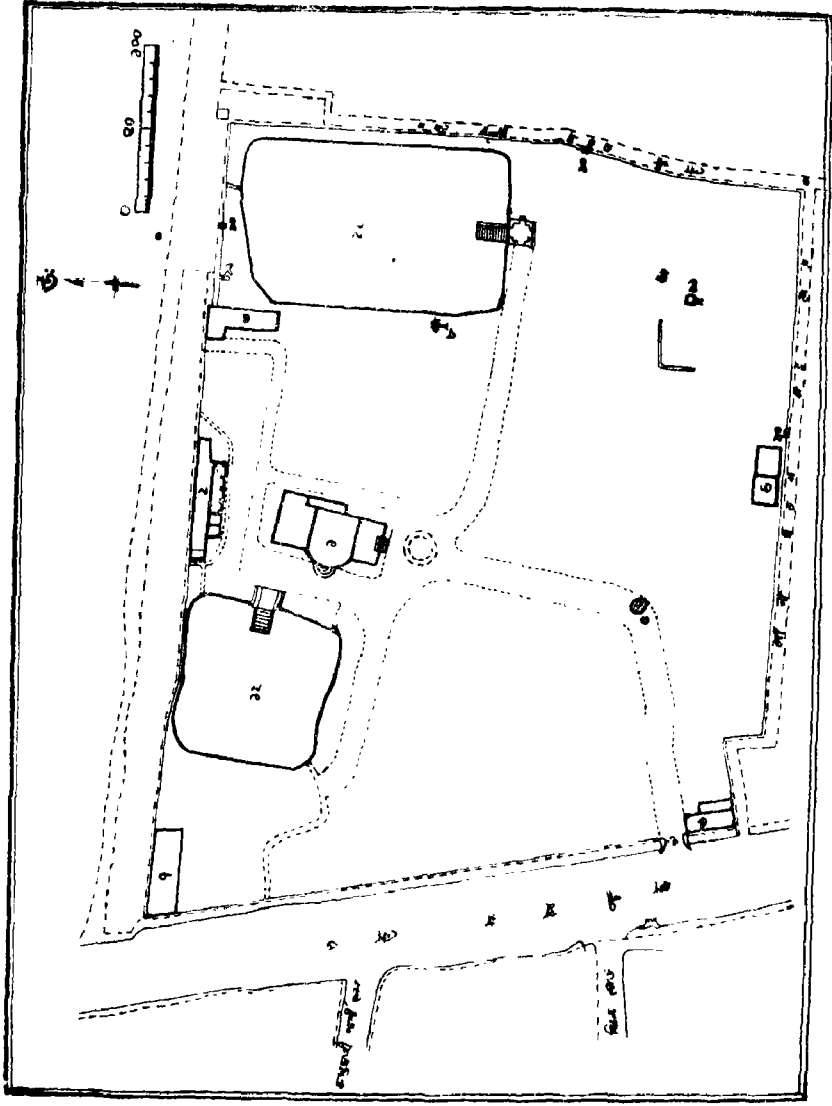
রায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবক নিরঞ্জনকে মশারির ভিতর বলেছেন, 'তুই আমার বাপ, তোর কোলে বসব।' ভক্ত কালীপদ ঘোষ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতেই ঠাকুর তাঁর বক্ষ স্পর্শ করে বলেন, 'চৈতন্য হও'। ঠাকুর কৃপা-পরবশ হয়ে তাঁর শ্রীচরণ কালীপদর কোলে তুলে দেন। আবার তাঁর চিবুক স্পর্শ করে চুমো খান। কালীপদর গভীর ভাব হয়। ভাবচক্ষে তাঁর অপূর্ব এক দর্শন ঘটে। তিনি ভাবে বিহ্বল হন। সে সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষণা করেন: 'যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডেকেছে বা সন্ধ্যা-আহ্নিক করেছে, তার এখানে আসতেই হবে।' শুদ্ধ প্রেমের ছড়াছড়ি। সিঁথির গোপালকে কৃপা করতে চান, তাই ঠাকুর বলেন: 'গোপালকে ডেকে আন।'

সকালবেলাতেই ঠাকুরের ঘরে উপস্থিত হয়েছিলেন দুজন মহিলা-ভক্ত, গোলাপ-ঠাকরুণ ও যোগীন্দ্রমোহিনী। করুণাঘন ঠাকুর সমাধিস্থ অবস্থায় গোলাপের বক্ষ তাঁর শ্রীচরণ দিয়ে স্পর্শ করেন, যোগীন্দ্রমোহিনীরও করেন। গোলাপ ভাবের ঘোরে কাঁদতে থাকেন। যোগীন্দ্রমোহিনী অশ্রু বিসর্জন করতে করতে বলেন, 'আপনার এত দয়া।' এক অপূর্ব দিব্যভাবের সংস্পর্শে উপস্থিত সকলে মোহিত হয়।

সন্ধ্যায় মাষ্টার মশাই উপস্থিত হয়ে দেখেন ঠাকুর জগন্মাতার চিন্তায় মশ্‌গুল। ঘরে উপস্থিত কালীপদ, চুনীলাল, নবগোপাল, শশী, নিরঞ্জন প্রভৃতি ভক্তগণ। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর মৃদুকণ্ঠে কথা বলেন। তিনি মাষ্টারকে একটা কাঠের টুল কিনে আনতে বলেন। পরের দিন বৃহস্পতিবার। তাই ঠাকুর মাষ্টারকে বারবেলা এড়িয়ে তিনটার পূর্বে আসতে বলেন।

কণ্ঠরোগ সারতে কতদিন লাগবে, ঠাকুরের এই প্রশ্নের উত্তরে মাষ্টার মশাই তাঁকে বুঝিয়ে বলেন যে রোগ নিরাময় হতে পাঁচ ছয় মাস লাগতে পারে। শুনে ঠাকুর বালকের মত অধৈর্য হয়ে ওঠেন। অস্থির হয়ে একবার নিজের গালে চড় মারতে উদ্যত হন, বলেন, 'বল কি!' মাষ্টার মশাই ছোট ছেলেকে প্রবোধ দেবার মত করে ঠাকুরকে বুঝিয়ে বলেন যে, সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করতে ঐ রকম সময় লাগতে পারে। বালকস্বভাব ঠাকুর এতেই নিশ্চিন্ত বোধ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: 'তাই বল।—আচ্ছা, এত ঈশ্বরীয় রূপদর্শন, ভাব, সমাধি!—তবে এমন ব্যামো কেন?'

ঠাকুরের এই প্রশ্ন তদানীন্তন কালের অনেক ভক্তের মনের সন্দেহকে প্রতিফলিত করছে। প্রশ্নের উত্তরে মাষ্টার মশাই বলেন: 'আজ্ঞা, খুব কষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য আছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ: 'কি উদ্দেশ্য?'

মাষ্টার: "আপনার অবস্থার পরিবর্তন হবে—নিরাকারের দিকে ঝোঁক হচ্ছে।—'বিদ্যার আমি' পর্যন্ত থাকছে না।"

শ্রীরামকৃষ্ণ: 'হাঁ, লোকশিক্ষা বন্ধ হচ্ছে—আর বলতে পারি না। সব রামময় দেখছি।—এক একবার মনে হয়, কাকে আর বলব! দ্যাখো না—এই বাড়ী ভাড়া হয়েছে বলে কত রকম ভক্ত আসছে!

'কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন'[১] বা শশধরের (শশধর তর্কচূড়ামণি) মত সাইনবোর্ড তো হবে না,—অমুক

১ কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (১২৫৮-১৩০৯ বঙ্গাব্দ): হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়াতে জন্ম। প্রথম জীবনে রেলওয়েতে চাকুরী করতেন। ১২৯০ বঙ্গাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করে কৃষ্ণানন্দ নাম গ্রহণ করেন। তিনি 'আর্যধর্ম প্রচারিণী সভা'র প্রতিষ্ঠাতা, 'ধর্মপ্রচারক পত্রের' প্রকাশক। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে 'গীতার্থসন্দীপনী' ও 'ভক্তি ও ভক্ত' বিশেষ সমাদৃত।

সময় লেকচার হইবে।' ঠাকুর ও উপস্থিত সকলে হেসে ওঠেন।

একটু থেমে মাষ্টার মশাই আবার বলেন: 'আর একটি উদ্দেশ্য, লোক বাছা। পাঁচ বছর তপস্যা করে যা না হতো, এই কয়দিনে ভক্তদের তা হয়েছে। সাধনা, প্রেম, ভক্তি।'

শ্রীরামকৃষ্ণ: 'হাঁ তা হলো বটে! এই নিরঞ্জন বাড়ী গিছলো।' নিরঞ্জনের প্রতি লক্ষ্য করে তিনি বলেন: 'তুই বল দেখি, কি রকম বোধ হয়?'

গূঢ় অবতারতত্ত্ব সম্যক্ অবধারণের জন্য শ্রীভগবানের দিব্যলীলার অনুধ্যানও একটি সাধনা। এই সাধনার পথে উদ্বুদ্ধ করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ প্রায়ই তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের প্রাগুক্ত প্রশ্ন করতেন। এ বিষয়ে তিনি নিজে অন্যত্র সুস্পষ্ট দিশারা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: 'ভক্ত এখানে যারা আসে—দুই থাক। এক থাক বলছে, 'আমায় উদ্ধার কর, হে ঈশ্বর।' আর এক থাক, তারা অন্তরঙ্গ, তারা ওকথা বলে না। তাদের দুটি জিনিষ জানলেই হল; প্রথম আমি কে! তারপর তারা কে—আমার সঙ্গে সম্বন্ধ কি?' (কথামৃত ৪।১৪।১)। এই জানাজানির সাধনায় প্রেরণা জোগাবার জন্যই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাগুক্ত প্রশ্ন।

অন্তরঙ্গ-ভক্ত যুবক নিরঞ্জন স্পষ্টবক্তা। তিনি খোলাখুলিই বলেন: 'আজ্ঞে, আগে ভালবাসা ছিল বটে,—কিন্তু এখন ছেড়ে থাকতে পারবার যো নাই!'

মাষ্টার মশাই বলেন যে তাঁর মনে হয়েছিল যুবক ভক্তদের কত ত্যাগ! এক একজন কত বিঘ্ন-বাধা ঠেলে উপস্থিত হয়েছেন ঠাকুরের সেবার জন্য। এই কথা শুনতে শুনতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হন। ক্রমে সমাধিস্থ হন।

ভাবের উপশম হলে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: 'দেখলাম সাকার থেকে সব নিরাকারে যাচ্ছে। আর আর কথা বলতে ইচ্ছা যাচ্ছে কিন্তু পারছি না।

'আচ্ছা, ঐ নিরাকারের ঝোঁক—ওটা কেবল লয় হবার জন্য; না?'

বিস্মিত মাষ্টার মশাই বলেন: 'আজ্ঞা তাই হবে।'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার চেষ্টা করেন কিছু গুহ্যতত্ত্ব প্রকাশ করতে। তিনি বলেন: 'এখনও দেখছি নিরাকার অখণ্ডসচ্চিদানন্দ এই রকম করে রয়েছে। ঘাড় নীচু করে রয়েছে ··· কিন্তু চাপলুম খুব কষ্টে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলেন যে, তাঁর অসুখ হওয়াতে আপনা হতেই লোক বাছাই হচ্ছে। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কারা তাঁর অন্তরঙ্গ, কারা বহিরঙ্গ। শ্যামপুকুরে ভবনাথ সাজগোছ করে এসে ঠাকুরের একটু খোঁজ নিয়েই চলে গিয়েছিলেন। ঠাকুরের শুদ্ধসত্ত্ব মন ভবনাথ আকর্ষণ করতে পারেননি।

ভগবান ভক্তের জন্য দেহ ধারণ করলে তাঁর সঙ্গে যাঁরা আসেন তাঁদের কেউ অন্তরঙ্গ, কেউ বহিরঙ্গ, আবার কেউ তাঁর রসদ্দার। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের যখন মাত্র ছয় বছর বয়স তখন তাঁর প্রথম ভাবসমাধি হয়। দ্বিতীয় ভাবাবেশ হয় দশ- এগার বছর বয়সে। যখন তাঁর বয়স বাইশ-তেইশ সে সময়ে তিনি শুনতে পান জগন্মাতার দিব্যপ্রশ্ন: "তুই কি অক্ষর হতে চাস?" ক্ষর মানে জীব, অক্ষর পরমাত্মা। শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তদের সঙ্গলাভের জন্য তাঁর প্রাণ আকুলি-বিকুলি করত। সন্ধ্যায় মন্দিরে আরতির জন্য কাঁসরঘন্টা বেজে উঠলে তিনি কুঠীর ছাদে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে ডাকতেন ভক্তদের। এভাবেই তিনি আবাহন করেছিলেন তাঁর শুদ্ধ ভাব ধারণে সমর্থ ভক্তদের।

তিনি তাঁর অন্যতম অলৌকিক অনুভূতি বর্ণনা

করে বলেন : 'এই অবস্থা যখন হলো ঠিক আমার মত একজন এসে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নাড়ী সব ঝেড়ে দিয়ে গেল! ষট্‌চক্রের এক একটি পদ্মে জিহ্বা দিয়ে রমণ করে, আর অধোমুখ পদ্ম উর্দ্ধমুখ হয়ে উঠে। শেষে সহস্রার পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে গেল।'

ভক্তগণ মুগ্ধবিস্ময়ে শোনেন অবতার-জীবনের গুহ্যতত্ত্ব। যখন যে ভক্ত ঠাকুরের নিকট আসতেন, সেই ভক্ত আসার পূর্বেই জগন্মাতা তাঁকে দেখিয়ে দিতেন। এভাবেই তিনি জানতে পেরেছিলেন যে তাঁর জন্য জগন্মাতা নির্দিষ্ট করেছেন পাঁচজন সেবাইত। সবাই গৌরবর্ণ। তাঁদের মধ্যে সনাক্ত করতে পারেন মথুরবাবু ও শম্ভুবাবুকে। সুরেন্দ্রকে তাঁর অনেকটা রসদ্দার বলে মনে হয়।[১] আবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চর্মচক্ষে দেখেছিলেন, চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্কীর্তন দলের মধ্যে বলরাম ও মাষ্টার মশাইকে। তিনি শরৎ ও শশীকে দেখেছিলেন যীশুখ্রীষ্টের[২] দলে। বটতলায় রাখালকে দেখেছিলেন একটি ছোট ছেলের রূপে। সেবাইৎদের মধ্যে মথুরবাবু ঠাকুরের সেবা করেছিলেন চৌদ্দ বছর।[৩] ভৈরবী ব্রাহ্মণী চৈতন্যলীলার সঙ্গে তুলনা করে মথুরবাবুকে বলতেন প্রতাপরুদ্র। তাঁর নিষ্ঠার সেবা ছিল অতুলনীয়। তিনি হাসিমুখে ঠাকুরের সব ইচ্ছা পূরণ করতেন, ঠাকুরের আদেশ পালন করে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলেন : 'বৈষ্ণবচরণ বলেছিল, এবারে নিত্যানন্দের আধারে চৈতন্যের আবির্ভাব। সে পুঁথি লিখেছিল। বলেছিল, ঐশ্বর্য প্রকাশ পেলে সে পুঁথি ছাপাবে।'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ রসিকচূড়ামণি। তিনি রসের হাটবাজার বসিয়ে মজা দেখেন। আবার কখনও হিসাব করেন খদ্দেরের সংখ্যা। তিনি বলেন : 'নোটো (লাটু) গুণলে একত্রিশজন। কৈ তেমন বেশী কৈ?—তবে কেদার আর বিজয় কতকগুলো কচ্ছে।'

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে মাষ্টার মশাই কথিত আরেকটি ঘটনা। সম্ভবতঃ এই সময়কার ঘটনা। মাষ্টার মশাই বলেন : 'ঠাকুরের কাছে যেতো সব নড়ে ভোলা ভক্ত—টাকা নেই, পয়সা নেই। ভক্তদের খুব হাসাতেন। একদিন ঠাকুর বললেন, ক'খানা গাড়ী এসেছে? লাটু শুনে বললে, উনিশখানা। ঠাকুর হেসে উত্তর করলেন, মোটে এই। তাহলে আর কি হ'ল রে? অনেক গাড়ী অনেক ঘোড়া অনেক ভক্ত হবে তবে তো!' ('শ্রীম দর্শন', চতুর্থ ভাগ, পৃঃ ২৮৩-৪)।

তিনিই আবার ধর্মপিপাসুগণের অত্যধিক ভীড় দেখে গলরোগের প্রারম্ভে একদিন ভাবাবিষ্ট হয়ে ৺জগন্মাতাকে অভিমানভরে বলেছিলেন : 'এত লোক কি আনতে হয়? একেবারে ভীড় লাগিয়ে দিয়েছিস্। লোকের ভীড়ে নাইবার খাবার সময় পাই না! একটা ত এই ফুটো ঢাক, রাতদিন এটাকে বাজালে আর কয়দিন টিকবে?' (লীলাপ্রসঙ্গ, ৫।২৮৮-৯)। বাস্তবিকই ফুটো ঢাক অবিশ্রান্ত বাজাবার ফলে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। ঠাকুরের দেহপিঞ্জর জীর্ণ দীর্ণ হয়ে পঞ্চভূতে লীন হবার মত হয়েছিল।

ভক্তেরা মুগ্ধবিস্ময়ে শোনেন শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক বৈভবপ্রকাশের কাহিনী। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অলৌকিক দর্শন বর্ণনা করে শ্রীরামকৃষ্ণ

---

১ স্বামী সারদানন্দের মতে, ৺জগদম্বা ঠাকুরকে দেখিয়েছিলেন যে তাঁর জন্য চারজন রসদ্দার নির্দিষ্ট হয়েছে। মথুরানাথ ও শম্ভুচন্দ্র যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় রসদ্দার এবং সুরেন্দ্র ছিলেন 'অর্ধেক রসদ্দার'। বলরাম বসুর সেবাযত্নও নির্দিষ্ট রসদ্দারদের সঙ্গে তুলনীয়। (লীলাপ্রসঙ্গ, ৪।২৮০-৮১)।

২ শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'ঋষি কৃষ্টের দলের'। ৩ মাষ্টার মশায়ের ডায়েরী অনুসারে ষোল বছর।

নিজেই বলেন : 'বিজয় এইরূপ (অর্থাৎ ঠাকুরের বিগ্রহমূর্তি) দর্শন করেছে। একি বল দেখি? বলে, তোমায় যেমন ছোঁয়া, ঐরূপ ছুঁয়েছি।'[১]

ঠাকুর ভাবচক্ষে দেখেন তাঁর রোগাক্রান্ত দেহের অদূর ভবিষ্যতের অবস্থা। তিনি বলেন : 'ভাবে দেখালে, শেষে পায়েস খেয়ে থাকতে হবে।

'এ অসুখে পরিবার পায়েস খাইয়ে দিচ্ছিল। তখন কাঁদলাম এই বলে—এই কি পায়েস খাওয়া! এই কষ্টে।'

ঠাকুরের শ্রীমুখে তাঁর করুণকাহিনী শুনে ভক্তদের চোখে জল এসে যায়।

অন্তরঙ্গদের আসরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আলোচনা হতে তিনটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নরলীলাবিলাসে একটি ভাবের পরিবর্তন উপস্থিত হয়েছে। ভাবরাজ্যের রাজা শ্রীরামকৃষ্ণের বিশুদ্ধ মন নিরাকারের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। যে 'বিদ্যার আমি' নিয়ে লোক-শিক্ষা ও লীলাবিলাস, সেই 'বিদ্যার আমি' পর্যন্ত লীন হতে উদ্যত। দ্বিতীয়তঃ অবতারপুরুষের দেহে রোগের আবির্ভাব দেখে ফলাকাঙ্ক্ষী ভক্তের দল সরে পড়েছে, অবিশ্বাসের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন সংসারীদের অনেকেই তাঁর সংসর্গ ত্যাগ করেছে। তৃতীয়তঃ শ্যামপুকুরে কয়েকমাস ও কাশীপুরে কয়েক সপ্তাহ বাসের মধ্যে অন্তরঙ্গদের আন্তর-জীবনে আবির্ভূত হয়েছে নূতন উষার আলো। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পূত সাহচর্যে ও তাঁর নির্দেশনায় সাধনভজনের ফলে প্রত্যেক অন্তরঙ্গ ভক্তের জীবননদীতে উপস্থিত হয়েছে বিবেক-বৈরাগ্য ও প্রেমভক্তির প্লাবন। প্রত্যেকেই কল্পতরু ভগবানের করুণা-সমীরণে পাল তুলে ছুটিয়েছেন নিজ নিজ সাধনতরী। লীলাকুশলী শ্রীরামকৃষ্ণের লীলানাট্য দেখে ভক্তগণ মোহিত হয়েছেন, অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছেন।

উপস্থিত হয় ২৬শে ডিসেম্বর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। সেদিন ছিল শনিবার, ১২ই পৌষ, ১২৯২ বঙ্গাব্দ। বড়দিন উপলক্ষে স্কুল-কলেজ বন্ধ। মাষ্টার মশাই সকালবেলা উপস্থিত হয়েছেন কাশীপুর উদ্যান-বাটীতে। দোতলার হলঘরে গিয়ে তিনি ঠাকুরের চরণ বন্দনা করেন, ঠাকুরের শয্যার কাছে মাদুরের উপর আসন গ্রহণ করেন।

পশ্চিমের খড়খড়ি জানালার তিন চার হাত পূর্বে ঠাকুরের বিছানা ছিল। ঠাকুরের শিয়র থাকত দক্ষিণের দেয়ালের গায়ে। ঠাকুরের বামদিকে তিন হাত দূরে খড়খড়ির জানালা। মেঝেতে মাদুরের উপর পাতা সতরঞ্চি, তার উপর ছিল ঠাকুরের বিছানা। ('শ্রীম দর্শন', ৫ম ভাগ, পৃঃ ১২১, ১২৩)।

ঠাকুরের ঘরটি বড়। বিছানার নিকট ওষুধপত্র ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছানো রয়েছে। ঘরের উত্তরের দরজা পেরিয়ে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে হয়। আর এই দরজার উল্টোদিকে দক্ষিণগায়ে আরেকটি দরজা। সেই দরজা দিয়ে দক্ষিণের ছোট ছাদে যাওয়া যায়। সেই ছাদের উপর দাঁড়িয়ে বাগানের গাছপালা, অদূরে রাজপথ ইত্যাদি দেখা যায়।

মাষ্টারের সঙ্গে প্রাথমিক কুশলবার্তার পর

---

১ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী অনুরূপ ভাব প্রকাশ করতে থাকলে ব্রাহ্মসমাজে তীব্র প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠে। স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে বিজয়কৃষ্ণকে লেখেন : "'সাধুদিগের পদধূলি গ্রহণ ও অঙ্গে মাখা, পদে পড়িয়া থাকা, প্রসাদ গ্রহণ ইত্যাদি কার্য ধর্মসাধনের উপায় ;... সিদ্ধযোগীর সূক্ষ্মশরীরে আগমন ও আলাপাদি করা ;' এই সকল কথা তোমার মত বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসকে এই সকল অযথাবাদ ও কুসংস্কারযুক্ত করিয়া প্রচার করিলে তাহার গতিরোধ করা হয়।... বিজয়কৃষ্ণ উত্তরে তাঁর বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন।" (তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই ফাল্গুন, ১৮০৯ শকাব্দ, পৃঃ ২৫৯-৬০)

কিশোরীর[1] কথা ওঠে। কিশোরী গুপ্ত মাষ্টার মশাইয়ের আপন কনিষ্ঠ ভাই। তিনিও ঠাকুরের কৃপালাভে ধন্য।

মাষ্টার মশাই বলেন: 'সে বলেছে গুরুদেব ছেড়েছে ত ছেড়েছে, আমি ছাড়ছি না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ শুনে হাসেন, বলেন: 'ভাল, তা বেশ।'

একটু থেমে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: 'ত্রিগুণাতীত ভক্তি আছে, যেমন নারদাদির।

'পরমহংস তিনগুণের অতীত। তাঁর ভিতর তিনগুণ আছে, আবার নেই। ঠিক বালক, কোন গুণের বশ নয়। ত্রিগুণাতীত, ঈশ্বরলাভ হলে পাঁচবছরের বালকের স্বভাব হয়। কোন কিছুতেই আঁট নেই।

'গীতায় আছে ত্রিগুণাতীত ভক্তির কথা।'

মাষ্টার কিশোরীকে ডাকতে যান। ঠাকুর ইঙ্গিতে তাঁকে নিরস্ত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: 'বালকের কোন গুণের আঁট নেই। ঈশ্বর নিজে বালকস্বভাব কিনা! তাই যে তাকে লাভ করে, তারও বালকস্বভাব হয়ে যায়।'[2]

পরদিন ২৭শে ডিসেম্বর, রবিবার, ১৩ই পৌষ, ১২৯২ বঙ্গাব্দ।[3] একে বড়দিনের বন্ধ, তার উপর রবিবার, অনেক ভক্তের সমাগম হয়েছে।

অপরাহ্ণ। দোতলার ঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপবিষ্ট রামচন্দ্র, নৃত্যগোপাল, বড় হরিশ ও তার ছেলে, মাষ্টার প্রভৃতি।

ঠাকুরের শরীর আজ অনেকটা ভাল। তিনি আনন্দের হাট বসিয়েছেন। তিনি হরিশের ছেলেকে লক্ষ্য করে বলেন: 'ছেলেটি অতি শান্ত।'

ঠাকুর তাঁর পীড়ার কথা তোলেন। রামচন্দ্র প্রমুখ ভক্তেরা ঠাকুরের পীড়ার নিগূঢ়ার্থ নিষ্কর্ষণের জন্য সর্বদাই উন্মুখ, সেই কারণেই বোধ করি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সুযোগ পেলেই তাঁদের সামনে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করতেন।

রামচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে অবতারপুরুষের দেহে রোগগ্রহণ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, এটাও তাঁর একপ্রকারের লীলাবিলাস। ঠাকুরের রোগভোগ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন: "এই নিদারুণ রোগের যন্ত্রণা তিনি হাস্যাননে সহ্য করিতেন। একদিনও বিমর্ষ বা চিন্তিত হন নাই। যখনই যে গিয়াছে, তাহারই সহিত ঐশ্বরিক বাক্যালাপ করিয়াছেন। লোকে ব্যাধির বিভীষিকা দেখাইলে, তিনি হাসিয়া উঠিতেন এবং বলিতেন, 'দেহ জানে, দুঃখ জানে, মন তুমি আনন্দে থাক।' কোন কোন ব্যক্তির নিকট তিনি রোগের কথা কহিয়া চিন্তাকুল হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা তাঁহার মনোগত ভাব ছিল না।" (জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৭৪)।

ঠাকুর জানতেন রামচন্দ্রের মনের ভাব। তিনি রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করে বলেন: 'তুমি কেবল হাস। এই এত কষ্ট আর তুমি হাসছ।'

একথাতেও রামচন্দ্রের মুখের হাসি মিলিয়ে যায় না। তাঁর অটল বিশ্বাস ঠাকুরের দেহে রোগভোগ একটা লীলাখেলা বৈ ত নয়। ঠাকুরের রোগ চিকিৎসকের সাধ্যাতীত, একমাত্র তিনি নিজেই নিজেকে আরোগ্য করতে সক্ষম।

একজন সেবক ঘরে ঢোকেন, হাতে একটা মধুর চাক। ঠাকুর দেখে আনন্দ করেন, বলেন 'তোমরা নীচে নিয়ে থাও, আবার মেঝেতে

---

১ 'ছুটিল কিশোরী এবে মাষ্টারের ভাই। বহু রঙ্গ তার সঙ্গে করিলা গোঁসাই॥' (পুঁথি, পৃঃ ৪১১)

২ মাষ্টার মশাইয়ের ডায়েরী, ৬২৪ পৃঃ হতে গৃহীত।

৩ এই দিনের বিবরণ প্রধানত: মাষ্টার মশাইয়ের ডায়েরী, পৃঃ ৬২৫ হতে গৃহীত।

পড়বে।' কয়েকজন নীচে নেমে যান।

লোকমুখে শুনে শ্রীরামপুর হতে একটি দৈব ওষুধ আনা হয়েছে। ঠাকুর ব্যবহার করবেন। ঠাকুর মাষ্টারকে দেখিয়ে বলেন: 'ইনি দাম দেবেন।'

মাষ্টার মশাই জানান যে নবগোপাল ও চুনীলাল, ইতিমধ্যে ওষুধের দাম দিয়েছেন। নীচে একজন ব্রহ্মচারী অপেক্ষা করছিলেন। ব্রহ্মচারী হাতে করে ওষুধ এনেছেন। মাষ্টার মশাই তাঁর কাছে যান। ইতিমধ্যে ঠাকুর মাষ্টারকে ডেকে পাঠান ও তাঁকে খোঁজখবর নিতে বলেন, কখন কিভাবে ওষুধ ব্যবহার করতে হবে। মাষ্টার মশাই ব্রহ্মচারীর নিকট প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে ঠাকুরকে এসে নিবেদন করেন। ঠাকুর মাষ্টারকে আবার পাঠান ওষুধের মাত্রা ভাল করে জানবার জন্য। তিনি আদেশ পালন করেন।

পরবর্তী দৃশ্য। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ঘরে সমাসীন, নিকটে কয়েকজন ভক্ত। রামচন্দ্র, নৃত্যগোপাল প্রভৃতি ভক্তেরা সমবেত হয়েছেন বাড়ীর পশ্চিমদিকের পুকুরের ঘাটে। তাঁরা খোল করতাল নিয়ে হরিনাম সুরু করেছেন। সঙ্কীর্তন জমে উঠেছে। কীর্তনের সঙ্গে নৃত্য মধুর একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

ঠাকুর শয্যার উপর উত্তরাস্য হয়ে বসেছিলেন। কীর্তন শুনছিলেন। হঠাৎ তিনি ভাবাবিষ্ট হন। ভাবের ঘোর কেটে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: 'ঈশ্বরের কার্য কিছু বুঝা যায় না। ভীষ্মদেব শরশয্যায় শুয়ে। পাণ্ডবেরা তাঁকে দেখতে এসেছেন। এসেছেন কৃষ্ণ। তাঁরা দেখেন ভীষ্ম কাঁদছেন। পাণ্ডবেরা কৃষ্ণকে বলেন, কৃষ্ণ, কি আশ্চর্য! পিতামহ অষ্টবসুর একজন, এঁর মত জ্ঞানী দেখা যায় না; ইনিও মৃত্যুর সময় কাঁদছেন! কৃষ্ণ বললেন, ভীষ্ম সেজন্য কাঁদছেন না। ওঁকে জিজ্ঞাসা কর দেখি। জিজ্ঞাসা করতে ভীষ্ম বললেন, কৃষ্ণ! ঈশ্বরের কার্য কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমি এই জন্য কাঁদছি যে, সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণ ফিরছেন, তবু পাণ্ডবদের বিপদের শেষ নাই। এই কথা যখন ভাবি, দেখি যে তাঁর কার্য কিছুই বোঝার যো নাই!'

সঙ্কীর্তন চলেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কথা শেষ হতে না হতে আবার ভাবাবিষ্ট হন, গভীর ভাবাবিষ্ট হন, ক্রমে গভীর সমাধিতে স্থির হন। সেবকেরা অবাক্ হয়ে দেখেন ঠাকুরের আনন্দ-বিকীর্ণ মুখমণ্ডল। বেশ কিছুক্ষণ সময় চলে যায়। ক্রমে ভাবের আবেশ তরল হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তিনবার গভীর নিঃশ্বাস নেন। যেন ডুবুরী গভীর সমুদ্রের জলে নেমে কুড়িয়ে এনেছে মণি-মাণিক্য। ডুবুরী উপরে উঠেছে। জলে ভাসছে। সবাই তাঁকে দেখছে। তখনও তাঁর গায়ে লেগে আছে সামুদ্রিক গাছ-গাছড়ার গন্ধ, ঘাসের টুকরো।

ধীরে ধীরে ঠাকুরের বাহ্যস্ফূর্তি হয়। তিনি বলেন: 'দেখছি অবস্থা ষোল আনাই ঠিক আছে—রোগেতে চেপে রেখেছে শুধু—।'

বেশ কিছুদিন পরে ঠাকুরের গভীর ভাব-সমাধি হয়। ঠাকুরের মনে হয়েছিল শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছায় তাঁর আর গভীর ভাবসমাধি হবে না। ব্যাধির প্রাবল্যে তাঁর সে অবস্থা কেটে গেছে। শশধর তর্কচূড়ামণি, শিবনাথ শাস্ত্রী, মহিমাচরণ প্রভৃতি কয়েকজন মনে করতেন যে ঠাকুরের আধ্যাত্মিক অবনতি ঘটেছিল। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: 'দেহাবসানের কিছু পূর্বে তিনি (পরমহংসদেব) কিছু নামিয়া পড়িয়াছিলেন, ইহা বেশ অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম।' (পদ্মনাভ ভট্টাচার্য: রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ, পৃঃ ১০)। বলা বাহুল্য, এই সিদ্ধান্ত ভুল।

এদিকে গভীর ভাবসমাধি দেখে সেবকেরা

চিন্তিত হন। ভাবোচ্ছ্বাসে রোগের বৃদ্ধি হ'ত, সেই কারণে ডাক্তার সরকার বারংবার সাবধান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কে শোনে বাধানিষেধ? ভগবদ্ভাবের উত্তাল-তরঙ্গে নিয়মের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ে। ভাবের প্লাবন শরীর-মনের তটে তর্জন-গর্জন করে আছড়িয়ে পড়ে।

তখনও পুকুর-ধারে কীর্তন চলেছিল। ঠাকুরের নির্দেশে মাষ্টার ও সেবকদের কয়েকজন নীচে যান। পুকুরপারে দেখেন মনোমুগ্ধকর দৃশ্য, শোনেন ভক্তজনের প্রাণমাতান হরিনাম। নৃত্য ও সঙ্কীর্তনে চতুর্দিক আলোড়িত সচকিত। কয়েক-জনের আবার ভাবাবেশ হয়েছে। আরও কিছুক্ষণ পরে কীর্তন সমাপ্ত হয়। মাষ্টার ফিরে আসেন ঠাকুরের ঘরে, ঠাকুরকে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেন: 'কার কার ভাব হয়েছিল?'

মাষ্টার মশাই: 'নৃত্যগোপাল, সারদা ও খোকার।'

একটু পরে রামচন্দ্র ঠাকুরের ঘরে উপস্থিত হন। আজ সঙ্কীর্তনে ভক্তবৃন্দ যে মহানন্দ লাভ করেছেন সে-সম্বন্ধে বলেন। রামচন্দ্র: 'এ সবই আপনার ঐশ্বর্য!'

শ্রীরামকৃষ্ণ: 'আমরা ঐশ্বর্য নিয়েই ব্যস্ত! অত করে ঐশ্বর্য ভাবলে ঈশ্বরকে খুব নিকটে, খুব আপনার ভাবা যায় না—তাঁর উপর জোর করা যায় না। তাই বলি, যাঁকে নিয়ে আনন্দ হয়, তাঁকেই লোকে চায়, তাঁর বাড়ী কোথায়, কখানা বাড়ী, কটা বাগান, কত ধনজন দাসদাসী এ-খবরে কাজ কি?'

ঠাকুর রামকৃষ্ণ চুপ করে বসে থাকেন। আবার ভাবস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর চোখের কোণ বেয়ে প্রেমাশ্রু ঝরতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ মৃদুস্বরে বলেন: 'সচ্চিদানন্দই দেহ ধারণ করে আসেন···।'[১]

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, উদ্যান-বাটীতে এ ধরণের কীর্তনের আসর প্রায়ই বসত। একদিনের ঘটনা। নরেন বাবুরাম রাখাল প্রভৃতি যুবক ভক্তগণ প্রমত্ত হয়ে নামকীর্তন করছিলেন। কেউ কেউ ভাবতেন, "এই সব ছোঁড়াদের আমোদ আহ্লাদ স্ফূর্তি দেখ, বয়সটা জোয়ান কিনা, তাই বুদ্ধিশুদ্ধি কম। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কীর্তনীয়া দলের ভিতর থেকে একজনকে ডাকালেন এবং ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন, 'তোরা ত বেশ রে, কেউ মরে আর কেউ হরি-হরিবোল বলে।' উপস্থিত লোকটি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইল। কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরক্ষণেই অতি আহ্লাদ করিয়া বলিলেন, 'ওরে সুরটা এই রকম, অমুক জায়গায় এক কলি তোরা ভুলেছিলি। ঐখানে ঐ কলিটা দিতে হয়। উপস্থিত যুবকটি প্রত্যাগমন করিয়া ভ্রাতৃবৃন্দকে সেই বিষয় বলিলেন ও সুর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া ও কলিটি সংযোজন করিয়া উদ্দাম কীর্তন সুরু করিলেন। কীর্তনের আনন্দে সকলে বিভোর হইয়া অনেক রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।" (মহেন্দ্রনাথ দত্ত: শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮-৯)। [ক্রমশঃ]

---

১ শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ৭।৩।১৮৮৫ তাং বলেছিলেন: 'সেদিন দেখলাম, আমার ভিতর থেকে সচ্চিদানন্দ বাইরে এসে রূপ ধারণ করে বললে, আমিই যুগে যুগে অবতার। দেখলাম পূর্ণ আবির্ভাব, তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।' (কথামৃত. ৫। পরিশিষ্ট। ১০ পরিঃ)।

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে : শ্রীমৎ তোতাপুরী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পূর্বভাষ

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে শ্রীমৎ তোতাপুরী একটি স্বনামধন্য চরিত্র। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভিনব সাধন-লীলাকাণ্ডে এই মহাত্মার ভূমিকা চিরস্মরণীয়। তোতাপুরীজী ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বেদান্তসাধনা ও সন্ন্যাসদীক্ষার আচার্য-গুরু। অবতারবরিষ্ঠের দিব্য জীবন-ইতিহাসে এই মহাত্মার নাম ও বৃত্তান্ত বহুল পরিকীর্তিত।

'লীলাপ্রসঙ্গ,' 'পুঁথি,' 'কথামৃত' প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহে এই মহাত্মা-সম্পর্কিত বহু বৃত্তান্ত ইতস্ততঃ লিপিবদ্ধ দেখা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ঐ সকল বিবরণীর প্রায় সমুদয়ই স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত। সুতরাং প্রামাণিকতার দিক হ'তে সেগুলির মূল্য ও গুরুত্ব যেরূপ অপরিমেয়, তত্ত্ব ও রসমাধুর্যের দিক হ'তেও ঐগুলি সেরূপ অনবদ্য ও অতুলনীয়।

পরিচিতি

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমৎ তোতাপুরীজী ছিলেন একজন অসাধারণ যোগসিদ্ধ ও জীবন্মুক্ত মহাত্মা। তিনি ছিলেন ভগবান শঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত বিখ্যাত দশনামী সন্ন্যাসীর 'পুরী' শাখাভুক্ত নাগা সন্ন্যাসী। তাঁর জন্মভূমি ছিল ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে—সম্ভবতঃ পাঞ্জাবের নিকটবর্তী কোনও স্থানে এবং গুরুস্থান ছিল কুরুক্ষেত্রের সন্নিকটে লুধিয়ানা অঞ্চলে। তাঁর গুরুজীও ছিলেন একজন সমর্থ যোগী এবং জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ।

তোতাপুরীজী সম্ভবতঃ বাল্যাবস্থা হ'তেই তাঁর গুরুজী মহারাজের আশ্রয়ে কঠোর সংযম-তিতিক্ষা ও শাসন-শৃঙ্খলার মধ্যে জীবন যাপনের সৌভাগ্য লাভ করেন। তার ফলে, ঐহিক ভোগ-লালসা, মোহ-ঈর্ষা প্রভৃতি তাঁকে কখনও স্পর্শ ক'রতে পারেনি। আবাল্য নিয়মিত গুরুসেবা, গুরুর উপদেশ শ্রবণ, স্বাধ্যায়, নিদিধ্যাসন এবং ধ্যান-ধারণাদি সহায়ে তিনি স্বল্পায়াসে যোগসাধনার রহস্যসমূহ অবগত হন। অতঃপর যথাকালে তিনি গুরুজী মহারাজের অনুগ্রহে যোগসাধন ও সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। সন্ন্যাস প্রাপ্তির পর তিনি পুণ্যতোয়া নর্মদাতটে একান্ত নির্জনে কৃচ্ছ্র সাধনায় নিমগ্ন হন। এইরূপে একাদিক্রমে সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল নিরন্তর নিঃসঙ্গ বাস ও কঠোর সাধন-ভজনের ফলে তিনি নির্বিকল্প সমাধি-পথে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করেন।

তাঁর অদ্ভুত পারমহংস্য অবস্থা, যোগ-সংসিদ্ধি ও অধ্যাত্ম শক্তি-বিভূতি তাঁর গুরুকুলে সকলেরই সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার ফলে, গুরুজী মহাত্মার দেহাবসানের পর তিনিই সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত মঠের মোহন্ত ও মণ্ডলীর অধীশ্বর নির্বাচিত হন। তিনি কখন কখন মণ্ডলীসহ, আবার কখন কখন বা নিঃসঙ্গভাবে পদব্রজে ভারতের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ তীর্থ পর্যটন করেন। তিনি 'কিমিয়া' বিদ্যার প্রভাবে তাম্রাদি ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করতে পারতেন। গুরুপরম্পরায় তিনি ঐ বিদ্যা প্রাপ্ত হ'য়েছিলেন।

পুরীজী যোগবলে দীর্ঘ পরমায়ুর অধিকারী হন। তাঁর দেহত্যাগ সম্বন্ধে কিছু কিছু কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে। শোনা যায় লুধিয়ানা অঞ্চলস্থিত উক্ত মঠে একটি 'সমাজ' তাঁর পবিত্র সমাধিরূপে চিহ্নিত রয়েছে।

গুরুজীর কথা

শ্রীমৎ তোতার গুরুজী মহারাজের নাম জানা যায় না। তবে, তিনি যে একজন সিদ্ধ ও শক্তিমান যোগীপুরুষ ছিলেন, তা সুবিদিত। সেই মহাত্মার আশ্চর্য তপঃশক্তি ও অসাধারণ যোগ-বিভূতির খ্যাতি ঐ অঞ্চলে সুপ্রচারিত ছিল। তিনিই ছিলেন উক্ত প্রাচীন মঠের মোহন্ত এবং বিশাল মণ্ডলীর অধীশ্বর। ঐ মঠটি তিনি অথবা তাঁর গুরু বা গুরুর গুরু কোন্ সন্ত মহাত্মা প্রতিষ্ঠা করেন, তাও জানা যায় না। তবে সেই মঠটি অতি প্রাচীন এবং তার আয়তনও সুবিস্তৃত।

সেই গুরুজী মহারাজের মণ্ডলীতে সাতশত নাগা ছিলেন। তাঁরা তাঁর পদপ্রান্তে বাস ক'রে, তাঁর নির্দেশ ও উপদেশানুসারে বেদান্তনিহিত সত্যসমূহ নিজেদের জীবনে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করার জন্য নিয়মিত ধ্যান-ধারণাদি অভ্যাস ক'রতেন। সেই মহাত্মার প্রত্যক্ষ শিষ্যগণের মধ্যে আরও দু'জন সন্তের নাম জানা যায়। তাঁদের নাম চামেলি পুরী ও গণেশ গর্জী। শেষোক্ত সন্ত-সম্পর্কিত কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গও 'কথামৃতে' লিপিবদ্ধ রয়েছে। তিনি সিদ্ধ ছিলেন এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে চলতেন। তাঁর একজন বিশেষ অন্তরঙ্গ সঙ্গী ঐ মঠ হ'তে অন্যত্র চলে যাওয়ায় তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং অধৈর্য হয়ে পড়েন।

যা হোক, সেই পুণ্যশ্লোক গুরুজী মহাত্মার দেহাবসানের পর লুধিয়ানাস্থিত ঐ মঠেই তাঁর পূত দেহ সমাহিত করা হয় এবং তথায় তাঁর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে সমাধিও রচিত হয়। তাঁর স্মরণে ও সম্মানে প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে কয়েকদিন ধ'রে একটি বৃহৎ মেলাও বসে। ঐ মেলায় উক্ত মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ঐ অঞ্চলের দূরবর্তী গ্রামসমূহ হ'তেও শত শত নরনারী সমবেত হয়। তিনি তামাক সেবন ক'রতে ভালবাসতেন। এ জন্য সমাগত পুণ্যার্থি-গণ ঐ সমাধিতে তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাপূর্বক তামাক উপহার উৎসর্গ ক'রে থাকেন।

গুরুকুলের কথা

শ্রীমৎ তোতার গুরুকুলে ব্রতী সাধকদের ধ্যানাদি শিক্ষাদানের প্রণালী ছিল বড়ই চমৎকার। ধ্যানে বসার জন্য অধিকারী ভেদে তাঁদের আসনের ব্যবস্থা ছিল বিভিন্ন রূপ। যাঁরা প্রথম ধ্যানাভ্যাস আরম্ভ ক'রতেন, তাঁদের গদিতে বসিয়ে ধ্যান করান হ'ত। কঠিন আসনে বসলে ক্লেশবশতঃ তাঁদের মন ধ্যেয় বস্তুতে নিবদ্ধ না হ'য়ে দেহগত হ'য়ে পড়বে, এ-জন্যই ঐরূপ কোমল আসনে বসানর ব্যবস্থা করা হ'ত। তারপর ধ্যানাভ্যাসে ধীরে ধীরে প্রীতি ও অনুরাগ বৃদ্ধি পেলে তাঁদের বসার আসনও ক্রমশঃ কঠিন হ'তে কঠিনতর ব্যবস্থা করা হ'ত। অবশেষে, মন একান্ত স্থির ও নিবদ্ধ হ'লে কেবল চর্মাসন বা শুধু মাটিতে ব'সে তাঁদের ধ্যান ক'রতে হ'ত।

আহারাদি বিষয়েও বিশেষ বিধি-ব্যবস্থা ছিল। আহার্যের পরিমাণ, অবস্থা-ভেদে নির্ধারিত হ'ত। ঐ বিষয়েও তাদের সংযম অভ্যাসের ব্যবস্থা ছিল। ক্রমশঃ তাঁদের আহার কমিয়ে কমিয়ে শেষে কেবল মাত্র জীবনধারণোপযোগী যৎসামান্য আহার্য দেওয়া হ'ত। পরিচ্ছদাদি বিষয়েও তাঁদের অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল। ধীরে ধীরে ত্যাগ অভ্যাস করিয়ে, শেষে একেবারে উলঙ্গ হ'য়ে থাকতে অভ্যাস করান হ'ত। এভাবে ক্রমশঃ তাঁদের লজ্জা-ঘৃণা-ভয়, জাতি-কুল-শীল-মান-অভিমান প্রভৃতি 'পাশ' মুক্ত হ'তেও শিক্ষা দেওয়া হ'ত।

কালক্রমে ঐভাবে সর্ববিষয়ে সুসংযত ও সুকঠোরব্রত হ'লে এবং ধ্যান-ধারণাদিতে মন সুনিবদ্ধ হ'লে তাঁদের তীর্থাদি পর্যটনে পাঠানো হ'ত। প্রথমের দিকে প্রবীণ সাধকগণ তাঁদের

সঙ্গে নিয়ে পরিভ্রমণ ক'রতেন এবং সযত্নে তাঁদের ঐ বিষয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলাদি শিক্ষা দিতেন। পরিশেষে, তাঁদের একান্ত নিঃসঙ্গভাবে যদৃচ্ছা ভ্রমণের জন্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ ক'রতে হ'ত।

উক্ত মঠের মোহন্ত এবং মণ্ডলীর অধীশ্বর নির্বাচনের পদ্ধতিটিও ছিল সুন্দর। তাঁদের মধ্যে যিনি প্রবীণ, প্রাজ্ঞ এবং যথার্থ কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী ও পারমহংস্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন বলে বিবেচিত হ'তেন, ঐ পদ শূন্য হ'লে, সকলে মিলে তাঁকেই সেই সর্বোচ্চ পদে অভিষিক্ত ক'রতেন।

শ্রীমৎ তোতার গুরুকুলের প্রাচীন পরমহংসগণ 'কিমিয়া' বিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিলেন। ঐ বিদ্যার প্রভাবে অর্থোপার্জন বা ভোগ-বিলাস সাধন একান্তই নিষিদ্ধ ছিল। ঐরূপ উদ্দেশ্যে ঐ বিদ্যা প্রয়োগ ক'রলে গুরুর অভিসম্পাৎ লাভ ক'রতে হ'ত। মণ্ডলীশ্বর মহারাজ যখন বিশাল মণ্ডলী-সহ তীর্থ হ'তে তীর্থান্তরে গমনাগমন ক'রতেন, সে-সময় কখনও তাঁদের আহারাদির বন্দোবস্তের জন্য অর্থাদির বিশেষ অনটন ঘটলে ঐ বিদ্যা প্রয়োগ ক'রে মণ্ডলীর সেবাদির ব্যবস্থা ক'রতেন। অন্যথা কদাচ তাঁরা ঐ বিদ্যার প্রয়োগ ক'রতেন না।

আকৃতি-প্রকৃতি

তোতাপুরীজী ছিলেন যেমন বলিষ্ঠ সুঠাম, তেমনি সমুন্নত ও প্রশস্তকায় পুরুষ। তাঁর মস্তকে দীর্ঘ জটাজাল এবং মুখমণ্ডল ঘন শ্মশ্রু-গুম্ফ পরিশোভিত ছিল। শৈশবকাল হ'তেই তাঁর দেহ ছিল একান্তই নীরোগ ও বলশালী। তার ফলে, বৃদ্ধ বয়সেও তিনি ছিলেন বেশ সবল-সুস্থ এবং অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী।

তিনি ছিলেন নিত্য-মুক্ত-স্বভাব-সম্পন্ন পুরুষ। মুক্ত বায়ুর ন্যায় অবাধে যত্র তত্র বিচরণ ক'রে বেড়াতেন এবং বায়ুর মতই তাঁকে কোন দোষ-গুণ কখনও স্পর্শ ক'রতে পারত না। প্রব্রজ্যা-কালে তিনি কখনও এক স্থানে আবদ্ধ হয়ে থাকতেন না এবং কোথাও একাদিক্রমে তিন দিনের অধিক কাল অবস্থান ক'রতেন না।

পুরীজী যেমন নির্ভীক-হৃদয়, তেমনি সরল বিশ্বাসী এবং শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর গুরুজী মহারাজ তাঁকে যেমন যেমন উপদেশ ক'রতেন, তিনি সেগুলি যথাযথভাবে গ্রহণ ধারণ ক'রতে পারতেন এবং সেগুলিকে কার্যে পরিণত ক'রতেও সক্ষম হ'তেন। অবিদ্যার দুস্তর প্রভাব হ'তে বিমুক্ত ছিলেন তিনি। এজন্য তাঁকে কখনও মনের জুয়াচুরি ও ভণ্ডামিতে ভুগতে হয়নি। যখনই যা ধ'রতেন তা নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন ক'রতে পারতেন। মানবের যথার্থ কল্যাণকর বলে যা বুঝতেন তা কার্যে পরিণত ক'রতেন।

তিনি ছিলেন যেমন গভীর আত্মপ্রত্যয়শীল তেমনি প্রবল উদ্যমী। অদম্য পুরুষকার ও প্রচেষ্টা সহায়েই তিনি নির্বিকল্প সমাধি লাভ ক'রে মহোচ্চ পারমহংস্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ঘোর অজ্ঞান বন্ধন হ'তে নির্মুক্তি লাভের জন্য পুরুষকার অবলম্বনকেই তিনি চরম ও পরম পন্থা ব'লে জ্ঞান ক'রতেন। তিনি ছিলেন 'শান্ত' প্রকৃতির 'শান্ত' ভাবের পথিক। শম-দমাদি ষট্-সম্পত্তি সহায়ে আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করেছিলেন।

পুরীজী ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানী। বেদান্তোক্ত কর্মফলদাতা ভিন্ন অপর কোনও দেব-দেবীর অস্তিত্ব তিনি স্বীকার ক'রতেন না। অপরোক্ষানুভূতি সহায়ে তিনি জেনেছিলেন যে, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব, দেশ-কালাদি দ্বারা সর্বদা অপরিচ্ছিন্ন একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই নিত্য সত্য। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া নিজ প্রভাবে তাঁকে নাম-রূপাদির দ্বারা খণ্ডিতবৎ প্রতীত ক'রলেও তিনি কখনও বাস্তবিক ঐরূপ নন। কারণ সমাধিকালে মায়াজনিত দেশ-কাল বা নাম-রূপের বিন্দুমাত্রও

উপলব্ধি হয় না। অতএব নামরূপাদির সীমার মধ্যে যা কিছু অবস্থিত, তা কখনও নিত্যবস্তু হ'তে পারে না।

তিনি কালী-দুর্গা, শিব-নারায়ণ প্রভৃতি দেবতার উপাসনাকে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার জ্ঞান ক'রতেন। এজন্য কখনও কোন দেব-দেবীর বিগ্রহের নিকট মস্তক অবনত ক'রতেন না। তিনি ব্রহ্মশক্তিকে মায়া বা ভ্রমমাত্র বলে মনে ক'রতেন। সগুণা শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার বা উপাসনাদি দ্বারা তাঁর প্রসন্নতা সাধনের চেষ্টাদিকে ভ্রান্ত সংস্কার বলে জ্ঞান ক'রতেন। ঈশ্বর বা শক্তিসংযুক্ত ব্রহ্মের সহায়তা ও করুণা প্রার্থনার বিন্দুমাত্রও সার্থকতা তিনি অনুভব ক'রতেন না। যাঁরা ঐরূপ করে থাকেন, তাঁরা অজ্ঞতা ও ভ্রান্তসংস্কার-বশে ঐরূপ করেন ব'লে তিনি সিদ্ধান্ত ক'রতেন।

কল্পনাসহায়ে ঈশ্বরকে সখ্য-বাৎসল্য, জায়া-পতি, মাতা-পিতা প্রভৃতি ভাবে ভজনা করেও যে সাধক সত্য-বস্তুর দিকে দ্রুত অগ্রসর হ'তে পারেন, পুরীজী এ-কথা কখনও ধারণাই ক'রতে পারতেন না। ভাবের প্রেরণায় ঈশ্বরের নিকট আবদার অনুনয়, তাঁর জন্য বিরহ-ব্যাকুলতা, তাঁর প্রতি মান-অভিমান এবং ভাবের প্রাবল্যে হাস্য-ক্রন্দন ও নৃত্যাদি সাত্ত্বিক চেষ্টাকে তিনি পাগলের খেয়াল রূপে গণ্য ক'রতেন। ঐ সকল অবস্থার মধ্য দিয়েও যে সাধকের আশু অভীষ্ট ফল লাভ হয়, এটি তাঁর কল্পনারও অতীত ছিল। যা হোক, তাঁর এ-ধরণের মতিগতি দেখে সাধারণে হয়ত বা ভাবতে পারেন যে, তিনি নাস্তিক ছিলেন এবং ঈশ্বরের প্রতি তাঁর কোনও অনুরাগ ছিল না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, আদৌ তা নয়। তিনি 'শান্ত' ভাবটিকেই অভীষ্ট ফল লাভের একমাত্র পথ জ্ঞান ক'রতেন। কারণ, ঐ পথেই তিনি চরম সত্য লাভ ক'রেছিলেন।

ধ্যানানুষ্ঠানে পুরীজীর বরাবরই বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়। তিনি নির্বিকল্প সমাধি-পথে স্বীয় মনকে সুস্থির নিবদ্ধ এবং সকল বৃত্তিশূন্য ক'রতে সক্ষম হয়েছিলেন। তথাপি তিনি নিত্য নিয়মিতভাবে ধ্যানানুষ্ঠান ক'রতেন। অধিকাংশ সময়ই তিনি মৌন ও আত্মসমাহিত হ'য়ে থাকতেন। সদা অন্তর্মুখী ভাব তাঁর একান্ত স্বভাবজ ও প্রকৃতি-গত ছিল। বহির্জগতের কোন বিষয়েই তাঁর আদৌ ভ্রুক্ষেপ ছিল না। তিনি প্রায় সর্বদাই নিজেকে এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে নিমগ্ন ক'রে রাখতেন।

সমাধি অবলম্বনেও তাঁর অগাধ প্রীতি ও অনুরাগ লক্ষিত হয়। তিনি ইচ্ছামাত্রই সমাধিস্থ হ'তে পারতেন। ঐ মহোচ্চ যোগাবস্থা লাভের জন্য তাঁর বিশেষ কোনও প্রচেষ্টা বা প্রক্রিয়াদিরও প্রয়োজন হ'ত না। যোগবিদ্যার সেই দুরূহ রহস্যটি তাঁর অতি সহজায়ত্ত ছিল। প্রতিনিয়ত তিনি বহুক্ষণ গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হ'য়ে থাকতেন। বস্তুতঃ তাঁর ধ্যানানুরাগ ও সমাধি-প্রীতি দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, তিনি বিজিতনিদ্র ছিলেন।

জীবন-যাত্রা

শ্রীমৎ তোতাপুরীজীর আহার-বিহার, শয়ন-উপবেশন প্রভৃতি কাজ মানব সাধারণের ন্যায় ছিল না। তিনি প্রায় সর্বদাই বালকের ন্যায় উলঙ্গ থাকতেন এবং কখনও গৃহমধ্যে বাস ক'রতেন না। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা—সকল ঋতুতে তিনি দিবারাত্র বৃক্ষতলে অবস্থান ক'রতেন। তিনি 'নাগা' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন ব'লে নিয়মিত অগ্নিসেবা ক'রতেন—যখন যেখানে থাকতেন, কাষ্ঠাদি আহরণপূর্বক সেখানে 'ধুনি' জ্বালিয়ে রাখতেন। কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা—সকল সময়ই অহোরাত্র তাঁর ঐ ধুনি প্রজ্বলিত থাকত। ঐ ধুনির পার্শ্বেই তাঁর ধ্যান-ধারণা, শয়ন-উপবেশন এবং ভোজনাদি কৃত্যসকল অনুষ্ঠিত হ'ত। তিনি ঐ অগ্নিকুণ্ডেই ভিক্ষালব্ধ ভোজ্যাদির অগ্রভাগ আহুতি দিতেন।

পুরীজী ঐ ধুনিকে মহাপবিত্র জ্ঞান ক'রতেন এবং সাধারণতঃ অপর কা'কেও তাঁর অগ্নি স্পর্শ ক'রতে দিতেন না! অজ্ঞতাবশে, কেহ কখন তা স্পর্শ ক'রে ফেললে, তিনি ভয়ানক বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হ'তেন এবং সেজন্য তাকে কঠোর তিরস্কারাদিও করতেন। ঐ ধুনির পবিত্র ভস্ম তিনি প্রত্যহ সর্বাঙ্গে মাখতেন এবং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সেবনও ক'রতেন। সকাল-সন্ধ্যায় ঐ ধুনির বিহিত অর্চনা ও আরতি অনুষ্ঠান তাঁর নিত্যকৃত্য-সকলের অন্তর্গত ছিল।

পুরীজী মহারাজের নিকটে একটি বৃহৎ 'লোটা' (জলপাত্র), একটি দীর্ঘ চিম্‌টা, এক-খানি প্রশস্ত চর্মাসন এবং একখানি মোটা চাদর থাকত। তাঁর ঐ লোটাটি ছিল পিতলের। সেই লোটাটি এবং চিম্‌টাটি তিনি প্রত্যহ মেজে-ঘষে চক্‌চকে ক'রে রাখতেন। তাঁর জলপান, ভোজন এবং শৌচাদি সম্পাদনের কার্যে ঐ লোটাটি ব্যবহৃত হ'ত চিম্‌টাখানি দিয়ে তিনি ধুনির আগুন নাড়াচাড়া ক'রতেন এবং সেটির সাহায্যে হিংস্র প্রাণীর হাত হ'তে আত্মরক্ষাও ক'রতেন। পর্যটনকালে সেটি প্রায় সর্বদাই তাঁর হাতে থাকত। চর্মাসনটি তাঁর উপবেশন এবং শয়নের জন্য ব্যবহৃত হ'ত। তিনি শয়ন-কালে ঐ চাদরখানি দ্বারা স্বীয় সর্বাঙ্গ আবৃত ক'রে রাখতেন এবং পর্যটনকালেও সেটি গাত্রা-বরণরূপে ব্যবহার ক'রতেন।

গভীর নিশীথে যখন সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি শান্ত ও নিদ্রাভিভূত হ'য়ে পড়ত তখন তিনি অতিরিক্ত কাষ্ঠাদি সংযোগে ধুনিটিকে অধিক প্রজ্বলিত ক'রে, তার পার্শ্বে অচল অটল সুমেরুবৎ আসনে উপবিষ্ট হ'য়ে নিবাত নিষ্কম্প দীপ-শিখার ন্যায় সুস্থির মনটিকে গভীর সমাধিতে নিমগ্ন ক'রতেন এবং অবশিষ্ট রাত্রি তাঁর ঐভাবে অতিবাহিত হ'ত। দিবাভাগেও বিশ্রামকালে তিনি কখন কখন আপাদমস্তক আচ্ছাদিত ক'রে ঐ ধুনির পার্শ্বে শায়িত থাকতেন। তাঁকে দেখে সাধারণে ভাবত তিনি নিদ্রিত রয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ঐ সকল সময়ও ধ্যানমগ্ন ও সমাধিলীন হ'য়ে থাকতেন। অন্যান্য সময়ে তিনি কখনও বৃথালাপ বা অযথা বাক্যব্যয় ক'রতেন না।

প্রাণপ্রতিম

শ্রীমতী অঞ্জলি ঘোষ

প্রাণপ্রতিম শ্রীরামকৃষ্ণ! হৃদয়ের দ্বার খোলো,
তোমার বাণীর আলোক-ধারায় ঘুচাও মনের কালো।
পথের দিশারী নরদেব তুমি, আশ্রয় সবাকার,
তাপিতা ধরণী শীতল করিতে যুগে যুগে অবতার।
তোমায় চাওয়ার অন্ত যে নাই সারাটি জীবন ধরে!
ধরা দাও প্রভু, মুছাও অশ্রু তব মঙ্গল-করে।
জ্ঞানদীপ জ্বালি রাখ অনুখন, বাজাও প্রেমের বাঁশি,
এ জন্ম-লগন সার্থক করো মনোমন্দিরে আসি।

ঋগ্বেদীয় দেবদেবী

শ্রীজয়দেব হাজরা চৌধুরী

সৃষ্টির আদিম কাল হইতে মনুষ্যজাতি দেবদেবীকে অর্চনা করিয়া আসিতেছে। হিন্দুজাতি আজ যে দেবদেবীর পূজা করিতেছে, সেই দেবদেবী কতদিন হইতে পূজিত হইতেছেন? ঋগ্বেদ আর্যজাতির প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, ঋগ্বেদই বিশ্বের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ। অবশ্য বায়ু সোম মিত্রাদির উপাসনা পারসীকদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা ও ঋগ্বেদ উভয়ত্রই দেখা যায়। কিন্তু ঋগ্বেদ আবেস্তা হইতেও প্রাচীনতর। ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্রটি হইতেছে :

ওঁ অগ্নীমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং
হোতারং রত্নধাতমম্। ১।১।১

উক্ত মন্ত্রটি ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক দেবপূজায় ঘন্টাসহকারে উচ্চারিত হয়। গ্রামোফোন আবিষ্কারকর্তা মার্কিন বৈজ্ঞানিক এডিসন গ্রামোফোন প্রচারকল্পে যখন প্রথম রেকর্ড প্রস্তুত করেন তখন বেদাচার্য ম্যাক্সমুলার কর্তৃক এই মন্ত্র উচ্চারিত ও 'রেকর্ডেড' হয়। এই মন্ত্রের দ্বারা অগ্নিকে উপাসনা করা হইতেছে। প্রথমেই আর্য ঋষিরা অগ্নিকে উপাসনা করিলেন কেন? সৃষ্টির আদিম যুগে মনুষ্যজাতি যাযাবরের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। অগ্নি আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে মানব সম্প্রদায় ফল-মূল শাক-সবজি ও কাঁচা মাংস খাইত। অগ্নির আবিষ্কার মানবজাতির ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সূচনা করিল। একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, অগ্নির আবিষ্কারে মানবচেতনায় এক নূতন আলোকসম্পাত ঘটিল। নূতন যুগের সূচনায় আর্যরা প্রথম অগ্নিকেই উপাসনা করিয়াছেন। সমগ্র ঋগ্বেদ পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, অগ্নি ও ইন্দ্রের উদ্দেশেই অধিকাংশ ঋক্ রচিত হইয়াছে।

সরস্বতীকে ঋগ্বেদের প্রথমেই পাইতেছি। সরস্বতী প্রথম মণ্ডল হইতে দশম মণ্ডল পর্যন্ত (মধ্যে অষ্টম ও নবম মণ্ডল ব্যতীত) সর্বত্রই পূজিত হইতেছেন। তিনি দেবী ও নদী উভয়ভাবেই পূজিত হইতেছেন, যথা—

(১) পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী
যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ। ১।৩।১০

(২) অম্বিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতি
অপ্রশস্তা ইব স্মসি প্রশস্তিমম্ব নঃ কৃধি।
২।৪১।১৬

প্রথম ঋকে দেবী সরস্বতী ও দ্বিতীয় ঋকে নদী সরস্বতী অর্চিত হইয়াছেন।

সরস্বতীর পর আমরা যাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন তিনি হইতেছেন 'বিষ্ণু'। যথা—

ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীব চক্ষুরাততম্।
তদ্ বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে
বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্। ১।২২।২০

'চন্দনচর্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালী' ও বিষ্ণু অভিন্ন। সুতরাং বেদ হইতে কৃষ্ণ বাদ পড়েন নাই। অবশ্য রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা-কাহিনী এখানে নাই। তবে ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ৭৬তম সূক্তের সপ্তম ঋকে 'রাধসঃ' শব্দের প্রয়োগ আছে এইজন্য বহু বৈষ্ণবের মতে বেদেও রাধার উল্লেখ রহিয়াছে।

দেবী ঊষা প্রথম মণ্ডল হইতে দশম মণ্ডল পর্যন্ত (মধ্যে দ্বিতীয়, অষ্টম ও নবম মণ্ডল ব্যতীত) পূজিত হইয়াছেন। যথা—

(১) সহ বামেন ন উষো ব্যুচ্ছা দুহিতর্দিবঃ
সহ দ্যুম্নেন বৃহতা বিভাবরি রায়া
দেবি দাস্বতী। ১।৪৮।১

(২) আ যাহি বনসা সহ গাবঃ
সচন্ত বর্তনিং যদূধভিঃ। ১০।১৭২।১

নিশাবসানে আর্যঋষিরা দেবী উষাকে কাতর-ভাবে ডাকিতেছেন। দেবী উষা কেবল মাত্র এখানে রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত করিয়া আলোক আনিতেছেন না, তিনি দিব্যজ্ঞানের আলোকবর্তিকা লইয়া বিশ্বে প্রতিভাত হইতেছেন। তিনি দিব্য-জ্যোতিতে পরিপূর্ণা।

প্রথম মণ্ডলেই সূর্যস্তব রহিয়াছে। সেই বৈদিক যুগ হইতে আজও পর্যন্ত সূর্যস্তব চলিয়া আসিতেছে। সূর্যস্তব ভারতে শুধু হিন্দুজাতির মধ্যেই নয়, বোম্বেতে যে পারসীক জাতি বাস করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। বিহারে যে ছট্‌পূজা প্রচলিত আছে তাহা সূর্য-পূজাই। হিন্দুরা স্নান করিয়া প্রথমেই সূর্যকে স্তব করিয়া থাকেন। এতদ্‌ব্যতীত গৃহে গৃহে সূর্যদেবকে অর্ঘ দেওয়া হয়।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলেই (১।৮।১) 'হরি' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। ইনিই কি সেই হরি যাঁহার নাম-সঙ্কীর্তন আমরা ভক্তিভরে করিয়া থাকি ?*

---

* ধর্মতত্ত্বাচার্য ডক্টর হরেন্দ্রকুমার দে চৌধুরীর মতে, বিষ্ণু বা কৃষ্ণ অর্থে পাপহরণকারী ভগবান্ 'হরি'-শব্দের প্রয়োগ মহাভারত, পুরাণাদিতেই প্রথম প্রচলিত হয়। ঋগ্বেদে 'হরি'-শব্দের মুখ্যার্থ অশ্ব। 'হরিঃ অশ্বঃ' –এবংবিধ প্রয়োগ বহুস্থলে রহিয়াছে, যথা ২।১৭।৩, ৩।৩২।৫, ৩।৩৬।৪,৯, ৩।৪৪।৪, ৮।৬৬।৪ ইত্যাদি। ইন্দ্র 'হরিবান্' বলিয়া সূচিত হইতেন। ইন্দ্র তাঁহার রথে হরিদ্বয় যোজনা করিয়া বিশ্বভুবন সঞ্চরণ করিতেন। হরী 'হরিতবর্ণৌ অশ্বৌ' (রথ বহনকারী) হরিত-বর্ণ অশ্বদ্বয়। কোন কোন স্থলে হরিতবর্ণ বস্ত্রও বুঝাইত। ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের বহু সূক্ত অনেকটা অর্বাচীন ; সেখানে কয়েকটি স্থলে 'হরি' অর্থে 'হরিতবর্ণঃ অগ্নিঃ'-ও সূচিত হইয়াছেন (যথা, ১০।৭৯।৬)।—সঃ

প্রার্থনা

শ্রীমতী বাসন্তী মণ্ডল

জন্ম তোমার পুণ্যতীর্থ কামারপুকুর ধাম,
এযুগের তুমি অবতার ওগো, শ্রীরামকৃষ্ণ নাম।
শুনেছি তোমার মহিমা অপার, দীনের হে দীনবন্ধু!
জীব-উদ্ধারে তুমি হে নাথ, অহেতুক কৃপাসিন্ধু।
তাইতো আজিকে একান্তে বসে, প্রার্থনা করি মনের হরষে,
তালে তালে তব গান গেয়ে যাই, ধ্যানের পুলকে তোমারে যে পাই।
তব শ্রীচরণে মতি যেন রহে, নিশিদিন এই প্রার্থনা ;
জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে করি যেন তব বন্দনা।

মহর্ষি দুর্বাসা

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার

(১)

আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ যেমন অসংখ্য, শাস্ত্রের ভাব বা তাৎপর্যও তেমনি সুগভীর—অনেক ক্ষেত্রে বুদ্ধির অগম্য বললেও চলে! দেখা যায়, স্পষ্ট করে যা সব হয়েছে বলা, তার চাইতে আকার-ইঙ্গিতে রূপকের ছলেই বলা হয়েছে ঢের বেশী। এই রূপকের আবরণ ভেদ করে শাস্ত্রের মর্মার্থ বুঝতে না পেরে, অনেক ক্ষেত্রেই শাস্ত্রকথাকে নেওয়া হয়ে থাকে, নেহাৎ গল্পকথা, অদ্ভুত অসামঞ্জস্যপূর্ণ লোক-ভোলান কথার কথা বলেই।

এরই একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণাদিতে বর্ণিত মহর্ষি দুর্বাসার চরিত-কথা। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার মানসপুত্র মহর্ষি অত্রির ঔরসে, আর দক্ষপ্রজাপতির কন্যা, যিনি শুধু নামেই নন, কাজেও ছিলেন অনসূয়া,—এমন মায়ের গর্ভে মহেশ্বর শিবের অংশে হয়েছিল মহর্ষি দুর্বাসার জন্ম। নিজেও ছিলেন একজন মহাতপস্বী মহাতেজস্বী ঋষি যাঁর ধৈর্য ও সংসারে অনাসক্তির কথায় বলা হয়েছে, একশ'বার পর্যন্ত তিনি নিজ স্ত্রীর অপরাধ সহ্য করেছিলেন। আরও লক্ষ্য করার বিষয়—গোটা শাস্ত্রপুরাণে যে ক'জন মাত্র ঋষিমুনিকে দেখা যায় সম্পূর্ণ কামজিৎ থাকতে, দুর্বাসা ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। এমন যে একজন মহামুনি যাঁকে দেখি ত্রেতাযুগ থেকে দ্বাপর—রামাবতার থেকে কৃষ্ণাবতার পর্যন্ত—সর্বজ্ঞ, সর্বসাক্ষীরূপে, কী আশ্চর্য! তাঁকেই আবার আচরণ করতে দেখা যায়, একটি মহাক্রোধী, সাধু-অসাধু-নির্বিশেষে সকলেরই মর্যাদালঙ্ঘনকারী, হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য অর্ধোন্মাদের মত! এই অসামঞ্জস্য—এই পরস্পর-বিরোধীভাবের একত্র সমাবেশের ফলে, শুধু যে দুর্বাসাচরিত্রটিই হয়ে দাঁড়িয়েছে সকলের চোখে একটি কৌতুকের সামগ্রী, অব্যবস্থিতচিত্ততারই একটি প্রতিমূর্তি, তাই নয়, সেই সঙ্গে এই সব ঋষিচরিত্র অবলম্বনে রচিত সকল শাস্ত্র-পুরাণকেও আপাতদৃষ্টিতে নামিয়ে আনা হয়েছে নিছক এক-গাদা অবাস্তব গল্পের স্তরে। এই সব অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য করতে গিয়ে, কখনও কখনও কার্যকারণ-সম্বন্ধ হিসাবে দেখান হয়ে থাকে একটির বদলে আর একটি পৌরাণিক কাহিনী। কিন্তু, এর ফলে মূল প্রশ্নটিকেই যাওয়া হয় এড়িয়ে, হয়না তার সত্যকারের কোন সমাধান। একথা মেনে নিলে, তখন প্রশ্ন দাঁড়ায়—আছে কি তাহলে আদৌ এর কোন সমাধান? উত্তরে বলতে হয়, যদি নাই থাকে এর কোন সত্যকার মীমাংসা—কোন যুক্তি-সম্মত ব্যাখ্যা, তবে এসকলকে অনর্থক ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, অথবা চিরন্তন সত্য বলে বলা কেন? ঈশ্বর যেমন স্বয়ং-সম্পূর্ণ, আমাদের চোখে শাস্ত্রও তেমনি স্বয়ং-সম্পূর্ণ অথবা অন্য-নিরপেক্ষ। কাজেই, ধরে নিতেই হয়—আছেই আছে কোথাও না কোথাও শাস্ত্রের মধ্যেই এসকলের কোন একটা সমাধান। এ বিষয়ে করণীয় হচ্ছে—এই সব রূপকের আবরণে লুকানো রয়েছে যে সত্যকার রূপ তাকে খুঁজে খুঁজে বের করে এনে দাঁড় করান যুক্তিসম্মত শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সকলের আলোতে, যাতে করেই কেবল সম্ভব হয়ে উঠতে পারবে এই সমস্যার সমাধান—এই অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য-বিধান—এই রহস্যের অবসান।

(২)

এদিক দিয়ে, দুর্বোধ্য দুর্বাসা-চরিত্রটি নিয়ে

একটু পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ে ঋষি দুর্বাসাকে রামায়ণের শেষ অঙ্কে লক্ষ্মণ-বর্জনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে। কালপুরুষের সাথে (এখানেও রূপক! সর্বসংহারক মহাকালই পুরুষরূপে কল্পিত) চলেছে শ্রীরামচন্দ্রের গোপন আলোচনা। শর্ত হয়েছে—তৃতীয় কোন ব্যক্তি এসময়ে ঘরে ঢুকলে, করতে হবে তাকে চিরদিনের মত বিসর্জন। দরজায় তাই পাহারা রয়েছেন লক্ষ্মণ স্বয়ং। এমন সময় ঝড়ের মত হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন ঋষি দুর্বাসা। করতেই হবে তাঁকে তখনিই রামচন্দ্রের সাথে দেখা—চলবে না এক মুহূর্তও দেরি করা। বাধ্য হয়েই খবর দিতে গেলেন লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে। ফলে ঘটল যা ঘটবার। হল লক্ষ্মণবর্জন। প্রাণত্যাগ করলেন লক্ষ্মণ সরযুর জলে। রামচন্দ্রও করলেন সেই সঙ্গে নরলীলা সংবরণ। একেবারে একটা নাটকীয় ব্যাপার! যার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল দুর্বাসার মতই একজন ঋষির। যে মিত্র, কখনই সে চাইবে না এমন নিদারুণ কাজে হাত দিতে। যে শত্রু, তার পক্ষে ত সম্ভবই ছিল না একাজ করা। কাজেই, দরকার হয়ে পড়েছিল এমন একটি চরিত্রের সৃষ্টির যা হবে— না-মিত্র, না-শত্রু, সর্বত্র অবাধগতি, অপ্রতিহতপ্রভাব—সম্পূর্ণ মায়ামমতা-বর্জিত। তাকে নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য পরিণতি, কালের করালগ্রাস, বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধান অথবা ঋষি দুর্বাসা—যে নামে বা রূপেই কবা হোক না কেন পরিকল্পিত! এই রামায়ণেই দেখা যায়, একদিন দশরথ-মহিষী কৈকেয়ীকেও এমনি এক উপলক্ষ্য করে পাঠান হয়েছিল রামচন্দ্রকে বনবাসে। কিন্তু তফাৎ এই, করেছিলেন সেদিন একাজ কৈকেয়ী আসক্তির বশে—অজ্ঞানতার মোহে, যার ফলে চোদ্দ বছর ধরে অনুতাপের আগুনে পুড়ে পুড়ে শেষকালে বলতে শোনা গিয়েছিল তাঁকে অভিমানের সুরে বনবাস-প্রত্যাগত রামকে দেখে—'বনে গেলে দেবতার কার্যসিদ্ধি লাগি। আমারে করিলে কেন নিমিত্তের ভাগী॥' অন্যপক্ষে, যখন যা কিছু করতে দেখা যায় ঋষি দুর্বাসাকে, সে-সব কিছুই যেন করা হচ্ছে সম্পূর্ণ সজ্ঞানে—সব জেনে শুনে—একেবারে নির্বিকার-চিত্তে। তাই রাম লক্ষ্মণকে মৃত্যুর মুখে তুলে দিয়েও, শোনা যায় না দুর্বাসার মুখে কোন অনুশোচনা—কোন অনুতাপের কথা। যেমন যায়নি শোনা কৃষ্ণাবতারের শেষে যদুকুল ধ্বংসের কারণ হয়েও, মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব, দেবর্ষি নারদের মুখেও। তাই মনে হয়, এই সব ঋষিচরিত্র যেন শাস্ত্রকারের এক একটি সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি—সকল মায়া মোহের অতীত এক নৈর্ব্যক্তিক ভাবকেই যেন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ব্যক্তি-আকারে ঋষি দুর্বাসা ও এমনি সব আর আর ঋষি-চরিত্রের মাধ্যমে!*

(৩)

এরপর মহাভারতের যুগেও মাঝে মাঝেই দেখতে পাওয়া যায় ঋষি দুর্বাসাকে। যখনই দরকার হয়ে পড়েছে কোন অঘটন কিছু ঘটাবার—কোন চরম অপ্রীতিকর কিছু করবার, তখনই হয়েছে তাঁর আবির্ভাব। করতে হবে বনবাসী পাণ্ডবদের শরণাগতির পরীক্ষা, পাঠান হল মহাক্রোধী ঋষি দুর্বাসাকে দশহাজার অভুক্ত শিষ্য নিয়ে এমন এক অসময়ে যখন পাণ্ডবদের পক্ষে সম্ভব ছিল না অতিথিসৎকারের কোন কিছুই ব্যবস্থা করা। সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপী ঋষি দুর্বাসার আগমনে সেদিন যেমন করে মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন

* সব ঋষি-চরিত্রই কাল্পনিক মনে হয় না। নারদের কথা ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—'নারদাদি নিত্যজীব'। বাস্তব চরিত্রকে ভিত্তি করিয়া কিছু কিছু কাল্পনিক কাহিনী রচনা অসম্ভব নহে। —সঃ

পাণ্ডবেরা তাঁদের চরম অসহায় অবস্থাটা ও সেই সাথে ঈশ্বর-শরণাগতির মহিমা, হাজার শাস্ত্রপাঠ অথবা সৎপ্রসঙ্গ করেও বুঝিবা শতজন্মেও সম্ভব হয়ে উঠত না, ঠিক তেমন করে বোঝা! অথচ বায়ুর মত নির্লিপ্ত দুর্বাসার পক্ষে এসব ঘটা না-ঘটায় যেন আসে যায় না কোনও কিছু।

(৪)

কৃষ্ণলীলার নিত্যসঙ্গী ঋষি দুর্বাসা এসেছেন একদিন দ্বারকায়। ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন তাঁকে স্বয়ং কৃষ্ণ ও রুক্মিণী। বিশ্রামের পরে নিবেদন করে দেওয়া হল একবাটি পায়সান্ন। তাড়াতাড়ি করে খানিকটা গরম-গরম পায়স খেয়ে নিয়ে, দিলেন দুর্বাসা বাকীটা কৃষ্ণ ও রুক্মিণীকে। বলা হল কৃষ্ণকে সারাগায়ে সেই গরম পায়স মাখতে। করলেনও কৃষ্ণ তাই-ই, বাকী রইল শুধু পায়ের তলাটা। একে ত ব্রাহ্মণ, তারপর তপস্বী—কি করে আর তাঁর খাওয়া-পায়স মাখান যায় পায়ের তলায়! হল না কিন্তু ব্যাপারটা দুর্বাসার মনের মত। দেখাও যায়, এই পায়ের তলার ছিদ্রপথেই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ছত্রিশ বছর পরে ঢুকেছিল একদিন শনি—সেই জরা নামে ব্যাধের মৃত্যুবাণ যাতে করেই ঘটেছিল কৃষ্ণলীলার অবসান। এই জরার কথাতেও মনে এসে যায়—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের দীর্ঘকাল পরে যখন ফুরিয়ে এসেছিল অবতার-লীলার প্রয়োজন তখন বুঝিবা একদিন নরদেহধারী কৃষ্ণেরও দেহ-মনে দেখা দিয়েছিল জরারূপধারী মহাকাল তাঁর মৃত্যুবাণ হাতে নিয়ে! আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ ত কেবল নীরস ধর্মগ্রন্থ নয়, সরস কাব্যগ্রন্থও বটে! সে যা'হক, এখানে যা দেখা যায়, তাতে করে বলতেই হয়—সব জেনে শুনেই করেছিলেন এদিন কৃষ্ণ যা কিছু করবার—রেখেছিলেন এইভাবে আপন মৃত্যুর আগমনের পথ প্রস্তুত করে, কৌরব-জননী গান্ধারীর অভিশাপের সূত্র ধরে। এরপর দেখা যায়, এক অদ্ভুত বায়না করে বসলেন ঋষি—রথের ঘোড়া খুলে দিয়ে স্বয়ং রুক্মিণীকেই টানতে হবে রথ, আর সেই রথে করে করবেন তিনি নগর ভ্রমণ। মৃদু হেসে রাজী হয়ে গেলেন সদাহাস্যময় কৃষ্ণ ও সেই সাথে রুক্মিণীও। পিঠে চাবুক মারতে মারতে রুক্মিণীকে দিয়ে রথ চালিয়ে ঘুরে এলেন দুর্বাসা, আর তারপর কৃষ্ণকে 'ক্রোধজিৎ' দেখে খুশি হয়ে বললেন তাঁকে—তিনি ও রুক্মিণী তাঁর বরে হবেন সর্বলোকপ্রিয়। শোনা যায়—কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মই সর্বপ্রথম দিয়েছিলেন কৃষ্ণকে অবতারত্বের সম্মান, আর এ থেকেই শুরু হয়েছিল কৃষ্ণপূজা। মনে হয়, লোকসমাজে দুর্বাসারও খ্যাতি ছিল বড় কম নয় যাতে করে তাঁর বরেও উঠতে পেরেছিল কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর সর্বজনপ্রিয় হওয়ার কথাটা। এছাড়াও আছে আরও একটা ভাববার কথা। যিনি নিজে যা নন, তাঁর পক্ষে অন্যকে (বিশেষ করে কৃষ্ণকে) তেমন প্রশংসাপত্র দেওয়ার অর্থই বা কী আর অধিকারই বা কতটুকু! তাই, দুর্বাসা নিজেও যে ছিলেন না ক্রোধজিৎ অথবা লোকপ্রিয় তাই বা কেমন করে পারা যায় বলতে? কিন্তু, এসব সত্ত্বেও এখানে দেখতে পাওয়া যায় তাঁর যে আচরণ, বিশেষ করে রুক্মিণী সম্বন্ধে, তাতে ত তাঁকে আপাতদৃষ্টিতে একটি বদ্ধপাগল ছাড়া কিছুই আর যায় না ভাবা। তবে কথা এই, দুর্বাসা পাগল হলেও, কৃষ্ণ ত আর ছিলেন না পাগল। তাঁরই চোখের সামনে—তাঁরই সম্মতিতেই ত করা হয়েছিল এই পাগলামি! কাজেই একে নিছক একটা পাগলের খেয়ালই বা বলা যায় কি করে? তাহলে কী এটা? এটা কি তবে একটা পরীক্ষা? হাঁ, পরীক্ষাই বটে! কঠিন পরীক্ষা! দেখা যায় জগতে যাঁরাই খ্যাতি লাভ করেছেন ঈশ্বরের অবতার বলে, সকলকেই তাঁদের দিতে হয়েছিল এমনি সব কঠিন অগ্নি-পরীক্ষা। আর, যেমন তেমন আগুনেও হয় না

এই অগ্নি-পরীক্ষা। যে আগুনে শুধুই পোড়ান যায় খড়কুটো, সে-আগুনে যায় না লোহা-গলান। তাই এই পরীক্ষার জন্য দরকার হয় মহাশক্তিশালী আগুন যারই জীবন্ত প্রতীক ছিলেন আমাদের শাস্ত্রোক্ত দুর্বাসার ন্যায় ঋষিরা।

আনুষঙ্গিকভাবে এখানে কথা উঠতে পারে—কেনই বা মাখলেন না পায়ের তলায় ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট পায়স? তবে কি তাঁরও ছিল ত্যাজ্য-গ্রাহ্য ভাব? পা-মাথা বলে কোন পার্থক্য? কই বৃন্দাবনের গোপিনীরা ত করেননি কোন লজ্জা-সঙ্কোচ কৃষ্ণপ্রীতিকামনায়— কৃষ্ণের রোগনিরাময়ের জন্য আপন আপন পায়ের ধুলো উদ্ধবের হাতে তুলে দিতে গিয়ে?[১] এর উত্তরে বলতে হয়—হাঁ, রামাবতারেও উঠেছিল ঠিক এমনি একটা কথাই বটে! রামনাম করে একলাফে সাগর পারে চলে গেলেন রামভক্ত হনুমান, আর স্বয়ং রামচন্দ্রকে সেতু বেঁধে তবেই যেতে হয়েছিল লঙ্কায়! এ কেমন কথা? সেই সে-সময়ে এর যা দেওয়া হয়েছিল উত্তর, এবারের উত্তরও সেই একই। ভগবান যখন আসেন অবতার হয়ে, তখন নরলীলায় নরের মতই আচরণ করে করতে হয় তাঁকে কাজ। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, যুগধর্ম প্রবর্তন, গো-ব্রাহ্মণের হিত, জগতের হিত, এমনি সব কত কি কাজ যে করতে হয় তাঁকে, থাকে না তার কোন ঠিক-ঠিকানা! কিন্তু হনুমানই হোন, আর গোপিনীরাই হোন, ছিল না তাঁদের সে-সব ভাবনা-চিন্তা, ঝুট্-ঝামেলা! জানতেন তাঁরা রামকে, না হয় কৃষ্ণকে; আর তাই-ই ছিল তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট! শ্রীরামকৃষ্ণের কথা—নিজেকে মারতে গেলে যায় নরুন দিয়ে মারা, কিন্তু পরকে মারতে গেলে দরকার হয় ঢাল-তলোয়ারের।

(৫)

প্রসঙ্গতঃ দেখা যায়, এই সর্বজয়ী ত্রিকালজ্ঞ ঋষি দুর্বাসারও ঘটেছিল একবার পরাজয় সেই প্রথম জীবনে, কৃষ্ণাবতারেরও বহুপূর্বে, পরম-বিষ্ণুভক্ত রাজা অম্বরীষের কাছে[২]। কথা আছে—এঁর ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে, দিয়েছিলেন বিষ্ণু এঁকে আপন সুদর্শন-চক্র। ঋষি দুর্বাসা একদিন অম্বরীষের আতিথ্য গ্রহণ করেও সময় মত উপস্থিত হতে না পারায় ব্রতোপবাসী অম্বরীষ সমবেত ব্রাহ্মণদের উপদেশে পারণ আরম্ভ করতেই হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে ক্রুদ্ধ দুর্বাসা উদ্যত হয়েছিলেন তাঁর প্রাণনাশ করতে। কিন্তু সুদর্শন-চক্রে শুধুই যে তাঁর সে-চেষ্টা হয়েছিল ব্যর্থ তাই নয়, আপন প্রাণরক্ষার জন্য একে একে ব্রহ্মলোক শিবলোক বিষ্ণুলোক পর্যন্ত ছুটতে ছুটতে শেষপর্যন্ত বিষ্ণুর পরামর্শে বিষ্ণুভক্ত অম্বরীষেরই শরণ নিয়ে তবেই সে-যাত্রা তিনি পেয়েছিলেন রক্ষা! সে যাই হোক, একটু লক্ষ্য করলেই কিন্তু দেখা যায়, বিষ্ণুর আসন্ন নরলীলার প্রাক্কালে বিষ্ণুমাহাত্ম্য-সূচক পুরাণ সকলে শিবাংশ-সম্ভূত ঋষি দুর্বাসার এই পরাজয় কাহিনীটি বিবৃত করতে গিয়ে, সকল দেবতার মধ্যে বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ ও বিষ্ণু-ভক্তের গুণকীর্তনই ছিল পুরাণকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে এদিক দিয়েও ভেবে দেখলে মনে হয়, তপস্বী দুর্বাসারও সেকালে প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল বড় কম নয়। যাঁর পরাজয়ে হতে পারে স্বর্গে-মর্তে

১ কথা আছে—গোপিনীদের ছিলনা কোন দেহাত্মবোধ। তাই পায়ের ধুলোয় কৃষ্ণের অসুখ সারবে, উদ্ধবের মুখে একথা শুনতে পেয়েই অবলীলাক্রমে নাকি দিয়েছিলেন তাঁরা আপন আপন পায়ের ধুলো উদ্ধবের হাতে তুলে।

২ এখানেও কার্য-কারণ সম্বন্ধের অবতারণা করে বলা হয়েছে—দুর্বাসা-বন্ধুর ঋষি ঔর্বের অভিশাপের ফলেই নাকি ঘটেছিল এই পরাজয়।

বিষ্ণুমাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত,—যুগধর্ম প্রবর্তিত, তাঁকে শিব বা বিষ্ণু না বললেও, অন্ততঃ শিবতুল্য বিষ্ণুতুল্য ত বলতেই হয়! বাস্তবিকই, দুর্বাসা চরিত্রে ছিল জ্ঞান বা শক্তির এক অসাধারণ প্রকাশ। অনেক অলৌকিক শক্তিরই অধিকারী ছিলেন ঋষি দুর্বাসা। অনেককেই দেখা যায় তাঁর বরে লাভ করতে আপন আপন কাম্যবস্তু—এমনকি পাণ্ডব-জননী কুন্তীকেও। কিন্তু, কী আশ্চর্য! নিজের জন্য দেখা যায় না তাঁকে কখনও কিছু কামনা করতে। এর পরে আরও বলা যায়—নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ। ত্রিগুণের অতীত যাঁরা, তাঁদের পক্ষে বিধিই বা কি? আর নিষেধই বা কি? একথা বুঝতে না পেরেই, জ্ঞানমূর্তি শুকদেবকেও লোকে ছাড়েনি পাগল বলে উপহাস করতে! তাই, ত্রিগুণাতীত ঋষি দুর্বাসারও বিধিনিষেধের পারের যে আচরণ তারও তাৎপর্য বুঝে উঠতে না পেরে, তাঁকেও যদি কখনও উন্মাদ, কখনও বা অব্যবস্থিতচিত্ত বলে করা হয় ভুল, তাতেও আশ্চর্য হবার নেই কিছু!

(৬)

দুর্বাসাচরিত্রে কখনও কখনও দেখতে পাওয়া যায় যে ক্রোধের উন্মেষ, সে-কথায় এসে পড়ে—দুর্বাসারই মত আরও তিনজন ঋষির কথা যাঁদের অভিশাপেই নাকি হয়েছিল যদুবংশ ধ্বংস। এরা হলেন, বিশ্বামিত্র (যিনি আগে ছিলেন রাজর্ষি, পরে মহর্ষি ও অবশেষে ক্রোধ ত্যাগ করে হয়েছিলেন ব্রহ্মর্ষি), মহর্ষি কণ্ব (যাঁর পিতৃসুলভ স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায় শকুন্তলার উপাখ্যানে) আর দেবর্ষি নারদ (ভক্তবৎসল বলে রয়েছে যাঁর চার যুগে খ্যাতি)। এমন যে-সব ঋষি এঁদের অভিশাপে কৃষ্ণবংশ ধ্বংস হওয়ার কথাটাকে শুনতেও যেন লাগে কেমন বিসদৃশ! কিন্তু শাস্ত্রপুরাণ মানতে গেলে একথাটিও ত নিতেই হয় মেনে—তা এর অন্তর্নিহিত অর্থ যা'ই হোক না কেন। এ ছাড়া আরও আশ্চর্য এই যে, এঁরা সকলেই এসেছিলেন দ্বারকায় বসুদেবের নিমন্ত্রণে, আর নিজে কৃষ্ণই পাঠিয়েছিলেন এঁদের আপন পুত্র শাম্ব ও আর আর যদুকুলের ছেলেদের সাথে দেখা করতে। কাজেই, যদি এই সব ঋষিদের করতে হয় যদুকুল ধ্বংসের জন্য দায়ী, তবে ঘটনা-চক্র দেখে যা মনে হয়, তাতে যাদের স্বয়ং কৃষ্ণকেও বাদ দেওয়া চলে না সে দায়িত্ব থেকে। অথবা বলতে হয়—অন্তলীলায় এই সব মহর্ষিরাই হয়েছিলেন কৃষ্ণের স্বজনবধের লীলাসঙ্গী যেমনটি ছিলেন ব্রজগোপীরা ব্রজের আদি প্রেমলীলায়, আর ভীমার্জুনেরা ধর্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে মধ্য-লীলায়, দুষ্টের দমন ও ধর্মরাজ্য স্থাপনের বেলায়। তাই যদি হয়, যদি নটের গুরু কৃষ্ণচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব হয়ে থাকে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ—অবহেলায় স্বজননিধন তবে দুর্বাসা ও অপর আর ঋষিদের নিষ্কাম মনেও (কামনা প্রতিহত হয়ে ক্রোধের উদয় হওয়ার কথাটার চেয়ে) কেবল কৃষ্ণকার্য সাধনের জন্যই স্বার্থশূন্য ক্রোধের উদয় হওয়াটাই বেশী যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় নাকি? যে কামজয়ী, সহস্র কামিনীতেও যেমন নেই তাঁর কোন ভয়; তেমনি যে ক্রোধজয়ী, শতবার ক্রোধের আচরণ করেও হয় না তাঁর কোন ক্ষয়-ক্ষতি। ক্রোধের আগুনে জগৎ-সংসার পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও, হয় না তাঁর ঈশ্বর-স্বরূপতার কোন বিচ্যুতি! মনে হয়, এমনি কোন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই গড়া হয়েছে আমাদের শাস্ত্রে দুর্বাসার মত দুর্বোধ্য সব ঋষিচরিত্র।

এ ছাড়াও, শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অনুযায়ীই বলতে হয়, যে-অভিশাপের কথা নিয়ে এত কথা, সে-অভিশাপ দেওয়ার মত ক্ষমতা অথবা যোগ্যতাও লাভ হয় না যতক্ষণ না সাধক হতে পারে পুরোপুরি ক্রোধজয়ে সমর্থ। অসমর্থ অথবা অযোগ্য সাধকের পক্ষে ক্রোধবশে অভিশাপ দেওয়াটা হয়ে দাঁড়ায় তার নিজেরই পতনের কারণ যেমনটি হয়েছিল একবার

প্রথম জীবনে ঋষি বিশ্বামিত্রের ক্ষেত্রে, অথবা ঋষি দুর্বাসারও প্রথম অবস্থায়—যেমন দেখা যায় অম্বরীষ-উপাখ্যানে।

প্রসঙ্গক্রমে মনে এসে পড়ে শ্রীমৎ নরোত্তম দাসের 'কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নামে'র কথাটাও। যাঁর যেমন ভাব তাঁর মুখ দিয়ে ঠিক তেমন নামটিই উচ্চারণ করিয়েছেন নরোত্তম তাঁর সুমধুর কৃষ্ণ-কথায়। মনে হয়, ঋষি দুর্বাসার তাপস-হৃদয়ের শুকনো বালুস্তরের মাঝে লুকিয়ে ছিল যে প্রেম-প্রবাহ, কৃষ্ণভক্ত নরোত্তমের অন্তর্দৃষ্টির কাছে পারেনি তা আত্মগোপন করতে। তাই-ই বুঝি তাঁকে বলতে শোনা যায়—'ভক্তগণ নাম রাখে দেব জগন্নাথ। দুর্বাসা রাখেন নাম অনাথের নাথ॥' ভগবানকে যে জানে 'অনাথের নাথ' বলে, সে ত শুধু একজন নির্মম সাধকই নয়,—একজন পরম প্রেমিক ভক্তও বটে!

সাবিত্রী মন্ত্র

অধ্যাপক শ্রীশিবশম্ভু সরকার

অসহ এ রিক্ততার পরম পুণ্যতা
জীবনের কী দিল বারতা
কী কহিল কথা
—শুধু দিনযাপনের গুটি-গুটি নিরীহ শান্ততা—
অর্থহীন কথাচালা দরভরা বিরাট শূন্যতা!
নাহি ক্ষতি, নাহি গতি—
অচল অসাড়ে পরিণতি!
'লোক মান্তি' যায় যদি—তাই সাবধান।
প্রাণে সাধ—হবে পুণ্যবান—
তাই মাথাভাঙা শুদ্ধতার মাঝে
সূর্য উঠে—নিবে যায় সাঁঝে॥

চায় ক্ষোভ—বিপুল স্ফারণ
চূর্ণ হোক মূঢ় সংকোচন
চায় দাহ—প্রতপ্ত বিদার
বজ্র হানিবার—
উন্মত্ত মন্থন হোতে জীবন বন্যার
অসীম অজস্রতায়
বাহিরিবে প্রাণ আর ঘোষিবে মল্লার—
সৃজনের পাশাপাশি নাচিবে সংহার।
প্রাণের উৎভঙ্গ হোতে বিষ ও সুধার
নিত্য আস্বাদন
জীবনেরে করিবে জীবন!
—ঘুমন্তের দৃপ্ত জাগরণ
ভাঙিবে স্বপন
রিমিঝিমি সঙ্গীতের মুগ্ধ আলাপন
সাবিত্রীর নব উদ্ভাবণ॥

ভারতের অধ্যাত্মবাদ তথা সনাতনধর্ম

ডক্টর কৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়

'ধর্ম' কথাটি খুব ব্যাপক। 'ধর্ম' বলিতে শুধু 'অধ্যাত্মবাদ' বুঝায় না। সমস্ত ভৌতিক পদার্থ ও সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যকেই তাহাদের স্ব স্ব ধর্ম বলা যায়। তজ্জন্যই 'ধর্ম' মানে যাহা ধরিয়া রাখে,—কারণ বৈশিষ্ট্যই প্রতিটি পদার্থ, প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌কে বিশ্বে ও সমাজে তাহার স্থান নির্দেশ করিয়া দেয়। জলের ধর্ম 'শৈত্য', অগ্নির ধর্ম 'তাপ', চুম্বকের ধর্ম 'আকর্ষণ'—এইরূপ নানা প্রকার ধর্ম 'পদার্থে' রহিয়াছে। অপর দিকে প্রাণী ও উদ্ভিদের ধর্ম—জন্ম বৃদ্ধি প্রজনন বংশরক্ষা ও মৃত্যু।

মানুষ জীবশ্রেষ্ঠ। কারণ সে মননশীল এবং বিচারবুদ্ধিপরায়ণ। তাই মানুষের ধর্ম সত্যানুসন্ধান।

বিশ্বপ্রপঞ্চে নানাভাবে প্রকটিত খণ্ড শক্তির প্রকাশ দেখিয়া ভারতের বৈদিক যুগের ঋষিগণের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল: এই পরিবর্তনশীল ও নশ্বর সৃষ্টিলীলার পশ্চাতে কোন্ চরম 'সত্য' অপ্রকটিত রহিয়াছে যাহাকে জানিলে সমগ্র প্রকটিত শক্তির খণ্ড প্রকাশের কিছুই অবিদিত থাকে না? এই 'সত্য'কেই তাঁহারা 'ব্রহ্ম' বা 'আত্মা' বলিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রজ্ঞাসহায়ে অপরোক্ষানুভূতির দ্বারা 'ব্রহ্ম' তথা 'আত্মা'কে অখণ্ড 'সৎ' (সত্তা), অখণ্ড 'চিৎ' (চৈতন্য) ও অখণ্ড 'আনন্দ' রূপে উপলব্ধি করেন। ইহাই 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' উপলব্ধি। এই প্রজ্ঞাভূমিতে দাঁড়াইয়া তাঁহারা ঘোষণা করেন যে, মানব 'অমৃতের পুত্র' এবং এই সচ্চিদানন্দে মানবের রহিয়াছে সহজাত অধিকার। প্রতিটি মানবের স্বারাজ্যসিদ্ধি একসময়ে—ইহজন্মে বা জন্মান্তরে—অবশ্যই ঘটিবে (সনাতন ধর্মে জন্মান্তর স্বীকৃত এবং জন্ম ও মৃত্যু অবস্থান্তর মাত্র)। এই 'স্বে মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত হওয়াই জীবের চরম ও পরম লক্ষ্য। 'সাধনা' দ্বারা ঐ প্রাপ্তি ত্বরান্বিত হয়।

দৃশ্যমান জগতের সর্বত্র শক্তির —প্রকৃতির খেলা। যাহা 'প্রকৃতি' বলিয়া অভিহিত তাহার উৎস সেই চরম 'সত্য'—যিনি নিজে নিষ্ক্রিয়, অপ্রকটিত—কিন্তু যাঁহার কার্যকারিণী শক্তি প্রকটিতা হইয়া খণ্ড খণ্ড ক্রিয়া-শক্তিরূপে বিশ্বপ্রকৃতিতে প্রকাশ পাইতেছে। বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতির বিশ্লেষণ ও কার্যকারণ অনুসন্ধানদ্বারা প্রকৃতির শক্তিকে মানবের বিবিধ পার্থিব সুখসুবিধায় নিয়োজিত করিতেছেন। ইহাও 'সত্যানুসন্ধান',—কিন্তু ইহা 'সত্য'কে খণ্ডভাবে দেখা। পরন্তু 'সত্য'কে অখণ্ডভাবে উপলব্ধি করিলে এই নশ্বর জীবদেহ ও সৃষ্টিবৈচিত্র্যের ভিতর অবিনশ্বর অখণ্ড চৈতন্যের সন্ধান পাইয়া 'অমৃতে'র আস্বাদন লাভ করা যায় এবং নিরবচ্ছিন্ন 'আনন্দে'র অধিকারী হওয়া যায়। ইহাই আত্মজ্ঞান, অপরোক্ষানুভূতি ও ব্রাহ্মীস্থিতি। এই আনন্দের পথে অগ্রসর হওয়াই মানবধর্ম এবং ভারতের সনাতন শাস্ত্র অনুমোদিত সনাতন ধর্ম। ইহাই ভারতের অধ্যাত্মবাদ।

এখন প্রশ্ন জাগে: সমাজের সামগ্রিক কল্যাণে, ব্যাবহারিক দিক দিয়া এই আত্মজ্ঞানের, এই অধ্যাত্মবাদের কি কোনও সার্থকতা আছে? অবশ্যই আছে। এই আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কর্ম করিলে, ঐ কর্ম কর্তাকে ফলাকাঙ্ক্ষারহিত ও নির্লিপ্ত করিয়া দেয়। ইহাই শ্রীগীতায় ব্যাখ্যাত 'কর্ম'—'অকর্ম' বা 'বিকর্ম' নহে। এই প্রকার

কর্ম স্বার্থপরতা, বিদ্বেষ বা শত্রুতার জন্ম দেয় না। পরন্তু ইহা ব্যক্তি ও সমাজের যথার্থ কল্যাণ আনিয়া দেয়।

এখন পুনরায় প্রশ্ন উঠিতে পারে—ঐরূপে কর্ম করা কি সম্ভব? অবশ্যই সম্ভব,—কারণ প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ এইরূপ নিরাসক্ত. অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দুরূহ রাজকার্যসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতেন। উদাহরণস্বরূপ রাজর্ষি জনকের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। যদি বলা হয় কাব্যের উপাখ্যান কল্পনামাত্র, উহা কখনও ইতিহাসের মর্যাদা পাইতে পারে না,—তবে তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, সকল সাহিত্যেই সমকালীন সমাজব্যবস্থা রাষ্ট্রব্যবস্থা ইত্যাদি প্রতিফলিত হইয়া থাকে—কাজেই নৃপতিগণের ঐভাবে কর্ম সম্পাদনের নজীর না থাকিলে কাব্যে কখনই এইরূপ দৃষ্টান্ত স্থান পাইত না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভারতের অধ্যাত্মবাদ বা সনাতন ধর্ম মানবসমাজের কল্যাণের পথপ্রদর্শক। ইহা সকল প্রকার প্রগতির সহায়ক, প্রতিবন্ধক নহে। তাই ঋষির মুখে উচ্চারিত হয় 'চরৈবেতি'। দেবর্ষি নারদ আদি ঋষি সনৎকুমারের নিকট শান্তিলাভের আবেদন জানাইবার কালে, ঋষির প্রশ্নের উত্তরে স্বীয় অধীত বিদ্যার যে 'নির্ঘণ্ট' বা 'ফর্দ' দিয়াছেন, তাহাতে রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সাহিত্য, জ্যোতিষ, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি সবই স্থান পাইয়াছে। বিজ্ঞান-চর্চা নারদ ঋষির আত্মজ্ঞান লাভে প্রতিবন্ধক হয় নাই।

এখন কথা হইল, এই আত্মজ্ঞান লাভের উপায় বা পথ সম্বন্ধে সনাতনধর্মের অভিমত কি? সনাতনধর্ম বিশাল ও উদার। 'প্রকৃতি' ও 'আধার' ভেদে আত্মজ্ঞান লাভের বিভিন্ন 'মত' ও 'পথ'—যথা অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, অচিন্ত্যভেদাভেদ ইত্যাদি সনাতনধর্ম অনুমোদন করে।

কালের বিবর্তনের সাথে সাথে ভারতের সুমহান অধ্যাত্মবাদের উপর নানাপ্রকার আবরণ আসিয়াছে ঠিকই—কিন্তু আবরণ সরাইলেই 'সত্য' ভাস্বর ও প্রোজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয়। আমাদের 'সত্য' লইয়াই কারবার—আবরণ দেখিয়া ভ্রান্ত হইলে চলিবে না। বর্তমানে জাতির জীবনে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে চরম স্বার্থের হানাহানি ও ঘৃণ্য কলুষ ঝাঁকিয়া বসিয়াছে, তাহা দূর করিয়া জগতে শান্তি সমৃদ্ধি ও ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম একমাত্র ভারতের অধ্যাত্মবাদ, যাহার চরম লক্ষ্য আত্মজ্ঞান। এই জ্ঞানই আনে সমদর্শিতা—সবার ভিতর আত্মদর্শন। 'বহু' হইতে হয় 'একে' উত্তরণ—ভেদাভেদ দূরীভূত হয়। তখন আর প্রাচ্য পাশ্চাত্য, এদেশ ওদেশ কি করিয়া থাকে? সকলেই সকলের সহিত একাত্ম হইয়া যায়। ইহাই চরম সাম্যবাদ। হাজার হাজার বৎসর পূর্বে ভারতের ঋষিরা এই পরম সাম্যের গান গাহিয়াছিলেন। সেই পরম ক্ষণকেই বলা যায় মানবীয় সভ্যতার প্রথম সূর্যোদয়। এ যুগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল, ত্রিতাপ-ক্লিষ্ট মানবসমাজকে এই মহান্ আত্মতত্ত্বের অমৃতের আস্বাদন করাইবার জন্য। ভারতের প্রাচীনতম কাল হইতে তাঁহার আবির্ভাব কাল পর্যন্ত সর্বসিদ্ধি ও সকল অপরোক্ষানুভূতির তিনি ছিলেন ঘনীভূত বিগ্রহ। বর্তমানের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহাসঙ্কটের প্রাক্কালে তিনি আসিয়াছিলেন প্রেম শান্তি ও মৈত্রীর উৎস ভারতের মহাসঞ্জীবনী মহাজ্ঞান বা অধ্যাত্মবার্তা দিকে দিকে, দেশে দেশে ছড়াইয়া দিবার জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণের চিহ্নিত শিষ্য পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীগুরুর নির্দেশে এই বার্তা ভারতের

বাহিরে প্রথম প্রচার করেন এবং উত্তরকালে ভারতমাতার বিভিন্ন গৃহী ও সন্ন্যাসী মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রতিভাবান্ সন্তানগণ সেই আলোকবর্তিকা জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। বর্তমানে দেখা যাইতেছে,—ভোগক্লান্ত, হিংসাদ্বেষজর্জরিত বিভিন্ন দেশ ও জাতি পিপাসার্ত হৃদয়ে ভারতের অধ্যাত্মবাদের শরণ লইতেছে। ভারতের বেদান্ত পুরাণ রামায়ণ মহাভারত ক্রমবর্ধমান শ্রদ্ধাসহকারে বিদেশে সাদরে গৃহীত হইতেছে। বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতি স্বার্থপরতা হিংসা ও বিদ্বেষের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা কখনই স্থায়ী শান্তি আনিতে পারে না। ভারতীয় সাম্যবাদ ও সমদর্শিতায় উদ্বুদ্ধ না হইলে মানবজাতি শান্তি লাভ করিবে না। ভারতের অধ্যাত্মবাদ যে কোনও কল্পনাবিলাস নহে তাহা প্রাচীন ভারতের নৃপতি, সাধারণ গৃহী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মানুষের জীবনযাপন প্রণালীর ইতিবৃত্ত হইতে ভালভাবেই বোধগম্য হয়। মোট কথা, ভারতের 'অধ্যাত্মবাদ তথা সনাতনধর্মের অনুশীলনই 'শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান' আনিতে সক্ষম,—কারণ, প্রাচীনতম সভ্যতার আকর, এই সনাতন ধর্মের ঐতিহ্যই জগৎকে শুনায়—

'সর্বেষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ
সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু
মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ ভবেৎ॥'

চারণকবি বিজয়লালের অপ্রকাশিত কবিতা

ভবতাৎ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি

তোমাতে আমার প্রীতি হোক একমুখী।
ঈশ্বরে আমার প্রেম হোক অহৈতুকী
জন্মে জন্মে। আর কিছু করি না কামনা।
পুত্র-পৌত্র-বিত্ত-যশ—কিছুতে বাসনা
নাহি মোর। পাণ্ডিত্যেও নাহি প্রয়োজন।
অল্পে তো ভরে না হায় মানুষের মন!
ভূমার পিয়াসী সে যে! পুত্র অমৃতের!
করো মোরে বৈরাগ্যের দুর্গম পথের
যাত্রী তুমি। করো মোরে দুঃখ-ধনে ধনী।
দুঃখ-সিন্ধু-পারে যেতে একই তরণী
আছে শুধু! প্রেম, প্রেম, প্রেম সেই তরী।
ভক্তি-সুধা-রসে মোর হৃদয়-গাগরি
পূর্ণ করো। অবিচ্ছিন্ন তৈলধারা প্রায়
তোমারই ভাবনা থাক আমার চিন্তায়।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ স্মরণে

ডক্টর ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা

কোথাও রুক্ষতার লেশ নেই। প্রথম দৃষ্টিতেই নজরে পড়ত—অনাবিল শুভ্রতা। রেশমের মত আশ্চর্য শুভ্র কোমল অবিন্যস্ত পক্ককেশ—আর তারই পাশাপাশি, জরাহীন এক তারুণ্যোজ্জ্বল আনন। প্রথম দর্শনের সেই বিস্ময়, আর কখনো অনুভূত হবে না।

গত ৪ঠা ফেব্রুআরি মহাপ্রয়াণ ঘটেছে মহাবিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর। দীর্ঘ আশি বছর পরে তাঁর সঙ্গে লৌকিক বিচ্ছেদ ঘটল দেশের। বিচ্ছেদমাত্রেই বেদনার। সে বেদনা আরো গভীর, যখন তা ব্যষ্টি ছেড়ে সমষ্টিতে অনুভূত। একটি দেশের জীবনে, একটি জাতির জীবনে আনন্দের লগ্ন আসে, যখন একের কীর্তি জাতির গৌরব বহন করে আনে; একটি দেশের জীবনে, একটি জাতির জীবনে আবার পরম দুঃখের লগ্ন আসে, যখন একের বিচ্ছেদ সমষ্টির বিষাদে বেজে ওঠে। আচার্যের মহাপ্রয়াণ সেই জাতীয় দুঃখের দিন।

পরাধীন ভারতবর্ষে অবমাননার ও লাঞ্ছনার দিনগুলিতে যাঁরা কীর্তির স্বাক্ষরে স্বদেশকে গৌরবমণ্ডিত করেছিলেন, যাঁরা পরাধীন জাতির চিত্তে আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন নানা ক্ষেত্রে, সেই পুরোধাদের অনেকেই ছিলেন বাংলার। বাংলার সেই সব বরণীয় মানুষের স্মরণীয় নামগুলির প্রথম সারিতে ছিলেন রামমোহন বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ এবং বিজ্ঞানের ধারায় জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লচন্দ্র। পরে সে তালিকায় আরো যে ক'টি নাম যুক্ত হয়েছে, তার মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের নাম উজ্জ্বলতম। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির যে ধারাটি ক্ষীণ হয়ে এসেছিল সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের পর, আজ সেই স্বীকৃতির শেষ যোগসূত্রটি ছিন্ন হয়ে গেল সত্যেন্দ্রনাথের তিরোধানে। অদূর ভবিষ্যতের কথা দূরে থাক, সুদূর ভবিষ্যতেও সেই শূন্যস্থান পূরণের কোনো প্রতিশ্রুতি এই দুর্ভাগা দেশে বুঝি নেই! তাই আচার্যের শূন্যতার বেদনা আরো গভীর।

দেহান্তের মাত্র একমাস আগে সত্যেন্দ্রনাথের অশীতিতম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়েছে। উৎসারিত হয়েছে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ দেশবাসীর শ্রদ্ধা প্রীতি ভালোবাসা। এই বৎসর এখনো অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাঁর অবিস্মরণীয় বিজ্ঞানকীর্তি—'বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়নে'র সুবর্ণজয়ন্তী। এই অনুষ্ঠানগুলিতে তিনি আবার দীর্ঘদিন বাদে জনচিত্তে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলেন কীর্তির মহিমায়। তাঁর নিকট-সাহচর্য আবার আমরা লাভ করছিলাম, তাঁর জীবনসাধনার কথা আবার আমরা নতুন করে শুনছিলাম—এমন সময়েই অবসান ঘটল তাঁর মহাজীবনের। মহাজীবনের মহাপ্রয়াণ অবশ্যই শোকের, তবু স্বীকৃতি ও নবমূল্যায়নের গরিমায় ভাস্বর হয়ে তিনি তিরোহিত হলেন—এই্ই সান্ত্বনা।

নিজের জীবিতকালেই যিনি কিংবদন্তী, এমন মানুষের সংখ্যা বিরল। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন সেই বিরল শ্রেণীর মানুষ। মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন ও মহাকবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর নাম একত্রে যুক্ত হয়েছে দুর্লভ গৌরবে। আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর বিজ্ঞানকীর্তি কীর্তিত, আর রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সম্মাননায় ভূষিত করেছেন তাঁর অবিস্মরণীয় একমাত্র বিজ্ঞানগ্রন্থ 'বিশ্বপরিচয়ে'র উৎসর্গনামায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বাংলার চিত্তলোকের যে আশ্চর্য প্রকাশদীপ্তি, তা আজ ইতিহাসের সামগ্রী। সেখানে উদ্ভাসিত রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের মতো জ্যোতিষ্ক। সেদিনে প্রবাহিত সাহিত্য দর্শন ধর্ম প্রভৃতি নানা প্রবল প্রবাহিণীর পাশে, বিজ্ঞানের ধারাটি ছিল অবশ্যই ক্ষীণস্রোতা। তবু তারও উদ্বোধন ঘটেছিল জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের কীর্তিতে। আজকের স্বাধীন ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চার প্রচার ও প্রসার ঘটলেও, সেদিনের পরাধীন ভারতবর্ষে নানা প্রতিকূল পরিবেশে বিজ্ঞান সাধনার কীর্তি-স্তম্ভ রচনা সহজসাধ্য ছিল না। তবু তারই মধ্যে, একাধিক ভারতীয় ও বাঙালী বিজ্ঞানী প্রতিভার স্বাক্ষরে জয়মাল্য অর্জন করেছিলেন স্বদেশের এবং বিদেশের। রামানুজ, রমণ, মেঘনাদ সাহা এঁরা সসম্ভ্রম স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন বিশ্ববিজ্ঞানী মহলে, এবং দীপ্ততম নক্ষত্রের মতো অত্যুজ্জ্বল প্রতিভায় যিনি শীর্ষস্থানে সে স্বীকৃতি লাভ করেন তিনি আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ। সত্যেন্দ্রনাথের বিজ্ঞানকীর্তি অর্ধশতকেরও বেশী সময়কাল ধরে এবং নানা বিচিত্র বিজ্ঞানবৃত্তে। তাঁর সে কীর্তির পূর্ণমূল্যায়ন আজো সম্ভব হয়নি। যতো দিন যাচ্ছে, ততো তাঁর বিজ্ঞানকীর্তি সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে প্রসারিত হয়ে চলেছে।

প্রতিভার বীজ সুপ্ত ছিল তাঁর জন্মলগ্নেই। আর সে প্রতিভারই স্বাক্ষর তাঁর অত্যুজ্জ্বল ছাত্রজীবন। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পঞ্চমস্থান অধিকারের পর, আই. এস্‌সি. থেকে এম. এস্‌সি.— আর কোনো পরীক্ষায় দ্বিতীয় হননি সত্যেন্দ্রনাথ। অথচ এই সময় বিজ্ঞানজগতের পরবর্তী কালের নানা দিক্‌পাল প্রতিভাধরেরা ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের সহপাঠী। তবু এই মেধাবী প্রতিযোগীদের তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যেও সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম আসন ছিল অবিসংবাদিত।

ছাত্রজীবনের পর কর্মজীবনের শুরু সত্যেন্দ্রনাথের একেবারেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পদার্থ ও গণিত, উভয় বিভাগেরই অধ্যাপকরূপে (১৯১৬)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে সেদিন আধুনিক বিজ্ঞান-শিক্ষার ভিত্তিপত্তন করেছেন স্যার আশুতোষ। সেদিন তরুণ সত্যেন্দ্রনাথের সহযোগী, অধ্যাপক হয়ে এসেছিলেন আচার্য মেঘনাদ সাহাও। স্বাধীনচেতা সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষে বেশী দিন সম্ভব হয়নি এ শিক্ষকতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যোগ দিলেন, পদার্থবিদ্যার রীডার রূপে (১৯২১)। এইখানেই সূত্রপাত তাঁর জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞান-গবেষণার।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম মৌল গবেষণা মেঘনাদ সাহার সহযোগিতায়—'সাহা-বোস অবস্থা সমীকরণ' (Saha Bose Equation of State)। এর কিছু আগে আইনস্টাইনের যুগান্তকারী *আপেক্ষিক তত্ত্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল বিজ্ঞান*-জগতে। মেঘনাদ সাহা ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের সহযোগিতায় সত্যেন্দ্রনাথ আপেক্ষিক তত্ত্বের উপর একটি গ্রন্থ (Principle of Relativity) সম্পাদনা করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (১৯২০)। এটি আজো একটি প্রামাণিক গ্রন্থ।

১৯২৪ সালে সত্যেন্দ্রনাথ রচনা করলেন তাঁর সুবিখ্যাত 'প্লাংক সূত্র ও কোয়াণ্টাম প্রকল্প' সম্বন্ধে গবেষণাপত্রটি এবং প্রকাশের জন্য এ প্রবন্ধ পাঠালেন 'ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে'। অখ্যাতনামা এক বাঙালী অধ্যাপকের এ প্রবন্ধকে প্রকাশের গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি পত্রিকার কর্তৃপক্ষ। দুঃসাহসী সত্যেন্দ্রনাথ একটি পত্রসহ প্রবন্ধটি এবার পাঠালেন সোজাসুজি স্বয়ং আইনস্টাইনের কাছে মতামতের জন্য।

আইনস্টাইন শুধুমাত্র সচকিত হলেন না, স্বয়ং প্রবন্ধটিকে জর্মণ ভাষায় অনুবাদ করে টীকাসহ প্রকাশ করলেন 'ট্সাইটশ্রিফ্‌ট্ ফ্যুর ফিজিক্'এ। স্বয়ং আইনস্টাইনের অনুবাদ এবং মন্তব্য —'আমার মতে আধুনিক পদার্থবিদ্যার এক জটিল সমস্যার এ এক দ্যোতনাময় সমাধান।…প্লাংকের সূত্র প্রমাণে বোসের পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এখানে ব্যবহৃত পদ্ধতি, আদর্শ গ্যাসের কোয়ান্টামবাদে উপস্থিত করে যা আমি অন্যত্র দেখাব।'…

বসুর পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে, আদর্শ গ্যাসের কোয়ান্টামবাদের রূপ নিয়ে, আইনস্টাইন অনতিকালের মধ্যেই পরপর দুটি প্রবন্ধ রচনা করলেন ও প্রকাশ করলেন বার্লিনের বিজ্ঞান আকাদেমীর পত্রিকায়। এবং পরে আরো একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন—আদর্শ গ্যাসের সংশোধিত ধারণার উপর। এর আরো অনুবৃত্তিতে চলতে লাগল পরে প্লাংক ও শ্রয়ডিংগারের আলোচনা। বিজ্ঞানজগতে বসুর চারপাতার ছোট প্রবন্ধটি সেদিন যে যুগান্তকারী আলোড়ন তুলল, তা সেদিনের তরুণ বাঙালীকে অচিরেই এনে দিল বিশ্বব্যাপী খ্যাতি ও স্বীকৃতি।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে প্রস্তাব করেছিলেন তাঁর সংশোধিত তত্ত্ব ও শক্তি বণ্টনের সংখ্যায়ন, আলোককণা বা ফোটনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আইনস্টাইনের পরিবর্ধনায় দেখা গেল শক্তিবণ্টনের এ সংখ্যায়ন বস্তুকণার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বসুর প্রথম প্রস্তাবিত সংখ্যায়ন, 'বসু-সংখ্যায়ন' (Bose Statistics) ও পরিবর্ধিত রূপের সংখ্যায়ন 'বসু-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন' (Bose-Einstein Statistics) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে ইতিহাসে আর এই সূত্রেই ইতিহাসে চিরকালের মত যুক্ত হয়ে রয়েছে দুটি বরণীয় মানুষের স্মরণীয় নাম। এই বৎসর 'বসু-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন' প্রতিষ্ঠার সুবর্ণ-জয়ন্তী। এই উপলক্ষে নানা আলোচনার ও আচার্য বসুর সম্মাননায় নানা আয়োজন হয়েছিল।

এই সংখ্যায়নের পর, ফের্মি ও ডিরাক বসু-সংখ্যায়নের অনুপূরক আরেক সংখ্যায়ন প্রস্তাব করেন। এটি প্রখ্যাত—'ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন' নামে। আধুনিক পদার্থবিদ্যায় সব মৌল কণাগুলিই হয় 'বসু-সংখ্যায়ন', নয় 'ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন' অনুসরণ করে। যারা বসু-সংখ্যায়ন মেনে চলে তাদের 'বোসন' (Boson) এবং যারা ফের্মি-সংখ্যায়ন মেনে চলে তাদের 'ফের্মিয়ন' বলা হয়। দেখা গেছে যে, যে-মৌলকণার ঘূর্ণী (spin-value) শূন্য অথবা পূর্ণসংখ্যা, তারা বোসন এবং যাদের ঘূর্ণী ভগ্নাংশ বা তার গুণিতক, তারা ফের্মিয়ন। পৃথিবীতে মৌলকণা যতদিন থাকবে, ততদিন বোসন বহন করবে আচার্য বসুর নাম।

এ ছাড়া, সত্যেন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞান-কীর্তি—আইনস্টাইনের 'একীকৃত ক্ষেত্রবাদে'র (Unified Field Theory) ৬৪টি দুরূহ সমীকরণের সহজ সমাধান, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার সঙ্গে জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যায় (Astrophysics) গবেষণা, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের সঙ্গে D^2-সংখ্যায়নের ওপর গবেষণা, তরল হিলিয়মের প্রকৃতি নিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর প্রস্তাবিত তত্ত্ব (Bose-Einstein Condensation), কেলাসতত্ত্ব (Crystals) ও তাপস্বয়ংপ্রভতার (Thermo-luminescence) উপর গবেষণা এবং কিছু সাংগঠনিক রসায়নের (Structural Chemistry) উপর কাজ।

তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার বিজ্ঞানী হয়েও ফলিত পদার্থবিজ্ঞানে তাঁর উদ্ভাবিত কয়েকটি উন্নত যন্ত্র আজ গবেষণার বিশেষ সহায়ক। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাঁরই পরিকল্পিত 'মাইক্রো-ব্যালান্স' নামে গ্যাস পরিমাপের এক অতি সূক্ষ্ম

যন্ত্রের উদ্ভাবন। তাঁরই গবেষণায় ভারতে দুর্লভ ও মূল্যবান হিলিয়ম গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে ও তার উৎপাদন সম্ভব হতে চলেছে। বস্তুতঃ পদার্থ ও গণিতের বৃত্তের বাইরে বিজ্ঞানের সব শাখাতেই ছিল তাঁর গভীর অনুসন্ধিৎসা ও অনায়াস সঞ্চরণ। তাঁর মূল্যবান নির্দেশে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা নৃতত্ত্ব ভূবিদ্যা রসায়ন প্রভৃতিতেও উপকৃত হয়েছেন অনেক গবেষকই। আচার্য বসুর মূল গবেষণার সুদূরপ্রসারী ফলাফলের মূল্যায়ন আজো সম্ভব হয়নি। আজো ল্যাণ্ডাও প্রভৃতি নানা বিজ্ঞানীরা নানা নতুন আলোকে নতুন গবেষণা করে চলেছেন—তাঁরই তত্ত্বের ধারা অনুসরণে।

আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যাঁর নাম যুক্ত, মাদাম কুরীর গবেষণাগারে যাঁর শিক্ষানবিশী, প্লাংক-শ্রয়ডিংগার-ফের্মি-ডিরাকের সঙ্গে যাঁর প্রত্যক্ষ আদানপ্রদান, তাঁর কীর্তির নতুনতর স্বীকৃতি নিষ্প্রয়োজন। তবু সে স্বীকৃতি এসেছে বারংবার। এসেছে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির সদস্যপদে নির্বাচনে. এসেছে নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক ডক্টরেটে, এসেছে বিশ্বভারতীর দেশিকোত্তম সম্মাননায়, এসেছে পদ্মবিভূষণ উপাধিতে এবং সর্বশেষে ভারতের জাতীয় অধ্যাপকরূপে তাঁকে বরণে।

তবু শ্রুতকীর্তি সত্যেন্দ্রনাথের আড়ালে ছিলেন আরেক বিচিত্র সত্যেন্দ্রনাথ। তিনি মজলিশী সত্যেন্দ্রনাথ, খেয়ালী সত্যেন্দ্রনাথ। মেঘদূত থেকে এস্রাজের আলাপে তিনি আত্মমগ্ন, ফুল আর সঙ্গীতে তিনি আবিষ্ট, দাবা আর ক্যারামে তাঁর নিপুণ দক্ষতা। আর ছিল তাঁর জনলগ্নতা। কৈশোরের হেতুয়ার আড্ডা, পরে ঢাকার 'বারোজনা'র আসরের মজলিশ. 'বিচিত্রা'র সভা, 'সবুজপত্র' আর 'পরিচয়ে'র দপ্তর এবং শেষে 'কিশোর কল্যাণ পরিষদে'র শিশু কিশোরের আসর—সর্বত্রই যে তাঁর নিয়মিত উপস্থিতি, তাও সর্বজনবিদিত। বিজ্ঞানের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে, নানা ভাষা সাহিত্য ধর্ম দর্শন কলা শিল্প—মানব-মনীষার সব শাখাতেই ছিল তাঁর প্রগাঢ় বৈদগ্ধ্য, অবিশ্বাস্য অনায়াস দক্ষতা, অবাধ সঞ্চরণ।

সত্যেন্দ্রনাথের আরেক পরিচয়, দেশব্রতী সত্যেন্দ্রনাথ। সারাজীবন স্বদেশের কথা চিন্তা করেছেন তিনি। অনুশীলন সমিতির সঙ্গে ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। বহু বিপ্লবীকে গোপন সাহায্য ও নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছেন তিনি—সেই ইংরেজ শাসনের রুদ্র মধ্যাহ্নে। পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কালে, ত্রাণকার্যেও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল তাঁর। সমাজ সেবার নানা ক্ষেত্রে ছিল প্রত্যক্ষ যোগ ও সহানুভূতি। সেই দেশব্রতী সত্যেন্দ্রনাথ, তাঁর নিজের শেষ জন্মদিনে, তাঁর আদর্শ-দীক্ষার কথা উল্লেখ করেছিলেন 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে'র সভায়। বলেছিলেন প্রফুল্ল-চন্দ্রের কথা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ব্রতকে তিনি জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ব্যক্তিগত অর্থ সম্মান যশ প্রতিষ্ঠা নয়—বিজ্ঞানের প্রয়োগে স্বদেশের উন্নতি, এই-ই ছিল তাঁর জীবনস্বপ্ন, জীবনসাধনা। আর এ স্বপ্নের পরিপূরক হিসেবে, তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল দেশের বৈজ্ঞানিক শিল্পায়ন, ও মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের অনুশীলন। মানবতাবাদী সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন বিজ্ঞান মানুষের সত্য-অন্বেষণের একটি প্রক্রিয়া এবং মানুষের কল্যাণই বিজ্ঞানের প্রথম এবং শেষ লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথ জগদানন্দ রামেন্দ্রসুন্দর বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ধারাটির একদিন উদ্বোধন করেছিলেন। 'বিশ্বপরিচয়ে'র উৎসর্গনামায় রবীন্দ্রনাথ একদিন অনুপ্রেরিত করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথকে—বাংলা-ভাষায় বিজ্ঞানচর্চায়। চিন্তায় আচারে মননে নির্ভেজাল বাঙালী সত্যেন্দ্রনাথ সেই দায়িত্ব

আজীবন ভোলেননি। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি যৌবনেই। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ঢাকায় 'বিজ্ঞান পরিচয়' নামে বাংলা বিজ্ঞান-পত্রিকা। নিজে অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিলেন, দুরূহ আপেক্ষিক তত্ত্ব, 'পরিচয়' পত্রিকায়। স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে দুঃসাহসের সঙ্গে উচ্চতম ও জটিল বিজ্ঞানের বক্তৃতা দিয়েছেন বাংলায়। নিজের সারাজীবনে তিনি প্রমাণ করে গিয়েছেন তাঁর নিজেরই কথা: 'যাঁরা বলেন বাংলাভাষায় বিজ্ঞান হয় না, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান বোঝেন না।'

এই অকৃতার্থতার বেদনায় মর্মাহত সত্যেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ', প্রকাশ করেছিলেন 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অনলস কঠোর পরিশ্রম করেছেন তিনি এ দুটির জন্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি শিশুর মত নিরভিমান হয়ে বারংবার হস্ত প্রসারিত করেছিলেন দরিদ্র বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের তহবিলের জন্য। অনেক সমালোচনা, অনেক ব্যঙ্গ উপেক্ষা করে যত্রতত্র তিনি ছুটেছিলেন বাংলাভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের যৌক্তিকতাকে ব্যাখ্যা করতে। অথচ আজো পরিষদ ও পত্রিকা দুটিই সরকার ও জনগণের আনুকূল্য ও দাক্ষিণ্যের কৃপাকণা হতে প্রায় বঞ্চিত। আজো মাতৃভাষায় উচ্চতর বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের কোনো আয়োজন হয়নি। বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের মৌলিকগ্রন্থ, মৌলগবেষণা প্রকাশিত হয়নি। শিক্ষক শিক্ষার্থী রাষ্ট্রনায়কদের দৃষ্টিভংগীর কোনোই পরিবর্তন হয়নি।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর অবাস্তবায়িত স্বপ্নের বাস্তবায়নের দায়িত্ব রেখে গেছেন আমাদের ওপর। একদিন হয়ত তাঁর স্বপ্ন সার্থক হবে। সেদিন তাঁরই নাম, চিরকালের মতো আবার প্রথম হয়ে দেখা দেবে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের ইতিহাসে। সেই-ই হবে আমাদের তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন।

স্বাধীনচেতা সত্যেন্দ্রনাথ, অকুতোভয় সত্যেন্দ্রনাথ, কোনোদিন আপোষ করেননি অন্যায়ের সঙ্গে, অসত্যের সঙ্গে, অশুভের সঙ্গে। আইনস্টাইনের মৃত্যুর পর তিনি যা বলেছিলেন, সেকথা তাঁর সম্বন্ধে বলা চলে—

'Throughout his life he was a fearless exponent of what he believed to be true. His indomitable will never bowed and his love of Man often induced him to speak out unpalatable truths which were sometimes misunderstood.'

প্রচলিত আমলাতান্ত্রিক কাঠামোয় তাঁর মতো স্বাধীনচেতা আপোষহীন বিজ্ঞানীর কাছ থেকে যা আমাদের প্রাপ্য ছিল তা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। অনুকূল পরিবেশে তাঁর মতো বিজ্ঞানীর আরো অবদান, আরো সংগঠন হয়ত আমরা পেতে পারতাম। বঞ্চিত তিনিও—তাঁর যে স্বীকৃতি প্রাপ্য ছিল স্বাধীনদেশের কাছে, জনগণের কাছে, তার অল্পই তিনি পেয়েছেন। এমন কি তাঁর মৃত্যুতে একটি দিনের জন্য জাতীয় শোকও উদ্‌যাপিত হলো না, এমনই 'জাতীয় অধ্যাপকে'র সম্মাননা দিয়েছি আমরা তাঁকে!

অবশেষে অনাগত কালের কাছে রইল আরেক সত্যেন্দ্রনাথের জীবন। তিনি মানুষ সত্যেন্দ্রনাথ। যিনি ছিলেন ঋষির মতো নিরাসক্ত নির্লোভ নিরহংকার। যিনি ছিলেন সত্যধী স্থিতধী হৃদয়বান—কাছের মানুষ, যিনি রোগার্ত সতীর্থের সেবা নিজের হাতে করেছেন, ছাত্র এবং বন্ধুজনের আর্তির দিনে নিজে ছুটে গিয়েছেন, যিনি দুঃস্থকে সাহায্য করতে ব্যাংকে ওভারড্রাফট কেটেছেন। সেই সত্যেন্দ্রনাথের পরিচয় সাধারণ মানুষ জানেন না, জানার সুযোগ হয়নি তাঁর প্রচারবিমুখ নির্লিপ্ত

চরিত্রের জন্য।

সর্বধর্মের সমন্বয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণের যে মতবাদ পরিস্ফুট, সেই উদার মতবাদে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। আর ছিল তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা বিবেকানন্দের প্রতি। বিবেকানন্দ শতবর্ষ কমিটির সভায় তিনি নিয়মিত এসেছেন, বিবেকানন্দের ভাবধারার উপর বহু বক্তৃতায় তাঁর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। সাম্প্রতিক কালের অন্ধকার প্রহরগুলিতে, যখন গোলপার্কে স্বামীজীর মূর্তিতে কালিলেপন করা হয়েছিল, তখন অকুতোভয়ে তার প্রতিবাদ করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথই।

সত্যেন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ ব্যক্তি অসংখ্য। গুণমুগ্ধ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একদিন বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করেছিলেন 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যগ্রন্থ। নানা বিচিত্র সুরের একটি ছন্দোবদ্ধ সমন্বয়ের যে সুরসংহতি—তাই-ই অর্কেস্ট্রার ঐকতান। সত্যেন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনও ছিল অর্কেস্ট্রার মতোই নানা বিচিত্র সুরের একটি বিরল সমন্বয়। একটি সুষম সমে আজ তাঁর সমাপ্তি ঘটল—কিন্তু তার সুরের রেশ রেখে গেল চিরকালের জন্য।

আজ অবক্ষয়ের দিনে, মূল্যহীনতার দিনে, ভাঙন আর ঝড়ের অন্ধকার দিনে—যত্রতত্র শুধুই ভাঙাচোরা মানুষের মিছিলের মাঝে এক অখণ্ড মহাজীবনের প্রতীক, পথের দিশারী এই উত্তুঙ্গ আলোকস্তম্ভের দিকে তাকিয়ে আমাদের বিস্ময়ের আর পরিসীমা থাকে না। তাঁকে প্রণাম—বারংবার প্রণাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সংগীত

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

[খাম্বাজ—একতাল (আভোগ—খেমটা)]

'খণ্ডন' তরে 'ভববন্ধন' জাগালে এবার ভবতারিণীরে ;
শ্রীমায়ে তাঁহার বোধন করিলে, ষোড়শীরূপেতে পূজি জননীরে ॥
মন্দিরে যিনি মা ভবতারিণী
নহবতে তিনি মা সারদামণি
ঠাকুর ! তোমার মুখে ইহা শুনি,' কত আশা আজি জাগে অন্তরে ॥

'মাতৃভাব' তব সবার উপরে　　বিকাশিতে ভবে রেখে গেলে তাঁরে
আবার কহিলে, 'মা বলে ডাকিলে ভক্তি ভালবাসা হয়' যে অচিরে।
হে রামকৃষ্ণ ! যুগ-কল্যাণে
যুগজননীরে আনিলে ভুবনে
বিবেকানন্দ নিনাদে সঘনে, 'জয় দোঁহাকার' প্রণত শিরে ॥

আবেদন ঃ বলরাম মন্দির

কলিকাতা বাগবাজার অঞ্চলে ৫৭ রামকান্ত বসু স্ট্রীটে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ বলরাম বসুর বাসভবনটি শতাধিকবার শ্রীরামকৃষ্ণের পদধূলিপূত। কলিকাতায় রাত্রিবাস করিতে হইলে এখানেই তিনি থাকিতেন; দোতলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ঘরটিতে থাকিতেন, ভক্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন তৎসংলগ্ন হলঘরটিতে। বাড়ীটি এখন বলরাম মন্দির নামে সুপরিচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির স্বল্পকাল পরে তাঁহার দেহাবশেষ কাশীপুর উদ্যানবাটী হইতে এখানে আনীত হইয়া তিনি যে ঘরটিতে থাকিতেন সেখানে স্থাপিত ও নিত্য পূজিত হইত। (বরাহনগর মঠ হইলে বলরাম মন্দির হইতে উহা সেখানে লইয়া যাওয়া হয়।)

শ্রীশ্রীমা এই সময় সপ্তাহকাল এবং পরে বিভিন্ন উপলক্ষে বহুবার বলরাম মন্দিরে বাস করিয়াছেন।

এখানকার যে হলঘরটিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন সেখানে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে স্বামী বিবেকানন্দ 'রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোসিয়েশন' (অধুনা রামকৃষ্ণ মিশন নামে সুপরিচিত) প্রতিষ্ঠা করেন। এই উপলক্ষে কিছুদিন এবং পরেও কয়েকবার স্বামী বিবেকানন্দ এখানে বাস করিয়াছেন। এই হলঘরটিতেই ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ শে জুলাই স্বামী প্রেমানন্দ এবং ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল স্বামী ব্রহ্মানন্দ দেহত্যাগ করেন। এই বলরাম মন্দিরের একতলার দক্ষিণপূর্ব কোণের ঘরটিতে স্বামী অদ্ভুতানন্দ প্রায় দশ বৎসর বাস করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য সন্ন্যাসিসন্তানগণও বিভিন্ন সময়ে এখানে আসিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের এইরূপ বহুস্মৃতি-বিজড়িত এই বলরাম মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য বলরামবাবুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসুর ইচ্ছানুসারে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ একটি ট্রাস্ট ডীড করা হয়। বলরাম মন্দিরে ধর্মসভাদির অনুষ্ঠান, রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য পরিচালনা প্রভৃতির সহিত বেলুড় মঠের ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু সভ্যদের এখানে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও এই ট্রাস্ট ডীডের অন্তর্ভুক্ত। তদনুসারে ট্রাস্টীগণ পঁচিশ বৎসরাধিককাল পূর্বে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে ঘরে থাকিতেন সেখানে তাঁহার একখানি প্রতিকৃতি স্থাপন করিয়া নিত্যপূজার এবং হলঘরটিতে নিয়মিত ধর্মসভাদির ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন। রথের দিন শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম মন্দিরের সদরমহলের চকমিলান বারান্দায় রথ টানিতেন; রথে শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি প্রতিকৃতি স্থাপন করিয়া প্রতিবৎসর ঐদিন সেখানে রথটানাও হইয়া আসিতেছে।

বর্তমানে বলরাম মন্দিরের সদরমহলটি একটি পূর্ণাঙ্গ আশ্রম এবং রামকৃষ্ণ মিশনের একটি সেবাকেন্দ্র।

এইরূপ একটি পবিত্র ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রায় দুই শত বৎসরের পুরাতন এই বাড়ীটি একেবারে জরাজীর্ণ হইয়াছে ; ইহার আশু সংস্কার প্রয়োজন। ট্রাস্ট ডীডের বৈধতা লইয়া প্রশ্ন উঠায় ট্রাস্টীরা এতদিন এ বিষয়ে কিছু করিতে পারেন নাই। এই বৈধতা লইয়া মামলা চলিতেছিল। সুখের বিষয় গত ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুআরি মামলাটির নিষ্পত্তি হইয়াছে—ট্রাস্ট ডীডের বৈধতা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার পরই ট্রাস্টীরা বাড়ী মেরামতের কাজে হাত দিয়াছেন এবং কয়েকজন সহৃদয় ভক্তের অর্থসাহায্যে সামান্য মেরামতও করিয়াছেন। কিন্তু অভিজ্ঞ স্থপতিদের মতে বাড়ীটিকে প্রায় নূতনের মতো করিয়া মেরামত করিতে হইবে। এজন্য প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। তাছাড়া, মন্দির ও হলঘরটিকে যথাযথভাবে সাজানোগোছানো, অধিকতর সংখ্যক লোক যাহাতে ধর্মসভাদিতে যোগদান করিতে পারেন, অনুষ্ঠানগুলি যাহাতে আরো বড় করিয়া করা যায়, আরো অধিকসংখ্যক সাধু যাহাতে বলরাম মন্দিরে বাস করিতে পারেন—এসবের ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্যও যথেষ্ট অর্থ প্রয়োজন।

এইসব কাজের জন্য কমপক্ষে ৫,০০,০০০৲ টাকা প্রয়োজন। আশ্রমের দৈনন্দিন খরচ বাবদও মাসে প্রায় ২,০০০৲ টাকা প্রয়োজন।

সহৃদয় জনসাধারণের নিকট আবেদন—তাঁহারা যেন এই কাজে মুক্তহস্তে দান করেন। ট্রাস্টীদের হাতে প্রায় কিছুই নাই, সাধারণের দানই একমাত্র অবলম্বন। সর্ববিধ দানই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের সহিত গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। "BALARAM MANDIR" এই নামে চেক লিখিবেন। নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় অর্থাদি পাঠাইতে পারেন :

১। বলরাম মন্দির, ৫৭ রামকান্ত বসু স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৩
২। রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ, হাওড়া (পশ্চিমবঙ্গ)

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ
(অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ)
স্বামী গম্ভীরানন্দ
(সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন)
স্বামী নির্বাণানন্দ
স্বামী অভয়ানন্দ
স্বামী কৈলাসানন্দ

বলরাম মন্দির
৫৭ রামকান্ত বসু স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০৩
১লা মে, ১৯৭৪

সমালোচনা

শেলা রামকৃষ্ণ মিশন সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা। প্রকাশক: স্বামী গোকুলানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন, চেরাপুঞ্জী। ১৯৭৪, পৃঃ ৭৭।

১৯শে মার্চ ১৯৭৪, শেলা রামকৃষ্ণ মিশনের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে এই স্মরণিকাটি প্রকাশিত হয়। ইহা পাঠে চেরাপুঞ্জী রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত বর্দ্ধিষ্ণু শেলা গ্রাম ও সংলগ্ন খাসিয়া পার্বত্য অঞ্চলে মিশনের জনহিতকর কার্যাবলীর তথ্যসকল আদ্যোপান্ত জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

নিঃস্বার্থ জনসেবার কার্য যে শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সাফল্য অর্জন করে তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন এই শেলার আশ্রম। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে অবিস্মরণীয়-কীর্তি কেতকী মহারাজ একক চেষ্টায় যে সেবাকার্যের সূত্রপাত করিয়াছিলেন তাহাই আজ ৫০ বৎসর পরে বিপুল আকার ধারণ করিয়াছে এবং খাসিয়া ও জয়ন্তী পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতি জনগণের শিক্ষা ও প্রগতির সর্ববিধ দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে। উপরন্তু উপজাতীয় নরনারীকে তাহাদের স্বকীয় ধর্ম ও কৃষ্টি অব্যাহত রাখিতে সাহায্য করিয়াছে।

পত্রিকাটির ইংরেজী, বাংলা ও খাসিয়া ভাষার রচনাবলী বিশেষ আকর্ষণীয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর আশীর্বাণী ইংরেজী ও খাসিয়া ভাষায় সন্নিবেশিত। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দজীরও শুভেচ্ছা অনুরূপভাবে মুদ্রিত। অধিকন্তু রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী, মেঘালয়ের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী এবং চণ্ডীগড় রাজভবন হইতে শ্রী এম্. এম্. চৌধুরী প্রভৃতির শুভেচ্ছা ও বাণী ইংরেজী ও খাসিয়া উভয় ভাষায় সন্নিবেশিত হওয়াতে পত্রিকাটির আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রচ্ছদপট সুদৃশ্য ও সুপরিকল্পিত। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদামণিদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের ছবি পত্রিকার শোভাবর্ধন করিয়াছে।

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয় পত্রিকা (১৯৭৩-৭৪)। সম্পাদক: শ্রীহৃষীকেশ চক্রবর্তী, ১০৬ নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া। পৃঃ ১০+৫০।

পত্রিকাটির অঙ্গসজ্জা সুরুচির পরিচায়ক। সম্পাদকের লেখায় বিদ্যালয়ের ক্রমোন্নতি সুপরিস্ফুট। কবিতা প্রবন্ধ জীবন-কথা প্রভৃতি রচনা বিদ্যার্থিবৃন্দের সাহিত্য-প্রীতির পরিচায়ক এবং ভবিষ্যৎসম্ভাবনাসূচক। 'বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে বর্তমান ভারত' প্রবন্ধটি প্রাণরসে সঞ্জীবিত। 'প্রশ্ন' কবিতাটি সুন্দর। 'মহাপুরুষ'-শীর্ষক জীবনকথা ছাত্রদিগকে উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত করিবে। শিক্ষকগণের প্রবন্ধাবলী সুচিন্তিত ও তথ্যপূর্ণ। 'অতীতের পৃথিবী' বিজ্ঞান-নিবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। 'পদার্থ ও ইহার গঠন'-নিবন্ধটিতে কয়েকটি মারাত্মক ছাপার ভুল চোখে পড়িল। এই বিদ্যালয়ে সহপাঠ্যসূচীর প্রায় সকল প্রকার আয়োজন দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। অদূর ভবিষ্যতে একটি বিজ্ঞান-সমিতি গঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কথামৃত, মায়ের প্রসাদ, বিবেকমন্ত্র-এর সংকলন সুচিন্তিত। সমগ্র পত্রিকাটি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাব-পরিমণ্ডলের পরিচয়বাহী। প্রচ্ছদ-পটে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের বাণী সুনির্বাচিত।

শ্রীবাসুদেব সিংহ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

ভিত্তিস্থাপন

গত ২০শে জুন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রস্তাবিত সম্প্রসারণাংশের ভিত্তিস্থাপন করেন। নূতন গৃহ নির্মাণ ও অত্যাবশ্যক সাজসরঞ্জাম বাবদ প্রকল্পটিতে আনুমানিক চার লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

দ্বারোদ্‌ঘাটন

গত ৪ঠা জুন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী ত্রিবান্দ্রাম রামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত হাসপাতালের বহির্বিভাগের নূতন ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। কেরল প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রী এন. এন্. ওয়াঞ্চু উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

কার্যবিবরণী

বেলঘরিয়া: রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থিভবন।

স্বামীজীর শিক্ষাদর্শকে ভিত্তি করিয়া কলেজের ছাত্রদের জন্য স্বামী নির্বেদানন্দ কর্তৃক ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান যুগোপযোগী আবাসিক বিদ্যার্থি-ভবনটি স্থাপিত হয় এবং নানা প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করিয়া উহা বর্তমানে ২৪ পরগণার বেলঘরিয়ায় বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের ১৯৭২-৭৩ সালের কার্যবিবরণীর সারসংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হইল:

অবতার ও মহাপুরুষদিগের জন্মদিবস পালিত হয়। জাতির নেতাদের স্মৃতিসভা ও স্বাধীনতা দিবস এবং সাধারণতন্ত্র দিবসও উদ্‌যাপিত হয়।

বিদ্যার্থি-ভবনের গ্রন্থাগারে ৩৪০০ পুস্তক ছাত্রদিগের পাঠের জন্য রক্ষিত আছে। ইহা ছাড়া একটি পাঠ্যপুস্তক বিভাগ আছে—পাঠ্য-পুস্তক ২৭০০। পাঠাগারে কিছুসংখ্যক শিক্ষা সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা এবং সব দৈনিক সংবাদপত্র রাখা হয়।

বিদ্যার্থীদিগের পরিচালনায় হস্ত-লিখিত একখানি সাময়িক পত্র 'বিদ্যার্থী' নামে বাহির করা হয়। তাহাদিগকে শিক্ষামূলক পরিভ্রমণের জন্যও লইয়া যাওয়া হয়। ব্যায়ামাগার, প্রশস্ত উন্মুক্ত ময়দান এবং সন্তরণ-শিক্ষা ও স্নানাদির জন্য পুষ্করিণী ও দীর্ঘাকার ঝিল আছে।

আলোচ্য বর্ষে বিদ্যার্থীর সংখ্যা ছিল ১০৩, তন্মধ্যে ৭৫ জন বিনা-খরচায় ও ১১ জন আংশিক খরচায় থাকিবার সুযোগ লাভ করে।

আলোচ্য বর্ষে পরীক্ষোত্তীর্ণের সংখ্যা ৯০%, তন্মধ্যে ৯ জন প্রথম শ্রেণী লাভ করিয়াছে এবং একজন প্রথম শ্রেণীতে এম্. এ. পাশ করে।

প্রশস্ত বিবেকানন্দ শতবর্ষ জয়ন্তী ভবনের সভাগৃহে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আলোচনাদিতে বিদ্যার্থী ব্যতিরেকে সর্বসাধারণও যোগদান করে।

এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত একটি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত শিল্পপীঠ আছে। ইহাতে সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক কারিগরি বিদ্যা ত্রৈবার্ষিক ডিপ্লোমা প্রাপ্তি পর্যায়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে স্কুলফাইন্যাল বা সমপর্যায়ের মানের পরীক্ষায় পাশ করা ছাত্রদের ভর্তি করা হয়।

বিদ্যার্থীদের মধ্যে যাহাতে নেতৃত্বের বিকাশ, শ্রমমর্যাদাজ্ঞান এবং চরিত্রগঠন ও আত্মপ্রত্যয় জাগরিত হয়, পরিচালক সন্ন্যাসিবৃন্দ সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখেন।

উৎসব

ফিজি : গত ৭ই জুন রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ফিজির গভর্ণর জেনারল Ratu Sir George K. Cakobau রজত জয়ন্তী স্মারক ভবনের ভিত্তি-ফলকের' আবরণ উন্মোচিত করেন এবং Adi Lady Cakobau পুরস্কারসমূহ বিতরণ করেন।

বলরাম মন্দির (কলিকাতা) **:** গত ২১শে জুন, শুক্রবার বলরাম মন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব যথারীতি উদ্‌যাপিত হয়। পূর্বাহ্নে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয় ও অপরাহ্নে বলরাম মন্দিরের দ্বিতলের অলিন্দে রথ টানা হয়। বিশেষ উল্লেখ্য এই যে, এইস্থানে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং রথরজ্জু আকর্ষণ করিতেন এবং দিব্য কীর্তন ও নৃত্যে মাতিয়া উঠিতেন। স্মরণীয় এই বিশেষ দিনে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ উপস্থিত থাকেন ও রথ টানেন। প্রায় আট শতাধিক ভক্ত নরনারী এই রথোৎসবে উপস্থিত হইয়া ভক্তি-বিনম্রচিত্তে রথ টানেন ও ভজন কীর্তন করেন। ভক্তদের হাতে হাতে প্রসাদ বিতরিত হয়।

আলমোড়া : রামকৃষ্ণ কুটিরের স্বামী তুরীয়ানন্দ লাইব্রেরী হলে গত ১৯শে মে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে একটি সভার অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। সভানেত্রী ছিলেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ৺বশীশ্বর সেন মহাশয়ের পত্নী Mrs. Gertrude Emerson Sen। সভার প্রারম্ভে বৈদিক শান্তি-পাঠ করেন স্বামী অমৃতানন্দ ও শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ সিংহ। পরে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে স্বামী অমৃতানন্দ ইংরেজীতে ও শ্রীউমেশচন্দ্র পাণ্ডে হিন্দীতে ভাষণ দেন। স্বামী জয়ানন্দের ভাষণের পরে সভানেত্রী তাঁহার স্বামী বশীশ্বর সেন মহাশয়ের নিকট স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁহার প্রথম শিষ্য স্বামী সদানন্দ মহারাজের সম্পর্কে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা বলিয়া তাঁহার অভিভাষণ সমাপ্ত করেন। সমাপ্তি সঙ্গীতের পর প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, **স্বামী ঈশানানন্দ** গত ৫ই জুন, বৈকাল প্রায় ৪টায় বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে অকস্মাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের বিকলতাহেতু দেহত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কোয়ালপাড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে যোগদান করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের নিকট তিনি সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। তাঁহার সংঘজীবনের অধিকাংশ কাল জয়রামবাটী কোয়ালপাড়া ও বাগবাজার মঠে অতিবাহিত হয়। কিছুকালের জন্য তিনি কামারপুকুর কেন্দ্রের অধ্যক্ষতা করেন। বেলুড় মঠে এবং দেওঘর ও বারাণসী কেন্দ্রেও তিনি কর্মিরূপে ছিলেন।

সুদীর্ঘ এগার বৎসর (১৯০৯-১৯২০ খ্রীঃ) তিনি শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যলাভের দুর্লভ সুযোগ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' গ্রন্থে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিচারণা করিয়াছেন। ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে তাঁহার রচিত 'মাতৃ-সান্নিধ্যে'-গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য স্মৃতিকথা পরিবেশন করিয়া তিনি অসংখ্য ভক্ত নরনারীকে পরিতৃপ্ত করিয়া গিয়াছেন।

কাশীপ্রাপ্তিতে তাঁহার দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

কল্যাণী : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসংঘের উদ্যোগে গত ২৮শে ফেব্রুআরি, ১লা, ২রা ও ৩রা মার্চ ১৯৭৪, ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৩৯তম শুভ আবির্ভাব-উৎসব আনন্দময় পরিবেশে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

২৮শে ফেব্রুআরি মঙ্গলারতির পরে স্বামী একান্তানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করেন। অপরাহ্নে স্বামী প্রত্যয়ানন্দ ধর্মালোচনা সভায় ভাষণ দেন। সন্ধ্যারতির পরে ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

১লা মার্চ কল্যাণী সারদাসমিতির সভ্যাবৃন্দ ভজন করেন। বৈকালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসংঘ পরিচালিত বিবেকবাহিনী ও অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল (বাগমোড় শাখা) বিবেকবাহিনী কর্তৃক খেলাধূলা ও আবৃত্তি অনুষ্ঠিত হয় এবং ডঃ এস. পি. মাইতি পুরস্কার বিতরণ করেন। পরে শ্রীশ্রীসারদামায়ের জীবনী আলোচনা ও চাকদহ সারদা সংঘ কর্তৃক গানে ও কথায় শ্রীশ্রীচণ্ডী গীত হয়।

২রা মার্চ মঙ্গলারতির পরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতিসহ পথ-পরিক্রমা করা হয়। বৈকালে জনসভায় সর্বশ্রী বীরেন্দ্রমোহন আচার্য, নবনীহরণ মুখোপাধ্যায় ও বিমল ঘোষ ভাষণ দেন। সন্ধ্যারতির পরে শ্রীসুধীর কুমার রায় চৌধুরী রামায়ণ গান করেন।

৩রা মার্চ মঙ্গলারতির পরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতিসহ শোভাযাত্রা বাহির হয়। দ্বিপ্রহরে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বৈকালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসংঘ ভজন করেন ও জনসভায় ডঃ সুধাংশুভূষণ চট্টোপাধ্যায় ভাষণ দেন। সন্ধ্যারতির পরে নৌকাবিলাস কীর্তন হয়।

কল্যাচক : শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির উদ্যোগে বার্ষিক রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব গত ২৪শে ফেব্রুআরি সেবাসমিতির শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে ভক্তগণ কর্তৃক পূজা পাঠ ভজন ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে প্রতিপালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ২রা মার্চ সুভাষ শিল্প-ভারতীয় কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভবনে ছাত্রছাত্রী-সমাবেশে সমবেত প্রার্থনান্তে ঐ বিদ্যাভবনের শিক্ষক শ্রীসুনীল কুমার সাহু মহাশয় স্বামীজীর জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন।

৩রা মার্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা হোম চণ্ডীপাঠ ও প্রসাদ বিতরণ হয়। সান্ধ্য সভায় স্বামী সুতীর্থানন্দ (সভাপতি) শ্রীজ্যোতির্ময় নন্দ ও শ্রীলক্ষ্মীকান্ত দাস শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও বাণীর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। উদ্বোধন ও সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীবিমলকুমার মাইতি। অনুষ্ঠানান্তে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে জনশিক্ষা

গত ৩০শে মে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হইতে একটি উপগ্রহ উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে, যাহার কাজ হইবে জনশিক্ষার জন্য শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি প্রভৃতি বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার—যাহা বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া টেলিভিশনে ধরা যাইবে। যুক্তরাষ্ট্র এই উপগ্রহটি একবৎসর ব্যবহার করিবার পর ভারতকে এক বৎসরের জন্য ধার দিবে। আশা করা যাইতেছে, ১৯৭৭ সালে ভারত নিজেই এরূপ উপগ্রহ উৎক্ষেপ করিতে পারিবে।

এই উপগ্রহের সম্পূর্ণ নাম—অ্যাপলিকেশন্‌স্ টেক্‌নোলজি স্যাটেলাইট, সংক্ষেপে "এটিএস্"। এটি মানুষের তৈরি একটি কৃত্রিম যোগাযোগ উপগ্রহ, যাহার মাধ্যমে এই ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যবহারিক প্রয়োগ করিয়া তাহার প্রযুক্তিগত কার্যকারিতা যাচাই করিয়া দেখা যাইবে।

ভারতের ক্ষেত্রে এইরূপ একটি প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। সমগ্র দেশে যোগাযোগের ক্ষেত্রে তিনটি বাধা রহিয়াছে,—প্রথম দুর্গমতা। ভারত এক বিরাট দেশ, এই বিরাটত্বই একটা প্রতিকূল অবস্থা। যোগাযোগের বা ভাব আদান-প্রদানের দ্বিতীয় সমস্যা—নিরক্ষরতা। আমাদের দেশের শতকরা সত্তর জন মানুষ পড়িতে বা লিখিতে জানেন না। তৃতীয় সমস্যা—দূর-দুরান্তরে কর্মক্ষেত্রে গিয়া কাজ করিবার মত লোকের অপ্রতুলতা। উপগ্রহের মাধ্যমে ঐ তিনটি প্রতিকূলতাকে অনায়াসে দূর করা যাইবে।

ভারতের অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের ওপর টেলিভিশনের উপযোগিতা নিঃসন্দেহে রহিয়াছে। ভারতের শতকরা মাত্র চল্লিশজন ছেলেমেয়ে পঞ্চম-মান পর্যন্ত পড়িতে পারে, অনেকেই আবার মাঝপথে স্কুল ছাড়িয়া দেয়। উপগ্রহের মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা চালু হইলে শিক্ষকদের সুবিধা হইবে, ছোটদের কাছে শিক্ষাও চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিবে।

কৃত্রিম উপগ্রহকে সার্থকভাবে কাজে লাগাইতে গেলে ভারতকে যে খরচের ধাক্কা সামলাইতে হইত, এক্ষেত্রে তার মাত্র শতকরা দশ হইতে কুড়ি ভাগ অর্থ বিনিয়োগ করিলেই চলিবে বলিয়া মনে হয়।

সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার সহজ বিধানগুলিও এর মাধ্যমে গ্রামের মানুষের কাছে প্রচার করা যাইবে। পুষ্টিকর সুষম খাদ্যের কথা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয়তা, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি শিখাইতে পারা যাইবে।

এই সকল কারণে শিক্ষা প্রসারে "এটিএস্"-এর ন্যায় উপগ্রহ ভারতের নিজস্ব থাকা দরকার। আমরা সেই শুভদিনের দিকে চাহিয়া থাকিব।

[মার্কিন বার্তা, নং ২০।৭৪]

সবচেয়ে শক্তিশালী ইলেক্‌ট্রন মাইক্রোস্কোপ

মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন রসায়নবিদ্ নতুন ধরনের একটি ইলেক্‌ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করেছেন। এই অণুবীক্ষণের সাহায্যে কোনও বস্তুকে ৫০ কোটি গুণ বড় করে দেখানো যায়। একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে পরিবৃত করে থাকে যে তথাকথিত ইলেক্‌ট্রন মেঘ, সেই ইলেক্‌ট্রনের ঘনত্ব পরিদৃশ্যমান হয় দুই পর্যায়ের এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে। চলতি ধরনের ইলেক্‌ট্রন মাইক্রোস্কোপগুলি দিয়ে এক-একটি পরমাণুর চেহারা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু তারা পরমাণুর প্রকৃত আয়তন বা ইলেক্‌ট্রন মেঘ কীভাবে ছড়িয়ে আছে তা দেখাতে পারেনি।

[মার্কিন বার্তা, নং ২২।৭৪]

পরলোকে প্রমোদকুমার সেন

শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য, একান্ত নিষ্ঠাবান্ ভক্ত প্রমোদকুমার সেন গত ১২ই মে ১৯৭৪, রাত্রি ৯-৩৫ মিনিটে প্রায় ৮৭ বৎসর বয়সে তাঁহার বারুইপুরের গৃহে পরলোকগমন করেন।

কিছুকাল বেলুড় মঠে থাকিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানগণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। তাঁহার নির্মল স্বভাব, ভক্তি ও সেবাপরায়ণতা সকলকে মুগ্ধ করিত। শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার আত্মার সদ্‌গতি কামনা করি।

দিব্য বাণী

বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ

পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।

পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ

কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥

—মধুসূদন সরস্বতী : গীতাটীকা, ১৮শ অধ্যায়

বংশীবিভূষিত কর কান্তি নবজলধর

পীতাম্বর, অধরোষ্ঠ বিম্বফল মানি,

রাকাচন্দ্রসমানন পদ্মসম দু'নয়ন

কৃষ্ণ হতে পরতত্ত্ব কিছু নাহি জানি।

কথাপ্রসঙ্গে

স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ

স্বামী বিবেকানন্দ একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন :

> 'গীতা পাঠ না করিলে কৃষ্ণচরিত্র কথনই বুঝা যাইতে পারে না ; কারণ তিনি তাঁহার নিজ উপদেশের মূর্তিমান বিগ্রহ ছিলেন। সকল অবতারই, তাঁহারা যাহা প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, তাহার জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ ছিলেন। গীতার প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ চিরজীবন সেই ভগবদ্গীতার সাকার বিগ্রহরূপে বর্তমান ছিলেন ; ··· গীতায় সাধককে ধীরে ধীরে সেই চরম লক্ষ্য মুক্তিসাধনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।'

স্বামীজীর এই কথাগুলি আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

শ্রীকৃষ্ণচরিত্র অনুধাবন করিতে হইলে গীতার অনুশীলন প্রয়োজন এবং গীতার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে মানুষকে জীবনের চরম লক্ষ্যে ধীরপদে অগ্রসর করানো হইয়াছে। বাস্তবিক গীতা-প্রচারক শ্রীকৃষ্ণের জনপ্রিয়তার মূল কারণ এইখানেই। নিম্নতম অধিকারী হইতে উচ্চতম অধিকারী পর্যন্ত—সকলেরই জন্য শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যথাযথ উপদেশ দিয়াছেন। নিম্নতম অধিকারী কথনও ত্বরিতগতিতে লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারে না। তাঁহাকে ধীরে ধীরেই অগ্রসর হইতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণ সকলকেই গ্রহণ করিয়াছেন—কাহাকেও বাদ দেন নাই। এইজন্যই গীতার মোক্ষম কথা : 'শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া' (৬।২৫)। এই বিষয়টি পরে আরও পরিস্ফুট করা হইবে।

গীতায় সর্বত্র নিষ্কাম কর্মের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সকাম কর্মীদেরও স্থান দিয়াছেন। 'সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা' ইত্যাদি শ্লোকে (৩।১০-১৬) সেই সকাম কর্মীদের—বৈদিক কর্মকাণ্ডীদেরও—আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। স্বামীজী বলিয়াছিলেন :

> 'গীতার মতো বেদের ভাষ্য আর কথনও হয় নাই, হইবেও না। ··· গীতায় শ্রুতির তাৎপর্য ··· বিকৃত করিবার চেষ্টা নাই। ভগবান বলিতেছেন এগুলি [দ্বৈতভাবাত্মক ও অদ্বৈতভাবাত্মক বাক্য] সব সত্য. জীবাত্মা ধীরে ধীরে স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর সোপানে আরোহণ করিতেছেন, এইরূপে ক্রমশঃ তিনি সেই চরম লক্ষ্য অনন্ত পূর্ণস্বরূপে উপনীত হন। গীতাতে এইভাবে বেদের তাৎপর্য বিবৃত হইয়াছে, এমন কি কর্মকাণ্ড পর্যন্ত গীতায় স্বীকৃত হইয়াছে, আর ইহা দেখানো হইয়াছে যে, যদিও কর্মকাণ্ড সাক্ষাৎভাবে মুক্তির সহায় নয়, গৌণভাবে মুক্তির সহায়, তথাপি উহা সত্য।'

সকাম কর্মীকে যেমন শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাস দিয়াছেন, সকাম ভক্তকেও অনুরূপভাবেই আশ্বস্ত করিয়াছেন—আর্ত ও অর্থার্থী ভক্তকেও জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী ভক্তের সঙ্গে একই বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন—তাঁহাদের 'সুকৃতিনঃ' (৭।১৬), 'উদারাঃ সর্ব এবৈতে' (৭।১৮) বলিয়া অভিহিত করিয়া নিজেরই অসীম উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের একটি বিশিষ্ট দিক্।

শ্রীকৃষ্ণ দুর্বলের বল, অসহায়ের সহায়, হতাশের আশাভরসা। গীতার প্রথমেই এই চারিত্র্যগুণ

সুপরিস্ফুট। অর্জুনের ন্যায় মহাবীরও যখন শোকমোহে আচ্ছন্ন নিরুৎসাহ নিরুদ্যম, তখন অন্যে পরে কা কথা। কেহই জোর করিয়া বলিতে পারে না, আমরণ নৈরাশ্যের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে। এইজন্য অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমগ্র জগদ্বাসীকে শাশ্বতকালের উপদেশ দিলেন শ্রীকৃষ্ণ :

> ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ
> নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
> ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং
> ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ (২।৩)

—হে অর্জুন, কাপুরুষতা আশ্রয় করিও না, ইহা তোমার শোভা পায় না। হে অরিন্দম, হৃদয়ের এই তুচ্ছ দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া উত্থিত হও। স্বামীজী বলিয়াছিলেন : গীতার এই একটি শ্লোক পড়িলেই সমগ্র গীতাপাঠের ফল পাওয়া যায়। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—উপনিষদের এই ওজস্বিনী মহতী বাণী যিনি সারা জীবন প্রচার করিয়াছিলেন, কৃষ্ণচরিত্রের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক উপর্যুক্ত শ্লোকটি যে তাঁহার অতি প্রিয় ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

যাঁহারা প্রপন্ন ভক্ত, তাঁহারা স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে বৈশ্যশূদ্রাদিবর্ণ-নির্বিশেষে—এমন কি শুভাশুভকর্মি-নির্বিশেষে পরমগতি লাভ করিবেন, এই আশ্বাস দিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শরণাগতবৎসলতার সম্যক্ পরিচয় দিয়াছেন। স্মরণীয় সেই সুপ্রসিদ্ধ বাক্যগুলি : 'স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ (৯।৩২); 'সর্বকর্মাণ্যপি'[১] সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ, মৎপ্রসাদাদ্ অবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্' (১৮।৫৬) ইত্যাদি।

'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ (২।৪০), 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' (৪।১১) 'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি' (৬।৪০), 'অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মাম্ অনন্যভাক্, সাধুরেব স মন্তব্যঃ ...' (৯।৩০), 'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি' (৯।৩১), 'অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ' (১৮।৬৬) ইত্যাদি অসংখ্য বাক্যে আমরা শ্রীকৃষ্ণের অভয়দাতৃত্বের পরিপূর্ণ পরিচয় পাই।

স্বামীজী বলিয়াছিলেন : 'পূর্ব পূর্ব ধর্মশাস্ত্র হইতে গীতার নূতনত্ব কি? নূতনত্ব এই যে, পূর্বে যোগ জ্ঞান ভক্তি-আদি প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু সকলের মধ্যেই পরস্পর বিবাদ ছিল, ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যের চেষ্টা কেহ করেন নাই। গীতাকার এই সামঞ্জস্যের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি তদানীন্তন সমুদয় সম্প্রদায়ের ভিতর যাহা কিছু ভাল ছিল, সব গ্রহণ করিয়াছেন।' বাস্তবিক, গীতা কর্ম ভক্তি ও জ্ঞানের ত্রিবেণীসঙ্গমস্বরূপ। যদিও অনেকের মতে গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্মযোগ, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তিযোগ এবং শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, প্রায় সব অধ্যায়েই জ্ঞান ভক্তি ও নিষ্কাম কর্মের কথা বলা হইয়াছে। জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের মহাসমন্বয় শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের একটি পরম বৈশিষ্ট্য।

স্বামীজী বলিয়াছেন : 'শ্রীকৃষ্ণের জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল অনাসক্তি। তাঁহার কোন ব্যক্তিগত প্রয়োজন নাই, কোন অভাবও তাঁহার নাই। কর্মের জন্যই তিনি কর্ম করেন। কর্মের জন্য কর্ম। পূজার জন্য পূজা। পরোপকার

---

১ সর্বকর্ম বলিতে রামানুজ নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম গ্রহণ করিয়াছেন; শংকর ঐ ত্রিবিধ কর্মের অতিরিক্ত নিষিদ্ধ কর্মও গ্রহণ করিয়াছেন।

কর—কারণ, পরোপকার মহৎ কাজ ; আর কিছু চাহিও না। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র।·· আমি যত মানুষের কথা জানি, তাহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সর্বাঙ্গ-সুন্দর। তাঁহার মধ্যে মস্তিষ্কের উৎকর্ষ, হৃদয়বত্তা ও কর্মনৈপুণ্য সমভাবে বিকশিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের প্রতিমুহূর্ত নাগরিক, যোদ্ধা, মন্ত্রী অথবা অন্য কোন দায়িত্বশীল পুরুষের কর্মপ্রবণতায় প্রাণবন্ত। বিদ্যাবত্তা, কবি-প্রতিভা, ভদ্র ব্যবহার —সব দিক দিয়াই তিনি ছিলেন মহান্। গীতা ও অন্যান্য গ্রন্থে এই সর্বাঙ্গীণ ও বিস্ময়কর কর্মশীলতা এবং মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের অপূর্ব সমন্বয়ের কথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গীতায় যে হৃদয়বত্তা ও ভাষার মাধুর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অপূর্ব ও অনবদ্য। এই মহান্ ব্যক্তির প্রচণ্ড কর্মক্ষমতার পরিচয় এখনও দেখা যায়। পাঁচ হাজার বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে—আজও কোটি কোটি লোক তাঁহার বাণীতে অনুপ্রাণিত হইতেছে। চিন্তা কর—তোমরা তাঁহাকে জানো বা না জানো—সমগ্র জগতে তাঁহার চরিত্রের প্রভাব কত গভীর! তাঁহার পূর্ণাঙ্গ প্রজ্ঞাকে আমি পরম শ্রদ্ধা করি। কোন প্রকার জটিলতা, কোন প্রকার কুসংস্কার সেই চরিত্রে দৃষ্ট হয় না।·· তারপর হৃদয়বত্তা! বুদ্ধদেবেরও পূর্ববর্তী শ্রীকৃষ্ণই সকল সম্প্রদায়ের নিকট ধর্মের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। মনঃশক্তির এবং প্রচণ্ড কর্মপ্রবণতার কী অপূর্ব বিকাশ! বুদ্ধদেবের কর্মক্ষমতা একটি বিশেষ স্তরে পরিচালিত হইত—উহা আচার্যের স্তর। তিনি স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিলেন, নতুবা আচার্যের কাজ করা সম্ভব নহে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া উপদেশ দিতেছেন! যিনি প্রবল কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে একান্তভাবে শান্ত রাখেন এবং যিনি গভীর শান্তির মধ্যে কর্মপ্রবণতা দেখান, তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী ও জ্ঞানী। যুদ্ধক্ষেত্রের অস্ত্রশস্ত্র এই মহাপুরুষ ভ্রূক্ষেপ করেন না। সংগ্রামের মধ্যেও তিনি ধীর স্থিরভাবে জীবন ও মৃত্যুর সমস্যাসমূহ আলোচনা করেন। প্রত্যেক অবতারই তাঁহার উপদেশের জীবন্ত উদাহরণ।'

গীতাপ্রচারক শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে স্বামীজী কি বলিয়াছেন তাহা আমরা মোটামুটি দেখিলাম। এক্ষণে গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে স্বামীজী কি বলিয়াছেন তাহা আমরা উল্লেখ করিব। স্বামীজীর মতে 'আদর্শ প্রেমিক' শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে গীতার স্তর হইতে একটু উর্ধ্বে উঠিতে হইবে। কারণ, 'দর্শনশাস্ত্র-শিরোমণি গীতা পর্যন্ত সেই অপূর্ব প্রেমোন্মত্ততার সহিত তুলনায় দাঁড়াইতে পারে না।' স্বামীজী বলিয়াছিলেন: 'কৃষ্ণ-অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য এই গোপীপ্রেম শিক্ষা দেওয়া। এই গোপীপ্রেমের মধ্যে ঈশ্বর-রসাস্বাদের উন্মত্ততা, ঘোর প্রেমোন্মত্ততাই বিদ্যমান; এখানে গুরু-শিষ্য, শাস্ত্র-উপদেশ, ঈশ্বর-স্বর্গ সব একাকার, ভয়ের ধর্মের চিহ্নমাত্র নাই, সব গিয়াছে—আছে কেবল প্রেমোন্মত্ততা। তখন সংসারের আর কিছু মনে থাকে না, ভক্ত তখন সংসারে কৃষ্ণ—একমাত্র সেই কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না, তখন সর্বপ্রাণীতে কৃষ্ণ দর্শন করেন, তাঁহার নিজের মুখ পর্যন্ত কৃষ্ণের মতো দেখায়, তাঁহার আত্মা তখন কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়া যায়। মহানুভব কৃষ্ণের ঈদৃশ মহিমা।'

স্বামীজী গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীপ্রেম সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে ও বক্তৃতায় অনেক মন্তব্য করিয়াছেন এবং কয়েকটি পত্রেও এই বিষয়ে লিখিয়াছেন—স্থানাভাবে এখানে সকল কথা আলোচনা করা সম্ভব নহে। সংক্ষেপে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিতেছি: 'হে দার্শনিক! তুমি আমায় তাঁর স্বরূপের কথা বলতে আসছ, তাঁর ঐশ্বর্যের কথা—তাঁর গুণের কথা বলতে আসছ? মূর্খ, তুমি জানো না, তাঁর অধরের একটি মাত্র চুম্বনের জন্য

আমাদের প্রাণ বের হবার উপক্রম হচ্ছে। তোমার ওসব বাজে জিনিস পুঁটলি বেঁধে তোমার বাড়ী নিয়ে যাও—আমাকে আমার প্রিয়তমের একটি চুম্বন পাঠিয়ে দাও—পারো কি ? ···মূর্খ, তুমি তো সূক্ষ্ম তত্ত্ব বোঝ না যে যিনি অসীম অনন্তস্বরূপ, তিনি প্রেমের বাঁধনে পড়ে আমার মুঠোর মধ্যে ধরা পড়েছেন। তুমি কি জানো না যে, সেই জগন্নাথ প্রেমের ডোরে বাঁধা পড়েন—তুমি কি জানো না যে, যিনি এই জগৎটাকে চালাচ্ছেন, তিনি বৃন্দাবনের গোপীদের নূপুরধ্বনির তালে তালে নাচতেন।' (পত্র)।

'হে মাধব, অনেকে তোমায় অনেক জিনিস দেয়—আমি গরীব—আমার আর কিছু নেই, কেবল এই শরীর মন ও আত্মা আছে—এইগুলি সব তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করলাম—হে জগদ্-ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, দয়া ক'রে এইগুলি গ্রহণ করতেই হবে—নিতে অস্বীকার করলে চলবে না।' (পত্র)।

'বাল্যকালে যে-শ্রীকৃষ্ণ সরলভাবে গোপীদের সহিত ক্রীড়া করিতেন, জীবনের সকল অবস্থাতেই তিনি সেই সরল সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার জীবনের সেই চিরস্মরণীয় অধ্যায়ের কথা মনে পড়িতেছে, যাহা অতি দুর্বোধ্য। যতক্ষণ না কেহ পূর্ণ ব্রহ্মচারী ও পবিত্রস্বভাব হইতেছে, ততক্ষণ তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত নয়।··· প্রেমমদিরা-পানে যে একেবারে উন্মত্ত হইয়াছে, সে ব্যতীত আর কেহ তাহা বুঝিতে পারে না। কে সেই গোপীদের প্রেম-জনিত বিরহযন্ত্রণার ভাব বুঝিতে সমর্থ, যে-প্রেম প্রেমের চরম আদর্শস্বরূপ, যে-প্রেম আর কিছু চাহে না, যে-প্রেম স্বর্গ পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করে না, যে-প্রেম ইহলোক পরলোকের কোন বস্তু কামনা করে না! হে বন্ধুগণ, এই গোপীপ্রেম দ্বারাই সগুণ ও নির্গুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে বিরোধের একমাত্র মীমাংসা হইয়াছে। ··· যদি একজন সগুণ, সম্পূর্ণ দয়াময়, সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর থাকেন, তবে এই নরককুণ্ড—সংসারের অস্তিত্ব কেন ? কেন তিনি ইহা সৃষ্ট করিলেন ? তাঁহাকে একজন মহাপক্ষপাতী ঈশ্বর বলিতে হইবে। ইহার কোনরূপ মীমাংসাই হয় নাই, কেবল গোপীপ্রেম সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা পড়িয়া থাকো, তাহাতেই ইহার মীমাংসা হইয়াছে। তাহারা কৃষ্ণের প্রতি কোন বিশেষণ প্রয়োগ করিতে চাহিত না, তিনি যে সৃষ্টিকর্তা, তিনি যে সর্বশক্তিমান্—তাহাও তাহারা জানিতে চাহিত না। তাহারা কেবল বুঝিত—তিনি প্রেমময়; ইহাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। গোপীরা কৃষ্ণকে কেবল বৃন্দাবনের কৃষ্ণ বলিয়া বুঝিত।'

এ-পর্যন্ত আমরা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে স্বামীজীর যে-সকল কথার উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে কুরুক্ষেত্রের পাঞ্চজন্য-নির্ঘোষ অপেক্ষা বৃন্দাবনের মোহনমুরলী-ধ্বনি যে বহুগুণে আকর্ষক, তাহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না। 'রসো বৈ সঃ' বলিয়া শ্রুতি যাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, তিনিই রসিকশিরোমণি গোপকিশোরবেশে 'শারদোৎফুল্লমল্লিকা' রজনীতে বৃন্দাবনের কালিন্দীপুলিনে মধুর বেণুনিনাদ করিতেছেন। সেই পরমমোহন বেণুরব শ্রবণ করিয়া ব্রজগোপিকাগণের কেহ কেহ ক্রিয়মাণ কর্মসমূহ অসমাপ্ত রাখিয়াই ত্বরিতচরণে বনবীথিকা আশ্রয় করিতেছেন। কেহ বা এক অঙ্গের আভরণ অন্য অঙ্গে ধারণ করিয়া বিপর্যস্তবেশে গৃহত্যাগ করিতেছেন। অপরে গৃহ হইতে বহির্গত হইতে না পারিয়া কৃষ্ণধ্যানে তন্ময় হইয়া পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া চিন্ময় দেহে দয়িতের সহিত মিলিত হইতেছেন। ইহাই গোপীগণের সুরনরদুর্লভ দিব্যোন্মাদ অবস্থা। স্পষ্টতই 'শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া' গীতার এই উপদেশ ব্রজগোপিকাগণের ন্যায় অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য নহে। যুক্তাহারবিহার

যুক্তনিদ্রাজাগরণ ইন্দ্রিয়সংযম ইত্যাদি বিধিনিষেধও তাঁহাদের জন্য নহে।

'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়-
স্তদ্ধাম্ বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদ্ উপাসনা ব্রজবধূ-
বর্গেণ যা কল্পিতা।'

—ঠিক কথা। কিন্তু কয়জন এই 'রম্যা উপাসনা'র অধিকারী? —'এ ভারতে কয়জন?'

অতএব আমাদের বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্বামীজী গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের গুণগানে সহস্রমুখ হইলেও, ভারতের বর্তমান অবস্থায় কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণই যে আদর্শরূপে গ্রহণীয়, তাহা বারংবার বলিয়া গিয়াছেন। স্মরণীয় শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সহিত স্বামীজীর কথোপকথন:

'বৃন্দাবনলীলার কথা ছেড়ে কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ কেমন হৃদয়গ্রাহী তাও দেখ্। অমন ভয়ানক যুদ্ধকোলাহলেও কৃষ্ণ কেমন স্থির, গম্ভীর, শান্ত! যুদ্ধক্ষেত্রেই অর্জুনকে গীতা বলছেন, ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম—যুদ্ধ করতে লাগিয়ে দিচ্ছেন! এই ভয়ানক যুদ্ধের প্রবর্তক হয়েও নিজে শ্রীকৃষ্ণ কেমন কর্মহীন—অস্ত্র ধরলেন না। যে দিকে চাইবি, দেখবি শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র perfect (সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ)। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগ—তিনি যেন সকলেরই মূর্তিমান বিগ্রহ! শ্রীকৃষ্ণের এই ভাবটিরই আজকাল বিশেষভাবে আলোচনা চাই। এখন বৃন্দাবনের বাঁশীবাজানো কৃষ্ণকেই কেবল দেখলে চলবে না, তাতে জীবের উদ্ধার হবে না। এখন চাই গীতারূপ সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা ···।'

'বৃন্দাবনলীলা-ফীলা এখন রেখে দে। গীতা-সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের পূজা চালা, শক্তিপূজা চালা।

শিষ্য। কেন, বৃন্দাবনলীলা মন্দ কি?

স্বামীজী। এখন শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ পূজায় তোদের দেশে ফল হবে না। বাঁশী বাজিয়ে এখন আর দেশের কল্যাণ হবে না। এখন চাই মহাত্যাগ, মহানিষ্ঠা, মহাধৈর্য এবং স্বার্থগন্ধশূন্য শুদ্ধবুদ্ধিসহায়ে মহা-উদ্যম প্রকাশ ক'রে সকল বিষয় ঠিক ঠিক জানবার জন্য উঠে পড়ে লাগা।

শিষ্য। মহাশয়, তবে কি আপনার মতে বৃন্দাবনলীলা সত্য নহে?

স্বামীজী। তা কে বলছে? ঐ লীলার ঠিক ঠিক ধারণা ও উপলব্ধি করতে বড় উচ্চ সাধনার প্রয়োজন। এই ঘোর কাম-কাঞ্চনাসক্তির সময় ঐ লীলার উচ্চ ভাব কেউ ধারণা করতে পারবে না।

শিষ্য। মহাশয়, তবে কি আপনি বলিতে চাহেন, যাহারা মধুর-সখ্যাদি ভাব-অবলম্বনে এখন সাধনা করিতেছে, তাহারা কেহই ঠিক পথে যাইতেছে না?

স্বামীজী। আমার তো বোধ হয়, তাই—বিশেষতঃ আবার যারা মধুরভাবের সাধক ব'লে পরিচয় দেয় তারা; তবে দু-একটি ঠিক ঠিক লোক থাকলেও থাকতে পারে। বাকি সব জানবি ঘোর তমোভাবাপন্ন —full of morbidity (মানসিক দুর্বলতা-সমাচ্ছন্ন)!'

কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানের চিত্র কিরূপ হওয়া উচিত, সে-সম্বন্ধেও স্বামীজী পরিষ্কার নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহ লিখিয়াছেন:

"স্বামীজী শ্রীকৃষ্ণকে যেভাবে আঁকা কর্তব্য, সেইমত নিজে অবস্থিত হইয়া দেখাইলেন আর বলিলেন: 'এমনি ক'রে সজোরে ঘোড়া দুটোর রাশ টেনে ফেলেছেন যে, ঘোড়ার পিছনের পা-দুটো প্রায় হাঁটুগাড়া গোছ আর সামনের পাগুলো শূন্যে উঠে পড়েছে—ঘোড়াগুলো হাঁ ক'রে ফেলেছে। এতে শ্রীকৃষ্ণের শরীরে একটা বেজায় action (ক্রিয়া) খেলছে। তাঁর সখা ত্রিভুবন-

বিখ্যাত বীর ; দু-পক্ষ সেনাদলের মাঝখানে ধনুক-বাণ ফেলে দিয়ে কাপুরুষের মতো রথের ওপর বসে পড়েছেন। আর শ্রীকৃষ্ণ সেই রকম ঘোড়ার রাশ টেনে চাবুক হাতে সমস্ত শরীরটিকে বেঁকিয়ে তাঁর সেই অমানুষী প্রেমকরুণামাখা বালকের মতো মুখখানি অর্জুনের দিকে ফিরিয়ে স্থির গম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়ে তাঁর প্রাণের সখাকে গীতা বলছেন। এখন গীতার preacher (প্রচারক)-এর এ ছবি দেখে কি বুঝলি ?'

উত্তর। ক্রিয়াও চাই আর গাম্ভীর্য-স্থৈর্যও চাই।

স্বামীজী। আাই !—সমস্ত শরীরে intense action (তীব্র ক্রিয়াশীলতা) আর মুখ যেন নীল আকাশের মতো ধীর গম্ভীর প্রশান্ত। এই হ'ল গীতার central idea (মুখ্যভাব), দেহ জীবন আর প্রাণ মন তাঁর শ্রীপদে রেখে সকল অবস্থাতেই স্থির গম্ভীর।

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদ
অকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু
স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥

—যিনি কর্ম করেও তার মধ্যে চিত্তকে প্রশান্ত রাখতে পারেন, আর বাহ্য কোন কর্ম না করলেও অন্তরে যাঁর আত্মচিন্তারূপ কর্মের প্রবাহ চলতে থাকে, তিনিই মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান, তিনিই যোগী, তাঁরই সব কর্ম করা হয়েছে।"

"ভগবানের প্রতি উদ্দাম প্রেমে আত্মহারা হওয়া যে কি জিনিস, তাহার আভাস তিনি না দিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাই তিনি আমাদের কাছে এই সব গানও সুর-সংযোগে গাহিতেন :

'প্রেমের রাজা কুঞ্জবনে কিশোরী,
প্রেমের দ্বারে আছে দ্বারী, করে মোহন বাঁশরী,
বাঁশী বলছে রে সদাই, প্রেম বিলাবে কল্পতরু রাই,
কারু যেতে মানা নাই'
ডাকছে বাঁশী—আয় পিপাসী জয় রাধে নাম গান ক'রে।'

"তিনি তাঁহার বন্ধু-রচিত গোপগোপীগণের উত্তর-প্রত্যুত্তর-সূচক ভাব-গম্ভীর গীতটিও গাহিয়া শুনাইতেন :

'পরমাত্মন পীতবসন নবঘনশ্যামকায়।
কালা ব্রজের রাখাল ধরে রাধার পায়।
বন্দ প্রাণ নন্দদুলাল নমো নমো পদপঙ্কজে,
মরি মরি মরি, বাঁকা নয়ন গোপীর মন মজে।
পাণ্ডবসখা সারথি রথে, বাঁশী বাজায় ব্রজের ঘাটে পথে।
যজ্ঞেশ্বর বীতভয় হর যাদবরায়,
প্রেমে রাধা ব'লে নয়ন ভেসে যায়'।"

—ভগিনী নিবেদিতা : স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা

স্বামী সারদেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

সন্তান না খাইলে মা'র মুখে কিছু যায় না! দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে একদিন অপরাহ্নে একটি ব্রাহ্মণযুবক স্বহস্তে খিচুড়ি রান্না করিয়া দুইজন প্রৌঢ়া উপবাসক্লিষ্টা নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণবিধবাকে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতেছে। অনেক দর্শনার্থী কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহাদের রান্নাখাওয়া পর্যবেক্ষণ করিল। পরে তাহাদের মধ্যে সংশয় উপস্থিত হইল, যুবকটি বিধবাদ্বয়ের মধ্যে কাহার পুত্র! যুবক দুইজনকেই মাতৃসম্বোধন করিয়া পরমাদরে শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে খাওয়াইয়াছে। একজন অল্পবয়স্কা বালবিধবা এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সঙ্গিনী একজন প্রৌঢ়া তীব্রস্বরে উত্তর দিলেন, 'চোখ নেই! দেখতে পাস্‌নি। যার পাতে পড়তেই গব্‌গব্‌ করে খেতে লাগল, তার কখনও পেটের ছেলে হতে পারে না। আর যে পাতে খিচুড়ি নিয়ে বসে রইল ছেলের মুখের দিকে চেয়ে, ছেলে খেলে তবে মুখে দিলে, তারই পেটের ছেলে।'

আমাদের জগজ্জননীর কাছে থাকিলে নিত্য এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ মিলিত। ভক্তিমার্গাশ্রয়ী ত্রিগুণাতীত মহাপুরুষ নাগমহাশয় মায়ের বাড়ীতে উপস্থিত, বাহ্য হুঁশ নাই বলিলেই চলে, মুখে অর্ধস্ফুট 'মা মা' রব। মা ভোজনে বসিয়াছিলেন, খবর পাইয়া নিজের কাছে আনাইলেন, কাছে বসাইয়া স্বহস্তে নিজ পাত হইতে খাওয়াইতে লাগিলেন। সন্তান পরিতৃপ্ত, 'আশা পূর্ণ এত দিনে'। দীনতার প্রতিমূর্তি দুর্গাচরণ নাগ, যিনি একজন সাধারণ লোককেও ভোজনে বসাইয়া স্বহস্তে ব্যজন করেন কিংবা জোড়হস্তে তফাতে দাঁড়াইয়া কাতরভাবে অনুনয় বিনয় করিয়া ভোজন করান, তিনি আজ কাহার পাতে কাহার হাতে খাইতে বসিয়াছেন। আহারান্তে বিদায়কালে তাঁহার মুখে শুনা গেল, প্রাণের আবেগে বলিতেছেন—'বাপের চাইতে মা দয়াল! বাপের চাইতে মা দয়াল!!'

বাপের চাইতে মা দয়াল, ছেলেরা প্রাণে প্রাণে সর্বদাই উপলব্ধি করে। তাই বাবা শাসন করিলে দৌড়াইয়া গিয়া মায়ের আঁচলে গা ঢাকা দেয়। দক্ষিণেশ্বরে ভাবী সন্ন্যাসীদের জীবন কঠোরতার ভিতর দিয়া গড়িতে ঠাকুর সচেষ্ট, রাত্রে রুটি কম খাইতে বলেন। জোয়ান ছেলে, সারাদিন কাজকর্ম, মা খাওয়ার সময় টের পান ছেলের পেট ভরে নাই, আদর করিয়া পেট ভরাইয়া খাওয়ান। ঠাকুর জানিতে পারিয়া অনুযোগ করিলে মা তাঁহাকে স্পষ্টই শুনাইয়া দিলেন যে, ছেলেদের খাওয়ার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ চলিবে না। বেশী খাওয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে বিঘ্নকর বলিয়া ঠাকুর নিজের মত সমর্থন করিতে চাহিলে মা জবাব দিলেন, 'আমার ছেলেদের ভবিষ্যৎ আমিই দেখব, সেজন্য কোন ভয় নাই।'

মা ভগবদ্ভজন জপধ্যান করিবার জন্য যেমন সন্তানদের উৎসাহিত করিতেন, তেমনি আবার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করিয়া মাথা গরম না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রয়োজন মতো সাবধান করিয়াও দিতেন। অত্যধিক কঠোরতা করিতে নিষেধ করিতেন এবং আহারে পোশাকে অসংযম বিলাসিতাও পছন্দ করিতেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর তাঁহার সন্ন্যাসিসন্তানগণের খাওয়া-থাকার অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্ট মায়ের

মনে ভীষণ দুঃখের কারণ হইয়াছিল—বোধগয়া মঠের ঐশ্বর্য, সাধুগণের সুখসুবিধা দেখিয়া তাঁহার নিঃসম্বল পরিব্রাজক সন্তানদের কথা মনে পড়ায় কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। তাই পূজনীয়া যোগেন-মা একদিন আমাদের বলিয়াছিলেন, (মাকে দেখাইয়া) 'যা কিছু দেখ্‌ছ (মঠ আশ্রমাদি) সব ওঁরই (মায়ের) কৃপায়! যেখানে যা দেখেছেন,—শিলটি নোড়াটি (দেববিগ্রহ) কেঁদে কেঁদে বলেছেন, 'ঠাকুর! আমার ছেলেদের একটু মাথা রাখবার জায়গা কর, দুটি খাবার সংস্থান কর।' মায়ের সে ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।

মা যেমন সন্তানদের জন্য ভাবিতেন, সন্তানেরাও তেমনি মায়ের ভাবনায় কাতর। মা কোথায় থাকেন ঠিক নাই, আজ এখানে, কাল সেখানে। সংসারের চিরপরিচিত সর্বাপেক্ষা মর্মন্তুদ ব্যাপার, গৃহহীন অসহায়া পত্নী আর উপার্জনক্ষম সন্তান রাখিয়া হঠাৎ গৃহস্বামীর অন্তর্ধান। জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্রনাথ সংসারে জন্মস্থলে এইরূপ ভীষণ ধাক্কা খাইয়া বাহিরে আসিয়া গুরুপদাশ্রয়ে দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে সেই দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি! কিন্তু এখানে আপাত-কঠিনতর, সে ত মায়িক রাজ্য, ত্যাগ করিবার জন্যই প্রস্তুত ছিলেন, আর ইহা পারমার্থিক রাজ্য, ইহাকে বরণ করিবার জন্যই আসিয়াছেন। পূর্বাশ্রমের দুঃখ দুর্দশার একটু কিনারা করিয়া দিয়াছেন, এখন তাহারা ক্রমশঃ নিজেরাই নিজেদের পথ দেখিয়া লইবে। এখানে সম্পূর্ণ বিপরীত, বরাবরের জন্য তাঁহারই ঘাড়ে দায়িত্ব দিয়া গিয়াছেন গুরুদেব স্বয়ং। সকলেই ত্যাগের পথে, কে তাঁহাকে দেখে, সামলায়। ঠাকুরের দেহত্যাগের কয়েক দিন পরেই যখন কাশীপুরের বাগান ছাড়িয়া দেওয়া সাব্যস্ত হইল, নরেন্দ্রনাথ অন্তরে ভীষণ আঘাত পাইলেন। মাতাঠাকুরানী ও গুরুভাইদের লইয়া অন্ততঃ আরও কয়েকটা দিন একত্র কাটাইবার প্রস্তাব করিলেন; কাতর হইয়া বলিলেন, 'সদ্য শোকাচ্ছন্ন মায়ের মন—কোথায় যাইবেন! বাড়ীটা আরও কিছুদিন রাখা হোক; এখানেই থাকুন।' প্রস্তাব টিকিল না, বাড়ী ছাড়িয়া দেওয়া হইল। মায়ের আপাতত বলরামবাবুর বাড়ী গিয়া থাকা স্থির হইলে, গাড়ী করিয়া বাগান হইতে বাহির হইবার সময়, দারোয়ান আটক করিল, বাগানের ভাড়া বাকী আছে। নরেন্দ্র-নাথের বুকে এই অপমান ভীষণ বাজিল, বলিয়া কহিয়া মায়ের গাড়ী ছাড়াইয়া দেওয়া হইল। বাড়ীভাড়া চুকাইয়া দেওয়া হইলে, ঠাকুরের যুবক-ভক্তেরা অনাথ বালকের ন্যায় যে যেমন পারিলেন, কেহ স্বগৃহে, কেহ পরগৃহে আশ্রয় লইলেন। মা বৃন্দাবনে গেলেন, কয়েকজন তাঁহার সঙ্গী হইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অলৌকিক নির্দেশে ভক্তবর সুরেন্দ্রনাথের সহায়তায় বরাহনগরে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে সর্বপ্রকার শারীরিক কষ্টদুঃখ দারিদ্র্য উপেক্ষা করিয়া নবীন সন্ন্যাসিদল নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ধীরে ধীরে একত্র হইয়া রামকৃষ্ণ মঠের গোড়াপত্তন করিলেন। মা বৎসরখানেক বৃন্দাবনে বাস ও তীর্থদর্শনের পর কামারপুকুরে আসিয়া চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিতেছিলেন। ভক্ত সন্তানগণ খবর পাইয়া তাঁহাকে কলিকাতায় আনিলেন। এখানে সেখানে রাখেন মাকে—নিজেদের কোন স্থান নাই। নরেন্দ্রনাথের অন্তরে এই দুঃখ শেলসম বিদ্ধ হইয়াছিল, তাই তাঁহার পত্রে প্রথমেই মায়ের একটি নিজস্ব থাকার জায়গা করার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা দেখা যায়। সেই জ্বালার উপশম হইল, বেলুড় মঠের জমি কেনার পর স্বামীজী যেদিন মাকে সেই জমিতে লইয়া গিয়া নববস্ত্র পরিধান করাইয়া চেয়ারে বসাইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের পর অশ্রুপূর্ণলোচনে করজোড়ে বলিলেন, 'মা, এতদিনে আজ আমার মাথায় যে বোঝা ছিল তা নেমে গেল—তোমাকে তোমার

নিজের জমিতে এলে। এখন তুমি হাঁফ ছেড়ে চারিদিকে বেড়াও, ঘুরে ফিরে দেখ।' মা অতীব হৃষ্টচিত্তে সব দেখিলেন, ঠাকুরের পূজা ভোগ দিলেন, এতদিন পরে ছেলেদের থাকার একটা স্থান হওয়াতে আজ তিনি পরম আনন্দিতা। মা সেখানে, বেলুড়মঠে, স্থূলশরীরে সর্বদা বাস না করিলেও পূজা-পর্ব উপলক্ষে শুভাগমন করিতেন।

মনে পড়ে পূজ্যপাদ শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি-লেখককে স্বামীজী ব্যগ্রভাবে নির্দেশ দেন, পুঁথিতে ঠাকুরের সঙ্গে মায়ের স্তব করিবার জন্য : 'সশক্তিক ছাড়া ভগবানের উপাসনা হয় না'। তাই পরে সংযুক্ত হইল, 'জয় মাতা শ্যামাসুতা জগতজননী।

রামকৃষ্ণ-ভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী॥'

স্বামীজী স্বয়ংও স্বরচিত ঠাকুরের আরাত্রিকস্তবে মায়ের বীজমন্ত্র হ্রীঁ সংযুক্ত করিয়া দেন। আর স্বামী অভেদানন্দজীর বিরচিত অপূর্ব মায়ের স্তোত্র 'প্রকৃতিং পরমাং' ইত্যাদি তাঁহার প্রতি মায়ের অপরিসীম স্নেহকৃপারই ফল, মনে হয়।

কামারপুকুর, জয়রামবাটী, বিভিন্ন তীর্থ ও কলিকাতার নানাস্থানে কয়েক বৎসর সুখে দুঃখে কাটিবার পর তাঁহারই কৃপায় উদ্বোধনের বাটী নির্মিত হইলে মার সন্তানদের একটা মহাভাবনা দূর হইল। উদ্বোধনের বাটী ছোট হইলেও শরৎ মহারাজ ঋণের বোঝা মাথায় লইয়া উহাকে সুন্দর ও মায়ের স্বচ্ছন্দে থাকার উপযোগী করিতে যথাসাধ্য করিলেন। গঙ্গা বেশীদূর নয়, নিত্য স্নান করা যায়; ছাদ হইতে বেলুড়-দক্ষিণেশ্বরের দর্শন মিলে; বলরাম মন্দির এবং যোগেন-মা গোপাল-মার বাড়ী এখান হইতে বেশী দূর নয় এবং আশেপাশে আরও ভক্তের বাস। উদ্বোধনের ঋণের কথা মা'র অজ্ঞাত ছিল বলিয়া মনে হয় না এবং সম্ভবতঃ সেজন্য তাঁহার ভাবনা-চিন্তাও ছিল। কিন্তু অচিরেই তাঁহার কৃপায় দুর্ভাবনা সুভাবনার পথ উদ্ঘাটন করিল।

তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন-উপদেশামৃত দেশে প্রবল আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছে, স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য বিজয় ও প্রচার এবং স্বদেশী আন্দোলনের ফলে স্বধর্মের প্রতি লোকের আকর্ষণ দিনে দিনে বাড়িয়া চলিয়াছে। এই নবযুগের সূচনার মূলকেন্দ্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ— ইহাও সমাজ ক্রমশঃ হৃদয়ঙ্গম করিতেছে, সত্য। কিন্তু ভগবানের এই নব লীলারহস্য ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায় চারিদিকে কিম্ভূত-কিমাকার ধারণা ও অদ্ভুত আজগুবি সব গল্প ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। পূজনীয় শরৎ মহারাজ নানাশ্রেণীর লোকের, বিশেষতঃ অগ্রগামী যুবকদলের সঙ্গে বিশেষরূপে পরিচিত থাকায় তাঁহার কিছুই অজ্ঞাত ছিল না এবং ইহার প্রতিকারের কথা ভাবিতেছিলেন বলিয়াও বুঝিতে পারা যায়। মায়ের বাড়ীর ঋণশোধের চিন্তা করিতে গিয়া তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যাখ্যামূলক জীবনী-গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' লিখিতে আরম্ভ করিলেন। লেখার প্রারম্ভ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, প্রথমে তাঁহার সম্পূর্ণ জীবনের আলোচনা লক্ষ্য ছিল না,—মনের সংশয়স্থল মুখ্য মুখ্য বিষয়েরই আলোচনা করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু লেখা জনসাধারণের অতীব হৃদয়গ্রাহী ও আদরণীয় হওয়ায় ক্রমশঃ প্রায় সমগ্র জীবনলীলাই প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের বহুল বিক্রয়ে বাটী নির্মাণের জন্য যে ঋণ লওয়া হইয়াছিল তাহা শোধ হইল। সর্বোপরি, শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলারহস্য, জীব, জগৎ, ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব, সাধ্য-সাধনার প্রণালী, বর্তমান যুগ-প্রয়োজন, অবতারের আবির্ভাব, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য, আদর্শ মানব-সমাজের লক্ষ্য, কর্তব্য-নির্ণয় প্রভৃতি দুরূহ বিষয়ের সুমীমাংসা পাইয়া পাঠকের হৃদয় পুলকিত হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের মহিমার প্রচার বাড়িয়া চলিল।

মা, তুমি কিভাবে কি কর, কে বুঝিবে?

উদ্বোধন কার্যালয়ে (শ্রীশ্রীমায়ের বাটী নামেও সুপরিচিত) শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর অবস্থানের জন্য সেখানে বিচিত্র সমাবেশ! মঠ, মন্দির, পুস্তকালয়, সন্ন্যাসাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম, গৃহস্থাশ্রম, ব্রহ্মচর্যাশ্রম—আবার পুরুষমঠ, স্ত্রীমঠ একত্রে। ছোট বাড়ী, প্রধান কর্মকর্তা পূজনীয় শরৎ মহারাজ একতলার একটি ছোট ঘরে বসিয়া নিবিষ্টমনে কত যে কাজ করেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহারই মধ্যে সতর্ক দৃষ্টি— কে আসে যায়, কি করে! নূতন আগন্তুক দেখিলেই মিষ্টস্বরে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দেন, মার দর্শনার্থী কৃপা-প্রার্থীদের যথাবিহিত ব্যবস্থা করেন। আরও কত লোক কত কাজে আসে, সদাসর্বদা রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ণধার সেক্রেটারী তিনি এইখানে বসিয়াই দুনিয়ার বহু ঝঞ্ঝাট মিটান আর লীলাপ্রসঙ্গ লিখেন। এই স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের সাংসারিক অভিজ্ঞতা, ব্যবহার-কুশলতা ও কার্যদক্ষতা দেখিলে চিত্ত নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারে, অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বাঁধিয়া কাজ করিলে তাহা কিরূপ নিখুঁত হয়। উদ্বোধন মায়ের বাড়ী, তাঁহারই সেবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব এখানে, কিন্তু মার সেবা-প্রয়োজন অত্যল্প, বরং তিনিই এখানকার দৈনন্দিন কাজে যথাসাধ্য সহায়তা করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা-পূজা, ছেলেদের প্রসাদ দেওয়া, পানসাজা তাঁহারই কাজ! কাজ করিতেই তিনি ভালবাসেন, বলেন যে, কোথাও কাজ না করিয়া থাকিলে সেটি পরের বাড়ী হইয়া যায়; আর শ্রীশ্রীঠাকুরের এবং তাঁহার ভক্তদের সেবা তো মহাভাগ্যের কথা। অপর দিকে মায়ের উপর সকলের দাবীদাওয়া, নিত্য কত অনুযোগ-অভিযোগ মিটাইতে হয়, বহু তাপিত হৃদয়কে শীতল করেন, নানা ভাবে স্নেহকৃপা বর্ষণ করিয়া। ইহার উপরে আছে রাধির মনস্তুষ্টি। অন্য ভাইঝি নলিনী, মাকু বড় মামার মা-মরা মেয়ে দুইটি—যাহারা মায়ের স্নেহমমতায় প্রতিপালিত এবং বিবাহ হইলেও মায়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, তাহাদেরও সুখ-সুবিধা মা দেখেন, কিন্তু রাধি আর তাহার পাগলী মাকে লইয়াই বেশী বেগ পাইতে হয়। মা অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সব কিছুর সুব্যবস্থা করেন। গোলাপ-মা, যোগেন-মা প্রাচীন ভক্তমহিলা; তাঁহারা মায়ের সেবিকা হইলেও তাঁহাদের সুখ-সুবিধার দিকে মায়ের তীক্ষ্ণদৃষ্টি। তাঁহাদের যাহাতে কোনপ্রকার কষ্ট অসুবিধা না হয়, সেজন্য তিনি সদা সচেষ্ট।

উদ্বোধনের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ বিভিন্ন প্রকৃতির, কিন্তু সকলেই মায়ের সন্তান, মায়ের স্নেহের সমান অধিকারী। তাঁহাদের সকলেরই খাওয়া-পরা সুখ-সুবিধার জন্য মা চিন্তিতা। এই বিষয়ে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। উদ্বোধনের ডাক্তার মহারাজ পূর্ণানন্দজী রাত্রে কোন কোন দিন খাবার পঙ্‌ক্তিতে ঠিক সময় আসিতে পারেন না, সেজন্য গঞ্জনাও ভোগ করেন। একদিন খুব বেশী দেরী হওয়াতে গঞ্জনা খুব বেশী হইল দেখিয়া মা তাঁহাকে নিভৃতে ডাকিয়া সস্নেহে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি মায়ের করুণাতে বিগলিত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং অশ্রুমোচন করিতে করিতে বলিলেন, "রাজা মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর) আদেশ, 'নিত্য দশ হাজার জপ করবে, সংখ্যা ঠিক রেখে, এবং ভুল হলে প্রথম থেকে পুনরায় জপ করবে। সংখ্যা ভুল হলে জপের ফল রাক্ষসে খেয়ে ফেলে।'" মা রাক্ষসে খাওয়ার কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "বাবা! তোমরা ছেলেমানুষ, চঞ্চল মন, একাগ্রচিত্ত হয়ে জপ করার জন্যই রাখাল এরূপ বলেছে। তা বাবা! আমি বলছি, খাবার ঘণ্টা বাজলেই তুমি ঠিক সময়ে চলে এসে খাবে, জপের সংখ্যা পূর্ণ না হলেও দোষ হবে না। পরে আবার সুবিধামত জপ ক'রো।" মায়ের ভরসা পাইয়া সন্তান নির্ভয় হইলেন,

যথাসময়ে খাইতে যাইতে লাগিলেন।

উদ্বোধনের কর্মচারী, ঝি চাকর বামুন সকলেই মায়ের সন্তান—মায়ের স্নেহের সম-অধিকারী, তাহাদের ও সকলেরই জন্য মায়ের সমান ভাবনা। ৺চন্দ্রমোহন দত্ত উদ্বোধনে কাজ করিতেন; নিরুপায় অবস্থায় কলিকাতা আসিয়া অনশনে অর্ধাশনে পথে ঘুরিতেছিলেন, সেই সময়ে ভাগ্য-ফলে উদ্বোধনে কাজ জুটিল। সামান্য মাহিনা, সংসার আছে, পূর্ববঙ্গে বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজন রহিয়াছে, তাহাদের ভরণপোষণ করিতে হয়, কষ্টে দিন যায়। ক্রমশঃ তিনি মায়ের স্নেহকৃপার অধিকারী হইলেন, তাঁহার ফাই-ফরমাস খাটেন প্রয়োজন মতো, মা-ও আদর করেন, পেট ভরিয়া ভাল ভাল প্রসাদ খাওয়ান। ক্রমশঃ চন্দ্রবাবুর সুদিন দেখা দিল, উদ্বোধনে বই বিক্রী করিয়া তাঁহার বেশ দু'পয়সা অতিরিক্ত উপার্জন হয়। এমনি সময় খবর অসিল কীর্তিনাশা পদ্মা সর্বনাশ করিয়াছে, চন্দ্রবাবুর বাড়ীঘর সব গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। মাথারাখার স্থান নাই, আত্মীয়-স্বজন পথে বসিয়াছে! খবর পাইয়া চন্দ্রের মাথা ঘুরিয়া গেল, কি করিবেন ভাবিয়া কোন উপায় দেখিলেন না, আহার নিদ্রা ভুল, পাগল হওয়ার যোগাড। মা প্রিয় সন্তান চন্দ্রের বিপদের কথা জানিয়া বিষম ব্যথিতা হইলেন এবং যোগাড করিয়া গোপনে চন্দ্রকে তিনশত টাকা দিয়া স্নেহপ্রদর্শনপূর্বক বলিলেন, 'দেশে গিয়ে ওদের একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে এসো।' মায়ের শুভাশীর্বাদ লাভ করিয়া চন্দ্র অকূলে কূল পাইলেন এবং দেশে গিয়া নূতন জমি কিনিয়া আত্মীয়-স্বজনকে আবার ঘরের ভিতর রাখিয়া আসিলেন। মায়ের সেই অহেতুক কৃপার কথা ভক্তিবিগলিত চিত্তে বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে চন্দ্রদা বহুবার আমাদের শুনাইয়াছেন। এইরূপ কত বিচিত্র ঘটনা যে উদ্বোধনে ঘটিত, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিভিন্ন ভাব ও বিভিন্ন স্বভাবের বহু সন্তানকে স্নেহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া স্বল্পপরিসর উদ্বোধনের বাড়ীতে যে অদ্ভুত সমাবেশ মা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া মনে হয় 'সর্বস্য হৃদি সংস্থিতে' মহামায়া! এই বিশাল বিচিত্র বিশ্বজগৎ, যেখানে দুটি বস্তু সমান দেখা যায় না, তাহার সুশৃঙ্খল পরিচালনা তোমার দ্বারাই সম্ভব!

উদ্বোধনে থাকিলে মায়ের শারীরিক পরিশ্রমের লাঘব হয় অনেক। সংসারের ভার দায়িত্ব কম থাকায় মন হালকা থাকে—তদুপরি অন্তরঙ্গ সন্তানদের সেবা যত্ন ও খাওয়া-থাকার সুব্যবস্থা আছে, স্বাস্থ্যকর স্থান, জলবায়ুর গুণে শরীর বেশ ভালই থাকে। কিন্তু জয়রামবাটীতে সর্বপ্রকার অসুবিধা, কষ্ট; আবার ম্যালেরিয়া। কাজেই স্বাস্থ্য ভাল থাকে না, অল্প দিনেই দেহ কাহিল হইয়া পড়ে। দেহধারী মাত্রেই দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য লালায়িত। কিন্তু মায়ের মন নিজ দেহের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সর্বদা উদাসীন, সন্তানের সুখ- সুবিধাই তাঁহার একমাত্র কাম্য। তাই দেশে জয়রামবাটীতেই মা থাকিতে চান। সেখানে থাকিলে একদিকে বিদেশাগত সন্তানগণের দর্শনাদির বিশেষ সুবিধা, অপরদিকে মাতাও সন্তানগণকে মনের সুখে আদর যত্ন স্নেহ মমতা প্রদর্শন করিবার সুবিধা পান। আরও কয়েকটি কারণে মা দেশে থাকা পছন্দ করিতেন, মনে হয়: (১) শহরের বদ্ধ আবেষ্টনী হইতে পাডাগাঁয়ের খোলামেলা পরিবেশ ভালবাসিতেন; (২) উদ্বোধনে সাধুভক্তদের অন্তরে তাঁহার সেবার জন্য অত্যধিক আগ্রহ থাকিলেও তিনি সহজে কাহারও ঘাড়ে বোঝা চাপাইতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিলেন। ভাইঝি ভ্রাতৃবধূদের সহ তাঁহার সেবা করা সহজ নহে, খুবই ঝঞ্জাটপূর্ণ; একথা বিশেষভাবে ভাবিতেন; (৩) শ্রীমতী রাধি নানা কারণে দেশেই থাকিতে চাহিত, মাও তাহাকে ছাড়িয়া

থাকিতে চাহিতেন না। রাধিকে উদ্বোধনে রাখিবার জন্য মহারাজেরা কত চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার সুখ-সুবিধার জন্য উদ্বোধনে একখানা ঘরও ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল—স্বামীর সঙ্গে সেখানে বাস করিতে পাইত। তথাপি সে এখানে থাকিতে চাহিত না। এসব কারণ আমাদের অনুমান ; আসল কথা—'ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।'

জয়রামবাটী থাকাকালে একবার শ্রীশ্রীমার বিশেষ অসুখের খবর পাইয়া শরৎ মহারাজ চিকিৎসক সেবক সেবিকাসহ গোলাপ-মা ও যোগেন-মাকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত। ভাল হইলে তাঁহাকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিবার ইচ্ছা। মা সুস্থ হইয়াছেন, যাহাতে তিনি সবল হন, তাহার জন্য মহারাজ বিশেষ যত্ন করিতেছেন। মাসখানেক অপেক্ষা করিলেন,—মা অনেকটা সারিয়াছেন, কিন্তু কলিকাতা যাওয়ার ইচ্ছা নাই। তাঁহার অন্তরের অভিপ্রায় জানিয়া শরৎ মহারাজ নীরবে আছেন, কিছুই বলেন না। যোগেন-মা কিন্তু স্ত্রীসুলভ আগ্রহে অধীরা। শরৎ মহারাজকে অনুযোগ করিয়া বলিলেন, 'কই গো শরৎ, মাকে যে কলকাতা যাবার কথা বলবে বলেছিলে, তা বললে কই ?' শরৎ মহারাজ মৌনাবলম্বন করিয়া মাথা নোয়াইয়া আছেন, যোগেন-মা বিশেষ পীড়া-পীড়ি করাতে অতি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন, 'তা ওঁর যখন যাবার ইচ্ছাই নাই, তখন আর বলে কি হবে ?' গোলাপ-মা আর একদিন জয়রামবাটীতে থাকার কষ্টে অসুবিধায় অনিয়মে মায়ের শরীর সারা, ভাল হওয়া অসম্ভব ইত্যাদি মহারাজকে জানাইলে, তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কাতরস্বরে গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন, 'ওঁর যদি ইচ্ছা হয় এখানেই দেহ রাখবেন। কে বাধা দিতে পারবে ?' শুনিয়া সকলে নিরুত্তর। মায়ের মহিমাদর্শী এই সকল ভক্ত জ্ঞানী মহাপুরুষগণ তাঁহার ইচ্ছার তিলমাত্র বিরুদ্ধেও কখনো কিছু বলিতেন না। তবে তাঁহার পাদপদ্মে আকুল আবেদন, প্রার্থনা জানাইতেন ; মাও তাহা পূর্ণ করিতেন সময় বিশেষে। মায়ের ছেলেরা অবোধ, তাই তাহারা নিঃসঙ্কোচে অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়া ফেলে. মা হাসেন, কখন শুনেন, কখন শুনেন না, ভুলাইয়া অন্যমনস্ক করিয়া দেন।

সেইবার অসুখের কয়দিন পূর্ব হইতে কপিল মহারাজ জয়রামবাটী ছিলেন এবং অসুখে বিশেষ উদ্বিগ্ন হন ও সেবাযত্ন করেন। কপিল মহারাজ মায়ের বিশেষ স্নেহের অধিকারী, উদ্বোধনে বহুদিন শ্রীচরণপ্রান্তে বাস। মা সারিতে না সারিতেই, তিনি মাকে কলিকাতা যাইবার জন্য বারংবার বলিতে লাগিলেন। মা কিন্তু সেসকল কথায় কান দিতেন না, বরং অপরের কাছে বলিতেন, 'ওরা হলো ন্যাংটা গোদা সন্ন্যাসী, উঠ্ বললে উঠলো, বস্ বললে বসলো, ভাবনা নাই, চিন্তা নাই, কম্বল কাঁধে ফেলে—চললো ! আমার কি তা চলে ? আমাকে কত দিক ভেবে কাজ করতে হয়। যাতে অপরের কোন অসুবিধা না হয়।' শরৎ মহারাজ ফিরিয়া যাইবার পরেও কপিল মহারাজ কিছুকাল পরমানন্দে মায়ের অপার স্নেহাস্বাদন করিয়া জয়রামবাটীতে কাটাইয়া বিদায় লইলেন, মা কলিকাতা গেলেন না। কিছুকাল সুস্থ থাকার পর মা কোয়ালপাড়ায় সন্তানগণের আগ্রহে বায়ু পরিবর্তনের জন্য তথায় গিয়া ৺জগদম্বাশ্রম আলোকিত করিলেন, সেখানে আনন্দের স্রোত বহিল। হায় ! ভক্তগণের সেই আনন্দ অল্পদিন পরেই নিরানন্দে পরিণত হইল—মা আবার ম্যালেরিয়ার কবলে পড়িয়াছেন। আবার কলিকাতা হইতে প্রথমে চিকিৎসক ও সেবক, পরে শরৎ মহারাজ, যোগেন-মাও আসিলেন। মা সুস্থ হইয়া জয়রামবাটী ফিরিয়াই বলিলেন, 'না, এবার আর না গেলেই চলবে না, বারবার ওদের কষ্ট করে আসা, আর আমার না যাওয়া, একি ভাল দেখায় ?' শরৎ মহারাজ মায়ের মনোভাব জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন এবং প্রণাম করিবার কালে হৃষ্টচিত্তে নিবেদন করিলেন, 'এবার মা, আপনাকে এখানে রেখে যাব না।' মাও প্রসন্ন হইয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, 'হ্যাঁ, বাবা, ভাল দিন দেখ, শিগ্গীরই যাব তোমাদের সঙ্গে।'　　[ক্রমশঃ]

ঈশোপনিষদ্ অনুধ্যান

স্বামী নিরাময়ানন্দ

বৈদিক যুগ হইতেই এদেশের দার্শনিক চিন্তাধারায় দুই প্রকার আদর্শের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। একটিতে কর্মের উপর জোর—এই কর্ম আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ড, যাগযজ্ঞ—যাহার ফলে স্বর্গবাস ও অবাধ সুখভোগ করা যাইবে, এই মতে ইহাই মুক্তি।

অন্যটি কোন প্রকার কর্মকে কখনও মুক্তির উপায় বলিয়া স্বীকার করে না। কারণ কর্ম মাত্রেরই ফল থাকিবে। শুভ ও অশুভ কর্মের ফল যথাক্রমে সুখ ও দুঃখ, দুইটিরই ফলভোগ করিতে হইবে।

'শুভ কর্মে—শুভ, মন্দে—মন্দ ফল,
এ নিয়ম রোধে নাহি কারো বল।'

কোন মানুষ সর্বদা সর্বাবস্থায় শুভ কর্মই করিবে—এমন কোন নিশ্চয়তা নাই, তাহাকে দু'চারিটি অশুভ কর্মও করিতে হয়। একটা জনপ্রিয় ধারণা অবশ্য আছে যে, শুভ কর্ম দ্বারা অশুভ কর্ম কাটা যায়; কিন্তু সূক্ষ্মবিচারে তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। সুখ-দুঃখ ভোগ দ্বারাই শুভাশুভ কর্মের ফল কাটে; তবে শুভ কর্ম দ্বারা অশুভের প্রবলতা কিছুটা কমিতে পারে। স্বর্গভোগ দ্বারা শুভ কর্মের ফল না হয় কাটিল—তারপর 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি'—এই মনুষ্যলোকে আসিয়া বাকী শুভাশুভ-কর্মের ফলভোগ—সঙ্গে সঙ্গে নূতন শুভাশুভকর্ম সম্পাদন—এই চলিয়াছে—অনন্তকাল ধরিয়া চলিবে—এই পৌনঃপুনিক চক্রগতি।

কর্মবাদীর মনে চিরমুক্তির কোন আকাঙ্ক্ষাই নাই, অতএব সেখানে জ্ঞানবাদীর আকাঙ্ক্ষিত মুক্তির প্রসঙ্গই উঠিতে পারে না। জ্ঞানবাদী এই চক্রগতির মধ্যে কোন সুখবোধ করেন না, তিনি জানিতে চান ব্যাপারটা কি? কেন এই বাধ্যতা-মূলক 'ভ্রমণ' বা বন্ধন, ইহা হইতে মুক্তিই বা কিভাবে সম্ভব?—এই প্রশ্নের উত্তরেই গড়িয়া উঠিয়াছে উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন। প্রথমটিকে অর্থাৎ যাগযজ্ঞ সমর্থক বাসনামূলক ক্রিয়াকাণ্ডকে বলা হয় পূর্বমীমাংসা। ঈশোপনিষদে এই দুই-এর দ্বন্দ্ব সুপরিস্ফুট; সামঞ্জস্য-প্রচেষ্টাও লক্ষণীয়।

আচার্য শংকরের মতে, একই কালে একই ব্যক্তিতে কর্ম ও জ্ঞান সম্ভব নয়। কারণ কর্ম করিতে গেলে চাই কামনা ও বাসনার প্রেরণা এবং কর্তৃত্ববোধ বা অহংকার। এগুলি থাকিতে জ্ঞান অসম্ভব। অতএব আলোক ও অন্ধকার যেমন একত্র থাকিতে পারে না, জ্ঞান এবং কর্মও সেইরূপ একই ব্যক্তিতে একই সময়ে থাকিতে পারে না। তবে শংকর স্বীকার করিয়াছেন, কর্ম করিয়া করিয়া ক্রমশঃ সকাম কর্মের ব্যর্থতা বুঝিয়া সাধক নিষ্কাম-কর্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হন, তারপর চিত্তশুদ্ধি হয় এবং শুদ্ধচিত্তে বেদান্তবিচারের দ্বারা ব্রহ্মাকারা বৃত্তির উদয়ে আত্মজ্ঞান স্বয়ং প্রকাশিত হয়।

জ্ঞান কখনও উৎপন্ন হয় না, জ্ঞান কোন কর্মের ফলও নয়—এমনকি বিচার বা ধ্যান প্রভৃতি কর্মের ফলও ঐ চিত্তশুদ্ধি পর্যন্ত—মনের বাসনা কামনারূপ মলিনতা দূর করা। শুদ্ধচিত্তে জ্ঞান স্বয়ংপ্রকাশ। দর্পণের মলিনতা দূর হইবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে মুখের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। অতএব দেখা যাইতেছে—সকাম কর্মের ঘাত প্রতিঘাতের পর মানবজীবনে নিষ্কাম কর্মের সাধনা সুরু হয়। নিষ্কাম কর্মই মানবকে ধীরে ধীরে জ্ঞানসাধনার উপযুক্ত করিয়া তোলে—যার চরম সার্থকতায় মানুষ জ্ঞানলাভ করে বা আত্ম-উপলব্ধি করে।

উপনিষদে প্রকাশিত, গীতায় বিঘোষিত,

শংকরাচার্য দ্বারা ব্যাখ্যাত—বর্তমান যুগে স্বামীজীর মুখে প্রচারিত এই সাধনার মধ্যে কোন তন্ত্রমন্ত্রের, ম্যাজিক বা মিস্টিসিজম্-এর কোন স্থান বা অবকাশ নাই। এখানে প্রয়োজন শুধু চিত্তের বিশুদ্ধতা বা 'স্বার্থমলিনতা বিসর্জন'। সকল প্রকৃত ধর্ম-সাধনার মূলনীতি এইখানেই অবস্থিত।

আচার্য শংকরের বিশ্লেষণ অনুসারে এই উপনিষদের প্রথম মন্ত্রটি কামনা ও কর্মত্যাগী জ্ঞানমার্গী সাধকের জন্য, বর্তমানকালে 'সন্ন্যাসী' বলিতে আমরা যাঁহাদের বুঝি—বৈদিক যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ড ত্যাগ করিয়া উপনিষদ্ অধ্যয়ন ও অনুধ্যানকে যাহারা জ্ঞানলাভের পথ বলিয়া মনে করেন। চতুর্থ হইতে অষ্টম এই পাঁচটি মন্ত্রে আত্মতত্ত্ব বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। এগুলি জ্ঞানমার্গী সাধকের পরম অবলম্বন। অন্যগুলিতে বলা হইয়াছে কর্মের কথা, বাসনা-কামনা পূরণের পর ক্রমমুক্তির কথা।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মন্ত্রে স্পষ্টই বলা হইয়াছে —যাহারা 'ঈশ'ভাবে জগৎকে 'বাসিত' করিতে পারিবে না, যাহারা কর্ম ও কামনা ত্যাগ করিতে পারিতেছে না—তাহারা শাস্ত্রবিহিত কর্ম করিয়া শতবর্ষ সুস্থ শরীর ও মন লইয়া জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা করুক, এই জগৎ ভালভাবে মনের মতো করিয়া ভোগ করুক। তবে শাস্ত্রানুসারে ভোগ করিতে হইবে, তাহা হইলেই তাহারা কর্মে ডুবিয়া যাইবে না ; ক্রমশঃ শুদ্ধচিত্ত হইয়া এ জন্মে বা জন্মান্তরে আত্মজ্ঞানের পথে অগ্রসর হইবে। অন্যথা অশুভ কর্মের মলিনতায় আচ্ছন্ন হইয়া তাহারা অসুর-লোকে যাইবে—অর্থাৎ শাস্ত্রবহির্ভূত ভোগের জীবনে নিমগ্ন হইবে ; সেই অন্ধকার হইতে উদ্ধার পাওয়া অতি কঠিন ব্যাপার। মুক্তি বা আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা না করিয়া যাহারা এই প্রকার ভোগে মগ্ন হইয়া জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া যায়, তাহারা নিশ্চয়ই আত্মঘাতী।

এখানে 'অসুর' শব্দটির বিশেষ অর্থ অবধারণ করিতে হইবে। সাধারণ পৌরাণিক অর্থে অ-সুর অর্থাৎ সুর নয়, দেবতা নয়—অর্থাৎ দৈত্য বা দানব প্রকৃতির মানব। ধাতু-প্রত্যয়গত দ্বিতীয় অর্থ 'অসুতে রমণ করে—আনন্দলাভ করে' যাহারা। এই অর্থে 'অসু-র' ইন্দ্রিয়ভোগী দেহবাদী ভোগবাদী জড়বাদী। ঈশ্বর চৈতন্য বা আত্মাকে ইহারা স্বীকার করে না, সে-হিসাবে ইহারা ঈশ্বর বিদ্বেষী ঐশীশক্তিতে অবিশ্বাসী এবং পরিণামে আত্মহত্যাকারী। ইহারা জানে না কিসে ইহাদের প্রকৃত কল্যাণ।

সে-দিক দিয়া নিশ্চয়ই ইহারা ঘোরতর অজ্ঞানের অন্ধকারে পতিত হয়। এ সম্বন্ধে গীতায় ১৬শ অধ্যায় (দৈবাসুরসম্পদ্-বিভাগ যোগ) পঠিতব্য। সেখানে দৈবী-সম্পদ্ ও আসুরী-সম্পদ্ বিস্তারিতভাবে আলোচিত। সংক্ষেপে আসুরী-সম্পদ্ রজোগুণাত্মক দম্ভ দর্প অভিমান অহংকার কামনা বাসনায় পরিপূর্ণ। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও —এই কথা বিভিন্ন লীলার মাধ্যমে বর্ণিত। 'দেবাসুরমভূদ্ যুদ্ধং পূর্ণমব্দশতং পুরা'—মানুষের সারা জীবনটাই তো দেবতা অসুরের যুদ্ধ—শুভ অশুভের সংঘর্ষ, ত্যাগবাদী ও ভোগবাদী আদর্শের সংগ্রাম—সত্ত্বগুণ ও রজোগুণের লড়াই।

চতুর্থ হইতে অষ্টম মন্ত্রে আত্মতত্ত্ব বিশেষভাবে কথিত, অবশ্য রহস্য ভাষায় বিপরীত গুণের বর্ণনায় : যথা,আত্মার কোন গতি নাই, অথচ ইহা প্রচণ্ড গতিশীল—মনের চেয়েও গতিশীল। নিষ্ক্রিয় আত্মার উপস্থিতিতেই বিশ্বের সমস্ত শক্তি ক্রিয়াশীল —প্রাণীদের সর্ববিধ কাজকর্ম চলিতেছে। আত্মা চলেন, অথচ চলেন না, আত্মা দূরে, আবার কাছে ; আত্মা সকলের অন্তরে, আবার বাহিরে। যিনি সর্বপ্রাণীকে এই আত্মা হইতে অভিন্নভাবে অনুভব করেন, নিজেকে সর্বভূতে দেখেন, তিনি

কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারেন না; কাহাকেও বর্জন করিতে পারেন না। যিনি সর্বভূতের এই একত্ব অনুভব করেন, তাঁহার শোক-মোহ নাই। সেই সৎস্বরূপ আত্মা সর্বব্যাপী, তাঁহার শরীর নাই, তিনি শুদ্ধ পবিত্র জ্যোতির্ময় সর্বজ্ঞ; তিনি প্রজাপতিদিগের জন্য যথাস্বরূপ কর্ম বিভাগ করিয়া দিয়াছেন।

এত অল্পকথায় আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে এতখানি বলার নজীর উপনিষদেও খুব বেশী নাই। যুক্তিতর্কের অতীত অনুভূতিগত এই নির্ভয় উক্তি।

এইবার এমন দুইটি ভাবের কথা বলিয়া সাধককে সাবধান করিয়া দেওয়া হইতেছে, যেগুলি আত্মজ্ঞান লাভের সহায়ক নয় বরং বাধা। কর্মমার্গীরা ঐ ভাবের ঘূর্ণিপাকেই হাবুডুবু খাইতেছেন। প্রথমটি 'অবিদ্যা ও বিদ্যার' ঘূর্ণি, দ্বিতীয়টি 'অসম্ভূতি ও সম্ভূতি'র। প্রায় একইভাবে তিনটি তিনটি করিয়া ছয়টি মন্ত্রে (৯-১১, ১২-১৪) বিষয়টি বলা হইয়াছে একটু দুর্বোধ্যভাবে। পূর্বকালে হয়তো এইগুলির অর্থ স্পষ্টই ধরা পড়িত, কিন্তু বর্তমানকালে আচার্যদের সাহায্য ব্যতীত এগুলির অর্থ করা যায় না বলিলেই হয়। প্রথম তিনটির আক্ষরিক অর্থ ধরা যাক:

যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে, তাহারা গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে। আর যাহারা বিদ্যার উপাসনায় নিরত তাহারা যেন গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। বিদ্যার দ্বারা একরূপ ফল পাওয়া যায়, অবিদ্যার দ্বারা অন্যরূপ—একথা আমরা আমাদের ধীর আচার্যদের নিকট শুনিয়াছি (অর্থাৎ এ কথা আমাদের মন-গড়া নয়)। বিদ্যা ও অবিদ্যার রহস্য যে একত্র বুঝিতে পারে, সে অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যাদ্বারা অমৃতলাভ করে।

মনে হয় না—এই অনুবাদের দ্বারা কোন অর্থ ধরা পড়িয়াছে। তবে এইটুকু বোঝা যায়, 'অবিদ্যা' ও 'বিদ্যা' শব্দগুলির অর্থের উপরই এই মন্ত্রগুলির অর্থ নির্ভর করিতেছে। 'অবিদ্যা' বলিতে সাধারণতঃ 'অজ্ঞান'ই বোঝায়—এখানে ইহার অর্থ: প্রকৃত তত্ত্ব কিছু না বুঝিয়া শুধু আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড।

আর 'বিদ্যা' বলিতে সাধারণতঃ বোঝায় 'জ্ঞান'- এখানে 'বিদ্যা' শব্দের অর্থ সাধনবিহীন শাস্ত্রজ্ঞান বা দেবতাজ্ঞান, উপনিষদে যাহা 'উপাসনা' বলিয়া কথিত। অবিদ্যা বা শুধু আনুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড দ্বারা স্বর্গ বা পিতৃলোক প্রাপ্তি ও পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় মর্ত্যলোকে আগমন। বিদ্যা বা দেবতাজ্ঞান দ্বারা দেবলোক প্রাপ্তি ঘটিতে পারে, কোনটির দ্বারাই আত্মজ্ঞান লাভ হইবে না। প্রথমটির দ্বারা যদি বা কোন এক জন্মে এই পৌনঃপুনিক কর্মের উপর বিরক্তি আসায় সাধক জ্ঞানের সাধনায় উদ্‌বুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু একবার দেবলোক গেলে, সেখানকার সূক্ষ্ম আনন্দে কতদিনের জন্য সাধক কিভাবে আটকাইয়া পড়িবেন, কেহ বলিতে পারে না। এইজন্য জ্ঞানের সাধক আত্মজ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া অবিদ্যাকে গভীর অন্ধকার ও বিদ্যাকে গভীরতর অন্ধকার বলিয়াছেন। তবে যদি কেহ একসঙ্গে দুইটি সাধনা মিলাইয়া করিতে পারেন, তাহা তাহা হইলে বিধিমত কর্ম দ্বারা পিতৃলোক বা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া দেবতাজ্ঞান বা উপাসনা দ্বারা অমৃত লাভ করিতে পারেন। বড়জোর দেবতাদের মতো অমর হইতে পারেন। তবে এ অমৃত আপেক্ষিক অমৃত, প্রকৃত অমৃত নয়—জ্ঞানলাভের অমৃতত্ববোধ নয়—দেহাত্মবন্ধনবিমুক্তি নয়।

পরবর্তী তিনটি মন্ত্রের গঠন উপরি-উক্ত তিনটি মন্ত্রেরই অনুরূপ। শুধু অবিদ্যা ও বিদ্যার পরিবর্তে 'অসম্ভূতি' ও 'সম্ভূতি' দুটি শব্দ দেখা যায়। প্রাচীনকালে এদুটি শব্দের ঠিক যে কি অর্থ ছিল, তাহা এখন নির্ণয় করা দুরূহ। বাধ্য হইয়া আমাদের আচার্যদের নির্দেশিত অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে।

'অসম্ভূতি'র অর্থ প্রকৃতি বা মায়া, জড়জগতের উপাদান কারণ; 'সম্ভূতি'র অর্থ হিরণ্যগর্ভ, বা সূক্ষ্ম সমষ্টি বা ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ, পৌরাণিক ভাষায় 'ব্রহ্মা,' বৈদান্তিক ভাষায় 'সূত্রাত্মা'।

'সম্ভূতি'র উপাসনায় যৌগিক শক্তিলাভ হয়, 'অসম্ভূতি'র উপাসনায় প্রকৃতিলয়ে আনন্দলাভ হয়। কিন্তু কোনটির দ্বারাই আত্মজ্ঞানের বা স্বরূপলাভের আনন্দলাভ হয় না। এইজন্য দুটির কোনটিই জ্ঞানের সাধকের লক্ষ্য নয়। তবে যদি কেহ ঐ দুয়ের একত্র সাধন করিতে পারে, তাহা হইলে কর্ম অনুষ্ঠান দ্বারা যতদূর লাভ করা যায়, ততদূর সে লাভ করে—প্রকৃতিলীন থাকিয়া প্রলয়ান্তে কোন লোকের নিয়ামক হইয়া পরে মুক্ত হয়।

১৫শ-১৮শ মন্ত্রে—সাধকের শেষ প্রার্থনা, এবং কাতর প্রার্থনা—হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে উত্থিত আকুল প্রার্থনা: আমি তো সারাজীবন সত্যপথে থেকে শাস্ত্রবিধি মেনে নিয়মিত ধর্ম করলাম, কিন্তু হায় আজও তো সত্যের দর্শন পেলাম না! হে সূর্য হে সবিতা, আমি তো তোমারই ধ্যান করেছি; বাল্যে গুরুমুখে শুনে শিখেছিলাম—তোমাতেই ব্রহ্ম প্রকাশিত! তবে কেন আজও দেখা দিলে না? দেখা দাও, দেখা দাও, আর বঞ্চিত কোরো না, আমার আর সময় নেই। আমি আজ মৃত্যুপথযাত্রী। আমার চোখে আঁধার নেমে আসছে, এখনি ঘোর অন্ধকার আমায় ঢেকে ফেলবে। তার আগে তুমি নিজেকে প্রকাশ করো আমার কাছে—পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করো! বুঝেছি সোনার ঢাকনির মতো তুমিই সেই সত্যকে আবৃত করে রেখেছ—হে পোষণকর্তা, জীবনভোর তুমিই আমাকে পালন করেছ, সেজন্য আমি ধন্য, কিন্তু এখন তুমি আমার ঐ আবরণ সরিয়ে নাও। জীবনের শেষ মুহূর্তে আমি অনাবৃত জ্যোতির্ময় সত্যদর্শন ক'রে নশ্বর জগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ করি।

কি আকুল ব্যাকুল প্রার্থনা সরল স্বীকারোক্তি ও ভ্রম উপলব্ধি: সারাজীবন শুধু কাজই করলাম—হ'তে পারে সে কাজ শাস্ত্রবিহিত, কিন্তু তার ফলে কই আমার জ্ঞানলাভ তো হ'ল না! যদি প্রথম থেকেই জ্ঞানের সাধনা করতাম—তাহ'লে হয়তো শেষ সময়ে এ খেদ করতে হ'ত না—তাহ'লে হয়তো একদিনে সর্বত্র ব্রহ্ম উপলব্ধি করে—'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্' এই শ্রুতিবাক্যের মর্ম অনুধাবন ক'রে আজ পরিপূর্ণ শান্তিতে এই অনিত্য দেহ ত্যাগ করতে পারতাম।

সগুণ ঈশ্বরের বিস্ময়কর সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের লীলা মানুষকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে, নির্গুণ ব্রহ্ম—নিরপেক্ষ সত্যকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। সূর্যই সেই সগুণ ব্রহ্মের চাক্ষুষ প্রতীক—তাই তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই আবার প্রার্থনা:

হে পোষণকারী, একাকী আকাশপথচারী, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতিনিয়ন্ত্রণকারী, জীবজগতের প্রাণস্বরূপ তোমার ঐ চোখধাঁধানো কিরণরাজি সরিয়ে নাও, তেজ সম্বরণ কর। তোমার কল্যাণময় শান্তরূপ আমি একটু দেখি। শেষ সময়ে দেখি—তোমারই কৃপায় দেখি! বুঝেছি, ঐ তো তোমার মাঝে যে জ্যোতির্ময় পুরুষ—সেই তো আমার স্বরূপ! বুঝেছি, ঐ তো আমি, ঐ তো আমার নিত্যরূপ!

আমি ধন্য, আমি ধন্য। এখন আমার প্রাণবায়ু বিশ্বব্যাপী মহাপ্রাণে মিশে যাক্! এই শরীর ভস্মে পরিণত হোক্! মন, এখন আর অন্য কিছুর চিন্তা কোরো না—এখন শুধু ভাবো জীবনে কতটুকু কি ভালো কাজ করেছ, ধর্ম বা সৎকর্মই শুভ সংস্কাররূপে সূক্ষ্মশক্তিরূপে তোমার সাথী হবে—এ জগতের আর কিছুই তোমার সঙ্গে যাবে না। এরই সাহায্যে তুমি ঊর্ধ্বগতি লাভ করবে।

হে অগ্নি, সারাজীবন তোমার মাধ্যমেই

দেবতাদের উপাসনা করেছি, শেষকালে এই দেহ তোমাতেই অর্পিত হবে। তাই তোমার কাছে প্রার্থনা জানাই, আমার কৃত কর্মফল ভোগ করার জন্য তুমি আমায় সুপথে নিয়ে যেও—জ্যোতির্ময় পথে—অন্ধকারের পথে নয়। দেবতার পথে নিয়ে চল—পুনরাবর্তনের পথে নয়—অন্ধকারের পথে নয়।

হে প্রভু, আমাদের কৃত কুটিল কুকর্ম সব দগ্ধ করে দিও। তোমাকে প্রণাম করি, প্রণাম করি। শুধু মুখে উচ্চারিত বাক্যদ্বারা প্রণতি জানাই, কারণ এই অন্তিম অবস্থায় করজোড়ে প্রণাম জানাবার শক্তিটুকুও আর আমার নেই। প্রণাম—প্রণাম।

কি করুণ, কি মধুর এই জীবন-সঙ্গীত যাহা মৃত্যুর লয়ে মিলাইয়া যায়; অথচ নিবিষ্টমনে লক্ষ্য করিলে ইহারই মধ্যে ধরা পড়ে গভীর বিশ্বাস ও দৃপ্ত পৌরুষের সুর—যে বিশ্বাস মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে অমৃতের অভিযানে - যে পৌরুষ সেই পরমপুরুষের সঙ্গে ঐক্য আকাঙ্ক্ষা করে।

ইহাই উপনিষদের সাধনা—ইহাই বেদান্তের সাধনা। এখানে ভয়ের স্থান নাই, সন্দেহ বা দুর্বলতার স্থান নাই। এই সাধনায় প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তির উপর একান্ত নির্ভরতা। আর প্রয়োজন গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস—যাহার অপর নাম 'শ্রদ্ধা'।

বৈদিক যাগযজ্ঞের সাধনার শেষে বৈদান্তিক জ্ঞান-সাধনার প্রারম্ভে এক মহান্ সন্ধিক্ষণে এই ঈশোপনিষদ্ ঋষিমনে উদ্ভাসিত! ইহা মানবাত্মার মুক্তির এক পরম সাধনা—আত্মোপলব্ধির এক চরম ঘোষণা।

লুকোচুরি

শ্রীমতী শেফালি ভট্টাচার্য

একি রকম খেলা তোমার, বলো আমায় প্রভু
খেলেই চলো লুকোচুরি দাওনা ধরা কভু।
পথে পথে বাঁকে বাঁকে এমনি ছুটে চলে
সকাল সন্ধ্যে কত গেলো তোমায় পাবো বলে।
একি তোমার প্রেমের ধারা স্নেহের ধারা একি
এতোদিন যে ডাক্‌লে আমায় সবই কি আজ ফাঁকি!
যদি, পথের ধূলির মলিনতায় ম্লান হয়ে যাই কভু,
আমায় তুমি চিন্‌তে যেন ভুল করোনা প্রভু।
পথ-হারানো বোকা মেয়ে সজল চোখে সাঁঝে
দাঁড়িয়ে আছি দিশেহারা অন্ধকারের মাঝে।
এবার তুমি এগিয়ে এসে তোমার কাছে নাও
তোমার স্নেহের শান্তি ছোঁয়ায় ক্লান্তি মুছে দাও॥

কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী প্রভানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

কাশীপুরের রঙ্গমঞ্চে নামভূমিকায় অবতীর্ণ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, কিন্তু নাট্যপ্রবাহ আবর্তিত হয়েছে নরেন্দ্রকে কেন্দ্র করে। নরেন্দ্র তখন সংসারের অগ্নিবলয়ের একটির পর একটির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। মাষ্টার মশাই তাঁর অবস্থা বর্ণনা করে বলেছেন: "কত বড ধাক্কা। অতি বড সংসার ঘাডে। হঠাৎ পিতা মারা গেলেন। ঘরে খাবার নাই। থাকে কি করে? আয়ের চাইতে খরচা বেশী। খুব খোলা হাত ছিল কিনা তাঁর বাবার! ... তাই যখন হঠাৎ মারা গেলেন, ঘরশূন্য। সেই অবস্থায় কত অনাহার গেছে। অনেক চেষ্টা করে বিদ্যাসাগর মশাইকে বলে একটি কর্ম যোগাড হ'ল। তাঁর বৌবাজার স্কুলের হেডমাষ্টারের কাজ। সেটিও গেল। কি সর্বনাশ! বিদ্যাসাগর মশায় বললেন, 'মহেন্দ্র, তুমি নরেন্দ্রকে বলো আর না আসে।' ...বুকে সাহস বেঁধে নরেন্দ্রকে বললাম। কিন্তু নরেন্দ্র কোন প্রতিবাদই করলেন না। শুধু বললেন, 'কেন ছেলেরা একথা বললে![1] আমি তো খুব খেটেখুঁটে পড়াতুম।' ব্যস্ অন্য কথা নাই। তখনকার এই নির্দ্বন্দ্বভাব দেখে মনে হয়েছিল, নরেন্দ্র সত্যই মহাপুরুষ।" (শ্রীম-দর্শন, ৫ম ভাগ, পৃঃ ২৩১)। তিনি একমাস হেডমাষ্টারির কাজ করেছিলেন।[2] গ্রন্থ অনুবাদ করে অর্থ রোজগারের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সুবিধা হয়নি। স্থির করেন, আইনজীবীর পেশা গ্রহণ করবেন। একটি আইন-ব্যবসার কোম্পানিতে আর্টিকেলড ক্লার্কের কাজ করেন। বাড়ী হতে কয়েকটা আইনের বই নিয়ে আসেন,—বাসনা আইনের পরীক্ষা দেবেন। ইতিমধ্যে রুগ্ন ঠাকুরের সেবাশুশ্রূষা ও চিকিৎসা সুসংগঠিত হয়েছে। ঠাকুরও অনেকটা সুস্থ বোধ করেন। প্রকৃতপক্ষে ঠাকুরের শরীর কাশীপুরে থাকাকালীন এর চাইতে পূর্বে বা পরে কখনও অধিকতর সুস্থ হয়নি। এবার নরেন্দ্র পডাশুনায় মন দেন। তিনি যখন যেটা ধরতেন, তাতে ষোল আনা মন ঢেলে দিতেন। তিনি পরীক্ষার পাঠে ডুব দেন। কিন্তু ভাগ্যনিয়ন্তা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন ভিন্ন একটি পথ। তাঁর অন্যতম সঙ্গী কালীপ্রসাদ লিখেছেন: "কয়েকদিন এমন হইয়াছে যে, আইন-সংক্রান্ত পুস্তকপাঠে ব্যস্ত থাকার জন্য নরেন্দ্রনাথ উপরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিতে যাইতে পারে নাই। তাহারই মধ্যে একদিন সন্ধ্যার সময় উপরে নরেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিতে গিয়াছে। প্রণাম করিয়া বসিলে শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে নরেন্দ্র-নাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিরে, তুই আর আমার কাছে আসিস্ নি কেন?' নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'মশাই, আইন-পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, পুস্তকপাঠে ব্যস্ত থাকি। তারজন্য

---

১ বিদ্যাসাগর মশাইয়ের জামাই অনেক চেষ্টা করেও নরেন্দ্রকে দাবিয়ে রাখতে পারেন না। জামাই ছিলেন ঐ স্কুলের সেক্রেটারী। জামাই এক ফন্দি করলেন। ফার্স্ট ও সেকেণ্ড ক্লাশের ছাত্রদের দিয়ে অভিযোগ করালেন, নূতন হেডমাষ্টার ভাল পড়াতে পারেন না। একমাস পরেই কাজটি যায়। (শ্রীম-দর্শন, চতুর্থভাগ, পৃঃ ৫৬ দ্রষ্টব্য)।

২ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের মতে নরেন্দ্র একমাস চাকুরিটি করেছিলেন। স্বামী সারদানন্দের মতে নরেন্দ্রনাথ চার পাঁচ মাস কাজটি করেছিলেন।

উপরে আসার সময় পাই না।' এই কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, 'শ্যাপ্, তুই যদি উকিল হস্ তাহলে তোর হাঁতের জল আর আমি খেতে পারব না।' এই কথা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ অতিশয় চিন্তিত হইল। আমিও সেই সময়ে উপস্থিত ছিলাম।... সে ভাবিতে ভাবিতে গম্ভীরভাবেই নীচে হলের পার্শ্বের ছোট ঘরে যাইয়া আইন-সংক্রান্ত পুস্তকগুলি বন্ধ করিয়া আমাদের বলিল, 'আমার আইন-পরীক্ষা দেওয়া বোধ হয় আর হোল না'।" (আমার জীবনকথা, পৃঃ ৮৪-৫)। এসময়েই একদিন গিরিশ-ভ্রাতা অতুলচন্দ্র ঠাকুরের নিকটে অভিযোগ করেন: "'আপনারই শ্রীমুখে শুনিয়াছি, অর্থবাসনায় লোকের রোগকামনা, বিষয়ের জন্য বিবাদ বাধান এবং অযথা মিথ্যাভাষণে ডাক্তার, উকিল ও দালালদের ধর্ম হয় না। কিন্তু দেখিতেছি, এখানে আসিয়াও নরেনবাবু ওকালতি পরীক্ষায় সচেষ্ট।' ঠাকুর কোন উত্তর না দিয়া মৃদুহাস্য করেন মাত্র।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত, পৃঃ ১৯৪)। অনতিবিলম্বে কয়েকটি ঘটনা ঘটে। যুবক নরেন্দ্রের আশা-বৃক্ষ হতে বি. এল পরীক্ষা দেবার আকাঙ্ক্ষা শুকনো পাতার মত ঝরে পড়ে। শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করেছিলেন: 'নরেন্দ্রকে দেখছ না?—সব মনটা ওর আমারই উপর আসছে।' (কথামৃত ৪।২৮।১)। কাশীপুরের প্রথম পর্বেই দেখা গেল যে নরেন্দ্রকে প্রায় ষোল কলা গ্রাস করেছে ত্যাগীর রাজা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ। নরেন্দ্রের মানসলোক নবরাগে অনুরঞ্জিত হয়ে উঠেছে; রামকৃষ্ণশক্তির অনুস্যূতিতে নরেন্দ্র হয়ে উঠেছেন রামকৃষ্ণময়। কাশীপুরের দ্বিতীয় পর্ব নরেন্দ্রের বিকাশ-দ্যুতিতে উদ্ভাসিত এবং তার প্রস্তুতি ঘটেছিল প্রথম পর্বের মধ্যে।

সেদিন ২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। সোমবার, ১৪ই পৌষ।[১]

মাষ্টার মশাই কাশীপুর থেকে স্কুলে এসেছিলেন। স্কুলের কাজকর্ম সেরে তিনি কাশীপুরে ফিরে যান। তিনি দেখেন বাড়ীর নীচতলায় সিঁড়িতে বসে রামচন্দ্র, হাজরা, গিরিশচন্দ্র, বাগবাজারের কবিরাজ, কালিপদ প্রভৃতি একদল ভক্ত। পশ্চিমের রোদ পড়েছে বাড়ীর উপর। শীতের পড়ন্ত রোদে বসে তাঁরা গল্পগুজব করছিলেন।

বাগবাজারের কবিরাজ ঠাকুরের চিকিৎসা করছিলেন। তিনি তাঁর দৈব ওষুধের প্রাপ্তির কাহিনী বলেন। একজন শ্রোতা বলেন: 'কি আষাঢ়ে গল্প।'

কবিরাজ প্রতিবাদ করে বলেন: 'সত্যি বলছি, আমি নিজে অন্ধকারে ওষুধ মাড়ছিলাম। হঠাৎ সেসময়ে পাই দৈবদর্শন। তারপর ওষুধ খাওয়া—।'

ভক্তদের আড্ডার আসর অতিক্রম করে মাষ্টার মশাই দোতলায় ঠাকুরের ঘরে যান। ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেন। তখন ঘরে উপস্থিত কালীপ্রসাদ ও কয়েকজন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টার মশাইকে বলেন: 'দুটো কাঁচের বাটি এনো।'

মাষ্টার: 'আজ্ঞে, হাঁ।'

কালীপ্রসাদ: 'রামবাবু বলেছেন যে তিনিই আনবেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ: 'ইনি না হয় দুটো আনবেন।'

ক্রমে ক্রমে গিরিশচন্দ্র ও অন্যান্য ভক্তেরা উপস্থিত হন। গিরিশ হাজরা মশাইর প্রসঙ্গ তোলেন। প্রতাপচন্দ্র হাজরা ঠাকুরের দেশের লোক। রামকৃষ্ণলীলায় হাজরা হচ্ছেন জটিলা কুটিলা। হাজরার নিজের সম্বন্ধে উঁচু ধারণা। তিনি বলতেন যে, নরেন্দ্রের ষোল আনা সত্ত্বগুণ, তাঁর

---

১ মাষ্টার মশাইয়ের ডায়েরী (পৃঃ ৬২৬-৮) হতে গৃহীত।

নিজের আঠারো আনা, আর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বার আনা—'এখনও লাল্চে মারছে।' তিনি দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে এসে জুটেছেন, সেখানেই থাকার ইচ্ছা। হাজরা নরেন্দ্রের 'ফেরেণ্ড', ঠাকুর হাজরাব উপর নজর রাখেন।

গিরিশ বলেন: 'রামবাবু আজ হাজরাকে খুব ধরেছেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ হাজরার স্বভাব বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন: 'ওর স্বভাব যেখানে যেমন। এখানে তুমি না হলে অন্য কাউকে ধরবে। আবার বৃন্দাবনে মাতাজী, তাঁকে ধরেছিল। ঠিক যেন খাটের খুবো।'

গিরিশ হাসতে হাসতে বলেন বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসনের কাহিনী। বত্রিশটি মূর্তি ধারণ করত সিংহাসনটি। অপর কেউ সিংহাসনে বসতে গেলে মূর্তিগুলির প্রত্যেকটি গল্পচ্ছলে রাজা বিক্রমাদিত্যের মাহাত্ম্য বলত।

শ্রীরামকৃষ্ণ: 'হাজরা বড় আপ্সার। নিরিবিলি হলে বসে আমার কি হোল!

'আবার সিদ্ধাই আছে এমন সাধু সে খুঁজবে—যে সাধু টাকা দিতে পারে।

'হাজরার সব হচ্ছে—যোগভোগ দুদিকেই তার টান।'

হাজরা মশাই সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম-ভবনে বসে বলেছিলেন: 'দক্ষিণেশ্বরে বসে হাজরা জপ করতো। আবার ওরই ভিতর থেকে দালালীর চেষ্টা করতো। বাড়ীতে কয় হাজার টাকা দেনা আছে—সেই দেনা শুধ্তে হবে।' (কথামৃত ৩।১৫।১)। রামকৃষ্ণলীলাঙ্গনে হাজরা-চরিত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নানান কারণে।

এমন সময় হাজরা মশাই সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরে আসেন। তাঁর দিকে চোখ পড়তেই ঠাকুর নিকটে বসা গিরিশের গা টেপেন। গিরিশচন্দ্র হাজরা মশাইকে লক্ষ্য করে বলেন: 'আপনি যা খুঁজছেন তা কি এখানে পাবেন মনে করেন?'

হাজরা মশাই চুপ করে থাকেন, কোন উত্তর দেন না।

প্রসঙ্গক্রমে ঠাকুরের পীড়াব কথা ওঠে।

বেদনাতুর বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য অবতার পুরুষের অজ্ঞানলেশরূপ শরীর ধারণ। প্রাকৃতিক নিয়মে শরীরে সুখ-দুঃখ রোগ-শোক উপস্থিত হয়। কিন্তু জড়শরীরের মোহ ও আসক্তি তাঁকে স্পর্শ করে না। ফলে এই শরীরধারণে বন্ধন নাই। পোড়া দড়ি দেখতেই দড়ির আকার, দড়ির বন্ধনশক্তি থাকে না। অবতারপুরুষ মানুষের সাজে মানুষের মাঝে আসেন, দেহে রোগবরণ করে সহ্য করেন, তাও লোকশিক্ষার জন্য। দেহে অসহ্য যন্ত্রণা, আবার 'যখন তাঁতে মনের যোগ হয়, তখন কষ্ট একধারে পড়ে থাকে।' (কথামৃত ২।২৭।৪)। অদ্বৈতকরস ব্রহ্মানুভূতির রসে জারান তাঁর দৃষ্টি, এক ও অভিন্নদৃষ্টির মাধুর্যে বিশ্বসংসার তাঁর কাছে মজার কুঠি, তখন তিনি সকল দুঃখকষ্ট রোগশোকের অতীত। সর্বানুস্যূতির উপলব্ধিতে তিনি নির্লেপ, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত।

অবতারপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে পীড়া নিয়ে নানান কথা ওঠে। গিরিশের কিন্তু অটুট বিশ্বাস, পাঁচসিকা পাঁচ আনা বিশ্বাস। তাঁর স্থির বিশ্বাস যে, অবতারপুরুষের দেহে ব্যাধি একটা উপলক্ষ মাত্র। তিনি বলতেন যে, এই রোগও তাঁর লীলা, মানুষের দুঃখ হরণ করার জন্য একটা ছল বৈ ত নয়।

আজ গিরিশ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে চেপে ধরেছেন রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য। গিরিশ সরাসরি জিজ্ঞাসা করেন: 'বলুন, আপনি ওষুধ কেন খান?'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মৃদু হাসেন। তিনি বলেন: 'আমার কি জান, যখন যা ধরি তাই করছি—যদি

ইচ্ছে হয়েছে তো সব ওষুধ একবার চাখ্‌তে হবে।

'কারও কারও সিদ্ধাই থাকে। শরীরে রোগ হলে সিদ্ধাই দিয়ে সারাতে পারে। তাছাড়া আমি ওষুধ খাই না এটাও একটা অহঙ্কার। একথাও মনে হয় না। •

'তবে এগুলো যে বুঝে করছি তা-ও নয়।'

গিরিশ পণ্ডিত ব্যক্তি, পুরাণাদি গ্রন্থ পড়েছেন। তিনি জেনেছেন যে, অবতারপুরুষের প্রত্যেক কার্যের পিছনে লোকসংগ্রহের উদ্দেশ্য থাকে। সেই বিষয় স্মরণ করে গিরিশ বলেন: 'আপনার ব্যামোর তো একটা উদ্দেশ্য আছে? যেমন রাধিকার কলঙ্কভঞ্জনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ রোগের অভিনয় করেছিলেন। জটিলা-কুটিলা থেকে সুরু করে অপর সকলে ব্যর্থ হলে রাধারাণী সহস্রধারা কলসী করে যমুনা হতে জল আনেন, সেই জলে শিকড় বেটে খাওয়াতে শ্রীকৃষ্ণের রোগ সারে। আবার যেমন মহাপ্রভু রোগ নিরাময়ের জন্য ব্রাহ্মণের পাদোদক গ্রহণ করেছিলেন।

'আপনি অবশ্য কারুকে উদ্ধার করবেন। আপনার ওষুধপত্র খাওয়া শুধু কবিরাজের অহঙ্কার বাড়ানো।'

শ্রীরামকৃষ্ণ: 'তা বুঝতে পারি না।'

গিরিশ: 'আচ্ছা, এক জ্ঞানের বিষয় ত বলছেন—'

শ্রীরামকৃষ্ণ: 'ভাব বুঝতে পারি না।'

ঠাকুরের ওষুধ খাবার সময় হয়েছে। সেবক বুড়োগোপাল এসে ওষুধ খাওয়ান ও ঠাকুরকে বলেন: 'এখন গয়ার ফেলবেন না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ: 'একটা জানালা খুলে দাও।'

কিছুক্ষণ পরে নৃত্যগোপাল, গিরিশচন্দ্র, রামচন্দ্র প্রভৃতি কয়েকজন ঠাকুরের চরণবন্দনা করে বিদায় নেন।

কবিরাজ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে যে ওষুধ দিয়েছিলেন তার নাম হরিতালভস্ম।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: 'গয়ারে (উঠে গেল)।'

গয়ার ওঠার পর ঠাকুর মুখে রেখে দেন। সেবক তাকে গয়ার ফেলতে নিষেধ করেছিলেন।

বুড়োগোপাল: 'ফেলুন।'

মাষ্টার হেসে ফেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণ বালকের মত। মাষ্টার বলেন: 'এখন আর রেখে কি হবে?'

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে): 'ওর অনুরাগটা আছে তো!'

বুড়োগোপাল: 'কফ গাঢ় হচ্ছে তো আরেকটা ওষুধ খান না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসেন। মাষ্টার হাসেন। উপস্থিত সবাই হাসেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: 'হাঁ, একজনের ওষুধে কাশি ভাল করবে, আর একজনের ওষুধে শ্লেষ্মা সরল করবে।' সবাই আবার হাসেন।

সেদিনই ভক্ত গিরিশচন্দ্র মাষ্টার মশাই-প্রমুখ ভক্তদের বলেছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এক কাহিনী। গিরিশচন্দ্র কাশীপুর উদ্যানবাটীতে এসেছিলেন। উদ্যানবাটীতে সেদিন তাঁর দ্বিতীয় বার আগমন। বেশ কয়েকদিন পরে গিরিশ এসেছিলেন, তাঁকে দেখেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাঁদতে থাকেন। গিরিশ বলেন: 'আমি আসামাত্র আমাকে দেখে কান্না। আপনজনা মনে করেন কি না।'[১] কি অপার তাঁর কৃপা।

'আমায় বলেছেন, তোর কাজ ফুরালে ডুব

১ গিরিশচন্দ্রের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন একাধারে পিতা মাতা সখা, সব কিছু। শ্রীরামকৃষ্ণের নিঃস্বার্থ স্নেহ-ভালবাসায় তিনি বাঁধা পড়েছিলেন। তাই গিরিশচন্দ্রকে পরবর্তী কালে বলতে শুনি: "তাঁহাকে (পরমহংস-দেবকে) মানা ভালবাসা পূজা করা কঠিন নয়। তাঁহাকে ভুলাই কঠিন।' (১৫।৮।১৮৯৭ তারিখে রামকৃষ্ণ মিশনের সপ্তদশ অধিবেশনে গিরিশচন্দ্রের ভাষণ)।

মারলে আর কেউ দেখতে পাবে না।

'তিনি অভিনয় সম্বন্ধে, অভিনেত্রীদের নিয়ে থিয়েটার করা সম্বন্ধেও বলেন। তিনি বলেছেন, বেশ হয়েছে।'

কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতিচারণ করে তাঁর বাল্যকালের কয়েকটি ঘটনা শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেন। তখন ঘরে উপস্থিত লাটু, বুড়োগোপাল, মাষ্টার প্রভৃতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ: 'আগে কম বয়সে দেশে ছোট ছোট ঠাকুর গড়তুম। কেষ্টঠাকুর, তাঁর হাতে বাঁশি। এরকম নানা দেবদেবীর মূর্তি গড়তুম। আবার পাঁচ আনা ছয় আনা দামে বিক্রী করতুম।'

লাটু: 'আজ্ঞে মহাপ্রভুও বাজার করতেন, থোড় প্রভৃতি কিনতেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ: 'আবার ছবি আঁকতুম।

'পুতুল গড়তুম। কল শুদ্ধ হাত পা নাড়ছে এই সব।

'রাসের মিস্ত্রিরা অনেক সময় আমার কাছে ভঙ্গিমা জেনে নিত।'

লাটু: 'পিচকারী দেবার ভঙ্গী, এরকম নানা ভঙ্গী।' লাটু সেই ভঙ্গিমা নকল করে দেখান।

শ্রীরামকৃষ্ণ: 'আবার ইটের কাজও জানতুম।'

কিছুক্ষণ পরে নীচতলায় কীর্তন ও নৃত্যের শব্দ শোনা গেল। মাষ্টার ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে নীচে নেমে যান। গিয়ে দেখেন খোকা (সুবোধ) অপূর্ব নৃত্য করছেন। মাষ্টার ভাবেন, সুবোধ কোথা হতে এই মনোহর নৃত্য শিখলেন? নৃত্যও কি জন্মগত সংস্কার? নর্তকের মধ্যে ভাব কি সুন্দরভাবে স্ফূর্তি পায়! নৃত্যে স্বর্গের সুষমা সৃষ্টি হয়।

ইংরাজী বছর শেষ হয়; উপস্থিত হয় ইংরাজী বছর পয়লা। শুক্রবার। ১৮ই পৌষ, ১২৯২ বঙ্গাব্দ।

লীলানিস্যন্দী রসময় শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে 'লীলারসপ্রেমগন্ধঘ্রাণে যোগিবৃন্দ যোগানন্দে মত্ত।' উদ্যানবাটীর আরোগ্যনিকেতন রূপান্তরিত হয় ভবরোগনিরাময়ের আলয়ে। ভববন্ধন উত্তরণের অভিযানে অগ্রসর হন সাধকবৃন্দ। পথদিশারী শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে আলোকিত তাঁদের চলার পথ। উদ্যানবাটীতে অনিন্দ্য এক প্রেমের আবর্ত সৃষ্টি হয়।

এই বিশেষ দিনটির বিবরণ আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। (উদ্বোধন ১৩৭৯, মাঘ ও ফাল্গুন)। ঐ দিনের বিষয়ে আমাদের সংগৃহীত আরও কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্য পাঠককে এখানে উপহার দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অহেতুক কৃপাসিন্ধু পতিত-পাবন রূপ অপাবৃত করেছেন। তিনি অকাতরে করুণা বিতরণ করেছেন। দেবেন্দ্র মজুমদারের মাতুল হরিশ মুস্তাফী ঠাকুরের ঘরে উপস্থিত হলে কৃপাপরবশ হয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শ্রীচরণ দিয়ে হরিশের বক্ষ স্পর্শ করেন। দিব্যস্পর্শে হরিশ আনন্দে উন্মত্তপ্রায়, তিনি নীচতলায় এসে অন্যান্যদের বলেন: 'ভাইরে, আমার আনন্দ যে ধরে না! এ কি ব্যাপার! জীবনে এমন ঘটনা একদিনও দেখিনি।' শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে দেবেন্দ্রনাথ ভক্তদের সঙ্গে 'শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব,' সম্বন্ধে আলোচনা করেন, কিন্তু ঠাকুরের আদেশের গূঢ়ার্থ উদ্ধার করতে সমর্থ হন না।

অপরাহ্ণে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উদ্যানের পথে বেড়াতে বের হন। প্রেমভক্তি ও বিশ্বাসের জীবন্ত বিগ্রহ গিরিশ। তাঁকে দেখে 'উথলিত কৃপাসিন্ধু প্রভুর এখন।' গিরিশ জুতো খুলে রেখে ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন। গিরিশের

আচরণ দেখে তিনি বলেন: 'আমার লজ্জা করে।' গিরিশ আবেগের সঙ্গে বলেন: 'আজ্ঞে, আপনি -দের তরিয়েছেন।'[১] শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন: 'তুমি যে সকলকে এত কথা বলে বেড়াও, তুমি কি দেখেছ, কি বুঝেছ?' গিরিশ ঠাকুরের পদতলে জানু পেতে বসে গদ্‌গদ স্বরে বলেন: ব্যাস বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেননি, আমি তাঁর সম্বন্ধে অধিক কি আর বলতে পারি!' গিরিশের ভাবপূর্ণ স্তব শুনে ঠাকুর ভাবস্থ সমাধিস্থ হন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ তাঁর শ্রীচরণবন্দনা করেন। ভাবের গাঢ়তা তরল হলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অমোঘ করস্পর্শ দান করেন বিভিন্ন জনকে। করুণাবিগলিত হয়ে ভক্তদের ভক্তি-মুক্তি-প্রেমপ্রদ মহামন্ত্র 'চৈতন্য হোক্' দান করেন। চৈতন্য-দানের হরিলুটে ছুটে আসেন বিভিন্ন জন, কাউকে বা ধরে নিয়ে আসেন রামচন্দ্র,[২] গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি। হরমোহন, হাজরা প্রভৃতি গুটিকয়েক ব্যক্তি ভিন্ন সকলকে কৃপা করেন ঠাকুর। সৌভাগ্যবান হারাণচন্দ্রের মস্তকে তিনি পাদপদ্ম স্থাপন করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চারিদিকে গৃহস্থ ভক্তদল, ঠাকুরের কৃপাভিলাষে সমবেত। 'চারিদিকে ঝলমল করে ভক্তগ্রহদল। ভক্তসঙ্গে ভক্তসখা লীলারসময় হে।' প্রেমের হাটের হট্টগোলে ছুটে আসেন যুবক ব্রহ্মচারীদের কয়েকজন।[৩] দেখেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বসতবাটীর দিকে ফিরে আসছেন। 'রাশি রাশি কৃপা ঢালি প্রভু ভগবান। উপরে দ্বিতলভাগে করিলা পয়ান॥'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রান্ত ক্লান্ত, কিন্তু প্রতিনিয়ত ভক্তকল্যাণে উদ্‌গ্রীব। আনন্দকন্দ ঠাকুর কৃপাবিতরণ করতে ব্যগ্র। আনন্দোৎস শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন্ত উৎসব-বিগ্রহ। তাই দেখা যায় ঠাকুরের শয়নঘরে প্রত্যাবর্তনের পরও 'কল্পতরু উৎসব' তথা 'আত্মপ্রকাশে অভয়দানের উৎসব' চলতে থাকে।

সন্ধ্যার সময় ঠাকুরের ঘরে উপস্থিত মহিমা চক্রবর্তী, অতুল ঘোষ, হাজরা মশাই, মাষ্টার মশাই, নরেন্দ্র প্রভৃতি। সন্ধ্যার পূর্বে তিনি চুনীলাল ও হাজরাকে আশ্বস্ত করেন, কৃপাদান করেন।

মহিমাচরণ একতারা সংযোগে ওঁকার মন্ত্র সাধন করতেন। তাঁকে লক্ষ্য করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: 'ওঁ ধ্বনি নাভি হতে উঠে শিরে লীন হয়। তুমি 'তুরীয়' 'তুরীয়' কর কিন্তু এটি তোমার এখনও বাকি।'

মহিমাচরণ অভিমানী, তিনি দমবার পাত্র নন। তিনি বলেন: 'আজ্ঞে, ঐটী দৈববাণী। আমার দু'তিন দিন হয়েছিল। আমিও ঐটে ভাবছি।'

আজকের প্রেমবিতরণ উৎসবে যোগদানকারী-গণ বাড়ী ফিরে যাবেন। তাঁদের অধিকাংশের ভাবের ঘোর, আনন্দের কুয়াশা এখনও কাটেনি। তাঁরা একে একে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণিপাত করেন। প্রণামের মধ্যে ঢেলে দেন অন্তরের আকুতি।

---

১ মাষ্টার মশাইয়ের ডায়েরী, পৃঃ ৭৮২।

২ রামচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস যে ঠাকুরের অমোঘ কৃপাশক্তিতে যে কেউ তরে যাবে। তিনি ধরে আনেন নবগোপাল ঘোষকে, অতুল ঘোষ, কিশোরী রায় প্রভৃতিকে। গিরিশচন্দ্র একটি প্রবন্ধে লিখেছেন: 'আমার ভ্রাতা শ্রীমান অতুলকৃষ্ণ বলেন—পরমহংসদেবের কৃপা আমি তো রামবাবুর কৃপাগুণে লাভ করিয়াছি। আমি একপাশে দাঁড়াইয়া ছিলাম; রামবাবু হাত ধরিয়া টানিয়া আমায় প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করেন।...রামবাবুর কৃপাগুণ সেদিন অনেকেই অনুভব করিয়াছিলেন।' (তত্ত্বমঞ্জরী, ৮বর্ষ, ৯ সংখ্যা, পৃঃ ২০৬-৭)।

৩ যুবক সেবকদের অধিকাংশই তখন রাতভোর জপধ্যান করতেন, সেইকারণে মধ্যাহ্নের পর ঘুমিয়ে নিতেন। ১লা জানুআরির দিনও নরেন্দ্রপ্রমুখ অধিকাংশ যুবক ভক্ত ঘুমাচ্ছিলেন, সে সময়ে ঠাকুর বাগানে বেড়াতে বের হন। (লীলাপ্রসঙ্গ, ৫। ৩৯৭ ও শিবানন্দবাণী, ২। পৃঃ ৩৯-৪০ দ্রষ্টব্য)।

মহিমাচরণ দেখে মুগ্ধ হন, বলেন : 'আহা কি সুন্দর! যারা এখানে বসে এসব দেখে তাদের পর্যন্ত ভক্তি-ভাবের উদয় হয়।'

কিয়ৎক্ষণ সময় চলে যায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পূর্বজীবনের দর্শনাদির উল্লেখ করে বলেন : 'সাত বছর আগে মনে উঠেছিল যে এখানে খুব লোক হবে। এত লোক হবে যে দারোয়ান রাখতে হবে।'

লোকের ভীড় সামলাবার জন্য সত্য সত্যই দারোয়ান বসেছিল। শ্যামপুকুরে ঠাকুরের দরজায় পাহারা দিতেন সেবক নিরঞ্জন। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে কিছুদিন পরে নিরঞ্জন দরজা পাহারা দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

মহিমাচরণের মনে পড়েছে তদানীন্তন দক্ষিণেশ্বর মন্দির-কর্তৃপক্ষের কথা। তিনি বলেন : 'ত্রৈলোক্য[১] এরা আবও পাপে ডুবে তাহ'লে আমরা দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কর্তৃত্বটা পাই—এই প্রার্থনা করি—'

শ্রীরামকৃষ্ণ অদোষদর্শী। তিনি কারু অমঙ্গল ভাবতে পারেন না। মহিমাচরণের কথায় কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে তিনি বলেন : কি বলছে বুঝতে পারছি না।'

তখন সন্ধ্যা সাতটা। শীতের সন্ধ্যা। মাষ্টার ঠাকুরের নিকট হতে বিদায় নেন। নিকটেই মহিমাচরণের বাড়ী। মাষ্টার মশাই মহিমার একজন গুণগ্রাহী। উদ্যানবাটী হতে তাঁরা দুজনে কিছু দূর একত্রে হেঁটে যান।

মহিমাচরণ (মাষ্টারকে লক্ষ্য করে) : 'ওঁকার-তত্ত্ব লয়কাণ্ড পড়লে বুঝবে।' কিছুক্ষণ থেমে মহিমা আবার বলেন : 'আজ উনি (ঠাকুর) বল্লেন, মহেন্দ্রের শীঘ্র হবে।

'উনি তো আর সাধারণ গুরু নন, শাস্ত্রে বর্ণিত সাধারণ গুরুর স্তর পেরিয়ে গেছেন। শাস্ত্রে বলেছে সদ্‌গুরুর কাছ থেকে তত্ত্ব শুনতে হয়। সাধুমুখে বারবার শুনে তত্ত্বের তাৎপর্য হৃদয়ে দৃঢ় অঙ্কিত হয়। তারপর পরমাত্মার প্রত্যক্ষ দর্শনলাভ হয়।

'লোকে শাস্ত্র পড়ে বুঝে একরকম, সাধুর মুখে শুনে বুঝে আরেক রকম, আর প্রত্যক্ষদর্শন করে ধারণা করে অন্যরকম।'

মহিমাচরণ নানা সদ্‌গুণযুক্ত হলেও তাঁর চরম দুর্বলতা ছিল লোকমান্যের লালসা। যাতে লোকে তাঁকে ধনী, বিদ্বান, ধার্মিক, দানশীল ইত্যাদি মনে করে, এই ভাবনা তাঁর সকল আচার-আচরণের মধ্যে প্রকাশ পেত, অনেক সময় অপরের নিকট হাস্যাস্পদ করে তুলত। তাঁর বিশাল বপু, সুন্দর কান্তি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, বাকছটা অনেক ব্যক্তিকেই সাময়িকভাবে হলেও আকর্ষণ করত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁর মনোগত ভাব জেনে তাঁকে বলেছিলেন : 'তুমি পণ্ডিত, ইহাদিগকে কিছু উপদেশ দাও গে।' মহিমাচরণ নিজেকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বড় সমঝদার মনে করতেন। (লীলাপ্রসঙ্গ, ৫।৩৬৫-৯ দ্রষ্টব্য)।

মহিমাচরণ শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলতে থাকেন : 'পরমহংসদেবের দুটো বিষয় লক্ষ্য করার মত। প্রথম, তাঁর অনন্যসাধারণ জীবন। দ্বিতীয়, লক্ষ্য করে দেখ তাঁর কথা বলার সময় কোন অহঙ্কার প্রকাশ পায় না। পাছে অহঙ্কার হয় সেজন্য পরের মুখ দিয়ে বলান।' আবার অনেকসময় তিনি নিজেকেই ঠাকুরের যোগ্য মুখপাত্র হিসাবে জাহির করতেন।

কথামৃতের পাঠকের মনে থাকতে পারে যে, মহিমাচরণের হিসাবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 'একটি সাধু বা ভক্ত', তার বেশী কিছু নয়। (কথামৃত

---

১ মথুরামোহন বিশ্বাসের পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ।

৪।২৪।৩)। এখন তিনিই আবার মহাবিজ্ঞের মত বলেন : 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের মত Indiaতে কাউকে দেখিনি।'

মহিমাচরণের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মাষ্টার মশাই শেয়ারের গাড়ীতে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করেন। সমস্তদিনের মধুর স্মৃতি সুগন্ধ পুষ্পের মত তাঁকে যেন আচ্ছন্ন করে রাখে।

* * *

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর হতে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুআরি পর্যন্ত কাশীপুর উদ্যান-বাটীতে রামকৃষ্ণলীলার প্রথম পর্ব।

প্রথম পর্ব বিবিধ কারণেই তাৎপর্যপূর্ণ। তুলনামূলকভাবে এই কালেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাধির প্রাবল্য সবচেয়ে নিস্তেজ হয়েছিল, তিনি নিজেও অনেকটা সুস্থ বোধ করছিলেন। ভক্তদের আসরে বারবার আলোচনা চলেছিল অবতারদেহে ব্যাধির সম্ভাব্য তাৎপর্য সম্বন্ধে। ঠাকুরের বচনামৃত হতেই জানা যায় যে, 'জগদ্ধিতায়' ঈশ্বরের নরদেহ-ধারণ। অবতারপুরুষের আধিব্যাধি রোগশোক সব কিছুই মানুষের কাছে নজীরের জন্য, আদর্শ-স্থাপনের জন্য। ঘটনাবলী অনুসরণ করে দেখা যায় ঠাকুরের দেহে ব্যাধির সূত্র ধরে যথার্থ রামকৃষ্ণানুরাগিগণ পৃথক্ হয়ে দাঁড়িয়েছেন; অবতারের লোকসংগ্রহের কাজে নির্বাচিত অন্তরঙ্গগণের বাছাই হয়েছে এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা-দীক্ষার প্রগাঢ় কর্মসূচী চালু হয়েছে। যুবক অন্তরঙ্গ ভক্তগণ উদ্যানবাটীতে সমবেত হয়েছিলেন অসুস্থ ঠাকুরের সেবাশুশ্রূষার জন্য, কিন্তু কাশীপুরের প্রথমপর্বের শেষাংশে স্পষ্টভাবে দেখা গেল অধিকাংশের সাধন ভজন তথা রামকৃষ্ণ-চর্চা ও চর্যাই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে; ঠাকুরের সেবাযত্নাদি যেন তাঁদের সাধনভজনের অঙ্গরূপে পরিগৃহীত হয়েছে। তাঁদের যেমন ছিল তন-মন-প্রাণ-সমর্পিত দরদের সেবা, তেমনি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-উদ্বোধিত ভগবদ্দর্শনের জন্য ব্যাকুলতা। নিরঙ্কুশ তাঁদের আন্তরিকতা, নিরলস তাঁদের অধ্যবসায়। আর এই সকল বিবিধ আয়াস-প্রয়াসের ফলশ্রুতিস্বরূপ এই পর্বেই বীজাকারে গড়ে ওঠে রামকৃষ্ণভক্তগোষ্ঠী এবং তার কেন্দ্রস্থলে রামকৃষ্ণপ্রচারের প্রধান কর্মযন্ত্র, ত্যাগীভক্তসঙ্ঘ। বলা বাহুল্য, সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই এই সঙ্ঘবীজ আত্মপ্রকাশ করে। শ্রীমা বলেছিলেন : "তাঁর (ঠাকুরের) ইচ্ছামৃত্যু ছিল। সমাধিতে অনায়াসে দেহ ছাড়তে পারতেন। বলতেন, 'আহা, ওদের (ছেলেদের) একটা ঐক্য করে বেঁধে দিতে পারতুম!' এতদিন তো এ বলেছে, 'নরেনবাবু কেমন আছেন?' ও বলেছে, 'রাখালবাবু কেমন আছেন?' —এই রকম ছিল। তাই অত কষ্টেও দেহ ছাড়েন নি।" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২।৬৫)। রামকৃষ্ণ-ভাবধারা প্রচার ও প্রসারের উদ্যোগ দানা বেঁধে ওঠে, সেই সঙ্গে উদ্যোগের পুরোধারূপে প্রতিষ্ঠিত হন 'খাপখোলা তলোয়ার' নরেন্দ্রনাথ। এই পর্বেই নরেন্দ্রনাথের জীবন-দিগন্তে দেখা যায় ত্যাগ-বৈরাগ্যের ঝড়ের পূর্বাভাস, স্বরূপসন্ধানের অভিযানে তাঁর দুরন্ত গতি। ফলতঃ কাশীপুরের প্রথম পর্ব নরেন্দ্রনাথের আগতপ্রায় সম্ভাবনাপূর্ণ জীবনের 'স্প্রিংবোর্ড'। আবার এই পর্বেই শ্রীমায়ের সঙ্ঘজননীর ভবিষ্যতের ভূমিকা অস্পষ্ট হলেও রূপ পরিগ্রহ করতে সুরু করে। এই সকল কারণে কাশীপুরের প্রথম পর্ব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

কিন্তু সকল কিছুর কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন 'প্রেম পাথার' শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর অপার্থিব ভাল-বাসা প্রথম তিন সপ্তাহের মধ্যেই কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে ভক্তগোষ্ঠীর জীবনধারাতে পরিবর্তন নিয়ে আসে। মহেন্দ্র দত্ত যথার্থই লিখেছেন : 'কাশীপুরের বাগানের প্রত্যেক প্রসঙ্গটিই হইল

যেন ভালবাসার একটি আদর্শ সমুদ্রবিশেষ।··· ভগবান যে ভালবাসার মূর্তি – এইটি তখন সকলে অনুভব করিতে পারিত। ভালবাসার জন্যই ভালবাসা। প্রত্যেক ব্যক্তিতেই যেন ভালবাসা মাখানো রহিয়াছে। পরমহংস মশাই ছিলেন ভালবাসার কেন্দ্র এবং প্রত্যেকেই যেন ভালবাসার এই কেন্দ্র হইতে বিচ্ছুরিত এক একটি বিন্দু বা জীবন্ত সচল ভালবাসার মূর্তি হইয়াছিল।··· ভবিষ্যৎ জগৎ বুঝিতে পারিল যে কাশীপুরের বাগানে কী এক অভূতপূর্ব ভাবের উৎস উঠিয়াছিল, যাহাতে সমস্ত জগৎ স্তম্ভিত হইয়া যাইল। সম্ভবতঃ পরমহংস মশাই দেহত্যাগ করিবেন, এইজন্য, ভিতরকার যত ভালবাসা উচ্চভাব ও মহতীশক্তি একসঙ্গে প্লাবনস্বরূপ অল্পদিনের মধ্যে এইস্থানে বিকাশ করিয়াছিলেন।' (গুরুপ্রাণ রামচন্দ্রের অনুধ্যান: পৃঃ ৪২-৩)। বাস্তবিকই কাশীপুর উদ্যানপ্রাঙ্গণে রামকৃষ্ণ-প্রেম-সংবহন এক অনন্যসাধারণ দিব্যপরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।

কখনও কখনও এই অপার্থিব ভালবাসা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। কৃপাজলধি শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাবর্ষণ ভক্তহৃদয়ের তৃষিতপনের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করেছিল। আনন্দবিহ্বল ভক্তগণ 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে অধীর হয়ে উঠেছিল, ভাবের আবেগে প্রেমাশ্রু বিসর্জন করেছিল,—তাঁদের দেখে মনে হয়েছিল 'ক্ষ্যাপার হাটবাজার'। এইরূপ বিশেষ একটি দিন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুআরি। সেদিন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বজনসমক্ষে তাঁর 'নিষ্কারণ ভকত-শরণ' স্বরূপটি অপাবৃত করেছিলেন, উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে 'প্রেমভাণ্ড ভেঙে' দিয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের ঘটনাপঞ্জী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ২রা জানুআরি হতে ঘটনাস্রোত গতিমুখ পরিবর্তন করেছে, নূতন নূতন প্রান্তর অতিক্রম করে অগ্রসর হয়েছে চরম পরিণতির দিকে।

কামারপুকুর

শ্রীস্বদেশ বসু

কত ছোট, ছোট তার সীমা, মরা নদী, আম্রবীথি, সবুজ প্রান্তর,
নীল আকাশের নীচে, তরুছায়ায় ঘেরা, যুগতীর্থ কামারপুকুর।
তবু যেন মনে হয় সে এক সংগীতমুখর আর এক পৃথিবী,
পুণ্যতোয়া সুগভীর জীবনের অনির্বচনীয় চিরন্তনী ছবি।
তৃষিত নয়ন ভক্তজনের সমাগমে, সবুজ প্রাণের মুক্ত মেলা,
পরম-আশ্রয় অভয়ারণ্য, শান্তির একান্ত পরিবেশে খেলা।
নররূপী-ব্রহ্মের শৈশব-কৈশোর-যৌবনের নিত্য লীলাভূমি,
কত প্রেম, কত স্মৃতি দিয়ে ঘেরা অহরহ দেয় হাতছানি।
মাঝে মাঝে ছুটে যায় উদাসী মন, কী এক দুর্নিবার টানে,
অতৃপ্ত আকর্ষণে, 'বেলা শেষে বাসনার আগুনে' খুঁজে পায় জীবনের মানে॥

জন্মাষ্টমী

শ্রীমতী কুন্তলা দত্ত

পাঁচহাজার বছর বা তারও বেশী আগের কথা।

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথির মধ্যরাত্রে পুণ্য ভারতভূমির একটি অন্ধকার কারাকক্ষ অপূর্ব এক স্নিগ্ধজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সেই কারাকক্ষে শৃঙ্খলিতা দুঃখিনী মায়ের কোলে আবির্ভূত হলেন শ্রীভগবান। চতুর্ভুজ মূর্তি স্মিতহাস্যে অভয় দিল 'ভয় নেই; আমি এসেছি।'

তিনি শুধু 'এসেছি' বলেননি। কুরুক্ষেত্রে বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে বল্লেন, 'ধর্মসংস্থাপনের জন্য, সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।' তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন—বললেন, 'আমি যুগে যুগে আসি।'

কেন আসেন? না, সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য। কিন্তু সেজন্য তাঁর নিজের আসার কি দরকার? সর্বশক্তিমান ভগবানের ইচ্ছামাত্রই তো সাধুদের পরিত্রাণ ইত্যাদি হতে পারে? তবে কেন তিনি নিজে নরদেহ ধরে ধরণীর ধূলিতে অবতীর্ণ হন?

তিনি নিজেই আসেন কারণ, আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর অষ্টপাশবদ্ধ ভবরোগ-বিকারগ্রস্ত জীবদের তিনি ভালবাসেন—তাই আমাদের সঙ্গে খেলতে আসেন। রাজরাজেশ্বর আমাদের ভালবেসে আমাদের হৃদয়ে একটু স্থান পাবার জন্যে কত কাণ্ডই করছেন—আমরা অন্ধ, আমরা বধির, দেখিও না, শুনিও না।

তাঁর কটাক্ষে সহস্র অসুর নিহত হতে পারে। কিন্তু তিনি ক্রীড়াচঞ্চল, কৌতুকময় রাখাল বালকটি হয়ে আমাদের সঙ্গে খেলতে চান। তাই তাঁকে নিজেই আসতে হয়—এসে যশোদার হাতের চড়চাপড় খেতে হয়, উদূখলের সঙ্গে বাঁধা থাকতে হয়, শ্রীরাধার পায়ে ধরে মানভঞ্জন করতে হয়—আরও কত কি? স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত থেকে অসুরবিনাশ ধর্মসংস্থাপন ইত্যাদি হয়, কিন্তু সুমধুর নরলীলা তো হয় না! তাই কংস-কারাগারে অখিলব্রহ্মাণ্ডপতি জন্ম নিলেন।

ভগবানের ভালবাসা! ক্ষুদ্র জীবের কি সাধ্য যে সেই প্রেমের ধারণা করে? কি অসীম সেই ভালবাসা, যেজন্য আমাদের এই রোগশোকপূর্ণ ধরণীতে এসে নরদেহ নিয়ে কখনো 'সীতা সীতা' বলে আকুল হয়ে বনে বনে কেঁদে বেড়াচ্ছেন, ভক্ত সুগ্রীবের জন্য বালিবধের কলঙ্ক মাথায় তুলে নিচ্ছেন, আবার প্রাণাধিকা সীতাকে প্রজানুরঞ্জন তথা লোকশিক্ষার জন্য বনবাস দিয়ে অনাসক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন, আবার কখনও দেখি ভক্তের জন্য সহস্র দুর্নাম মাথায় তুলে নিয়ে তাকে বিপদসাগর থেকে উদ্ধার করছেন, এমন কি বীরসমাজে হেয় সারথির বৃত্তি, তাও ভক্তের জন্য স্বীকার করছেন!

কখনও বা ভবরোগগ্রস্ত জীবের উদ্ধারের জন্য পরমাসুন্দরী স্ত্রী ও প্রভূত ধনমান হেলায় ত্যাগ করে নেড়ামাথায় ছেঁড়া কাঁথা সম্বল করে দ্বারে দ্বারে ঘুরে লোকের পায়ে ধরে ভিক্ষা চাইছেন—'একবার হরি বলে আমায় কিনে নাও'। যেন কত দায়ে ঠেকেছেন! আমাদের পাষাণ-হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার করবেন—তাই 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে চোখের জলে ভেসে পথের ধূলায় আছাড় খেয়ে পড়ছেন—কাঁচা সোনার বরণ অঙ্গ ধূলায় ধূসর।

কখন আবার দেখছি দরিদ্র ব্রাহ্মণঘরে জন্ম

নিয়ে 'চালকলাবাঁধা' বিদ্যে শিখতে অস্বীকার করে তরুণ সাধকরূপে ভাগীরথী-তীরে 'মা, দেখা দিলি নে' বলে মাটিতে মুখ রগড়ে কাঁদছেন—শেখাচ্ছেন কি করে তাঁকে ডাকতে হয়। জীবের পাপ-তাপ নিয়ে ভয়াবহ কর্কটরোগে তিলে তিলে দেহপাত করছেন। কিন্তু ঐ রোগের অত যন্ত্রণার মধ্যেও করুণাঘন মূর্তিতে অহরহ ঈশ্বর-প্রসঙ্গ করছেন; তাপিত জীবের কল্যাণ-চিন্তায় রোগযন্ত্রণাকে উপেক্ষা করছেন।

তবু কি আমাদের চৈতন্য হয়? আমাদের ভালবেসে তিনি এসেছেন আমাদের কাছে—তাঁর অভ্যর্থনার কোনো আয়োজন করেছি কি? কোনো বিশিষ্ট লোক বাড়ীতে আসার কথা থাকলে ঘরদোর পরিষ্কার করে সাজিয়ে গুছিয়ে নিজেরা সেজে আমরা তাঁর অভ্যর্থনা করি। আর রাজার রাজা আসবেন—অথচ হৃদয়মন্দিরে সেই মাধবকে বসানোর কোনো আয়োজন করছি না। মন্দির মার্জনা হয়নি—বিষয়বাসনা, হিংসাদ্বেষ, মানযশের লালসা—এ সব জঞ্জালে হৃদয়মন্দির পূর্ণ, তাতে এগারজন চামচিকের আড্ডা। শুধু ভোঁ ভোঁ করে শাঁখ বাজিয়ে আড়ম্বর করছি। অহঙ্কারের অন্ধকারে মজে আছি। ভক্তির দীপও জ্বালা হয়নি।

আমরা তাঁর আদর জানি না। কিন্তু তিনি করুণাময়। কংস-কারার অন্ধকারে, ঐ অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে তিনি এসেছিলেন। তেমনি আমাদের এই সঙ্কীর্ণ, অজ্ঞানের অন্ধকারসমাচ্ছন্ন হৃদয়ে তিনি কৃপা করে আবির্ভূত হয়ে স্বীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করবেন—তিনি যে বলেছেন 'আমি যুগে যুগে আসি।' হৃদয়ে হৃদয়ে এ ভাবে তাঁর জন্মাষ্টমী উদ্‌যাপিত হয়। আমাদের হৃদয়ের অন্ধতমিস্রা দূর করতে তাই তাঁকে ডাকি—

'জাগো জাগো শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী।
জাগো শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণাতিথির তিমির অপসারি॥'

লীলাময়

শ্রীধনেশ মহলানবীশ

বাগান দেখেই মুগ্ধ সবাই
　নাই যে রে সন্ধান
এমন সুন্দর বাগানখানি
　কাহার অবদান।

যো সো করে যা নারে তুই
　কাছে একটি বার
দেখতে পাবি তাঁর ঐশ্বর্যের
　নাই রে পারাপার।

হৃদয় মাঝেই আছেন, তবু
　মরছি তাঁরেই খুঁজে
লীলাময়ের এই যে লীলা
　কে বলতো বুঝে?

স্বামীজীর পত্রাবলী ঃ একটি সংখ্যাভিত্তিক আলোচনা

শ্রীসুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী সমসাময়িক কালে অগণিত সাধারণ ও অসাধারণ মানুষের প্রাণে জ্বলন্ত প্রেরণা সঞ্চার করেছে, আজও করছে এবং অনাগতকালেও করবে। ঈশ্বরজানিত পুরুষদের বার্তা প্রচারের এক একটি নিজস্ব রীতি আছে। বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে বাণী প্রচারের মূল মাধ্যম ছিল, জনসমাবেশে দৃপ্ত ভাষণ। সেই উদাত্ত কণ্ঠের বাণী প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা শুনেছেন তাঁরা ধন্য, আর যে সব অনুগতপ্রাণ সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাদের বক্তব্য রোমাঁ রোলাঁর ভাষায় বলা যায়: সঙ্গীতের মত তাঁর কথাগুলি, বীঠোফেনের মত তাঁর রচনা, হেণ্ডেলের ঐকতানের মত তাঁর উদ্দীপ্ত ছন্দ। কথাগুলি বইয়ের পাতায় ছড়িয়ে আছে, আজ এত বছর পরেও যখন তাদের স্পর্শ করছি শরীরে যেন ইলেকট্রিক শক লাগছে। তাহলে কী সে চমক, কী না উন্মাদনা পেয়েছিল তারা—যারা এই আগুনের মত কথাগুলি বীরের মুখ থেকে শুনেছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ মূলতঃ লেখক ছিলেন না। বাংলায় 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'বর্তমান ভারত' ও 'ভাববার কথা' এবং ইংরেজীতে অল্প কয়েকটি প্রবন্ধ ছাড়া লেখনী ধরে তিনি বিশেষ কিছু রচনাকৃতি রেখে যাননি। কিন্তু স্বামীজীর যে বজ্রনির্ঘোষ-বাণী মানুষকে অশেষ আত্মত্যাগের পথে আহ্বান করেছে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আঙুলকে নয়' সেই বাণী বহুলভাবে ছড়িয়ে রয়েছে স্বামীজীর স্বহস্তে লেখা অসংখ্য পত্রাবলীর মধ্যে। সতীর্থ, শিষ্য ও সুহৃদবর্গকে লেখা এই চিঠিগুলি যেন তাঁর দৃপ্ত কণ্ঠের ওজস্বিনী বাণী। পাঠকের দিকে তাকিয়ে ভাষার লালিত্য বজায় রেখে সাহিত্য-কীর্তির জন্য এগুলি রচিত হয়নি। স্বামীজীর জীবনের মহান উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করতে সেদিন যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন এবং যাঁদের উদ্দীপিত করে এই ত্যাগব্রতে দীক্ষিত করা যাবে বলে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁদের কাছেই তিনি এই অমূল্য বাণীসম্পদ রেখে গিয়েছিলেন। সমস্ত ভাবীকালের মানুষ আজ তার উত্তরাধিকারী। ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন ও রেনেসাঁর পথিকৃৎ এবং পথিকেরাও স্বামীজীর পত্রাবলী থেকেই সবচেয়ে বেশী প্রেরণা পেয়েছেন। সুতরাং এই পত্রাবলী সম্পর্কে নানা কৌতূহল অনেকেরই থাকা স্বাভাবিক। স্বামীজীর মোট পত্রসংখ্যা কত, অধিকাংশ পত্র কখন এবং কাদের কাছে লেখা, বাংলায় বেশী লিখেছেন না ইংরেজীতে বেশী ইত্যাদি অনেক তথ্য সম্পর্কে জানবার আগ্রহ আমাদের অনেকেরই আছে। তাই তাঁর পত্রাবলী সম্পর্কে একটি সংখ্যাভিত্তিক আলোচনার প্রয়োজন উপেক্ষা করা যায় না।

স্বামীজী তাঁর বহু-পর্যটিত জীবনে বহু ভারতীয় ও বিদেশী মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন এবং অনেক জ্ঞানী ও গুণী মানুষের সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। জীবনে পত্রও তিনি নিশ্চয় লিখেছেন অসংখ্য, কিন্তু অন্যান্য ভাষণ ও কথোপকথনের প্রতিলিপির মত (সংকেত-লিপিকার ও শিষ্য গুডউইনের অকালমৃত্যুতে তাঁর কাছে সূত্রাকারে রক্ষিত স্বামীজীর অনেক বাণী-সম্পদ যে আমরা হারিয়েছি এ সংবাদ সুবিদিত) পত্রাবলীর একটা বিপুল অংশও নিশ্চয় আমাদের অগোচরে রয়ে গিয়েছে। তবে যা হারিয়ে গেছে

তার জন্য আক্ষেপ করা বৃথা, যেটুকু পেয়েছি তাই নিয়েই আমাদের বর্তমান আলোচনা।

উদ্বোধন কার্যালয় থেকে দুইখণ্ডে বাংলা যে পত্রাবলী প্রকাশিত হয় তার পত্র-সংখ্যা ৪০৬।[১] ইংরেজী বাণী ও রচনায় (Complete Works of Swami Vivekananda) মোট ৫৪০টি পত্র স্থান পেয়েছে। স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে উদ্বোধন কার্যালয় থেকে বাংলায় প্রথম 'স্বামীজীর বাণী ও রচনা' প্রকাশিত হয় এবং তাতে ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম খণ্ডে মোট ৫৫২টি পত্র সংযোজিত হয়েছে। ঐ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ কিছুকাল আগে প্রকাশিত হয়েছে এবং ১০ম খণ্ডে অতিরিক্ত ২টি পত্র প্রকাশিত হয়েছে—একটি আমেরিকা থেকে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মন্মথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা এবং অপরটি হরিদাস বিহারীদাস দেশাই-এর ভ্রাতুষ্পুত্র গিরিধারীদাস মঙ্গলদাস হরিদাস দেশাইকে নিউ-ইয়র্ক থেকে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লেখা। এই ৫৫৪টি[২] পত্রের মধ্যে ৪০৩টি ইংরেজীতে, ১৪৬টি বাংলায়, ৩টি সংস্কৃতে এবং ২টি ফরাসী ভাষায় লেখা। স্বামীজীর সংস্কৃতজ্ঞান সুবিদিত, কিন্তু অনেকেই হয়তো জানেন না যে, তিনি ফরাসী ভাষাও আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি হিন্দীভাষাও জানতেন এবং ঐ ভাষায় বক্তৃতাও করেছেন, কিন্তু হিন্দীতে লেখা তাঁর কোন চিঠি প্রকাশিত হয়নি।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুআরি স্বামীজীর জন্ম, ১৮৮১ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। ১৮৮৬ খ্রীঃ শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর স্বামীজী ও অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প নিলেন কলকাতার অদূরে আঁটপুর গ্রামে এবং ১৮৮৮ খ্রীঃ থেকে শুরু হল স্বামীজীর পরিব্রজ্যা। পত্রাবলীর প্রথম পত্র ঐ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দেই লিখিত। তার আগে স্বামীজীর যদি কোনো পত্র থেকে থাকে (না থাকা খুবই অস্বাভাবিক), তা আত্মীয় ও বন্ধুদের লেখা খুব ব্যক্তিগত চিঠিও হতে পারে, আবার দর্শন-বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসু যুবা নরেন্দ্রের সংগ্রামী মনের পরিচয়বাহী চিঠিও হতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের কাছে তার কোনো তথ্যই নেই।*

ভারতবর্ষে পরিব্রাজক জীবন সমাপ্ত করে স্বামীজী ১৮৯৩ খ্রীঃ ৩১শে মে বোম্বে থেকে আমেরিকা যাত্রা করেন এবং ঐ বৎসরই ১১ই সেপ্টেম্বর চিকাগো ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা করে জগৎ-সমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়েন। ১৮৮৮ খ্রীঃ থেকে ১৮৯৩ খ্রীঃ পর্যন্ত ত্যাগ তপস্যা ও কর্মপ্রস্তুতিতেই স্বামীজীর জীবন ব্যাপৃত ছিল, তাই এই কয়েক বছর তাঁর পত্রসংখ্যাও খুব বেশী নয়। ১৮৯৪ থেকে ১৮৯৬ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি আমেরিকা ও ইংলণ্ডে তাঁর প্রচার-অভিযান চালিয়ে যান এবং তাঁর মিশনের একটা স্থায়ী রূপ দেবার পরিকল্পনা করেন। ঐ তিন বৎসরই তিনি অতুলনীয় পরিশ্রম করেছেন এবং সবচেয়ে বেশী পত্রও লিখেছেন। তার মধ্যে সর্বাধিক পত্র লেখা ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। আমেরিকাই ছিল স্বামীজীর মূল কর্মকেন্দ্র, ভারতের চাইতে ঐ দেশ থেকেই তিনি বেশী চিঠি লিখেছেন। ১৯০২ খ্রীঃ ৪ঠা জুলাই এই কর্মময় ভাস্বর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

---

১ ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩৫৫ সালে, পত্র সংখ্যা ১৬৬ এবং ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩৫৬ সালে, পত্র সংখ্যা ২৪০। পরবর্তী সংস্করণে কোনো পরিবর্ধন ছিল না।

২ শ্রীমতী মেরী লুই বার্ক লিখিত Swami Vivekananda, His Second Visit to the West : New Discoveries গ্রন্থে আরো ১৫টি অপ্রকাশিত পত্র প্রকাশিত হইয়াছে।—সঃ

* হার্বার্ট স্পেন্সারের সহিত নরেন্দ্রনাথের পত্র-বিনিময় সুবিদিত।—সঃ

নিম্নের তালিকা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে তিনি কোন্ সালে কোন্ কোন্ স্থান থেকে কতগুলো চিঠি লিখেছিলেন :

খ্রীষ্টাব্দ	ভারত	আমেরিকা	ইংলণ্ড	অন্যান্য স্থান	মোট
১৮৮৮	৪	—	—	—	৪
১৮৮৯	১৬	—	—	—	১৬
১৮৯০	২৯	—	—	—	২৯
১৮৯১	৪	—	—	—	৪
১৮৯২	৫	—	—	—	৫
১৮৯৩	৮	৯	—	১	১৮
১৮৯৪	—	৭৮	—	—	৭৮
১৮৯৫	—	৭১	২১	৫	৯৭
১৮৯৬	—	২২	৩৬	১৭	৭৫
১৮৯৭	৬৮	—	—	১	৬৯
১৮৯৮	২৭	—	—	—	২৭
১৮৯৯	৬	২৩	৩	১	৩৩
১৯০০	৬	৪৮	—	১৩	৬৭
১৯০১	২১	—	—	১*	২২
১৯০২	১০	—	—	—	১০
সর্বমোট—	২০৪	২৫১	৬০	৩৯	৫৫৪

এবারে স্বামীজীর অধিকাংশ পত্র কাদের লেখা এবং কীরূপ ভাবধারা তাতে প্রতিফলিত সে প্রসঙ্গে আসা যাক। পূর্বেই বলা হয়েছে স্বামীজীর অধিকাংশ পত্রই (শতকরা ৭২.৭) ইংরেজীতে লেখা। বাংলা ১৪৬টি পত্র স্বামীজী লিখেছিলেন, এগুলি অধিকাংশই গুরুভ্রাতাদের কিংবা প্রমদাদাস মিত্র, বলরাম বসু প্রমুখ সহৃদ্‌বর্গকে লেখা। গুরুভ্রাতাদের কাছে তিনি বহু ইংরেজী চিঠিও লিখেছেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনি এককভাবে সবচেয়ে বেশী চিঠি লিখেছেন তাঁর মান্দ্রাজী শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে ; এঁরই নেতৃত্বে মান্দ্রাজী যুবকেরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করেছিলেন এবং ভারতে স্বামীজীর ভাবাদর্শ প্রচারে এঁদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। আলাসিঙ্গাকে লেখা পত্রের মাধ্যমে স্বামীজী তাঁর মান্দ্রাজী যুবক শিষ্যদের প্রাণে আগুন জ্বালাতে চেয়েছিলেন, যেমন ব্রহ্মানন্দ কিংবা রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা চিঠিতে সকল গুরুভ্রাতাদের প্রাণে নূতন কর্মোদ্যম ও প্রেরণা সঞ্চারের প্রয়াস ছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৮৯১ থেকে ১৮৯৩ খ্রীঃ পর্যন্ত স্বামীজী গুরুভ্রাতাদের কোনো চিঠিই লেখেননি, পরিব্রাজকরূপে ঘুরে বেড়াবার সময় তিনি সাধারণতঃ তাঁদের দেখা-সাক্ষাৎ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতেন, হয়তো মায়িক বন্ধনকে সম্পূর্ণ ছিন্ন করার কামনায়, হয়তো তাঁর অধ্যাত্মজীবনের

* ঢাকা অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ থেকে লেখা।

বিবর্তনের পথে কিছুকাল এই দূরত্ব বজায় রাখা প্রয়োজন মনে করতেন। চিকাগো ধর্মসভায় সাফল্যের বেশ কয়েকমাস পরে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ তিনি রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা চিঠির মধ্য দিয়ে গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করেন। সে যাই হোক, স্বামীজীর আদর্শ ভাব ও প্রেরণাশক্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখা যায় আলাসিঙ্গা ও গুরুভ্রাতাদের কাছে লেখা এই চিঠিগুলির মধ্যেই। বলা যেতে পারে তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট রচনা এই পত্রাবলী।

এঁদের বাদ দিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে তিনি অধিক পত্র লিখেছেন প্রমদাদাস মিত্রকে। ইনি কাশীর জমিদার ছিলেন, পাণ্ডিত্য, ধর্মানুরাগ ও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির জন্য স্বামীজী এঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী ও তাঁর গুরুভ্রাতাগণ এঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন অনেক সময়। ১৮৮৮ খ্রীঃ থেকে ১৮৯০ খ্রীঃ পর্যন্ত অধিকাংশ পত্রই এঁকে লেখা, এ সব পত্রে কুশল সংবাদাদি ও শাস্ত্রালোচনাই স্থান পেয়েছে। কিন্তু ধর্মানুরাগ ও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি সত্ত্বেও তিনি ছিলেন গোঁড়া হিন্দু. তাই স্বামীজীর বিদেশ ভ্রমণ ও ধর্মের নব ব্যাখ্যা তাঁর হয়তো খুব মনঃপূত ছিল না, ৩০শে মে ১৮৯৭ খ্রীঃ লেখা (৩২৯ নং পত্র) স্বামীজীর পত্রে এই ইঙ্গিতই পাওয়া যায়। তাছাড়া জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে লেখা স্বামীজীর ১৩টি পত্র প্রকাশিত। এঁর সঙ্গে স্বামীজী ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং এঁরই সৌজন্যে ভারতের বহু দেশীয় রাজ্যের রাজার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল, যাঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে খেতড়ির মহারাজ অজিত সিং-এর নাম অগ্রগণ্য। স্বামীজীর কাজে তিনি প্রভূত অর্থসাহায্য করেছিলেন এবং তাঁর প্রেরণায় বহু জনহিতকর কাজ করেছিলেন। শোনা যায়, তাঁরই অনুরোধে স্বামীজী 'বিবেকানন্দ' নাম গ্রহণ করেছিলেন।

স্বামীজীর ৬৯টি পত্র মাত্র একটি পরিবারের লোকদের লেখা, তা হল চিকাগোর হেলপরিবার। চিকাগো ধর্মসভার পূর্বদিন স্বামীজী যখন সহায়-সম্বলহীনভাবে চিকাগোর পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, একটি সহৃদয়া নারী সেদিন স্বামীজীকে সযত্নে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। ইনি মিসেস্ জর্জ ডব্লু. হেল। মিঃ হেলকে ফাদার পোপ ও মিসেস্ হেলকে মাদার চার্চ বলে স্বামীজী সম্বোধন করতেন এবং কন্যাদ্বয় মেরী হেল ও হ্যারিয়েট হেলকে ভগিনীর মত স্নেহ করতেন। এই পরিবারের আরো দুটি কন্যা মিস্ ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলি ও হ্যারিয়েট ম্যাক্‌কিণ্ডলিকেও স্বামীজী খুব স্নেহ করতেন। এই পরিবারের সৌজন্য তিনি কখনও বিস্মৃত হতে পারেননি, চিকাগোতে এঁদের গৃহে তিনি বহুবার পদার্পণ করেছেন। এঁদের মধ্যে মেরী হেলকেই তিনি সবচেয়ে বেশী চিঠি লিখেছেন। এই পত্রগুচ্ছের মধ্যে স্বামীজীর স্নেহ প্রীতি ও শুভেচ্ছাই বেশী প্রকাশ পেয়েছে। হেল ভগিনীদের সম্পর্কে স্বামীজীর ধারণা ও অভিপ্রায় মেরী হেলকে ১৮৯৬ খ্রীঃ ১৭ই সেপ্টেম্বর লেখা (২৯৪ নং পত্র) চিঠিতে অনেকটা পরিস্ফুট। মেরী হেলকে ১৮৯৫ খ্রীঃ ১লা ফেব্রুআরি লেখা (১৫৯ নং পত্র) আর একটি পত্রের প্রতি আমি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যাতে স্বামীজীর সন্ন্যাসী-সত্তা অগ্নিবৎ জ্বলে উঠেছে। এবং এর পরেই মেরী হেলের সঙ্গে স্বামীজীর পদ্যচ্ছন্দে অপরূপ কয়েকটি পত্রালাপ ঘটে। পরিহাসে ভরা অথচ একান্ত গভীর এই চিঠিগুলো পত্রাবলীতে সংযোজিত না হয়ে 'বাণী ও রচনা'র ১০ম খণ্ডে 'একটি অপরূপ পত্রালাপ' শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রালাপের প্রথম পত্রটি ১৮৯৫ খ্রীঃ ১৫ই ফেব্রুআরি লেখা।

বিদেশী শিষ্য ও সুহৃদদের মধ্যে এককভাবে তিনি মিসেস্ বুলকেই সর্বাধিক পত্র লিখেছিলেন। ইনি নরওয়েবাসী বিখ্যাত বেহালাবাদক মিঃ ওলিবুলের স্ত্রী। স্বামীজীর শিষ্যত্ব তিনি গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে তাঁর কাজে অশেষ সহায়তা করেছিলেন। আর যাঁদের কাছে স্বামীজী অধিক পত্র লিখেছিলেন তাঁদের মধ্যে মিস্ ম্যাকলাউড, ভগিনী নিবেদিতা ও মিঃ স্টার্ডির নাম উল্লেখযোগ্য। মিস্ ম্যাকলাউড স্বামীজীর পাশ্চাত্যের অনুরাগী সুহৃদদের মধ্যে অন্যতমা, স্বামীজীর কাজে তিনি বহুভাবে সাহায্য করেছেন এবং আজীবন স্বামীজীর ভাবে অনুপ্রাণিত জীবন যাপন করেছেন। ১৮ই এপ্রিল, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে এঁকে লেখা (৪১৩ নং পত্র) পত্রটি স্বামীজীর সু-উচ্চ আধ্যাত্মিক সত্তার অপূর্ব প্রতিফলন।

স্বামীজীর আইরিশ শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার কথা সর্বজনবিদিত। ভারত-কল্যাণে নিবেদিত-প্রাণা এই মহীয়সী নারী স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন, তাই হয়তো খুব বেশী চিঠি তাঁকে লেখার প্রয়োজন হয়নি ; তাঁকে লেখা ৩২টি চিঠি রচনাবলীতে আছে। মিঃ স্টার্ডিকে লেখা ৩১টি চিঠি প্রকাশিত ; এই ইংরেজ মানুষটি প্রথম জীবনে ভারতবর্ষে থেকে তপস্যা করেছিলেন এবং পরে ইংলণ্ডে বেদান্ত প্রচারকাজে স্বামীজীকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। তথাপি মনে হয় স্বামীজীর মত বিরাট পুরুষকে সম্যক্‌ভাবে বোঝবার মত যথেষ্ট অন্তর্দৃষ্টি তাঁর ছিল না ; এ প্রসঙ্গে তাঁকে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ নভেম্বর মাসে লেখা (৪৩০ নং পত্র) পত্রটি কৌতূহলী পাঠকদের পাঠ করতে অনুরোধ করি।

লেগেট পরিবারকেও স্বামীজী অনেকগুলি চিঠি লিখেছিলেন। মিঃ ফ্রান্সিস লেগেট ছিলেন নিউইয়র্কের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, তিনি মিস্ ম্যাক-লাউডের বিধবা ভগিনী মিসেস্ স্টার্জিসের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এঁরা স্বামীজীকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন এবং স্বামীজীর অকুণ্ঠ আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। মিস্ এলবার্টা স্টার্জিস ছিলেন মিসেস্ লেগেটের প্রথম বিবাহের কন্যা, স্বামীজী এঁকেও অনেকগুলি চিঠি লিখেছিলেন। ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী মিসেস্ লেগেটকে 'খেয়ালীদের কংগ্রেস'-এর বিবরণ জানিয়ে একটি ভারী মজার চিঠি (৪২৭ নং পত্র) লিখেছিলেন।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীকভাষার অধ্যাপক জন হেনরী রাইট স্বামীজীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলেন। একটি পরিচয়পত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'ইনি এমন একজন মানুষ যাঁর পাণ্ডিত্য আমাদের জ্ঞানী অধ্যাপকদের মিলিত পাণ্ডিত্যকেও হার মানায়।' তিনি আরো বলেছিলেন, 'স্বামীজি ! আপনার কাছে পরিচয়-পত্র চাওয়া যেন সূর্যকে প্রশ্ন করা, তোমার কিরণ দেবার কি অধিকার ?' এঁর কাছে লেখা কয়েকটি চিঠি বাণী ও রচনায় স্থান পেয়েছে, তার মধ্যে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ ৪ঠা সেপ্টেম্বর লেখা (১০ নং পত্র) চিঠিখানি অনুরাগী পাঠকদের পাঠ করতে অনুরোধ জানাই, কারণ ঐ চিঠির সঙ্গে স্বামীজী একটি কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন, যাতে তাঁর অধ্যাত্মজীবনের একান্ত আকূতি ও পরম প্রাপ্তির কথা অনুপম ভাষায় রূপ পেয়েছে।

স্বামীজীর কাজে আরো অনেকে একান্তভাবে সাহায্য করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সিস্টার ক্রিস্টিন, মিঃ গুডউইন, মিস্ মুলার, ক্যাপ্টেন ও মিসেস্ সেভিয়ারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে প্রথম জনের কাছে দুটি ও দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে লেখা একটি মাত্র চিঠি আমরা দেখতে পাই, কিন্তু মিস্ মুলার বা সেভিয়ারদের কাছে লেখা কোনো চিঠিই ছাপা হয়নি, যদিও আমরা চিন্তাই করতে পারি না যে, স্বামীজী এঁদের

কাছে মোটেই চিঠি লেখেননি। মিস্ মূলার স্বামীজীর ইংলণ্ডের কাজে এবং বেলুড় মঠ নির্মাণের জন্য অর্থসাহায্য করেছিলেন, আর সেভিয়ারদের জীবন তো বেদান্ত প্রচার-কার্যে উৎসৃষ্ট এবং ভারতবর্ষের মাটিতেই ক্যাপ্টেন সেভিয়ার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। সেভিয়ার দম্পতির প্রতি স্বামীজীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা সম্পর্কে স্বামীজীর একটি পত্র (৪৩০ নং) থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করছি : '...আর অন্যদিকে ক্যাপ্টেন ও মিসেস্ সেভিয়ারের কথা মনে পড়ে—শীতের সময় তাঁরা আমাকে বস্ত্র দিয়েছেন, আমার নিজের মার চেয়েও যত্নে আমার সেবা করেছেন, ক্লান্তি ও দুঃখের দিনে আমার সমব্যথী হয়েছেন ; এবং এঁদের কাছে আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছু পাইনি।' সেই মিসেস্ সেভিয়ার মান মর্যাদার পরোয়া করেননি বলেই আজ হাজার হাজার লোকের পূজনীয়া। তাঁর লোকান্তরের পর লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁকে মনে রাখবে দরিদ্র ভারতবাসীর একজন অকৃত্রিম শুভার্থিনীরূপে।'

নীচে আমরা কয়েকজন ভারতীয় ও অভারতীয়দের কাছে লেখা স্বামীজীর প্রকাশিত পত্রের সংখ্যা উল্লেখ করছি :

ভারতীয়	পত্রসংখ্যা	অভারতীয়	পত্রসংখ্যা
আলাসিঙ্গা পেরুমল	৪৪	হেল পরিবার	৬৯
স্বামী ব্রহ্মানন্দ	৩৮	মিসেস্ ওলিবুল	৪৮
প্রমদাদাস মিত্র	৩৩	মিস্ ম্যাকলাউড	৩৫
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	২৪	ভগিনী নিবেদিতা	৩২
অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ	১৬	মিঃ স্টার্ডি	৩১
হরিদাস বিহারীদাস দেশাই	১৩	লেগেট পরিবার	১৯
স্বামী অখণ্ডানন্দ	১১	অধ্যাপক রাইট	৯
খেতড়ির মহারাজা	৯	অন্যান্য অভারতীয়	২৫
স্বামী তুরীয়ানন্দ	৮		
বলরাম বসু	৭		
সন্ন্যাসী শিষ্যবৃন্দ	৭		
অন্যান্য ভারতীয়	৬২		
মোট	২৭২		২৬৮

অবশিষ্ট ১৪টি চিঠির উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের নাম অজ্ঞাত।

পরিশেষে উল্লেখ্য যে, স্বামীজীর পত্রাবলীর মত মূল্যবান রচনা সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা ও আলোচনা প্রয়োজন। এটা আশার কথা যে, সম্প্রতি কোনো কোনো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায় স্বামীজীর কর্মধারা সম্পর্কে সর্বভারতীয় পত্রপত্রিকা থেকে অনেক অনুসন্ধান করা হয়েছে, যার কিছু কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছে এবং অনেকখানি প্রকাশিত হবার অপেক্ষায় আছে। স্বামীজীর পত্র সম্পর্কেও তেমনি ব্যাপক অনুসন্ধান হলে আজও নূতন পত্রের সংযোজন এবং ঐ দিব্য জীবন সম্পর্কে নূতন আলোকপাত অসম্ভব না-ও হতে পারে।

বাউল-কবি কাঙাল হরিনাথ

(১৮৩৩-১৮৯৬)

শ্রীরাধাচরণ রায়

উনবিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের মহাত্মা হরিনাথ মজুমদার বঙ্গীয় বাউলগান-রচয়িতাগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলিয়া স্বীকৃত। তাঁহার রচনা খুব উচ্চ শ্রেণীর না হইলেও গভীর ভাব ও তত্ত্ব-কথায় সমৃদ্ধ—সরল প্রাঞ্জল ভাষার গুণে চিত্তাকর্ষক। একদা বাংলাদেশের পল্লী-অঞ্চল তাঁহার হৃদয়গ্রাহী বাউল সঙ্গীতরাজি ভক্তির রস-ধারা ও আধ্যাত্মিকতার বন্যায় প্লাবিত করিয়াছিল। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে আমরা বিস্মৃতপ্রায় হরিনাথের কর্ম-জীবন সাহিত্য-সাধনা স্বদেশ-হিতৈষণা শিক্ষা-বিস্তার সংবাদপত্র-প্রচার বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ও বাউলসম্প্রদায়-গঠনের মাধ্যমে ধর্ম-প্রচার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়াসী।

'কাঙাল হরিনাথ' নামেই এই মহাপুরুষ সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার দৈন্য ও বিনয় 'কাঙাল' এই ক্ষুদ্র বিশেষণটির মধ্যেই নিহিত। ঢক্কানিনাদ দ্বারা তিনি কোনদিনই আত্মপ্রচারের প্রয়াসী ছিলেন না। নিশিদিন সৎকর্ম ও জনহিতচিন্তা তাঁহার ধ্যানের বস্তু ছিল। কোন বাধা বিপত্তিই তাঁহাকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। তিনি ছিলেন সত্যকারের একজন নীরব নিরলস ও শ্রমশীল কর্মী।

নদীয়া জেলার ক্ষুদ্র গ্রাম কুমারখালিতে (অধুনা বাংলাদেশ) এক দরিদ্র পরিবারে ১২৪০ বঙ্গাব্দের (ইং ১৮৩৩) শ্রাবণ মাসে ইঁহার জন্ম। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সুসাহিত্যিক ও 'ভারতবর্ষ'-পত্রের প্রথম সম্পাদক জলধর সেন, তন্ত্রশাস্ত্রবিশারদ অদ্বিতীয় পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, 'বিষাদ সিন্ধু'-রচয়িতা মীর মশাররফ্-প্রমুখ বিদ্বজ্জনগণ ছিলেন এই গ্রামেরই সুসন্তান এবং হরিনাথের সাহিত্যশিষ্য। পঞ্চম বর্ষ বয়সে হরিনাথ মাতৃহীন হন। পিতার দারিদ্র্য-পীড়িত সংসারে অসম প্রতিকূল পরিবেশের আবর্তে পড়িয়া হরিনাথের বিদ্যালয়ের শিক্ষা বেশী দূর অগ্রসর হইবার সুযোগ পায় নাই। কিন্তু তাঁহার প্রধান গুণ ছিল শ্রমশীলতা ও অপ্রতিহত অধ্যবসায়। নিভৃত ও শান্ত গৃহাভ্যন্তরে তিনি পুরাণাদি পাঠ শাস্ত্রচর্চা ও কাব্য-সাধনায় নিমগ্ন হইয়া অদ্ভুত সাফল্যের অধিকারী হন এবং কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' তাঁহার কবিতা প্রকাশ করিতে থাকেন। গুপ্তকবির উৎসাহ ও উপদেশে অচিরকাল মধ্যেই কাঙাল হরিনাথ একজন সুলেখক ও কবি বলিয়া পরিচিত হন। তিনি মোট আঠারখানা নীতি-ধর্মমূলক গ্রন্থ রচনা করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে যশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম পুস্তক—'বিজয় বসন্ত' (নীতিগর্ভ উপাখ্যান) ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং তৎকালে ইহা বিশেষ সমাদর ও জনপ্রিয়তা অর্জনে সমর্থ হয়। এতদ্‌ব্যতীত কতকগুলি ধর্মপুস্তক-প্রণেতারূপে তাঁহার খ্যাতি বিস্তার লাভ করে। যথা—'কবি-কল্প' (দক্ষযজ্ঞ-বিষয়ক কাহিনী), 'অক্রূর সংবাদ' (গীতাভিনয়), 'সাবিত্রী নাটিকা', 'একলব্যের অধ্যবসায়', 'ব্রহ্মাণ্ডবেদ' (৬ খণ্ড), 'কৃষ্ণকালী-লীলা' (পাঁচালী), 'বিজয়া', 'অধ্যাত্ম আগমনী', 'পরমার্থ গাথা', 'মাতৃমহিমা', 'কাঙাল ফকির চাঁদ ফিকীরের গীতাবলী' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'অক্রূর সংবাদ' পুস্তকের নান্দী অংশ হইতে চারিটি চরণ উদ্ধৃত করিয়া আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিব হরিনাথের অধ্যাত্মবোধের গভীরতা কিরূপ সুদূর-প্রসারী ছিল।

'সত্যকে রাখিলে হৃদে, ডোবে না জীব পাপ-হ্রদে,
সত্য কলুষ সংহারে, প্রকাশে বিভু মাহাত্ম্য।

*　　*　　*

শুন ওরে ভ্রান্ত মন, সত্য পথে কর ভ্রমণ,
ষড়রিপু হবে দমন, পাবে পরম পদার্থ।'

মৃত্যুর অল্পদিন পূর্বে রচিত 'মাতৃমহিমা'-নামক কবিতা-পুস্তকের তত্ত্বোপদেশ নিম্নরূপ;

'আগেও উলঙ্গ দেখ, শেষেও উলঙ্গ।
মধ্যে দিন দুই কাল বস্ত্রের প্রসঙ্গ॥
মরণের দিন দেখ, সব ফক্কিকার
তবে কেন মূঢ় মন কর অহঙ্কার।
আমি ধনী, আমি জ্ঞানী মানী রাজ্যপতি।
শ্মশানে সকলের দেখ একরূপ গতি॥'

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাঙাল হরিনাথের অন্তরে স্বদেশানুরাগ স্বদেশ-সেবা শিক্ষা-বিস্তার প্রভৃতি জনহিতকর কর্মের দুর্জয় বাসনা জাগিয়া ওঠে। তাঁহার হৃদয় উৎসাহ ও উদ্দীপনার অফুরন্ত আকর ছিল। তিনি উহাই সম্বল করিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং প্রাণপাত শ্রম স্বীকার করিয়া স্বগ্রামে বঙ্গবিদ্যালয় বালিকা বিদ্যালয় এবং অবশেষে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনে কৃতকার্য হন এবং সারাজীবন বিদ্যাদান ব্রত পালন করেন। অজ্ঞানতার ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন পল্লীবাসীর হৃদয় শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। পল্লীবাসিগণকে দেশ-বিদেশের শিক্ষা, শিল্পোন্নতি প্রভৃতির সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ প্রদানের নিমিত্ত এই কর্মবীর সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'-নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করিয়া জনসাধারণের মহোপকার সাধন করেন। তিনি তাঁহার আত্মজীবনীর একস্থানে লিখিয়াছেন :

'গ্রামবার্তার তৃতীয় বৎসর অনায়াসে অতিবাহিত হইল—চতুর্থ বর্ষে গ্রাহকগণের নিকট প্রাপ্য মূল্য আদায় ক্রমেই কঠিন হইয়া পড়িল। একদিন দুই দিন দূরবর্তী স্থানে নিজেই গিয়া মূল্য আদায় করিতে লাগিলাম। ... আমিই লেখক, সম্পাদক, বিলিকারক এবং মূল্য আদায়কারী।'

এই পত্রিকা প্রথমে মাসিক, তারপর পাক্ষিক, অবশেষে সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

তাঁহার আত্মজীবনীর (১৪৪ পৃঃ) অপর একস্থানে আছে : 'যখন গ্রামবার্তা মাসিক ছিল তখন ধর্মনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি সাহিত্যময় প্রবন্ধ ও রাজনীতিময় প্রস্তাব, মন্তব্য ও বিবিধ সংবাদ প্রকাশিত হইত। ... সাপ্তাহিক অবস্থায় সাহিত্যময় প্রবন্ধাদি রহিত হইয়া শুধু রাজনীতিরই আলোচনা হইত। কিন্তু সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শনাদি আলোচনার নিমিত্ত স্বতন্ত্ররূপে আর একখানি মাসিক গ্রামবার্তাও প্রকাশিত হইত' ১৪৪ পৃঃ)। 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' কতিপয় বর্ষ যথারীতি প্রচারের পর হরিনাথ ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং পত্রিকা বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন। কুমারখালিতে ছাপাখানা স্থাপন করিয়া হরিনাথ এক পয়সার মূল্যে গ্রামবার্তা বিক্রয় করিয়াছিলেন—কাঙাল হইয়াও প্রজাসমাজে তিনি রাজা হইয়া উঠিয়াছিলেন।

অতঃপর হরিনাথ সংবাদপত্র সেবার কণ্টকাকীর্ণ পথ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম-সাধনা ও ধর্মতত্ত্ব প্রচারোদ্দেশ্যে একটি বাউল সম্প্রদায় গঠন করেন। এই বাউল সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে 'বাউল' কি এবং তাঁহাদের ধর্ম-সাধনা ও মূল নীতিই বা কি তাহার সামান্য আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ করি। "বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী ফকীররূপে বাউলদের দেখা যায়।...বাউলদের ধর্ম-বিশ্বাস ও সাধনরীতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। উহারা বেদবিধি, কোরান, পুরাণ-নির্দিষ্ট ধর্ম-সাধনের

বিরোধী। বাউল সম্প্রদায়ের একটি বৈশিষ্ট্য হইল গান। এই গান তাঁহাদের সাধনার অঙ্গ। গুরুকেই বাউলেরা ভগবানের সহিত তুলনা করিয়াছেন। বাউলের সাধ্যবস্তু হইল 'মনের মানুষ'। তাঁহাদের 'মনের মানুষ' আছেন দেহ-সীমার মধ্যে—তাঁহার সহিত সমন্বিত হইতে হইবে প্রেমের দ্বারা। এইজন্য প্রেমব্যাকুলতায় বাউলরা উন্মত্ত। নিজেদের 'পাগল' বলিয়া পরিচয় দিতে তাঁহারা আগ্রহী।" বাউলগান-রচয়িতাদের মধ্যে লালন শাহ ফকীরের নাম সর্বাগ্রগণ্য। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাঁহার গানগুলি রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাউল গানের একটি উল্লেখযোগ্য সম্বন্ধ আছে। আধুনিক কালে তিনিই প্রথম বাউলগান সংগ্রহ করেন।

কাঙাল হরিনাথ তাঁহার নবগঠিত বাউল সম্প্রদায় লইয়া প্রথমে স্বগ্রাম কুমারখালি, পরে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, জেলা হইতে জেলান্তরে অভিযান ও প্রচার শুরু করেন এবং সেই প্রাণোন্মাদকারী সঙ্গীত-লহরীতে জনসাধারণ পরম আকৃষ্ট ও বিমোহিত হন। বাউলদের বেশ-ভূষাও ছিল অভিনব। মুখে কৃত্রিম শ্মশ্রু, পরিধানে গৈরিক 'আলখেল্লা', হাতে খঞ্জনী, একতারা ও গোপীযন্ত্র। গানের তালে তালে অপূর্ব ভঙ্গিমায় নৃত্য! সে এক উন্মাদনাপূর্ণ দৃশ্য! মুখে গান - 'ভাব মন দিবা নিশি'। এই ছিল তাঁহাদের ভূমিকা বা প্রাক্ বাক্। বৃদ্ধেরা এইগানে অশ্রুবর্ষণ করিয়া মেদিনী সিক্ত করিতেন, তরুণ-তরুণী শ্রোতা ও দর্শকেরা মুখে কাপড় চাপা দিয়াও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেন না। এই গানের প্রভাব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপরও ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ লালন শাহ ফকীরের গান সংগ্রহ করিতে একদা বহু বর্ষ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। লালন শাহ ফকীরের সহিত তিনি দেখা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্বকণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন, এরূপ জনশ্রুতি আছে। অধ্যাপক মহম্মদ মনসুর উদ্দীন, অধ্যাপক ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য-প্রমুখ সাহিত্যিকগণ লালন শাহ ও কাঙাল হরিনাথের বাউল গান সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া বাঙলা সাহিত্যের ভাণ্ডার পুষ্ট করিয়াছেন, এজন্য তাঁহারা সকলেরই ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই। 'ফিকির চাঁদ ফকীরের (কাঙাল হরিনাথ) গীতাবলী' এক সময়ে বাংলাদেশে এক মহা আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল এবং উহার তরঙ্গ শুধু কুমারখালি গ্রামেই সীমাবদ্ধ ছিল না, উহা দেশদেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

পাঠকবর্গের রসাস্বাদনের নিমিত্ত উহা হইতে কয়েকটি কণিকামাত্র এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

(১) হরি দিন ত' গেল সন্ধ্যা হ'ল,
পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্তা, শুনে বার্তা, ডাকছি
হে তোমারে॥
* * *
আমি দীন-ভিখারী, নাইকো কড়ি,
দেখ না ঝুলি ঝেড়ে।
আমার পারের সম্বল দয়াল নামটি কেবল,
ফিকির কেঁদে আকুল,
প'ড়ে অকূল সাঁতারে পাথারে॥
* * *

(২) রবে না দিন চিরদিন,
সুদিন কুদিন একদিন দীনের সন্ধ্যা হবে;
এই যে 'আমার' 'আমার' সবি ফক্কিকার,
কেবল তোমার নামটি রবে।
* * *

(৩) ফিকীর চাঁদ ফকিরে বলে,
সেই সাপকে ধ'রে বশ করেছে,
যে জন কৌশলে
কেবল সে পেয়েছে, নিজের কাছে,
সোনার মানিক মনোহর
(হায়রে পাগল)
* * *

(৪) কাঙাল কয়, পাদশা উজীর,
কাঙাল ফকীর সকলি ভাই ভোজের খেলা।
মন তুমি যখন যা হও।
ঠিক পথে রও, ধর্মকে ক'র না হেলা।

* * *

(৫) যদি ডাকার মত পারিতাম ডাক্‌তে।
তবে কি মা, এমন ক'রে তুমি লুকিয়ে
থাক্‌তে পারতে ?

* * *

(৬) ব'চ্ছে ভবনদীর নিরবধি খরধার।
দেখ, ক্ষণকাল বিরাম নাই এই দরিয়ার॥
ডিঙ্গা-ডেঙ্গি পিনাশবজ্‌রা, মহাজনী নৌকায় ;
পাপী তাপী সাধু ভক্ত, চড়নদার সমুদায়॥
ভাসিছে দরিয়ার জলে ইচ্ছামত নৌকা চলে ;
হাল ধ'রে তার সুকৌশলে,
বসে আছে কর্ণধার মন সবার।

* * *

(৭) দেখ ভাই জলের বুদ্বুদ, কিবা অদ্ভুত,
দুনিয়ার সব আজব খেলা।
আজি কেউ পাদ্‌সা হ'য়ে,
দোস্ত লয়ে রঙ্‌মহলে করছে খেলা।
কাল আবার সব হারায়ে,
ফকীর হ'য়ে সার ক'রেছে গাছতলা।
আজি কেউ ধনগরিমায়,
লোকের মাথায় মারছে জুতারি তলা।
কাল আবার কোপীন প'রে, টুকনি (ঘটি) ধরে,
কাঁধে ঝোলে ভিক্ষার ঝোলা।

* * *

(৮) তাই বলি, যাই দেখি চল
সত্য পথে নিত্য নগরেতে মোরা
শুনেছি সেই ধামেতে এই রূপেতে
মরে নারে মানুষ যারা।

* * *

আর দৃষ্টান্ত বাড়াইব না। কাঙালের বাউল-গানের স্বীকৃতি তৎকালেই পাওয়া গিয়াছিল। 'ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী' গ্রন্থে হরিনাথের বাউল-সঙ্গীত স্থান লাভ করিয়াছে। হরিনাথ আবাল্য ধর্মানুপ্রাণিত হৃদয়ে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া ধর্ম ও কর্মের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করিয়া গিয়াছেন। সংসারে বাস করিয়া সন্ন্যাসীর জীবন যাপনই ছিল তাঁহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। যৌবনে স্বদেশ-সেবার মহান ব্রত পালন-সময়ে তিনি এক অতি উচ্চ আদর্শের অনুসরণ করিতেন, তাহাই পরবর্তিকালে তাঁহার হৃদয়ে ধর্মানুরাগ সৃষ্টি করিয়া তাঁহার জীবন মহনীয় ও গৌরবান্বিত করিয়াছিল। তাঁহার যৌবনের স্বপ্ন নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তিতে ব্যক্ত হইয়াছে :—

* * *

পাপেতে পৃথিবী ছার।
ধর্ম তথা নাহি আর॥
কপটতা ধর্ম সাজে।
পৃথিবী ঢাকিয়া আছে॥
ধর্ম যদি চাও ভাই।
ধর্ম সাজে কাজ নাই॥
কপটতা পরিহর।
ভাল হও, ভাল কর॥

* * *

১৩০৩ বঙ্গাব্দের ৫ই বৈশাখ পুণ্য অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে এই মহাপুরুষ সজ্ঞানে দেহরক্ষা করেন।

আদর্শ মানবতার উপাসনা বর্তমানে হ্রাস পাইলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। তাই দিকে দিকে মহামানবগণের শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। একশত চল্লিশ বৎসর পূর্বে বাংলার পল্লী অঞ্চলে যে মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছিল সেই কর্মবীর ধর্মাত্মা কাঙাল হরিনাথের পূত জীবন ও সাধনার স্মৃতিচারণা করিয়া আমরা গৌরববোধ করি এবং ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করি, বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের বাঙালী যেন তাঁহার মহৎ অবদানের কথা সশ্রদ্ধ হৃদয়ে স্মরণ করিয়া উন্নততর জীবনযাপনে প্রয়াসী হয় এবং ধর্মভিত্তিক আদর্শের অনুসরণ করিয়া দেশের ও দশের কল্যাণ করিতে সমর্থ হয়।

আবেদন

রামকৃষ্ণ মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়

পোঃ বেলুড় মঠ, জিলা হাওড়া

স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি রামকৃষ্ণ মিশন ত্যাগ ও সেবার আদর্শ অনুসরণ করিয়া জাতিধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে সর্বতোভাবে মানবসেবার কাজ করিয়া আসিতেছে।

বেলুড় ও চারপাশের দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের কষ্ট লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের মূলকেন্দ্র, বেলুড় মঠ, হাওড়া, অন্যান্য বহুধা কার্যসূচী ছাড়াও ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বেলুড় দাতব্য চিকিৎসালয়টির প্রতিষ্ঠা করে। অতি সামান্য অবস্থা হইতে ইহা হাওড়া জিলায় একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসাকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। নিম্নে প্রদত্ত ক্রমবর্ধমান রোগীর সংখ্যা হইতেই ইহার বিপুল জনপ্রিয়তা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইবে :

বৎসর	নূতন রোগী	পুরাতন রোগী	মোট
১৯১৩	১,০০০	—	১,০০০
১৯৩৫	৬,৭৪৭	৯,৯২৩	১৬,৬৭০
১৯৫৫	১৩,১৫৭	১৯,৫৭৮	৩২,৭৩৫
১৯৭২-৭৩	৫৮,৯৪১	১,১৭,০৩৪	১,৭৫,৯৭৫

চিকিৎসালয়টিতে হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথি, দুইটি বিভাগ আছে। এলোপ্যাথি বিভাগে একটি শল্য বিভাগও আছে। এই চিকিৎসালয়ে কেবলমাত্র বেলুড় বালি উত্তরপাড়া ঘুসুড়ি ও লিলুয়া হইতেই নয়, পরন্তু সালকিয়া ও হাওড়ার পৌর-এলাকার বহুদূরবর্তী স্থান হইতে, এমন কি গঙ্গার অপর পার হইতেও সহস্র সহস্র দরিদ্র রোগী চিকিৎসার্থ আগমন করেন।

চিকিৎসালয়ের বর্তমান ভবনটি ১৯৩৯ সালে নির্মিত হয়, তখন বর্তমানের তুলনায় অনেক কমসংখ্যক রোগী চিকিৎসার জন্য আসিত। ক্রমবর্ধমান কার্যের প্রয়োজনে ইহা পরে সম্প্রসারিত করা হয় এবং সমগ্র ভবনটির নির্মাণে এক লক্ষ টাকারও বেশী ব্যয় হয়।

বর্তমানে রোগীর সংখ্যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায়—স্থানাভাব ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাবে আমাদের সেবার চাহিদা যথাযোগ্যরূপে মিটাইতে অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে। প্রত্যেকটি বিভাগ প্রসারিত করার প্রয়োজন গভীরভাবে অনুভূত হইতেছে। সুতরাং আমরা চিকিৎসালয়ের বর্তমান ভবনটির সম্প্রসারণ ও উন্নতিসাধনে অগ্রসর হইয়াছি।

নির্মাণকার্যে ও অপরিহার্য সাজ-সরঞ্জামে আনুমানিক চারলক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। ইহা ছাড়া, ইহার প্রাত্যহিক পরিচালনায় ক্রমবর্ধমান খরচের জন্যও পর্যাপ্ত তহবিল প্রয়োজন। চিকিৎসালয়টির প্রস্তাবিত সম্প্রসারণের বিরাট ব্যয়ভার বহন করা অথবা পরিচালনার খরচ, যাহা সেবার পরিধি-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষভাবে বর্ধিত হইবে, তাহার জন্য পর্যাপ্ত অর্থসংস্থান করা মিশনের সামর্থ্যের বাহিরে।

সুতরাং সদাশয় জনসাধারণ, দাতব্য ন্যাস (ট্রাস্ট) এবং ঔষধের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান—সকলেরই নিকট আমরা আবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা অগ্রবর্তী হইয়া এই মহান্ কার্যে মুক্তহস্তে অর্থ অথবা দ্রব্য সাহায্য করুন। মিশন অন্যান্য সময়ে সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়া যে সহানুভূতিপূর্ণ সাড়া পাইয়াছে, কৃতজ্ঞচিত্তে তাহার স্বীকৃতি জানাইতেছে এবং আন্তরিকভাবে আশা পোষণ করে যে, যাঁহারা সাহায্য করিতে সমর্থ তাঁহাদের নিকট হইতে এই ব্যাপারেও যথাসম্ভব সাহায্য এবং সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করিবে। ছোট বড় সব দান, এককালীন বা মাসিক ভিত্তিতে যেভাবেই করা হউক, সাদরে ও কৃতজ্ঞচিত্তে গৃহীত এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারী দ্বারা প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে। চেক ও ড্রাফ্ট-এ "RAMAKRISHNA MISSION" নাম লিখিতে হইবে। মনি অর্ডার যোগেও দান পাঠান যাইতে পারে।

১৫ই জুন, ১৯৭৪
পো: বেলুড় মঠ,
জিলা হাওড়া

স্বামী গম্ভীরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন

সমালোচনা

Swami Vivekananda : His Second Visit to the West : New Discoveries By Marie Louise Burke. Published by Advaita Ashrama, 5 Dehi Entally Road, Calcutta 700-014. Pages 843 including Appendix, Notes, Bibliography, Glossary and Index. Price Rs. 32.

কোথায় যেন পড়েছিলাম, মহাকাব্যের যুগ শেষ হয়ে গেছে—অর্থাৎ মহাকাব্য আর লেখা হয়না, হবে না। খেদ প্রকাশ করে লেখক আরও বলেছিলেন : রঙ্গমঞ্চের নানারকম উন্নয়নসাধন করা হচ্ছে, অপেরার ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ দ্বারা যুগান্তর আনয়ন করা হয়েছে বললেও হয়, কিন্তু শেক্সপীয়রের পায়ের ধুলো নেবার যোগ্য নাট্যকার আর জন্মগ্রহণ করছেন কই, আর নতুন অপেরাই বা লেখা হচ্ছে কোথায় ? সত্যিই শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বড় কিছু—'মহা'র দিন আর নেই—বর্তমান যুগ হ'লো 'মিনি'র যুগ। গবেষণার ব্যাপারে অভিমতটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। গবেষণা-গ্রন্থের আকার কতটা বড় হতে পারবে, সে-সম্বন্ধে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে। একবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একজন প্রখ্যাত মার্কিন অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করে পাঠানো হয়, একখানি ৬০০ পৃষ্ঠার থিসিস তিনি পরীক্ষা করতে সম্মত আছেন কিনা। উত্তরে অধ্যাপক মহাশয় জানিয়ে দিলেন : এই জেট এরোপ্লেনের যুগে (জেট এজ) থিসিসকে অত বড় করাই অযৌক্তিক, এবং এই কারণেই তিনি পরীক্ষকের কাজ করতে অপারগ।

এই রকম অবস্থায় মেরী লুই বার্কের নব আবিষ্কারের (New Discoveries) দ্বিতীয় খণ্ডকে ব্যতিক্রম বলেই গ্রহণ করতে হয়। এ যেন প্রচলিত পদ্ধতির বিরুদ্ধে সচেতন বিদ্রোহ ঘোষণা—যে বিদ্রোহের ফলেই জন্মগ্রহণ করে ক্ল্যাসিক গোষ্ঠীভূত শিল্প-সাহিত্য। লেখক বা গবেষক যদি পাঠক সমালোচক পরীক্ষকের কথা পদে পদে স্মরণ করে কাজে অগ্রসর হন তবে ক্ল্যাসিকের সৃষ্টি কখনই সম্ভব হয় না। মাঝে মাঝে তাঁর মনে সংশয় জাগলেও সেই সুবিখ্যাত আশাবাদমূলক উক্তিকে স্মরণ রেখেই তাঁকে কাজে অগ্রসর হতে হবে : পৃথিবী বিশাল এবং কাল অনন্ত।

মেরী লুই বার্কের বর্তমান গবেষণা-গ্রন্থকে 'নব আবিষ্কারের' দ্বিতীয় খণ্ড বলে অভিহিত করেছি। প্রথম খণ্ডের বিষয়বস্তু ছিল প্রথমবার আমেরিকায় স্বামীজীর অভিযান, এবং নাম ছিল Swami Vivekananda in America—New Discoveries। প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮। এই খণ্ড প্রকাশের ফলে স্বামীজীর প্রামাণ্য জীবনীর বেশ-কিছু পরিমার্জনার প্রয়োজন হয়। বর্তমানে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হওয়ায় (প্রকাশকাল নভেম্বর, ১৯৭৩) আরও পরিমার্জনার প্রয়োজন হবে এবং ফলে বেশকিছু শূন্যস্থানও পূরিত হবে।

অবশ্য এই অনুসন্ধানকার্যে মেরী লুই বার্ক ছাড়া অন্যান্য অনেকেও কাজ করেছেন। ডি. এস. শর্মা কয়েকটি নিবন্ধের মাধ্যমে অনুসন্ধেয় কয়েকটি বিষয়ের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিকীর বছরে (১৯৬৩) প্রকাশিত

শ্রীবেণীশঙ্কর শর্মার গ্রন্থ : Swami Vivekananda —A Forgotten Chapter of His Life বা দেশীয় রাজ্য খেতড়িতে স্বামীজীর জীবনের অধ্যায় এ দিক দিয়ে হ'ল এক উল্লেখযোগ্য অবদান। (এই গ্রন্থের সঙ্গে অন্যান্য প্রামাণ্য গ্রন্থ ও তথ্যের কোন কোন ক্ষেত্রে অসঙ্গতি দেখা যায়।)

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এবং আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীমতী বার্ক অধ্যাপক বসুর কাছে অকুণ্ঠ ঋণ স্বীকার করেছেন।

তবে শ্রীমতী বার্কের দ্বিতীয় খণ্ডকে অনন্য-সাধারণ বলে বর্ণনা করলে মোটেই অত্যুক্তি করা হয় না, এবং সকল দিক বিচার করে পূর্ণাঙ্গ আখ্যাও দেওয়া চলে। অভিমতটির সামান্য ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিকের ওপর বিশেষভাবে আলোকসম্পাত করেন ভগিনী নিবেদিতা। তাঁর The Master as I saw Him এবং Notes of some Wanderings with the Swami Vivekananda—এ ব্যাপারে শুধু উল্লেখযোগ্য নয়, কালোত্তীর্ণ রচনাও বটে। দ্বিতীয় গ্রন্থখানি পাঠ করে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় মন্তব্য করেছিলেন : It is Vivekananda here, Vivekananda there and Vivekananda all over (Character Sketches)। তবুও কিন্তু এই দুই গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনালেখ্য সম্পূর্ণ ফুটে ওঠেনি। হেতু শ্রীমতী বার্ক নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন : এই দুই গ্রন্থে ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর জীবনের অনেক ঘটনার উল্লেখ ইচ্ছা করেই করেননি, কারণ করলে এমন সব ব্যক্তির নামোল্লেখ করতে হ'ত যাঁরা স্বামীজীর সঙ্গে নামোল্লেখের যোগ্যই নন। সুতরাং তাঁদের অযথা সম্মান দেখানো অযৌক্তিক। (৯২ পৃষ্ঠা।) শ্রীমতী বার্ক কিন্তু ঐতিহাসিক অনুসন্ধান-পদ্ধতি অনুসরণ করে কোন কিছুই পরিহার করেননি, এবং এর দরুনই গ্রন্থখানি হয়ে উঠেছে পূর্ণাঙ্গ। লুপ্ত পত্রাবলী, সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ ইত্যাদির পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে শ্রীমতী বার্ক এমন অনেক ঘটনার ওপর আলোক-সম্পাত করেছেন যার অভাবে স্বামীজীর জীবনের এক অধ্যায়ের আলেখ্য অনেকাংশে অস্পষ্ট থাকত, এবং ফলে কিছুটা বিকৃতও হ'ত বলা চলে। শ্রীমতী বার্ককেই অনুসরণ করে বলা যায়, স্বামীজীর জীবন ছিল আলোছায়ার খেলায় ভরা, এবং এই আলো ও ছায়া—উভয়ের সঙ্গেই পূর্ণ পরিচয় না থাকলে ঐ মহৎ জীবন-নাটকের সম্পূর্ণ ধারণা ত' করা যাবে না। এই জীবনের মাধুর্য ও ঐশ্বর্য শুধু তিনি কি শিক্ষা দিয়েছিলেন তার মধ্যেই নিহিত নয় এ দু'টি বিষয় তাঁর চরিত্রের মধ্যে নিহিত এবং ক্ষুদ্র ও বিরাট উভয় প্রকার ঘটনার মধ্যে দিয়েই সমভাবে ফুটে উঠেছে (৯০ পৃষ্ঠা)।

এই রকম ক্ষুদ্র ও বিরাট ঘটনাই ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে গ্রন্থখানির ছত্রে ছত্রে—অধ্যায়ে অধ্যায়ে। এই সব ঘটনার অনেকগুলোই অনেকের জানা, কতকগুলো অস্পষ্টভাবে জানা এবং বাকীগুলো সম্পূর্ণ অজানা। এই জানা, আধা-জানা ও অজানার সমন্বয়ই শ্রীমতী বার্কের অনুসন্ধানের বৈশিষ্ট্য, এবং এখানেই গ্রন্থখানির মূল্য নিহিত।

১৮৯৯ সালের ২০শে জুন তারিখে এস. এস. গোলকুণ্ডায় কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করে ১৯০০ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ঘটনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে ভরা গ্রন্থখানি অনেকের কাছে হয়ত বিবরণভারে ভারাক্রান্ত বা ইংরেজীতে যাকে বলে prolix বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ধৈর্যসহকারে পাঠ শেষ করলে সব শ্রমই সার্থক মনে হবে। স্বামীজী মানুষকে অপরিমেয় শক্তিধর ও সম্ভাবনাপূর্ণ করে তুলতে

চেয়েছিলেন, এবং তার সম্ভাব্যতার প্রমাণ তিনি রেখে গেছেন নিজের জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে। গ্রন্থখানি তাঁর জীবনের অন্যতম অধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এবং অতি অভিজ্ঞ গবেষকের নিষ্ঠা ও অনন্যসাধারণ মূল্যায়ন-ক্ষমতার স্বাক্ষর বলেই যে স্বীকৃত হবে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। ভগিনী নিবেদিতার মতে, স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-বেদগানে দু'টি সুর বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে: জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা এবং বিশ্বে সত্যানুসন্ধানের আলোড়ন শুরু করা। এই সত্যানুসন্ধানমুখী আলোড়নের দ্বিতীয় অধ্যায় গ্রন্থখানিতে সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয়ে জীবনবেদের এই দিকটাও আলোকিত করে তুলেছে। এই মাপকাঠিতে বিচার করলে পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়কে আলোচ্য গ্রন্থখানির কেন্দ্রবিন্দু বলে বর্ণনা করা যায়। তবে শুধু কেন্দ্রবিন্দু নয়, ব্যাসও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বহুল সংখ্যায় সংযোজিত চিত্রাবলী ও প্রতিলিপি বাকী ফাঁকটুকু পূরণ করতে সহায়তা করে।

শ্রীমতী বার্ক আমার শ্রদ্ধা ও অদ্বৈত আশ্রমের কর্তৃপক্ষ আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

ভ্রম-সংশোধন

গত আষাঢ় সংখ্যার ২৭৭ পৃষ্ঠার ১ম কলম, ১১শ লাইনে '১৯৩৫' স্থলে '১৯৬৫' হইবে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

বাংলাদেশে সেবাকার্য: বাংলাদেশের সেবাকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে জুলাই ১৯৭৪-এর শেষ পর্যন্ত মোট ৩২,৮১,৯৫ টাকা খরচ করা হইয়াছে। বিতরিত দ্রব্যের মূল্য উক্ত হিসাবের অন্তর্ভুক্ত নহে। এপ্রিল, মে ও জুন মাসে কৃত সেবাকার্যের বিবরণ নিম্নে একসঙ্গে দেওয়া হইল।

ঢাকা কেন্দ্রে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ৮,৬৫৪। বিতরিত হয়: গুঁড়ো দুধ ৭,০৬০ পাঃ, সি. এস. এম. ৫৯,০৫০ পাঃ, সোয়েটার ৫১৬, কম্বল ৬৩১, ধুতি ৪৭৮, শাড়ী ১০,৭৯২, লুঙ্গি ৬৪১, গামছা ৩৯, মশারি ৪৭৬, শার্ট ১,৬৩৯, পুরাতন বস্ত্রাদি ৭,৯০২, শিশুদের পোশাক ১,৭৩৭, জুতা ১৫ জোড়া, বাসন ২৯৫, গায়েমাখা সাবান ৯২, কাপড়কাচা সাবান ২০৩, লণ্ঠন ২ ও নলকূপ বসানো হয় ২টি।

দিনাজপুর কেন্দ্রে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ৭,১৮০। বিতরিত হয়: গুঁড়ো দুধ ৩,৭৫০ পাঃ, শাড়ী ৩,০৩৫, লুঙ্গি ৭৬১, ভিটামিন ট্যাবলেট ২,৩০৯, জুতা ১,১৭৮ জোড়া এবং ১০টি বাড়ী তৈরী করানো হয়।

নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ১,০৬৩। গুঁড়ো দুধ বিতরিত হয় ১৯২ পাঃ।

বরিশাল কেন্দ্রে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ১,৩২৭। গুঁড়ো দুধ বিতরিত হয় ৩,২৫০ পাঃ।

বাগেরহাট কেন্দ্রে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ১৩,২০১। বিতরিত হয়: গুঁড়ো দুধ ৯,৩৮৫ পাঃ, শাড়ী ৩,৯২৫, কম্বল ৯৬০, ধুতি ১০৬, শার্ট ১০৭, মাছধরা জালের সুতলি ১,৯৩৫ বাণ্ডিল, ভিটামিন ট্যাবলেট ১,২৩২ এবং ৮টি বাড়ী তৈরী করানো হয়।

কার্যবিবরণী

বোম্বাই রামকৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের ১৯৭২-৭৩ সালের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১২তম রোড, খার-এ অবস্থিত এই আশ্রমটি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ-শিষ্য স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ ২৬।১১।২৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ স্বামী অখণ্ডানন্দজী ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীও এই আশ্রমে শুভাগমন করিয়াছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে আশ্রম বিভাগের উল্লেখ্য কার্যাবলী: (১) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিত্যপূজা, বেদপাঠ, গীতা আবৃত্তি, প্রার্থনা—প্রতি একাদশীতে রামনাম-সংকীর্তন; (২) প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা এবং এতদ্ভিন্ন শ্রীশ্রীলক্ষ্মী, কালী, শিব ও গণেশের পূজা ও উৎসব পরিচালনা; (৩) শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামীজীর জন্মতিথি পূজা ও উৎসব পালন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ শংকর ও যীশুর পবিত্র আবির্ভাবতিথিও যোগ্য আলোচনাদির মাধ্যমে পরিপালন।

(৪) নিয়মিত ধর্মীয় আলোচনা বক্তৃতাদির দ্বারা ধর্মীয় ভাবধারার প্রচার। এই উদ্দেশ্যে আশ্রমে প্রতি শনিবার হিন্দীতে শ্রীরামকৃষ্ণবচনামৃত ও প্রতি রবিবার ইংরাজীতে ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হয়। ইহা ছাড়া আশ্রমের বাহিরে দাদরে মারাঠী ভাষায় নিয়মিতভাবে, কোলিওয়াডায় পাক্ষিক ও পারেলে সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা হয়।

(৫) প্রতিবর্ষের ন্যায় এই বারেও ষষ্ঠ হইতে একাদশশ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে স্বামীজীর জাতি ও চরিত্রগঠনকারী বাণী ও রচনার আবৃত্তি প্রতি-যোগিতা হয়। ইহাতে বোম্বাই শহর ও উপ-কণ্ঠের ৭৮টি বিদ্যালয়ের ৩০৪৩ জন ছাত্র অংশ গ্রহণ করে। মারাঠী, গুজরাতী, হিন্দী ও ইংরাজী

ভাষায় প্রতিযোগিতায় ৩৭টি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ১৫৩টি পুরস্কার লাভ করে।

মিশন-বিভাগের কার্যাবলী

(১) শিক্ষা: কলেজের ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাসে ৭৬ জন ছাত্র ছিল। নিঃশুল্ক পাঠগৃহে ও শিবানন্দ পাঠাগারে ১৮,৫৯২ এর অধিক পুস্তক আছে ও ১৪৫টি দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকাদি ইংরাজী, হিন্দী, সংস্কৃত, মারাঠী, গুজরাতী, বাংলা, তামিল প্রভৃতি ভাষায় রাখা হয়। এই বর্ষে ১১,২২৮টি পুস্তক গৃহে পড়িতে দেওয়া হয়। পাঠাগারে প্রতিদিন বহু পাঠকের সমাগম হইয়া থাকে।

(২) চিকিৎসা: দাতব্যচিকিৎসালয়ের এলোপ্যাথিক বিভাগে মোট ১,৬৬,৮৫৬ জন রোগী চিকিৎসিত হন। ইনডোর বিভাগটিকে আরো উন্নত করা হইয়াছে।

(৩) সেবাকার্য: পূর্ববঙ্গ-উদ্বাস্তু-সেবা, পশ্চিমবঙ্গ-বন্যাত্রাণ, জোয়ান-সেবা মহারাষ্ট্র-খরাত্রাণ, বাংলাদেশ-উদ্বাস্তু-সেবা, পুরুলিয়া-খরাত্রাণ-সেবা উল্লেখযোগ্য। মহারাষ্ট্র-খরাত্রাণে মিশন পরিচালিত চিকিৎসাকার্য তালাওয়ালীতে ৪ মাস ধরিয়া চলে। তাহাতে ৪৭,৩৫১ টাকা ব্যয় হয় এবং ৭০৩৭ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে ও ২৩৯ নূতন শাড়ী বিতরিত হয়।

(৪) একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র বোম্বাই হইতে ৫৫ মাইল দূরে পালঘর তালুকের সাকওয়ার আদিবাসী গ্রামে চালু করা হয়। চিকিৎসকদল প্রতি রবিবারে গ্রামে যাইয়া ঔষধ, ভিটামিন, প্রোটিন খাদ্য, বিস্কুট ও পোশাকাদি বিতরণ করেন এবং সঙ্কটাপন্ন রোগীদের বোম্বাই শহরের হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থাও করেন। এই বৎসরের ৪৬টি রবিবারে ১২,২৮৯ জন রোগী চিকিৎসিত হন।

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৭২-৭৩-এর কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সেবাশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ইহা আধুনিকতম যন্ত্রাদি সহ ১০৩টি শয্যা ও ১১টি বিভাগ-বিশিষ্ট হাসপাতাল।

আলোচ্য বর্ষে অন্তর্বিভাগে রোগীর সংখ্যা ছিল ৩,৪১৪; শল্যবিভাগে অস্ত্রোপচার হয় ১,৭৮১ জনের; রক্ত-মল-মূত্রাদি পরীক্ষিত হয় ২০,০৮১ জনের, এক্সরে হয় ৩,২৭০ জনের। নন্দবাবা চক্ষু-বিভাগের অন্তর্বিভাগে ৬৫৬ ও বহির্বিভাগে ৭,৮৯৩ জন; শেঠ মানেকলাল চিনাই ক্যান্সার বিভাগের অন্তর্বিভাগে ৫৭ ও বহির্বিভাগে ৬৯ জন এবং ফিজিওথেরাপি বিভাগে ৯৭৫ জন রোগী চিকিৎসিত হন। বহির্বিভাগে চিকিৎসিত হন ২,৩১,২১২ তন্মধ্যে নূতন রোগী ৩৬,৯৪৪ জন। গড়পড়তা দৈনিক রোগীর সংখ্যা ৬৩৩ জন।

সেবাশ্রমের হোমিওপ্যাথি বিভাগে ৪,৫৪১ নূতন রোগীর এবং ২১,২২৯ জন পুরাতন রোগীর চিকিৎসা হয়।

বৃন্দাবন হইতে ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত ছোট শহর কোশীকালনে প্রতি পক্ষকালে একবার চক্ষুরোগীদের চিকিৎসার জন্য একটি কেন্দ্র আশ্রম কর্তৃক পরিচালিত হয়। চারিপার্শ্বস্থ গ্রামের চক্ষুরোগীরা এই ব্যবস্থায় সহজে চক্ষুরোগ নিরাময়ের সুযোগ পাইয়া থাকেন। ইহা ছাড়া ১৯৭৩ সালের ফেব্রুআরিতে একটি চক্ষু-শিবির পরিচালিত হয় ও ইহাতে ৭৫টি অস্ত্রোপচার হয়।

চিকিৎসা ব্যতীত আশ্রমের মাধ্যমে ২০৫ জন বিধবাকে খাবার ও ১৲ টাকা করিয়া সাহায্য, ৩২ জন দুঃস্থকে অর্থসাহায্য, ৩১২ জন গরীব ছাত্রকে পুস্তকাদি দেওয়া ইত্যাদি সেবাকার্যে উক্ত বৎসরে ৩,৪৭৮.৫০ টাকা ব্যয় হয়।

এই সেবাযজ্ঞের বিপুল ব্যয় জনসাধারণের সাহায্যেই হইয়া থাকে। আশ্রমটির বকেয়া ঋণ সর্বমোট ৫৫,৯৯৯ টাকা। তা ছাড়া উন্নয়নমূলক বহুবিধ পরিকল্পনা বাবতেও প্রায় ২,৪০,০০০ টাকার প্রয়োজন। আশ্রম কর্তৃপক্ষ এই সেবাযজ্ঞে সাহায্যের জন্য সহৃদয় জনসাধারণের কাছে আবেদন করিয়াছেন।

উৎসব

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের প্রায় ২০০ কি. মি. দূরে মিশিগান হ্রদের অপরপারে 'গঙ্গানগরে' (Ganges Town) **'বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি'র** একটি নির্জন মঠকেন্দ্র আছে। ঐ কেন্দ্রের প্রথম ভবন, 'ব্রহ্মানন্দ ধাম'টির উৎসর্গ-উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়, গত ২২ ও ২৩শে জুন, ১৯৭৪।

২২শে জুন, পূর্বাহ্নে শঙ্খ-ধ্বনি ও বেদমন্ত্র গানের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হয়। পরে, সংক্ষেপে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর প্রতিকৃতিতে পূজা করেন স্বামী অশেষানন্দ। পূজান্তে ঐ আলেখ্যগুলি এক শোভাযাত্রা সহকারে 'ব্রহ্মানন্দ ধামে' লইয়া গিয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়। উল্লেখ্য এই যে, উক্ত ভবনটির নির্মাণকার্য আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত মঠ-বাসী ব্রহ্মচারীরাই স্বহস্তে করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠার পরে শিকাগো বেদান্ত সোসাইটির রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের বালকেরা শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন অবলম্বনে একটি নাটিকা অভিনয় করে ও পরে প্রায় ৪০০ জন ভক্ত বসিয়া প্রসাদ পান।

বৈকালে স্বামী অশেষানন্দ ও স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ ভক্তসমাবেশে ধ্যান সম্পর্কে আলোচনা করেন। সন্ধ্যারতির পর বাংলা চলচ্চিত্রে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী প্রদর্শিত হয়। মঠের ব্রহ্মচারিগণ চারিটি বৃহৎ তাঁবু খাটাইয়া ভক্তবৃন্দের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেন। পরদিন প্রত্যুষে ভক্তগণ মঙ্গলারতি ও ধ্যানে যোগ দেন। রবিবাসরীয় ধর্মালোচনার ভাষণ হিসাবে পূর্বোক্ত দুইজন অতিথি স্বামীজী 'শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-শিষ্যদের সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা'-শীর্ষক বক্তৃতা দেন।

২৯শে জুন, শিকাগো মূলকেন্দ্রে নূতন পূজা-গৃহের আনুষ্ঠানিক উৎসর্গ উপলক্ষে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের যথাবিধি পূজা ও হোম হয়। পূজা করেন স্বামী অশেষানন্দ। পূজান্তে ভক্তগণকে প্রসাদ দেওয়া হয়। অতিথি স্বামীজীদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ধর্মালোচনাদির সুবিধার জন্য বৈকালে একটি প্রশ্নোত্তর সভার আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যারতির পর বাংলা চলচ্চিত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী প্রদর্শিত হয়।

৩০শে জুন, রবিবাসরীয় ধর্মালোচনায় 'ভগবদ্-গীতার বাণী' সম্পর্কে ভাষণ দেন স্বামী অশেষানন্দ ও স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ।

গঙ্গানগর ও শিকাগোতে অনুষ্ঠিত এই দুইটি বিশেষ উৎসব বহু ভক্তহৃদয়ের গভীর ধর্ম-জিজ্ঞাসা ও ধর্মকে জীবনে রূপায়িত করিবার আন্তরিক আগ্রহের স্বাক্ষর। মুখ্যতঃ তাঁহাদেরই অনলস প্রচেষ্টা উদ্যম ও সহযোগিতা উৎসব দুইটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে।

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত আমরা দুইজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগের সংবাদ জানাইতেছি :

স্বামী অপর্ণানন্দ গত ৩রা জুলাই রাত্রি ১০-২৫ মিনিটে বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ৭৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। বিগত কয়েক মাস যাবৎ তিনি বার্ধক্যজনিত নানাবিধ ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন। শ্বাস-ও হৃদ্-যন্ত্রের বিকলতাহেতু তাঁহার দেহান্ত ঘটে। তিনি শ্রীমা সারদাদেবীর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে সংঘে যোগ দেন এবং ১৯২২ সালে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মা-নন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ

করেন। তিনি মায়াবতী ও বোম্বাই কেন্দ্রের কর্মী এবং দীর্ঘকাল বরানগর ও আলমোড়া কেন্দ্রের মোহন্ত ছিলেন। শেষ কয়েক বৎসর তিনি বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমে অবসর-জীবন যাপন করিতেছিলেন। শান্ত ও মধুর স্বভাবের জন্য তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন।

স্বামী বোধাত্মানন্দ বেলুড় মঠে গত ২৮শে জুলাই রাত্রি প্রায় ৪ টার সময় ৭৪ বৎসর বয়সে শ্বাস-ও হৃদ্-যন্ত্রের বিকলতাহেতু নিদ্রিতাবস্থাতেই দেহত্যাগ করেন। শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে দেওঘর বিদ্যাপীঠে তিনি সংঘে যোগদান করেন এবং ১৯২৯ সালে স্বীয় দীক্ষাগুরুর নিকটেই সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। ১৯৫৬ সালে বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারী শিক্ষণ-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি উহার আচার্য হন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ঐ পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন সময়ে তিনি দেওঘর বিদ্যাপীঠ, গদাধর আশ্রম, কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান ও নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানরূপে সংঘ-সেবা করিয়াছেন। গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, ব্রহ্মচারীদের শিক্ষাদানে ঐকান্তিক অনুরাগ, সরল অনাড়ম্বর জীবন ও ভক্তিভাবময় প্রকৃতির জন্য তিনি সকলেরই প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁহার প্রয়াণে ব্রহ্মচারী শিক্ষণকেন্দ্রের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব

রাউরকেলা: গত ১২ই জুলাই হইতে চারদিনব্যাপী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৩৯তম শুভ জন্মোৎসব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-নামামৃত সংকীর্তন শ্রীশ্রীসারদা-নামামৃত সংকীর্তন শ্রীশ্রীরামনাম-সংকীর্তন ভজন পূজা আরতি এবং জনসভার মাধ্যমে রাউরকেলা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী অপূর্বানন্দ স্বামী বরিষ্ঠানন্দ স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ স্বামী আত্মানন্দ এবং স্বামী অকামানন্দ উৎসবে যোগদান করেন। প্রতিদিন পূজা-পাঠ আরতি ভজন এবং ১৪ই জুলাই ৭ নং সেকটর কমিউনিটি সেণ্টারে বিশেষ জনসভায় বহু নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। স্থানীয় ভক্তদের প্রবল উৎসাহ ও আন্তরিক সহযোগিতায় এবং স্বামীজীদের বক্তৃতায় উৎসব সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল।

আলিপুরদুয়ার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ১১ই, ১২ই ও ১৩ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩৯তম জন্মোৎসব মঙ্গলারতি পূজা পাঠ ভজন ভক্তসম্মেলন ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন ধর্মসভায় বক্তৃতা করেন স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ও স্বামী অজজানন্দ। স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনী প্রদর্শন করেন, শ্রীসুনীল দাশগুপ্ত ও সহশিল্পিবৃন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-লীলাগীতি পরিবেশন করেন। উৎসবের শেষদিন প্রায় পাঁচ হাজার ভক্ত নরনারীকে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পরলোকে হেমেন্দ্রকুমার রায়

স্বামী সারদানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য হেমেন্দ্রকুমার রায় বৈদ্যশাস্ত্রী গত ২৬শে আষাঢ় বেলা ১২-২০ মিনিটে ৭২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম স্মরণ করিতে করিতে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন। শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

দিব্য বাণী

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং
ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।
অতস্ত্বামারাধ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিভিরপি
প্রণন্তুং স্তোতুং বা কথমকৃতপুণ্যঃ প্রভবতি॥

—শংকরাচার্য : সৌন্দর্যলহরী, ১

শক্তির সহিত শিব যুক্ত যদি হন
তবে তিনি প্রভবিষ্ণু; নতুবা স্পন্দন-
রহিত দেবতা শুধু। ব্রহ্মা হরি হর
করে তাই শক্তি-পূজা। পুণ্যহীন নর
কেমনে করিব আমি চরণে প্রণতি—
কোথা অধিকার মম করি তব স্তুতি!

কথাপ্রসঙ্গে

তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচারে অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হইলেও, সাধারণভাবে ইহা অনায়াসেই বলা যায় যে, সাংখ্যের প্রকৃতি, অদ্বৈতবেদান্তের মায়া ও তন্ত্রের শক্তি একই বস্তু। অদ্বৈতবেদান্ত তো পরিষ্কার সাংখ্যভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন :

'কপিলই নিঃসন্দেহে অদ্বৈতবাদের ভিত্তি স্থাপন করিয়া যান; তিনি যতদূর পর্যন্ত সিদ্ধান্তে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা গ্রহণ করিয়া অদ্বৈতবাদ আর এক পদ অগ্রসর হইল।'

'কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব গৌরব কপিলেরই প্রাপ্য। প্রায়-সম্পূর্ণ অট্টালিকাকে সমাপ্ত করা অতি সহজ কাজ।'

সাংখ্যের প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী—'সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ'। বেদান্তের মায়া এবং তন্ত্রের শক্তিও ত্রিগুণময়ী। আচার্য শংকর মায়ার পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন :

'অব্যক্তনাম্নী পরমেশশক্তি-
রনাদ্যবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরা।
কার্যানুমেয়া সুধিয়ৈব মায়া
যয়া জগৎ সর্বমিদং প্রসূয়তে ॥'

—অর্থাৎ, মায়া বা অবিদ্যা ব্রহ্মের শক্তি। উহার অপর নাম অব্যক্ত। উহা অনাদি; সত্ত্ব রজঃ তমঃ— এই তিন গুণসমন্বিত এবং কারণস্বরূপা। সৃষ্টিরূপ কার্য হইতে সুধী ব্যক্তি উহার অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারেন। মায়া হইতে এই সকল জগৎ উৎপন্ন হয়।

তান্ত্রিকগণ বলেন—সাম্যাবস্থা গুণোপাধিকা ব্রহ্মরূপিণী দেবী। অর্থাৎ, দেবী বা শক্তি হইতেছেন সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ— এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা ও ব্রহ্মস্বরূপিণী।

সাংখ্যের একটি মূল তত্ত্ব – ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির দিক হইতে আমরা সাংখ্য, অদ্বৈতবেদান্ত ও তন্ত্রের সাদৃশ্য দেখিলাম। এখন সাংখ্যের দ্বিতীয় তত্ত্ব হইতেছেন—পুরুষ। এখানেও এই তিন দর্শনে যথেষ্ট সাদৃশ্য পাওয়া যাব। সাংখ্যের পুরুষ নিষ্ক্রিয় নির্বিকার অসঙ্গ নিত্যমুক্তস্বভাব শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ। অদ্বৈতবেদান্তের ব্রহ্ম ও তন্ত্রের শিবও তাহাই। আবার এই তিনটি দর্শনের লক্ষ্যও একই— মোক্ষ।

তাহা হইলে প্রভেদ কোথায়? প্রভেদ হইতেছে পথ লইয়া। সাংখ্য ও অদ্বৈতবেদান্ত বিচারপ্রধান। তন্ত্র উপাসনাপ্রধান। সাংখ্যের প্রকৃতি বা অদ্বৈতবেদান্তের মায়া উপাস্যা নহেন। তন্ত্রের শক্তি উপাস্যা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা :

"ব্রহ্ম আর মায়া। জ্ঞানী মায়া ফেলে দেয়। ··· ভক্ত কিন্তু মায়া ছেড়ে দেয় না। মহামায়ার পূজা করে। শরণাগত হয়ে বলে, 'মা, পথ ছেড়ে দাও। তুমি পথ ছেড়ে দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হবে'।"

তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এইখানে।

অদ্বৈতবেদান্ত বলিতেছেন—

হে অমৃতের পুত্র, ওঠো জাগো। অনাদি কাল থেকে যে মোহ-জড়িমা তোমাকে পেয়ে বসেছে তা' ঝেড়ে ফেলো। প্রবুদ্ধ কেশরীর মতো এই 'জগজ্জাল' দীর্ণ করে নির্গত হও। কার সামর্থ্য আছে, তোমাকে বদ্ধ করতে পারে? জ্ঞানের প্রবল বাত্যায় মায়ামেঘ উড়িয়ে দাও। নিরাবরণ প্রসন্ন

দৃষ্টিতে দেখো অনন্ত কাল ধরে তুমি পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ এবং অবিনাশীই আছো। যখন সূর্যচন্দ্রনক্ষত্রাদি ছিল না, তখনও তুমি ছিলে আর যখন এই বিরাট বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, তখনও তুমি থাকবে। তোমার নিজেরই কর্ম দিয়ে রচনা করেছো এই কল্পিত বন্ধন— আর তোমার নিজের ভিতরেই রয়েছে সেই শক্তি যা দিয়ে তুমি বন্ধনমুক্ত হবে। যা নিজে গড়েছো, তা' নিজেই ভাঙতে পারো। অতএব— ওঠো, জাগো।

তন্ত্র বলেন—

না, তোমার নিজের সামর্থ্য নেই এই বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার। উপরে নীচে সামনে পিছনে— চারিপাশে, দেখো মায়া— মায়া— মায়া। সর্বত্র এই মায়া। দেশ কাল কর্ম মন সব তাঁরই হাতের যন্ত্র— তোমাকে মুগ্ধ করবার জন্য, বদ্ধ করবার জন্য। তুমি ভাবছো জ্ঞান তোমাকে মুক্তি দেবে— কিন্তু ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অতিরিক্ত স্বতন্ত্র কোনও জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছো কি? যে মন দিয়ে বিচার করো, সেই মন-সরষের ভিতরেই যে ভূত ঢুকে রয়েছে— ওঝা সাজলেই হ'ল! যত উদ্যমই করো না কেন— যত প্রাণপণ চেষ্টাই করো না কেন, কোন প্রয়াসই ফলপ্রসূ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না, মহামায়া প্রসন্ন হয়ে রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করে দিচ্ছেন—মোহ-কারাগার থেকে নিষ্কৃতি দিচ্ছেন।—'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।' — এই মহামায়া প্রসন্ন হলে মানুষের মুক্তির জন্য বর দেন। তাই তাঁর চরণে শরণ নিয়ে নতমস্তকে প্রার্থনা করো তিনি যেন তোমাকে মুক্তি দেন। কখনও ভেবো না— তোমার প্রার্থনা বিফল হবে। কারণ, তিনি অনন্ত-করুণাময়ী।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, মুক্তি-রূপী লক্ষ্য সকল দর্শনেরই এক। প্রভেদ শুধু সেই লক্ষ্যপ্রাপ্তির সাধন-পথে। অদ্বৈতবেদান্ত ও সাংখ্যের মতে জ্ঞানবিচারের দ্বারা— নিজেরই চেষ্টার দ্বারা আমরা মুক্ত হইতে পারি। কিন্তু তন্ত্র বলেন, ভাল মন্দ সকল শক্তির যিনি অধিষ্ঠাত্রী সেই দেবীর কৃপা ব্যতীত কেহই মুক্তিলাভ করিতে পারে না।—

> 'সা বিদ্যা পরমা মুক্তে-
> হের্তুভূতা সনাতনী।
> সংসারবন্ধহেতুশ্চ
> সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী ॥'

—অর্থাৎ, তিনি সংসারমুক্তির হেতুভূতা পরমা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী ও সনাতনী এবং তিনিই সংসার-বন্ধনের কারণস্বরূপা অবিদ্যা ও ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী।

সাংখ্য বলেন—প্রকৃতির বিকৃতি-নাট্য পুরুষের ভোগাপবর্গের জন্য। তন্ত্রের সহিত কী সুন্দর মিল! বিস্মিত হইতে হয় এই সাদৃশ্যে। কারণ, তন্ত্রের শক্তিও জীবকে ভোগ ও মোক্ষ দেন। কিন্তু সাংখ্যের প্রকৃতি জড়া। তাই তিনি উপাস্যা নহেন। পক্ষান্তরে তন্ত্রের শক্তি সচ্চিদানন্দময়ী— জীবের আরাধ্যা, যাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। স্মরণ করি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা:

> 'মা!— কি মা? জগতের মা। যিনি সৃষ্টি করছেন, পালন করছেন। যিনি ছেলেদের সর্বদা রক্ষা করছেন, আর ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ— যে যা চায়, তাই দেন। ঠিক ছেলে মা ছাড়া থাকতে পারে না। তার মা সব জানে।'

অদ্বৈতবেদান্ত বলেন— শক্তি অবস্তু, মিথ্যা।

তন্ত্র উত্তর দেন—

তত্ত্ব হিসাবে বুদ্ধিগম্য করবার জন্যই তুমি বিশ্লেষণ ক'রে শক্তিকে ব্রহ্ম থেকে পৃথক্

করছো এবং অবস্তু বলছো, কিন্তু শক্তি তো কোনকালেই ব্রহ্ম থেকে বিশ্লিষ্টা ন'ন। শক্তিহীন ব্রহ্ম আমরা স্বীকার করি না। কি সৃষ্টিকালে, কি স্থিতিকালে, কি প্রলয়ে ব্রহ্মের সঙ্গে নিত্যসঙ্গতা যে শক্তি তাঁরই আমরা উপাসনা করি— অন্তকথায় আমরা শক্তিশবল ব্রহ্মেরই উপাসনা করি।

এই প্রসঙ্গে পুনরায় স্মরণীয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অমৃতবাণী :

'ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। একেকে মানলেই আর একটিকে মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি ;—অগ্নি মানলেই দাহিকা-শক্তি মানতে হয়, দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না ; আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না। সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না ; সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না।'

'দুধ কেমন ? না, ধোবো ধোবো। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না। আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না।

'তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলাকে, লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না।'

'এই আদ্যাশক্তি আর পরব্রহ্ম অভেদ। একটিকে ছেড়ে আর একটিকে চিন্তা করবার যো নাই। যেমন জ্যোতিঃ আর মণি। মণিকে ছেড়ে মণির জ্যোতিঃকে ভাববার যো নাই ; আবার জ্যোতিঃকে ছেড়ে মণিকে ভাববার যো নাই।'

'যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি ; পুরুষ বলি। যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় এই সব করেন, তাঁকে শক্তি বলি ; প্রকৃতি বলি। পুরুষ আর প্রকৃতি। যিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি।'

'আদ্যাশক্তি লীলাময়ী ; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কোন কাজ করছেন না— এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম ব'লে কই। যখন তিনি এই সব কার্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি নাম রূপ ভেদ।'

'জল স্থির থাকলেও জল, হেললে দুললেও জল, তরঙ্গ হলেও জল।'

'সাপ চুপ করে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ,—আবার তির্যক্‌গতি হয়ে এঁকে বেঁকে চললেও সাপ।'

'বাবু যখন চুপ করে আছে তখনও যে ব্যক্তি, —যখন কাজ করছে তখনও সেই ব্যক্তি।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপরি-উক্ত কথাগুলির মধ্যেই শক্তিতত্ত্বের সার নিহিত রহিয়াছে। অনেক তত্ত্বগ্রন্থ ঘাঁটিলেও যাহা দুর্বোধ্যই থাকিয়া যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উল্লিখিত কথাগুলিতে তাহা সহজ সরল হয়। শাস্ত্রারণ্য প্রতিপদে সমস্যা-শ্বাপদসঙ্কুল—সেখানে প্রবেশ করিতে হইলে শ্রীরামকৃষ্ণবাণীশস্ত্রে সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত থাকিলে নিঃশঙ্ক হওয়া যায়।

অদ্বৈতবেদান্তী নির্বিকল্প-সমাধিমান্ তোতা-পুরীকেও শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন :

"মাকে যে আগে মান্‌তে না, আমার সঙ্গে যে শক্তি মিথ্যা 'ঝুট্' ব'লে তর্ক করতে! এখন দেখ্‌লে, চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ঘুচে গেল! আমাকে তিনি পূর্বে বুঝিয়েছেন ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ—অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি যেমন পৃথক্ নয়, তেমনি!"

তোতাপুরী কী দেখিয়াছিলেন ? লীলা-প্রসঙ্গকারের প্রাণমাতানো ভাষায় তাহার বর্ণনা পাই :

'তোতার মন উজ্জ্বল আলোকে ধাঁধিয়া যাইয়া দেখিল—মা, মা, মা, বিশ্বজননী মা, অচিন্ত্য শক্তিরূপিণী মা ; জলে মা, স্থলে মা ; শরীর মা, মন মা ; যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, ভাবিতেছি, কল্পনা করিতেছি—সব মা ! তিনি হয়কে নয় করিতেছেন, নয়কে হয় করিতেছেন ! শরীরের ভিতর যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনি না ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে কাহা'রও সাধ্য নাই— মরিবারও কাহারও সামর্থ্য নাই ! আবার শরীর-মন-বুদ্ধির পারেও সেই মা—তুরীয়া, নির্গুণা মা !— এতদিন যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া তোতা প্রাণের ভক্তি-ভালবাসা দিয়া আসিয়াছেন, সেই মা শিব-শক্তি একাধারে হর-গৌরী মূর্তিতে অবস্থিত ! -- ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ !'

তন্ত্রের শক্তিতত্ত্ব ও সাধনপথের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমরা নাতিদীর্ঘ আলোচনা করিলাম। এক্ষণে তন্ত্রের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিতেছি।

বর্তমানকালে যখন বৈদিক যুগের ক্রিয়াকাণ্ড লোপ পাইয়াছে, তখন দেখা যাইতেছে যে, তন্ত্রের দ্বারা বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ— উভয় ভাগেরই কার্য সম্পাদিত হইতেছে। বহু নাম ও রূপের মাধ্যমে পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য যে সকল বিশেষ বিশেষ মন্ত্রজপ ও ক্রিয়ানুষ্ঠান করণীয় সে সকলই তন্ত্রে পাওয়া যায়। গৃহস্থের এবং সন্ন্যাসীর অবলম্বনীয় ভিন্ন ভিন্ন উপাসনাপদ্ধতির বিধানও তন্ত্রে দৃষ্ট হয়। কিন্তু তন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা প্রত্যেকটি মানুষের মুক্তির জন্য নির্দিষ্ট সাধন-প্রণালীর বিধান দেয়। জন্মজন্মান্তরের কর্মের ফলে প্রত্যেকটি মানুষ বিশিষ্ট সংস্কারযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই কারণে সকল মানুষের জন্যই একটি মাত্র সাধন-প্রণালী নির্দিষ্ট করা বিষম ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুদূর অতীতকাল হইতেই অধিকারিভেদে বিশেষ বিশেষ সাধনপদ্ধতির ব্যবস্থা হিন্দুধর্মে বিহিত হইলেও, তন্ত্রে আমরা সাধকভেদে ইষ্ট-নির্বাচনের যে ব্যবস্থা দেখি তাহা সত্যই অভূত-পূর্ব। তান্ত্রিক গুরু ভাবী শিষ্যের জন্মান্তরীণ কর্মানুসারে অভিব্যক্ত সংস্কারসমূহ সম্যক্ অবগত হইয়া তাহার জন্য একটি বিশেষ ইষ্টদেবতা নির্দিষ্ট করিয়া দেন এবং একটি বিশিষ্ট সাধনপদ্ধতির বিধান দেন। বর্তমান যুগেও এমন তান্ত্রিক গুরুর অভাব নাই, যিনি তাঁহার শিষ্যদের সংস্কারানুসারে প্রয়োজন হইলে বৈষ্ণবী বা অন্যবিধ দীক্ষাও দিয়া থাকেন।

তন্ত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হইল ত্যাগ-সম্পর্কে। ত্যাগের আদর্শ হিন্দুধর্মের মূলভিত্তি এবং এই মহান্ আদর্শই নানা রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের মধ্যেও যুগ যুগ ধরিয়া হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিয়াছে। অদ্বৈতবেদান্তমতে পূর্ণ ত্যাগী না হইলে কাহারও ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অধিকার নাই। সাংখ্যের মতও অনুরূপ। তন্ত্র কিন্তু বিশিষ্ট অধিকারীর জন্যই পূর্ণ ত্যাগের বিধান দেন—সকলের জন্য নহে। এখানেও আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, পুরুষ হউন বা নারী হউন, ব্রাহ্মণ হউন বা শূদ্র হউন— যিনিই পূর্ণ ত্যাগের অধিকারী তন্ত্র তাঁহার জন্য কৌল সন্ন্যাসের বিধান দেন। বলা বাহুল্য, পূর্ণ ত্যাগের অধিকারী অতি বিরল। কৌল সন্ন্যাসের অধিকার অর্জন করিতে হইলে দীর্ঘকাল নিরন্তর উপাসনা করিয়া নিজ মনকে প্রস্তুত করিতে হয়। ত্যাগ কাহারও উপর চাপাইয়া দেওয়া যায় না। নিঃস্বার্থপরতা, ভগবদ্ভক্তি ও উপাসনাসহায়েই উহা কালে স্বাভাবিকভাবে মানব-মনে প্রস্ফুটিত হয়।

তন্ত্রের আরেকটি উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য হইল স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান-প্রদর্শন। তান্ত্রিকগণ

বিশ্বাস করেন যে, ব্রহ্মশক্তি পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেই সমধিক প্রকাশিত এবং এই কারণে তাঁহারা প্রত্যেক স্ত্রীলোককেই বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখেন। আর বাস্তবিকই নারীর মধ্যে সেই শক্তি অবশ্যই নিহিত আছে, যাহা পুরুষকে দেবত্বে উন্নীত করিতে পারে। কি গৃহে কি সমাজে নারীই সেই দিব্য পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিতে পারেন, যেখানে পুরুষের পক্ষে কেবলমাত্র ইহলৌকিক সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি নহে, পরন্তু পারলৌকিক কল্যাণ তথা মুক্তি পর্যন্ত সুলভ হইতে পারে। তান্ত্রিকগণ 'জগতের যাবতীয় নারীমূর্তির ভিতর শ্রীশ্রীজগদম্বার বিশেষ শক্তিপ্রকাশ উপলব্ধি করিয়া ধন্য' হন। তাঁহারা বলেন, নারীর প্রতি আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিত পবিত্র ভাব হৃদয়ে পোষণ করিলে, পুরুষ দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হন, পক্ষান্তরে নারীকে অসম্মান করিলে—নারীর প্রতি স্বার্থদুষ্ট অপবিত্র ভাব পোষণ করিলে পুরুষ অধোগতিতে পশুত্বের স্তরে গিয়া পৌছায়। এইজন্য তান্ত্রিকগণ নারীর প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করা সাধনার অঙ্গ মনে করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশে পাই :

> 'বিদ্যাশক্তিই হউক বা অবিদ্যাশক্তিই হউক, সাধুসন্ন্যাসী ও ভক্তমাত্রেই সব স্ত্রীলোককে মা আনন্দময়ীর রূপ বলে জানবে।'

পরিশেষে উল্লেখ্য এই যে, ধর্মের নামে অনুষ্ঠিত এক শ্রেণীর তান্ত্রিকগণের কিছু কিছু সাধন ন্যায়-সঙ্গতভাবেই সমাজে বহুনিন্দিত হইয়াছে। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, ঐ সকল সাধন বা আচার-অনুষ্ঠান কোন কোন তন্ত্রগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ঐ তন্ত্রগুলি পরবর্তী কালে রচিত। যদি উক্ত আচার-অনুষ্ঠানের সপক্ষে কিছু বলিতে হয় তো, ইহাই বলা যায় যে, যাহারা অত্যন্ত পশুভাবাপন্ন তাহাদেরও কালে দিব্যভাবে উন্নীত হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই তন্ত্র তাহাদেরও গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল মানুষকে প্রথমেই পূর্ণ ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা শুনাইলে তাহা ফলপ্রসূ হইবে না বলিয়াই, তন্ত্র তাহাদিগের জন্য প্রথমে স্থূল ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং ক্রমশঃ উত্তরোত্তর সংযমের বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া তাহাদিগের প্রকৃত আধ্যাত্মিক কল্যাণের মার্গ ধীরে ধীরে নিরূপণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, উচ্চাঙ্গের তান্ত্রিক সাধনায় এই ধরনের সাধন-পদ্ধতির কোনও স্থান নাই। আমাদের সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণ পবিত্র না হইলে কেহই আদ্যাশক্তির কৃপালাভ করিয়া আপ্তকাম হইতে পারে না।

হে প্রভু

ফুলরাণী সেন

অনেক খেলনা দিয়েছো মোরে ভুলায়ে রাখিতে তুমি
হে প্রভু, আমার সকলি তো জানো তুমি যে অন্তরযামী।
খেলিতে পারিনা, এসেছে ক্লান্তি ;
নিয়ে যাও তথা, যেথায় শান্তি ;
তোমার চরণ করিলে স্মরণ, ঘুচিবে সকল ভ্রান্তি ॥

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীযুক্তা ইন্দুবালা দাশগুপ্তকে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Belur Math P. O.

Dt. Howrah

৩।৫।৩২

মা ইন্দু,

তোমার পত্র পাইয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। মা তুমি নিজের অযোগ্যতার কথা ভাবিয়া দুঃখ করিয়াছ কেন? তোমরা যে তাঁর অতি প্রিয় সন্তান। তাঁর যখন আশ্রয় লইয়াছ তখন সকল অযোগ্যতা সকল মলিনতা কাটিয়া যাইবে, ইহা অতি সত্য। মা নিজেকে অত হীন ভাবিও না। তুমি তাঁর সন্তান, এই বলিয়া মনে খুব জোর রাখিবে। প্রার্থনা করি, দিন দিন তোমার তাঁর উপর ভালবাসা প্রীতি বৃদ্ধি পাক। তাঁকে ভালবাসাই জীবনের লক্ষ্য ইহা মা, সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও। আমার শরীর তাঁর ইচ্ছায় একপ্রকার চলিয়া যাইতেছে। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। শিবানী ও গৌরীর পত্রও পাইয়াছি। তাহাদিগকে আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ দিবে। ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী

শিবানন্দ

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Godavari House

Ootacamund, (Madras)

16. 9. 26. ৩০ ভাদ্র/৩৩

মা ইন্দু,

তোমার ২রা শ্রাবণের পত্রের উত্তর এত [দিনে] দিবার সময় হইল। এত পত্র আসে যে সকলকে ঠিক ২ সময়ে উত্তর দিতে পারি না, তবু দুইজনে লিখি। তাহোক, একেবারে না লেখা অপেক্ষা বিলম্বে লেখাও ভাল। কিন্তু তোমাদের পত্র যখনই পাই তখনই তোমাদের উপর ঠাকুরের ইচ্ছায় একটা স্নেহপ্রীতি ও দয়ার ভাব উদয় হয় আর হৃদয়ের ভিতর হইতে ঠাকুরের শ্রীচরণে তোমাদের বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, জ্ঞান, বিবেক-বৈরাগ্যের জন্য প্রার্থনা করিবার ইচ্ছা উদয় হয় এবং তাহা করিয়া থাকি।

মা প্রভুরই এ সংসার, তিনি নানা প্রকারে জীবকে শিক্ষা দেন এবং জীবের তদ্দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ হয়, যার ফলে সে শেষকালে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর করিতে শেখে। আর আত্মনির্ভর হইয়া গেলে আর জীব সংসারের সুখে হৃষ্ট হয় না, দুঃখেও উদ্বিগ্নমনা হয় না, তোমাকে প্রভু তাই কচ্চেন। (সকলকেই তাই কচ্চেন তবে সকলে বুঝে না) তোমরা ঠাকুরের আশ্রিত ভক্ত তোমরা ঠিক বুঝিবে। তোমার পত্রে তুমি·· তোমার মনের যেরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছ, পড়িয়া আমার মনে বড়ই আশা হইল যে ঠাকুরের, ভক্তেরা তাঁর কৃপায় এই ভাবেই সংসারে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তাঁতেই শেষে আকৃষ্ট হয় ও তাঁতে আত্মনির্ভরতা লাভ করে। ধন্য প্রভু, ধন্য জ্ঞানদাতা গুরু, যুগাবতার প্রভু রামকৃষ্ণ। মা অধিক আর কি লিখিব, আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ তুমি ও তোমরা সকলে জানিবে। আমার ও আমাদের শরীর প্রভুর ইচ্ছায় মন্দ নয়। তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

(৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Belur Math P. O.
Dt. Howrah, (Bengal)
2. 7. 28

মা ইন্দু,

তোমাদের কুশল সংবাদ পাইয়া সুখী হইলাম। তোমাদের আসা নাই হইল— তোমরা ঘরে বসেই ঠাকুর ও মার কৃপা ও করুণা প্রাপ্ত হইবে। সংসার তিনিই দিয়াছেন— তাঁর দেওয়া কর্ত্তব্যও ত পালন করতে হবে। তাঁর প্রতি মনের নির্ভরতা ও ভক্তি বিশ্বাস স্থির রেখে কর্ত্তব্য পালন করে যাও— এর চেয়ে আর সুখের অবস্থা কি হবে বল। প্রার্থনা করি তিনি তোমাদের ভক্তি বিশ্বাস দৃঢ় করুন এবং সংসারের মধ্যেই শান্তি ও আনন্দ প্রদান করুন।

আমার শরীর তাঁর কৃপায় এক প্রকার চলে যাচ্ছে। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে এবং বিনো দেশ্বর প্রভৃতি বাড়ীর সকলকে জানাইয়া সুখী করিবে। ইতি

সতত শুভানুধ্যায়ী

শিবানন্দ

স্বামী তুরীয়ানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

কাশীধাম
22-8-19

প্রিয়—,

তোমার ১৯শে আগষ্টের পোষ্টকার্ড পাইয়া প্রীত হইয়াছি। আমার আবার জ্বর হইয়াছিল। ৬।৭ দিন একজ্বরে থাকি পরে জ্বর বিরাম হয়। এখন আর জ্বর নাই, কিন্তু অতিশয় দুর্ব্বল, সর্ব্বদা বিছানায় পড়িয়া থাকিতে হয়, উঠিয়া বেড়াইতে পারি না। আহারে দারুন অরুচি। সেজন্য খাইতেও পারি না। ডাক্তারী ঔষধ খাইতেছি। তুমি ভাল আছ জানিয়া সুখী হইলাম। নী , দি—, মু- প্রভৃতি ঠাকুর স্বামীজির ভক্তদের সহিত একত্রে থাক এবং পড়াশুনা কর ইহা খুব আনন্দের কথা। চিরকাল ছেলেমানুষের মত থাকিলে চলিবে না। চিঠি পাইলেই সাহস ও বল পাও নতুবা নয়, একথা যেন আর না শুনিতে হয়। প্রভুর কৃপায় এখন তুমি আর তেমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নও জানিয়া যে কতদূর সুখী হইলাম, তাহা আর কি জানাব। দীক্ষা লইবার ইচ্ছা করিয়াছ ইহা অতি সৎসঙ্কল্প। তার জন্য এখনও উপযুক্ত নও একথা কেন বলিব। ভগবানের স্মরণ লওয়া, তাঁহার নাম জপ ধ্যান আদি নিয়মপূর্ব্বক করিলে, ইহাতে ভাল হইবে। অমঙ্গলের সম্ভাবনা কোথায়? যাঁহার প্রতি তোমার ভক্তি শ্রদ্ধা হইবে, তাঁহারই নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিতে পার। শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট হইতে অনেকেই দীক্ষা লইয়াছে। ইচ্ছা হইলে তুমি ইঁহাদের কাহারও নিকট হইতে দীক্ষা লইতে পার। অধিক আর কি লিখিব। অন্যান্য সংবাদ সব কুশল। আমার শুভেচ্ছা ও ভালবাসা জানিবে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীতুরীয়ানন্দ

কাশীধাম
11-6-19

প্রিয়—,

তোমার ২১শে জ্যৈষ্ঠের (?) পোষ্টকার্ড পাইয়াছি। অনেক সময়ই তোমার কথা মনে হয়। তুমি এখনও সেই পূর্ব্বের মত রহিয়াছ দেখিতেছি। আপনাকে স্থির করিবার চেষ্টা কর না কেন? ভগবানকে নাই বা ডাকলে, নাই বিশ্বাস করলে, নিজেকে ভালবাসিতে চেষ্টা কর না কেন? নিজেকে ত আর বিশ্বাস করবার দরকার নাই, নিজে ত বর্ত্তমান আছই, তবে নিজের কল্যাণ-চেষ্টা কেন না কর? আবল তাবল কেন ভাব? উন্নতি বলে একটা জিনিষ আছে বুঝ ত? তার জন্য চেষ্টা কেন না কর? নিজে চেষ্টা করে উপায় না করলে অন্যের চেষ্টায় কি কিছু হয়? আমি পাপী আমি অধম ইত্যাদি বলতে তোমায় কে বলচে? আপনাকে যেরূপে পার উন্নত কর। মাথার বোঝা অন্যে সাহায্য করলে নামাইতে পারে কিন্তু একজনের ক্ষুধা অপরে খাইলে নিবৃত্তি হয় না, নিজেকেই খাইতে হয়। হতাশ হইও না, চেষ্টা কর সফলমনোরথ হইবে। বৃথা হা-হুতাশ করিলে কোনও ফলই হইবে না বরং অপকারই হইবে। চিত্তকে একাগ্র করিতে চেষ্টা করিও, বিক্ষিপ্ত করিতে দিও না। আমার সর্ব্বাঙ্গীণ আশীর্ব্বাদ ও ভালবাসা জানিবে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীতুরীয়ানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা

স্বামী সারদেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহবাৎসল্যের, মাতৃভাবের বিশেষ বিকাশ তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে থাকার সময় হইতেই। হৃদয় শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করিতেন। দৈবচক্রে হৃদয়কে দক্ষিণেশ্বর হইতে চলিয়া যাইতে হয়। তাহার পরই শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহরক্ষার ভার নেন যেন মাকালী স্বয়ং— শ্রীশ্রীমারূপে। ঠাকুর তখন প্রায় সর্বদাই অতি উচ্চ ভাবে থাকিতেন। শ্রীশ্রীমা তাঁহার দেহরক্ষার উপযোগী আহার স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতেন। নহবতের সেই ছোট ঘরটির মধ্যেই তাঁহার ভাণ্ডার, সেইখানেই বাসস্থান। সারাদিনরাত্রি সেই ঘরটিতেই কাটিত। ক্রমে শুধু ঠাকুরের নয়, ঠাকুরের স্ত্রীভক্ত ও যুবক ভক্তেরা যখন আসিতে লাগিলেন, তাঁহাদেরও অনেকের খাওয়ার ব্যবস্থা শ্রীশ্রীমাকেই করিতে হইত। তিনি তখন তাঁহাদেরও মা। কখনো কখনো যুবক ভক্তদের কোন ভাল জিনিস বা একটু বেশী খাওয়ানোর ব্যাপারে নিষেধ করিতে যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকেও তাঁহার মাতৃহৃদয়োত্থিত কথা শুনিয়া নীরবে ফিরিতে হইয়াছে !

তখন হইতেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের মা। অসুখের চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরে ও পরে কাশীপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থানকালে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণ তাঁহাকে মা বলিয়া আরো গভীরতরভাবে অনুভব করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের পর তিনি হইয়া উঠিলেন সংঘজননী। দেখা যায়, পরিব্রাজক স্বামী ব্রহ্মানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছেন ; শেষবার বরাহনগর মঠ হইতে পরিব্রাজকরূপে বাহির হইবার পূর্বে স্বামীজী শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন, আমেরিকা যাইবার পূর্বেও তাঁহার অনুমতি চাহিতেছেন ! ছোট মামীর মুখে শুনিয়াছি, বিশ্বজয় করিয়া ফিরিবার পর স্বামীজী যেদিন শ্রীশ্রীমায়ের চরণ বন্দনা করিলেন, সেদিন "রাজার মতো চেহারা, ঠাকুরঝির পায়ে লম্বা হয়ে পড়লো, জোড়হাতে বললো—'মা, সাহেবের ছেলেকে ঘোড়া করেছি, তোমার কৃপায়' !" ছোট শিশুও কোন মনোমত দ্রব্য পাইলে ছুটিয়া গিয়া মাকে দেখাইবে, মা তাহা ভাল বলিলেই তাহার আনন্দের সীমা থাকে না। স্বামীজী পাশ্চাত্য হইতে আহৃত শ্রেষ্ঠ রত্ন তাঁহার মানসকন্যাকে মায়ের পদপ্রান্তে উপহার দিলে মা পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন, আদর করিলেন, কাছে রাখিলেন। স্বামীজীর আনন্দের সীমা নাই। তখন গোঁড়া হিন্দুসমাজের পরিবেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিতা, রক্ষণশীলা, সর্বপ্রকারে সকলের সন্তোষ-সাধনে যত্নশীলা, কাহারও মনে কোন প্রকারে পীড়া দেওয়াতে অনিচ্ছুক মাতাঠাকুরাণীর পক্ষে সামাজিক প্রথার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ, নিবেদিতাকে স্বগৃহে আশ্রয়দানের কথা ভাবিলেও বিস্ময়ের অবধি থাকে না। পরমা বিদুষী মহামনস্বিনী পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতায় গঠিত জীবন, আধুনিক জগতের সর্ববিষয়ে পারদর্শিনী মিস্ নোবল এই অশিক্ষিতা সরলা পল্লীবালার স্নেহে কিরূপ আকৃষ্টা এবং তাঁহার প্রভাবে প্রভাবান্বিতা হইয়া দেবীজ্ঞানে ভক্তি বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা স্বয়ং লেখনীমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। মায়েরও এই পরম ভক্তিমতী মেয়ে 'খুকী'র প্রতি কিরূপ টান ছিল, তাহা তাঁহারই কথায় ব্যক্ত করিয়াছেন। আমাদেরও তাহা কিঞ্চিৎ দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। ভগিনী নিবেদিতার মত

আরও অনেক বিদেশী-বিদেশিনী পুত্র-কন্যারূপে মায়ের স্নেহ-অঙ্কে স্থানলাভ ও মাতৃস্নেহ আস্বাদন করিয়া চিরশান্তি ও পরমানন্দের অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বয়ং লীলাময়ীর সেই অপূর্ব লীলার সংবাদ সাধারণে ব্যক্ত করিয়াছেন।

স্বামীজী বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া সর্বাভীষ্ট-দাত্রী মা দুর্গার আরাধনায় অভিলাষী হইয়া অগ্রে জননী সারদাদেবীর অনুমতি গ্রহণ করিলেন। তিনিই ত মালিক,—এই সকল বাড়ীঘর মঠ আশ্রমের— তাই তাঁহারই নামে শ্রীদুর্গাপূজার সংকল্প। মা স্বয়ং পূজক ও তন্ত্রধারককে যথোপযুক্ত দক্ষিণা দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া পূজা, যজ্ঞ পূর্ণ করিলেন; অন্তরের ব্যাকুল প্রার্থনা, 'বাছাদের সর্বপ্রকারে কল্যাণ সুখ শান্তি লাভ হোক মা দুর্গার কৃপায়।' 'জ্যান্ত দুর্গা'র শরণাগত হইয়া তাঁহার স্নেহময়ী মোক্ষদাত্রী মূর্তিকে আশ্রয় করিয়া স্বামীজী প্রবর্তন করিলেন মঠে তাঁহারই অভ্যুদয়দায়িনী মূর্তি, দশভুজা দুর্গারূপের পূজা।

এই দুর্গাপূজা-প্রসঙ্গে মায়ের আর একটি শুভ প্রেরণার কথা মনে পড়ে। দুর্গাপূজায় বলির বিধান আছে, বাংলাদেশে পাঁঠাবলির বিশেষ প্রচলন। মা বলির সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া কেহ শুনে নাই। জয়রামবাটীতে সিংহবাহিনীর নিকটে, কামারপুকুরে শীতলাদেবীর স্থানে বলি হইত। মা স্বয়ং রান্না করিয়া সন্তানদিগকে মহাপ্রসাদ খাওয়াইয়াছেন। এক সময়ে জয়রামবাটীতে একটি সন্তান মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইলে মা স্নেহার্দ্রস্বরে বলিয়াছিলেন, 'মা সিংহ-বাহিনীর মহাপ্রসাদ, খাও, বল হবে।' সেই মা-ই কিন্তু মঠে সন্ন্যাসীদের আশ্রমে পশুবলি নিষেধ করিলেন।

স্বামীজী যে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধুদের জনসেবার কাজে লাগাইয়াছেন, এটি ঠিক ঠাকুরের ভাবানুগ কি না,—এ সংশয় প্রথম দিকে অনেকেরই মনে উঠিয়াছে। শ্রীশ্রীমায়ের নিকট এ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে জিজ্ঞাসাও করিয়াছেন কেহ কেহ। মা কাহাকেও বলিয়াছেন, "এ সবই ঠাকুরের কাজ"। আবার কাহাকেও বা বলিয়াছেন, "বাবা, তোমরা কাজ ক'রে খাও। কাজ না করলে কে খেতে দেবে—রোদে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে করে মাথা ঘুরে যাবে। ভাল করে খেতে না পেলে শরীরে অসুখ করবে। তোমরা ওসব কথা শুনো না। কাজ কর, ভাল ক'রে খাও দাও, ভগবানের ভজন কর।"

এই প্রসঙ্গে স্বামী শুদ্ধানন্দজীর কথা মনে পড়িতেছে। তিনি বলিতেন— "স্বামীজী বলিয়াছেন, ঠাকুরের একটি উপদেশ অবলম্বন করে বড় বড় পুস্তক লেখা চলে। মায়ের শুধু এই উপদেশটি—'কাজ ক'রে খাও, বাবা' নিয়ে আমিও কয়েক খণ্ড গ্রন্থ লিখিতে পারি।" তাঁহারই বিশেষ আগ্রহে শ্রীশ্রীমায়ের কথা প্রথম প্রকাশিত হয়, সে ঘটনা উল্লেখযোগ্য। মায়ের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত সন্তান স্বামী অরূপানন্দ জয়রামবাটীতে গিয়া মাকে প্রথম দর্শনের সময় হইতে সেইসব কথা-বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। শ্রীশ্রীমার অন্তর্ধানের অব্যবহিত পরেই অন্যান্য ভক্তগণের নিকট হইতেও মায়ের কথা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন। এবং শ্রীমতী—র দৈনন্দিন লিপি, মায়ের কথার প্রথমাংশ, অতি চমৎকার বিবরণ পাইয়া বিশেষ আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়া ঐ বিষয়ে বিশেষ প্রযত্ন করিতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে অনেক সংগৃহীত হইল বটে, কিন্তু অরূপানন্দজী উহা প্রকাশ করিতে সাহসী হইলেন না। প্রায় দুই বৎসর পরে স্বামী শুদ্ধানন্দজী কাশীতে গিয়া কিছুদিন অবস্থান করেন। সেই সময় উহা পাঠ করিয়া পরম পুলকিত হন এবং কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়া স্বামী সারদানন্দজীকে ঐ সকল লেখা

পুস্তকাকারে উদ্বোধন হইতে প্রকাশের জন্ম বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

সেই সময়ে প্রবাসী পত্রিকায়, উহার সম্পাদক মনীষী রামানন্দবাবু, মায়ের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া মায়ের কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তগণকে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে আরও অধিক কথা প্রকাশ করিবার জন্ম অনুরোধ জানান। প্রবাসীর প্রবন্ধ শ্রীযুত গণেন মহারাজ ও শ্রীশ্রীলীলাপ্রসঙ্গের সহায়তায় লিখিত হইয়াছিল। শুদ্ধানন্দজী প্রবাসী-সম্পাদকের অনুরোধের উল্লেখ করিয়া সারদানন্দজীকে বলেন: যখন জনসাধারণের পক্ষ হইতে মায়ের প্রসঙ্গ জানিবার আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে, তখন আমাদের এই সকল প্রকাশ করা কর্তব্য। সারদানন্দজী সম্মত হইলেন এবং বলিলেন: সংগৃহীত লেখা দেখিয়া ভালভাবে সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করা প্রয়োজন। তিনি ও শুদ্ধানন্দজী দুইজনে একসঙ্গে বসিয়া প্রথমে সব শুনিবেন, তৎপরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। অরূপানন্দজীকে কাশীতে পত্র লেখা হইল— গণেন মহারাজ টাকা পাঠাইলেন; তিনি খাতাপত্র লইয়া উদ্বোধনে আসিলেন, সন্ধ্যার পর সারদানন্দজীর ঘরে পাঠ হয়। তিনি ও শুদ্ধানন্দজী একত্রে বসিয়া শ্রবণ করেন। আরও অনেকের শুনিবার পড়িবার সৌভাগ্য হইয়াছিল এবং পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে ভক্তবৃন্দ ও সর্বসাধারণ পাঠকগণের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়।

* * *

শ্রীশ্রীমায়ের সন্তানদের মধ্যে সামাজিক ব্যবহার দোষগুণ বিচারে ভালমন্দ সব রকমেরই আছে। ভালদের ত সকলেই ভালবাসে, আদর করে, তাহাদের প্রশংসা শুনিয়া ত মাও প্রফুল্ল হন, অপরের কাছে উৎফুল্ল হইয়া বলেন 'আমার গুণী ছেলে'। মন্দছেলের দোষের কথা, নিন্দাও যাকে শুনিতে হয়, কষ্টও পান। কিন্তু স্নেহ-ভালবাসা সকল সন্তানের উপরই সর্বাবস্থায় সমানই থাকে, উহার বিন্দুমাত্র হ্রাস, বা ব্যবহারে তারতম্য কেহ কখনও দেখে নাই। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, নবাসননিবাসী জনৈক সন্তানের প্রতি মায়ের অপার স্নেহের কথা। মায়ের কৃপাপ্রাপ্ত যুবকটি ভদ্রবংশজাত, শিক্ষিত, গুণবান। দুরদৃষ্টবশতঃ তাহার পদস্খলন হইল। মায়ের উপর শ্রদ্ধা ভক্তি ঠিকই আছে, পূর্বের মত আসে যায়। অপর ভক্তেরা কিন্তু ইহা সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহারা একদিন মাকে ধরিলেন, ভ্রষ্টচরিত্র যুবককে যেন তিনি প্রশ্রয় না দেন, তাঁহার কাছে আসিতে নিষেধ করিয়া দেন। মা ছেলের জন্ম খুব দুঃখ প্রকাশ করিলেন সত্য, কিন্তু ভক্তগণকে বলিলেন, "আমি নিষেধ করিতে পারি না মা হয়ে ছেলেকে 'এসো না' বলা আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না।" সন্তানের আসা-যাওয়া বন্ধ হইল না, মায়ের স্নেহাদরও কমিল না, তবে ক্রমে ছেলের হৃদয়ে, ইহারই ফলে মনে হয়, অনুশোচনা বিবেকের উদয় হইয়াছিল।

পুত্রকন্যাগণের প্রতি মায়ের হৃদয়ের টান স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি তাহার বর্ণনা সাধ্যাতীত হইলেও কিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিতেছি। ঠাকুর-মার দেশে সেই সময়ে যাতায়াত কিরূপ কঠিন ছিল, তাহা আধুনিক কালের লোকের পক্ষে ধারণার অতীত। কোনদিকেই দশ-বারো ক্রোশ রাস্তা পদব্রজে বা গরুর গাড়ীতে অতিক্রম না করিলে আসা যায় না। সেই কষ্ট স্বেচ্ছায় সানন্দে বরণ করিয়া মায়ের পুত্রকন্যাগণ তাঁহার কাছে যাতায়াত করেন। [ক্রমশঃ]

সমুদ্রের উপকূলে

স্বামী নিরাময়ানন্দ

তখনও সমুদ্র দেখিনি, পুরী স্টেশন থেকে চলেছি চক্রতীর্থের পথে। সঙ্গীদের একজন বলে উঠল : ঐ তো আমাদের আশ্রম দেখা যাচ্ছে! আমি জিগ্যেস করলাম, 'তবে যে শুনেছিলাম আশ্রম একেবারে সমুদ্রের ধারেই! সমুদ্র কই?' ভুবনেশ্বর থেকে আগত আমাদের এই নাতিবৃহৎ দলটির নেতা বয়োবৃদ্ধ সাধুটি বলে উঠলেন, 'ঐ তো সমুদ্র — তুমি যা দেখছ সামনে।'

আমি তো অবাক্! ঐ তো সমুদ্র, যা দেখছি সামনে! আমি তো সামনে দেখছি— নীল-সবুজ রঙের একটা বিরাট ময়দান— তবে যত কাছে অগ্রসর হচ্ছি, মনে হচ্ছে, না এ তো স্থির নয়— ঠিক সমতলও নয়, গোলাকৃতি ভূগোলে-পড়া পৃথিবীর মতো, তার উপরিতলে কী যেন আসছে ও যাচ্ছে সাদা ফেনার মতো। ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছি সকলে শুদ্ধ মৌন, বুঝলাম— এই সমুদ্র, এখনি যাব ঐ সমুদ্রের উপকূলে। স্নান করব সমুদ্রে, না অভিষিক্ত হবো সমুদ্রের তরঙ্গে? স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা উপলক্ষে পুরীতে সমাগত এই আমার প্রথম সমুদ্র-দর্শন!

এই অপূর্ব অনুভূতির আগেকার কতকগুলি ঘটনা— যেগুলির কারও সঙ্গে কারও হয়তো সাক্ষাৎ কোন যোগাযোগ নেই, কিন্তু আজকের— মানসিক সমীকরণে মনে হয় এগুলির মধ্যে কোথায় যেন একটা 'সামান্যতা' রয়েছে, সেটা বোধ হয় প্রথম অনুভূতির সঙ্গে পরের অনুভূতির ঐ অপরূপ অসামান্যতা!

যাক্, এবার দার্শনিক আলোচনা ছেড়ে দর্শনের 'লোচনায়' আসা যাক্— অর্থাৎ যা দেখছি ও যা শুনেছি এবং যা আজও ভুলতে পারিনি এমনই কয়েক দিনের কয়েকটি কথায়। যা প্রথমে মনে হয়েছিল অতি সাধারণ, কিন্তু যতদিন গেছে ততই মনে হয়েছে, না এ অতি অসাধারণ!

(১)

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ। কলকাতায় একটা ভাবের চাঞ্চল্য জাগছে শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকীর প্রস্তুতির মুহূর্তে। এমনি একটা ভাবের স্রোতে ভাসতে ভাসতে গিয়ে হাজির হই 'উদ্বোধনে'র উপকূলে! কাশীধাম থেকে এসেছেন স্বামী অরূপানন্দ— রাসবিহারী মহারাজ— শ্রীশ্রীমায়ের একান্ত সেবক। চোখের ডাক্তারের কাছে তাঁকে নিয়ে যেতে হবে সন্ধ্যার পর। তখনও দিনের আলো আছে, পূজনীয় নির্মল মহারাজ (স্বামী মাধবানন্দজী তদানীন্তন সহকারী সম্পাদক— শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন) এসেছেন, হাতে কিছু কাগজপত্রের ফাইল। তাড়াতাড়ি ওপরে গেলেন— প্রণামাদি সেরে সন্ধ্যার মুখেই বেরিয়ে পড়লেন। সেই সঙ্গে রাসবিহারী মহারাজও বেরুলেন, তাঁর সঙ্গে আমি। বাগবাজার স্ট্রীটে পড়ে দুইজনের কথাবার্তা শুরু হ'ল :

হ্যাঁ ভাই নির্মল, কোথায় চলেছ— ফাইল-পত্র নিয়ে এই সন্ধে বেলা?—

'এটর্নির বাড়ি রাসবিহারীদা, মঠের পশ্চিমের জমিটা নেওয়া হচ্ছে— তারই পরামর্শ।'

রাসবিহারী মহারাজ কিছুক্ষণ নীরব রইলেন, তার পর গম্ভীরভাবে বললেন, 'আচ্ছা ভাই, আমরা যখন এসেছি তখন কি দেখেছি?— আর এখন যারা আসছে— তারা কি দেখছে?'—

নির্মল মহারাজের সপ্রতিভ উত্তর : যাদের যেমন ভাগ্য।

রাসবিহারী মহারাজ বলে চলেছেন— কতকটা নিজের ভাবে: আমরা এসে দেখলাম— জপ ধ্যান সাধন ভজন— মনে আছে তো সব ?—

'মনে থাকবে না কেন ?— তার জোরেই তো চলেছি।'

'আর এখন এরা এসে কি দেখছে ? টেবিল, চেয়ার, টাইপ-রাইটার হিসাব আর ফাইল। কি নিয়ে চলবে এরা ?'

'তাহলে রাসবিহারীদা, আমিও বলি, যিনি এদের এনেছেন, তিনিই এদের চালাবেন। আমরা তো বলি না, আমাদের দেখে চলতে শেখো। আমরা যাঁদের কাছে এসেছিলাম তাঁদের সেই জীবন দেখে যতটা পেরেছি, শিখতে চেষ্টা করেছি। শেষে তাঁরাই বলেছেন কাজ কর, ঠাকুর-স্বামীজীর কাজ, তাঁদের আদেশ-নির্দেশ ভেবেই কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। জানি তাঁরা পেছনে আছেন— তাঁরা দেখছেন – তাঁরা দেখবেন !'

'আর এদের কি হবে ? এরা তো তাঁদের ধ্যান ভজনও দেখেনি, তাঁদের আদেশ-নির্দেশও পায়নি— শুধু কাজ ক'রে ক'রে শেষ পর্যন্ত এদের কি হবে ?'

'রাসবিহারীদা, এদের কি আমরা ডেকে আনতে গিয়েছিলুম ?—এরা এসেছে ঠাকুর স্বামীজীর বই পড়ে, তাঁদের কথা শুনে, তাঁদেরই আকর্ষণে, তাঁদের আদর্শ ভালবেসে, তাঁদের কাজে জীবন যাপন করবে বলে ! এরাও কি কম ?— এই ভাবই এদের চালিয়ে নিয়ে যাবে, আমাদের দেখে এদের শিখতে হবে না।'

দুজনেই গম্ভীর হয়ে পথ চলছেন। তখনকার দিনের কলকাতার বিরল জনপথে নিজেদেরই পদ-শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর নির্মল মহারাজ আবার বলে উঠলেন: 'রাসবিহারীদা, গঙ্গোত্রী, হৃষীকেশ, হরিদ্বারে গঙ্গার জল স্বচ্ছ পরিষ্কার, দক্ষিণেশ্বর বেলুড়ে সে জল ঘোলা ময়লা, কত কিছু ভাসছে, তা'বলে গঙ্গার পাবনী শক্তি তো কমে যায়নি।' বলতে বলতে আমরা শ্যাম-বাজারের মোড়ে এসে পড়লাম। তখন ২ নং বাস ছাড়ত ভবনাথ সেন স্ট্রীটের মোড় থেকে ; একটা গাড়ী প্রায় ছাড়ে ছাড়ে। নির্মল মহারাজ টপ করে লাফিয়ে বাসে উঠে একটু হাত নেড়ে বললেন— 'আজ তা হলে আসি রাসবিহারীদা !'

আমরা ডাক্তারের বাড়ির পথ ধরলাম, কিছুক্ষণ নীরবতার পর রাসবিহারী মহারাজ বললেন: শুনলি সব কথা ?— দেখলি কি প্রতিভা ?— বেলুড়ের গঙ্গায় হরিদ্বার হৃষীকেশের স্বচ্ছতা নেই, তা'বলে পাবনী শক্তি তো কমে যায়নি।

দেশ-কালের হিসাবে উৎস থেকে বহু দূরে চলে এলেও অবতারলীলার পাবনী শক্তি কমে না বরং বেড়েই চলে— যথা নদীর গতি সমুদ্রাভিমুখে।

(২)

১৯৪২ মে-মাসের মাঝামাঝি কনখল সেবাশ্রম। বেলুড় দক্ষিণেশ্বরের ঘোলা গঙ্গার পর হরিদ্বার হৃষীকেশে এসেছি— স্বচ্ছ গঙ্গা দেখতে ! পাবনী শক্তির কমবেশি বোঝবার মতো বুদ্ধিও নেই— শক্তিও নেই। তবে নীলাভ স্বচ্ছ গঙ্গার কথা পড়েছি, আজ দেখলাম। অহর্নিশ কর্মমুখর সেবা-কেন্দ্র থেকে নির্জন তপস্যার কুটিরগুলিও দেখে এলাম, ভাবছিলাম— কর্ম না তপস্যা।

কনখলে দুই প্রকার সাধুরই সমাবেশ, তাই 'কর্ম না তপস্যা', এ আলোচনা মাঝে মাঝে চলত। এমন সময় শুনলাম পূজ্যপাদ বিরজানন্দজী মহারাজ দেরাদুন থেকে শ্যামলাতালে যাবার পথে একদিনের জন্য কনখলে আসছেন। শুনে খুব আনন্দ হল। তিনি নির্দিষ্ট দিনে সকালেই সদলবলে এসে পড়লেন, সারাদিন খুব আনন্দে কাটল। সন্ধ্যারতির পর পূজনীয় মহারাজ আশ্রমস্থ সকলের সঙ্গে লাইব্রেরি হলে মিলিত হবেন ও কিছু

বলবেন। বোধ হয় কেউ কর্ম ও তপস্যার কথা তাঁকে বলেছে!

ধীর গম্ভীর কণ্ঠে শ্মশ্রুশোভিত মুখে মাথাটি নেড়ে নেড়ে থেমে থেমে পূজনীয় মহারাজ কথা বলছিলেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আলোচনা এসে পড়ল কর্মী সাধু ও তপস্বী সাধুদের প্রসঙ্গে। আমরা সকলেই খুব মন দিয়ে শুনলাম—এবং 'পরমার্থ প্রসঙ্গ' বইখানির শেষ পৃষ্ঠায় লিখেও রেখেছিলাম—আলোচিত বিষয়ের মূল সূত্রগুলি। পূজনীয় মহারাজের জীবনে কর্ম এবং তপস্যা সমান তালে চলেছে, তাই তাঁর কথাগুলি সকলেরই প্রাণস্পর্শ করে। পরের দিন পরস্পরের আলোচনায় তা আমরা বেশ বুঝতে পারি। মহারাজের কথাগুলি বহুবার মনে মনে আলোচনা করেছি, তাই মনে হয় এই যেন সেদিনের শোনা:

কর্ম ও তপস্যা—দুইই দরকার, কোনটিকেই ছোট মনে করা ঠিক নয়। তোমরা স্বামীজীর ভাব নিয়ে সাধু হতে এসেছ—তোমরা কর্মকে বাদ দিয়ে দাঁড়াবে কোথায়?—আবার তপস্যা না থাকলে ঠিক ঠিক নিষ্কাম কর্মই বা করবে কি ক'রে? তোমাদের জীবনে দুইই দরকার। এই যে সব কাজ কর্ম চলেছে—এগুলি করতে হবে সেবাবুদ্ধিতে, উপাসনার ভাবে—অর্থাৎ স্বার্থ আর অহংভাব ত্যাগ ক'রে। তপস্যা না থাকলে এ সম্ভব নয়। তবে তপস্যা মানেই হৃষীকেশ বা উত্তরকাশী নয়; তা'বলে যে মাঝে মাঝে ঐ সব স্থানে যাবে না তাও নয়। স্বামীজী এই সব কাজের পত্তন করেছেন, আবার হিমালয়ে তপস্যার জন্যও তাঁর কত আগ্রহ। তোমাদের জীবনেও এ দুয়ের সমন্বয় চাই। তপস্যার ভাব না থাকলে শুধু কাজে অহমিকা এসে যায়, সাধু তার জীবনের উদ্দেশ্য ভুলে যায়।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে চার বছর পরে নতুন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের কাছে বলা তাঁর কথাগুলি: সন্ন্যাস জীবনের উদ্দেশ্য নয়, উপায় মাত্র। আত্মজ্ঞানলাভের উপায়। সন্ন্যাস সিদ্ধি নয়, সাধন! অর্থাৎ মনে করো না যে-উদ্দেশ্যে সংসার ছেড়ে বেরিয়েছিলে সেই উদ্দেশ্য আজ লাভ হয়ে গেল, তা নয়—একটা উচ্চতর জীবনের উচ্চতর সাধনার অধিকার পেলে তোমরা। এর মর্যাদা রক্ষা করবে! সর্বদা মনে রাখবে সেই মহৎ ও পবিত্র দিনটির কথা যেদিন মা বাপকে ছেড়ে ভগবানের জন্য—এ পথে পা বাড়িয়েছ, সেই দিনের ত্যাগ বৈরাগ্যের ভাবটি সর্বদা মনে জাগরূক রাখবে। এই ভাবই তোমাদের রক্ষা করবে।

আমি কত সময় সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখি এই তরুণ শুভ্র ব্রহ্মচারীদের—কি অনুরাগ নিয়ে এরা এসেছে—কি নিষ্ঠা নিয়ে এরা চলেছে!…

(৩)

১৯৩৩, বেলুড় মঠ গঙ্গাতীরে পায়চারি করতে করতে স্বামী শুদ্ধানন্দজী (তখন সাধারণ সম্পাদক) অর্ধপরিচিত একটি যুবককে বলে চলেছেন বেলুড় মঠের বাজেট অর্থাৎ বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব। বিশেষ কারণে বিবেকানন্দ সোসাইটির সম্পাদক পাঠিয়েছিলেন শুদ্ধানন্দজীর সঙ্গে দেখা করতে, এবং খুঁটিনাটি সব বলে দিয়েছিলেন, কারণ মহারাজ সব জিগ্যেস করবেন, জিগ্যেস করলেনও অনেক কথা। পরীক্ষায় পাস মার্কের চেয়ে বেশ কিছু বেশীই পেয়েছিলাম মনে হয়। কারণ মহারাজকে খুব সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট দেখাচ্ছিল। সাহস পেয়ে জিগ্যেস করলাম, 'মহারাজ, এখানে যারা আসে, তারা কি শুধুই কাজ করে, না জপধ্যানও করে?'

মহারাজ চমকে বলে উঠলেন, 'সে কিরে, এমন গঙ্গার তীর, মঠ-মন্দির, সাধু ব্রহ্মচারী হয়েছে—জপধ্যান করবে না কিরে? মানুষ কাজ

কতক্ষণ করতে পারে, আর জপধ্যানই বা কতক্ষণ করতে পারে? তাই স্বামীজী এই মঠ করেছেন—এখানে যারা আসবে, প্রথমে তারা কর্ম ও উপাসনা পৃথক্‌ভাবে করলেও ধীরে ধীরে উপাসনাবুদ্ধিতে কর্ম করতে শিখবে, শেষে কর্মই উপাসনা হয়ে যাবে। স্বামীজীর 'Work is worship' শুনেছিস তো?

'যারা সাধু হয়, তাদের সকলেই তো আর তীব্র বৈরাগ্য নিয়ে সংসার ত্যাগ করে না, তাই একটা সংঘ সংস্থার প্রয়োজন। বহুলোক যেখানে সদ্‌ভাবে অনুপ্রাণিত, সেখানে যারা আসবে, তারাও ঐ ভাবে অনুপ্রাণিত হবে একেই স্বামীজী বলতেন 'purity drilling'—বলতে পারো spiritual training। স্বামীজী কখনও কখনও মঠকে বলেছেন 'spring board'; এখানে এসে জীবন গঠন ক'রে উচ্চতর আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভের চেষ্টা করবে।'

মহারাজকে ক্লান্ত মনে হ'ল। ভাবলাম যতক্ষণ কাছে থাকব, মহারাজ তো কিছু না কিছু বলবেন। তাই প্রণাম ক'রে চলে আসবার উপক্রম করছি, মহারাজ জিগ্যেস করলেন, 'মঠে এসেছ, মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করেছ?' 'না', বলতেই বললেন, 'না কেন?' 'ভয় করে।' 'সে কিরে?—যা, যা এখ্‌খুনি যা, মহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন প্রণাম করে যা—আমি সঙ্গে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

সঙ্গের লোক গিয়ে—জানি না কি পরিচয় দিয়েছেন, পূজ্যপাদ শিবানন্দ মহারাজ পা ছড়িয়ে বিছানায় বসেছিলেন—আমার দিকে হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে তাঁকে বললেন:

তুমি তো বললে 'বিবেকানন্দ সোসাইটি'র বিভূতি, আমি তো দেখছি 'শিবের বিভূতি'। শোনামাত্র অভিভূত হয়ে গেলাম।

তাড়াতাড়ি মহারাজকে ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে বাইরে চলে এলাম ও চুপ ক'রে ভাবতে লাগলাম: কি দেখলাম, কি শুনলাম!

একজন প্রবীণ সাধুকে চিঠি লিখে জানতে চাইলাম, যা দেখলাম, তা সমুদ্র, না তরঙ্গ?

যথাসময়ে উত্তর এল—'যা দেখেছ—ঐ সমুদ্র!'

আমরা মা তোর অধম তনয়

অধ্যাপক শ্রীগোপেন্দু মুখোপাধ্যায়

তমোনাশী কল্যাণী মা, জগৎজোড়া রঙ্গলীলা,
তাইতো হেরি কণ্ঠে মা তোর শোভে বিকট মুণ্ডমালা।
দেশে দেশে ঘেষে ঘেষে, মত্ত এখন তোরই তনয়;
শান্তিসুধা বিলিয়ে দে মা, অন্তরে তুই দে গো অভয়।
সর্বহরা তুই যদি গো, আমরা কেন পাই বেদনা?
সর্বহারা সন্তানে আজ -- রক্ষা করিস, এই কামনা।
শিবের বুকে নাচিস্ মা তুই, শবের বুকে আমরা নাচি;
অধম তনয় আমরা এখন, শেষবিচারের আশায় আছি।
শক্তিমদে পাগল সবে, ভ্রান্তমানব আজ উতলা;
ধরায় ধর্ম ফিরিয়ে এনে শান্তিরূপে হ উজ্জ্বলা।

কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী প্রভানন্দ

দ্বিতীয় পর্ব

শ্রীরামকৃষ্ণাবতারের অন্ত্যলীলায় গুরুত্বপূর্ণ একটি চিহ্নিত দিন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুআরি। সেদিন পুরুষোত্তম শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবদুঃখে কাতর করুণাবিগলিত বিশ্বজনীন ভাবমূর্তিখানি ভক্তসাধারণের নিকটে উদ্ঘাটিত করেন। তারপরেই তিনি তাঁর এই দিব্যভাবটি সংবরণ করেছিলেন। এর তাৎপর্য বুঝতে হলে আমাদের স্মরণ করা প্রয়োজন স্বামী সারদানন্দের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা। তিনি বলেছিলেন: 'ঠাকুরের দুটো ভাব আছে—একটা মানুষভাব, আর একটা দিব্যভাব। মানুষভাবে তিনি সকলের উপর অনন্তসহানুভূতিপূর্ণ; যারা তাঁর কাছে আসত তাদের সকলের দুঃখ দূর করতে সচেষ্ট। কিন্তু দূর করবার জন্যে দিব্যভাবে আরূঢ় হয়ে দেখেন, এখনো সময় হয়নি—মার ইচ্ছা নয়।''[1] এরূপ দিব্য ও মানুষভাবে পাকানো তাঁর জীবনরজ্জু কাশীপুরের দিনগুলির মধ্যে বিস্তারিত হয়ে বিবিধ ভাববৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে।

তাছাড়াও আমাদের স্মরণ করা প্রয়োজন যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাগুক্ত ভাবৈশ্বর্যের প্রকাশ দেখে সংশয় ও বিপরীত বুদ্ধির জ্বালায় জর্জরিত সাধারণ ভক্তগণ 'আনন্দের উদ্দাম উল্লাসে যেন বিচারবুদ্ধির অতীত ভূমিতে আরোহণপূর্বক··· দিব্যালোকে দেখিতে পাইতেন যে, যাঁহাকে তাঁহারা জীবনপথের পরম অবলম্বনস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কেবলমাত্র অতিমানব নহেন কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের আশ্রয়, জীবকুলের পরমগতি—দেবমানব নারায়ণ! তাঁহার জন্ম, কর্ম, তপস্যা, আহার, বিহার—এমন কি দেহের অসুস্থতা-নিবন্ধন যন্ত্রণাভোগ পর্যন্ত সকলই বিশ্বমানবের কল্যাণের নিমিত্ত। নতুবা জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষাদির অতীত সত্যসঙ্কল্প পুরুষোত্তমের দেহের অসুস্থতা কোথায়? সেবাধিকার প্রদানপূর্বক তাঁহাদিগকে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ করিবেন বলিয়াই তিনি অধুনা ব্যাধিগ্রস্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন!' (লীলাপ্রসঙ্গ, ৫।৩।১৪)। কাশীপুরের দ্বিতীয় পর্বে ভক্তগণ এই ভাবটি সাময়িকভাবে হলেও হৃদয়ে ধারণ করে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাশুশ্রূষাতে মনোনিবেশ করেছিলেন।

দিন গড়িয়ে চলে মহাক্রান্তির চূড়ান্ত মুহূর্তের অভিমুখে। উদ্যানবাটীর প্রশান্ত পরিবেশে সংঘটিত হয় নিত্য নূতন ঘটনা, প্রকটিত হয় পুরুষোত্তমের লীলাবিলাসের নূতন নূতন রূপ।

পরদিন ২রা জানুআরি, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ; ১৯শে পৌষ, ১২৯২ বঙ্গাব্দ; কৃষ্ণাদ্বাদশী, শনিবার।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাগানবাড়ীর দোতলার হলঘরে শয্যায় উপবিষ্ট। গতদিনের লীলাবিলাসের তরঙ্গ তাঁর রুগ্নদেহে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে, প্রতিক্রিয়াতে তাঁর শরীর অধিকতর দুর্বল হয়েছে। কিন্তু সেসকল ভাবনা উপেক্ষা করে পুরুষোত্তমের হৃদয়ঘট উপছিয়ে পড়েছে আনন্দামৃত, পুরুষোত্তমের চিরাতৃপ্ত কল্যাণাকাঙ্ক্ষা প্রতিনিয়ত দূর করেছে মানুষের দুঃখভাবনার মেঘ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হয়েছেন যোগীন্দ্র, নিরঞ্জন, কালীপ্রসাদ প্রভৃতি যুবক

---

১ ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য: স্বামী সারদানন্দের জীবনী, পৃ: ৩৪৮-৯। শ্রীশচন্দ্র ঘটকের একটি বিশেষ প্রশ্নের উত্তরে প্রদত্ত স্বামী সারদানন্দজীর উক্তি বর্তমানে আলোচিত পটভূমিকাতেও প্রযোজ্য।

সেবকগণ। মহেন্দ্র মাষ্টার সেখানে উপস্থিত হয়েছেন বেলা প্রায় দেড়টার সময়।

প্রতাপচন্দ্র হাজরার রামকৃষ্ণলীলাবিলাসে জটিলা-কুটিলার ভূমিকা। কয়েকদিন হল তিনি বাগানবাড়ীতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন, অবশ্য কারুরই অনুমতি না নিয়েই। হাজরা মশায়ের কুটিল বুদ্ধিতে তরুণ সাধকদের মন কয়েকবার সংশয়-আঁধিতে সমাচ্ছন্ন হয়েছিল, সেজন্য ঠাকুর তাঁর কুযুক্তির আক্রমণ হতে যুবক ভক্তদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সন্ত্রস্ত থাকতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেন: 'হাজরা কোথায়?'

নিরঞ্জন বলেন: 'ঈশানবাবুর ওখানে গেছেন। এখানে তার কাপড়চোপড় আছে; শুনছি, তিনি পরে দক্ষিণেশ্বরে যাবেন।' শ্রীরামকৃষ্ণ: 'কেন?' নিরঞ্জন: 'কেন জানি, কি কাজ আছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ: 'এখানে অনেক লোক থাকা ভাল নয়—অনেক খরচ হয়। কথা উঠতে পারে,[১] কি বল?'

কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি আবার বলেন: 'লাটুর জন্য একখানা কম্বল দেবে,— তা কত দাম?'

জনৈক ভক্ত: 'আজ্ঞে, সাতসিকে হবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ: 'না, এক টাকা তিন আনাতেই হয়ে যাবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করেন: 'কত দাম?'

মাষ্টার: 'আজ্ঞে, পাঁচসিকের মত দাম হবে।'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর যুবকভক্ত সারদাপ্রসন্নের জন্য ভাবিত। সারদা শ্যামপুকুরে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে পড়তেন। সে-স্কুলের প্রধানশিক্ষক মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পূত-সান্নিধ্যে সারদার আবৃত ধর্মভাব উৎসারিত হয়, বিবেকবৈরাগ্যের প্রাবল্যে পড়াশোনার প্রতি আকর্ষণ ক্ষীণ হয়, সাধনভজনের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়। তিনি জগন্নাথ দর্শনের জন্য উদ্‌গ্রীব হন। তাঁর বয়স প্রায় একুশ বছর।

উপস্থিত সারদাকে দেখিয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে বলেন: 'এ বলছে শ্রীক্ষেত্রে যাবে, তা টাকা নেই।'

যোগীন্দ্র এগিয়ে এসে বলেন: 'গোপালদা (বুড়োগোপাল) এক টাকা, আর মাষ্টার মশাই দু' টাকা দেবেন বলেছেন।'

মাষ্টার: 'কিন্তু, এখন বেজায় শীত।'

শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারের কথার পিঠে বলেন: 'হ্যাঁ, ভারী শীত।'

যোগীন্দ্র: 'তা কম্বল নিলেই হবে। দমদমার মাষ্টার[২] একটা কম্বলের আধখানা দিয়েছে।' সারদা সেই আধখানা কম্বল এনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখান।

সারদা মাষ্টার মশাইয়ের স্নেহপুষ্ট ছাত্র। সারদা বিনীতভাবে মাষ্টার মশাইকে বলেন: 'আপনি কিছু বলবেন?' মাষ্টার মশাই: 'তুমি এইবেলা না গিয়ে মঙ্গলবারে জাহাজে[৩] চড়ে যাও। তখন বলে দেব—আর আমায় জিজ্ঞাসা করলেই বলব।'

---

১ বহুদর্শী ঠাকুরের এই বাণী যে কতদূর সত্য, তা কয়েকসপ্তাহের মধ্যেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বাগানবাড়ীর খরচপত্র বহনকারী ভক্তগণের কেউ কেউ 'অত্যধিক খরচ হচ্ছে' বলে প্রশ্ন তুলেছিলেন সেবকগণের সংখ্যাধিক্য সম্বন্ধে অভিযোগ করেছিলেন।

২ দমদমার মাষ্টার বা দমদম মাষ্টারের প্রকৃত নাম যজ্ঞেশ্বরচন্দ্র ঘোষ। দমদমের একটি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন বলে তিনি এই নামটি লাভ করেন।

৩ তদানীন্তনকালে পুরী যাওয়ার সহজ পথ ছিল—বড় জাহাজে কলকাতা হতে চাঁদবালি, তারপর ছোট লঞ্চে কটক পর্যন্ত এবং কটক হতে গোযানে বা পদব্রজে পুরী।

শ্রীরামকৃষ্ণ চুপ করে শোনেন।

যোগীন্দ্র: 'হাঁ ইনি সত্যবাদী। ইনি যা বলছেন সে-কথা শোনাই কল্যাণকর।'

এই সময়ে ভক্ত নবগোপাল ঘোষ প্রবেশ করেন ও ঠাকুরের শ্রীচরণ বন্দনা করে আসন গ্রহণ করেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ নবগোপালকে লক্ষ্য করে বলেন: 'লাটুর একটা কম্বল চাই — তুমি দেবে, না ইনি (মাষ্টার) দেবেন?' বলা বাহুল্য, নবগোপাল সানন্দে ঠাকুরের আদেশ পালনে রাজী হন।

ঠাকুরের পায়ের কাছে বসেছিলেন মাষ্টার। অযাচিত অনুগ্রহ বিতরণ ঠাকুরের স্বভাবজাত ধর্ম। তিনি সেবাকাজ্ক্ষী মাষ্টারকে বলেন: 'পা-টায় একটু হাত বুলিয়ে দাও তো।' মাষ্টার নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেন। তিনি সাগ্রহে ঠাকুরের পদসেবা করেন।

কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে দেখিয়ে মৃদুস্বরে বলেন: 'এটা সম্বন্ধে যা বলে তা কি সত্য?'

মাষ্টার: 'সত্য বলেই বোধ হয়, আমার তো বোধ হয় এই সবই সত্য।'[১]

শ্রীরামকৃষ্ণ: 'কতটা সত্য?'

মাষ্টার চুপ করে থাকেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলেন: 'আমি পূর্ণ অবতার মানে বুঝতে পারি না।' শ্রীরামকৃষ্ণ: 'পূর্ণ—কিনা ষোল আনা।'

আরও কিছু সময় অতিবাহিত হয়। মাষ্টার মুগ্ধবিস্ময়ে শোনেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী: 'আচ্ছা, এটা কি বল দেখি—এত বড আধার, অথচ সবাই যেন টোলের ছেলের মত যত্ন-আত্তি করছে।'[২]

মাষ্টার মশাই বিস্মিত হন। তিনি ভাবেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি এভাবেই তাঁর অবতারত্বের আভাস দিচ্ছেন? শ্রীভগবানের পূর্ণ-আবির্ভাবের ইঙ্গিত করছেন? তিনি এভাবেই কি ভক্তজনের হৃদয়ে অবতারলীলার মাহাত্ম্য দৃঢ়াঙ্কিত করে দিচ্ছেন?

ঠাকুরের গলার ক্ষত গভীর হয়েছে, ক্ষতস্থানে যন্ত্রণাও বেড়েছে। তিনি মুখে একটু ঘি গ্রহণ করেন। ক্ষতের উপর স্নেহ-প্রলেপ যন্ত্রণা লাঘব করতে পারে— চিকিৎসকের এই অভিমত।

পুনরায় অন্তরঙ্গ-আলাপনে অবতারপ্রসঙ্গ চলতে থাকে। পুরুষোত্তমের দেহ কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত— এই জটিল রহস্যের একটি সম্ভাব্য সমাধান ইঙ্গিত করেই যেন মাষ্টার মশাই বলেন: 'মহাভারতে উদ্যোগপর্বে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, দৈবী-শক্তি আমার আর নাই।'

উদ্যোগপর্বে দেখি শ্রীকৃষ্ণ কৌরব রাজসভায় যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, সে-সময়ে পাণ্ডুপুত্রদের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা চলেছে। কৃষ্ণসখা অর্জুন বলেছেন: 'তুমি ইচ্ছা করলে অনায়াসেই শান্তি স্থাপন করতে পার; তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।' প্রত্যুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেন: 'কৌরব ও পাণ্ডবগণের যাতে শ্রেয়োলাভ হয়, সেটাই আমার অবশ্য কর্তব্য। সন্ধি ও বিগ্রহ এই দুই-ই আমার আয়ত্তে, কিন্তু আমার কিছু বক্তব্য আছে, শোন। উর্বরজমিতে নিয়মমত হলচালনা ও বীজবপন করলেও বর্ষা ব্যতীত ফসল হয় না; মানুষ যদি পুরুষকারের বলে তাতে জলসেচন করে, তবুও দৈবপ্রভাবে জমি শুষ্ক হতে পারে। প্রাচীন মহাপুরুষগণ বলেছেন, দৈব ও পুরুষকার উভয়ে একত্র মিলিত না হলে কার্যসিদ্ধি হয় না। আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করতে পারি, কিন্তু

১ মাষ্টার মশাইয়ের ডায়েরী, পৃঃ ৭৮

২ ঐ, পৃঃ ৬২৮

দৈবকর্মের অনুষ্ঠানে আমার কিছু ক্ষমতা নাই।'[১] মাষ্টার মশায়ের মনের ভাব এই যে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণও যথাসাধ্য পুরুষকারের উপর নির্ভর করে তাঁর দেহের রোগ নিরাময়ের জন্য চিকিৎসক-গণের চিকিৎসা ও সেবকগণের সেবা-শুশ্রূষা গ্রহণ করছেন। কিন্তু এই সকল প্রয়াসের সাফল্যের প্রধান একটি উপাদান দৈবশক্তি, সেই দৈবশক্তি যেন তাঁর আর নাই, তাই তাঁর প্রয়াসের সাফল্য সম্বন্ধে থেকে যায় অনিশ্চয়তা।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্তব্ধভাবে বসে থাকেন, কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বলেন: 'আবার দেখি যে আমিই সব (হয়েছি)।' মাষ্টার: 'আজ্ঞে হাঁ, গীতাতেও শ্রীভগবান বলেছেন যে বিশ্বসংসার তাঁতেই অনুস্যূত ও বিধৃত হয়ে আছে।[২] তিনি আরও বলেছেন যে, তাঁর একটি অংশদ্বারা মাত্র তিনি সমগ্র জগৎ ধারণ করে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন।'[৩] শ্রীরামকৃষ্ণ: 'শাস্ত্রে অনেক কিছু আছে—চিনি বালি মেশান।'

মাষ্টার: 'তবে কি শাস্ত্রে বিশ্বাস করব না?'

শ্রীরামকৃষ্ণ: 'না তা নয়, তবে ভগবানের কার্য সহজে বোঝা যায় না।'

অনন্তশক্তিশালী ঈশ্বরের ক্রিয়াকলাপ মানুষের তিন ছটাক বুদ্ধির ধারণার অতীত, এই বাণী স্বয়ং ঈশ্বরাবতারের শ্রীমুখে শুনে মাষ্টার মশাই নির্বাক্ হন।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে একটি পাগলের মত মহিলা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে প্রায়ই আসত এবং ঠাকুরকে শ্যামাবিষয়ক ও ব্রহ্মসঙ্গীত শোনাত। সকলে তাকে পাগলী বলত, তার মধুর কণ্ঠে সুরলহরী শুনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে বিভোর হতেন, কখনও বা সমাধিস্থ হতেন। সে সুযোগ পেলেই কাশীপুরে ঠাকুরের ঘরে ঢুকতে চেষ্টা করত, ঠাকুরের কাছে যাবার জন্য সময় সময় বড়ই উপদ্রব করত। পাগলিনীর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ছিল মধুর ভাব; শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে তাঁর ঘরে ঢুকতে দিতে নিষেধ করতেন। সেবকগণ পাগলিনীর জন্য সর্বদাই সন্ত্রস্ত থাকতেন। পাগলিনী বাড়া-বাড়ি করলে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবকদের ডেকে বলেন: 'ঐ পাগলীকে বাগান থেকে বের করে দে। ওকে এখানে থাকতে দিস্ নি। ও ঘরে এলে আমার ভয় হয়।' তাকে বাগান হতে বের করে দিলেও সে ফিরে আসে, লাঠি নিয়ে তাড়া করলে সে পালিয়ে যায়, কিন্তু আবার ফিরে আসে। আলোচ্য দিনে পাগলিনী বেশী উৎপাত করলে নিরঞ্জন ও কালীপ্রসাদ শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে পাগলিনীর হাত ধরে টেনে কাশীপুর থানায় নিয়ে যান। কনস্টেবল পাগলিনীকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। ছাড়া পেয়ে পাগলিনী বাগানে এসে গাইতে থাকে,

"মা বলে আর ডাকিব না,
তারা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।
ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী,
আরও কি ক্ষমতা রাখিস এলোকেশী,
না হয় দ্বারে দ্বারে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
মা বলে তো আর কোলে যাব না॥"

গান শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হন। সেই পাগলিনীকে একটি ঘরে কিছুক্ষণ বন্ধ করে রাখা হয়। কিন্তু ঘরের দরজা খুলতেই সে দোতলায় ঠাকুরের ঘরে যাবার চেষ্টা করে। পরে পাগলিনী

---

১ দৈবে চ মানুষে চৈব সংযুক্তং লোককারণম্।
অহং হি তৎ করিষ্যামি পরং পুরুষকারতঃ॥ উদ্যোগপর্ব, ৭৯।৫
দৈবং তু ন ময়া শক্যং কর্ম কর্তুং কথঞ্চন। ঐ, ৭৯।৬

২ ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ গীতা, ৭।৭

৩ বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ গীতা, ১০।৪২

বিদায় নেয়।[1] পাগলিনীর কাহিনী শুনে মাষ্টার মশাই বাড়ী ফিরেন, তখন বেলা প্রায় পাঁচটা।

পরদিন রবিবার। ৩রা জানুআরি, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। ২০শে পৌষ, কৃষ্ণাত্রয়োদশী। অপরাহ্ন। কাশীপুরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে রাম দত্ত, দেবেন্দ্র মজুমদার, রাখাল, যোগীন্দ্র, লাটু, মাষ্টার মশাই প্রভৃতি ভক্তগণ উপস্থিত। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হন সারদাপ্রসন্নের পিতা শিবকৃষ্ণ মিত্র। তিনি কলকাতায় নন্দনবাগানে বাস করেন। পুত্র সারদা কলেজের পড়া অবহেলা করে দক্ষিণেশ্বরের 'পাগলা বামুন' শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ঘন ঘন যাতায়াত করছে জানতে পেরে তিনি আশঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। সারদা প্রায়ই বাড়ী-পালিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট গিয়ে রাত্রি যাপন করে, এই অভিযোগে তিনি পুত্রকে শাসন করতেন, কখনও কখনও মারধোর পর্যন্ত করতেন। এবার তিনি পুত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা করে ফেলেন। তিনি পুত্রের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। এমন সময় অকস্মাৎ তাঁর সাধের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। সারদা বিয়ের ফাঁদ জানতে পেরে চমকে ওঠেন, তিনি অবিলম্বে তাঁর ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলেন। তিনি পিতা-মাতাকে উদ্দেশ্য করে একটি চিঠি লেখেন, 'আমি বিবাহ করতে পারব না। চোখের দৃষ্টি যে দিকে নিয়ে যায়—সেইদিকে আজ চললুম আমি। সংসারের মায়াজালে বদ্ধ হতে আমার ইচ্ছা নাই।' তিনি চিঠিখানি বাড়ীতে রেখে সোজা এসে উপস্থিত হন কাশীপুর বাগানবাড়ীতে। গতদিনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মঙ্গলবার পর্যন্ত জাহাজের জন্য অপেক্ষা না করেই তিনি বেলা এগারটা নাগাদ পুরীধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পলাতক পুত্রের সন্ধান 'পরমহংসের'[2] নিকটই পাওয়া যাবে এই ধারণা নিয়ে শিবচন্দ্র উপস্থিত হন কাশীপুর বাগানে। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা, তাঁর সাজান সংসারে আগন্তুক অশান্তির মূলে দক্ষিণেশ্বরের 'পরমহংস', সেইজন্য তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ক্ষুব্ধ বিরক্ত ক্রুদ্ধ।

শিবচন্দ্রকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে শ্রীরাম-কৃষ্ণের মুখ গম্ভীরভাব ধারণ করে। শিবচন্দ্র আসন গ্রহণ করেন, লক্ষ্য করেন ঠাকুরের বিছানার নিকটে ঔষধের শিশিপত্র। তিনি একটু শ্লেষ করেই বলেন: 'একি, আপনার আবার ঔষধ কেন?'

ক্ষুব্ধ শিবচন্দ্র জানান যে, পুত্র সারদাপ্রসন্ন সকাল দশটা নাগাদ বাড়ী থেকে পালিয়েছে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট পুত্রের সন্ধান জানতে চান। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটেই সারদার সন্ধান পাওয়া যাবে, হয়ত শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশেই পুত্রকে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ স্থিরকণ্ঠে বলেন: 'আজ সে এখানে এসেছিল, জগন্নাথধামে চলে গেছে।'

শিবচন্দ্র: 'তার মা খাওয়া-দাওয়া করে নি, শুধু কান্নাকাটি করছে।—এদিকে আজই তার বিয়ের ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে গেল।'

মাষ্টার মশাই স্বগতোক্তি করেন: 'কি সর্বনাশ!'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও এই সংবাদে সচকিত হন। তিনি নিজের ভাব চেপে রেখে ক্ষুব্ধ সন্তপ্ত

---

১ স্বামী অভেদানন্দ: আমার জীবনকথা, পৃঃ ৯৭-৮ দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থানুযায়ী পাগলিনী আর কখনও কাশীপুর বাগানে আসেনি। 'কথামৃত' দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে দেখতে পাই এপ্রিলের মধ্যভাগে পাগলিনী উৎপাত করছে।

২ তদানীন্তন কালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 'পরমহংস' নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন।

শিবচন্দ্রকে সান্ত্বনা দেন। ঠাকুরের নির্দেশে সেবক শিবচন্দ্রকে জলখাবার এনে দেন।

রামবাবু সারদার পিতাকে বলেন: 'সে আপনাকে অত্যধিক ভয় করত— তাই সন্ধ্যার সময় পালিয়ে এখানে চলে আসত।' [১] রাখাল: 'আমরা ওকে যেতে অনেক বারণ করেছিলাম, তা কিছুতেই শুনলে না। সে তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে পড়লে।'

মাষ্টার মশাই সারদার পিতাকে বলেন: 'শুনুন, আপনার যদি খুঁজতে হয় তো এই বেলা।'

সারদার পিতা বিদায় নেন। তিনি পুত্রের অনুসন্ধানে বের হন। শিবচন্দ্র সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যেতেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বালকের মত হাসতে থাকেন। তিনি দেবেন্দ্র, রাখাল, যোগীন্দ্র প্রভৃতির দিকে চেয়ে হাসতে থাকেন। এ যেন লুকোচুরি খেলা। মাষ্টার দেখে হতভম্ব হয়ে যান।

রামবাবু: 'মাষ্টার মশাই ঘটাতেও আছেন ভাঙাতেও আছেন— শুনেছি উনিই সারদাকে বলেছিলেন কি ভাবে জগন্নাথ-তীর্থে যেতে হবে।'

মাষ্টার মশাই আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেন। তিনি হাসতে হাসতে বলেন: 'আমায় জিজ্ঞাসা করলে কি করব? যা জানতাম তাকে বলে দিয়েছিলাম।'

সন্ধ্যার পর বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে। ঠাকুর এবার পথ্য আহার করবেন। সেবক হরিশ ঠাকুরের আহার্য দ্রব্য নিয়ে আসেন। শ্রীরামকৃষ্ণ লক্ষ্য করেন হরিশ খাবারের ঘ্রাণ গ্রহণ করছে। তিনি ইঙ্গিত করেন সেই খাবার সরিয়ে নেবার জন্য। তিনি সেই খাবার গ্রহণ করেন না।

ঠাকুরের কণ্ঠরোগ ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠেছে। ভক্ত সেবকগণ তার জন্য অত্যন্ত ভাবিত। আজ দিনরাতের মধ্যে ক্ষতস্থান হতে দুবার প্রচুর রক্ত-ক্ষরণ হয়েছে। ভক্ত রাম দত্ত প্রমুখ কয়েকজন নিবেদন করেছেন, ঠাকুর যদি অনুগ্রহ করে 'তারকেশ্বরের তাগা' ব্যবহার করেন। ঠাকুর সেবক লাটুকে ডাকেন ও ক্ষীণকণ্ঠে তাঁকে বলেন: 'রাম-টাম বলছে তারকনাথের তাগা পরতে আর সোমবারে উপোষ হবিষ্যি করতে।'

লাটু চিন্তান্বিত হন, জিজ্ঞাসা করেন: 'কি আপনাকে?'

শ্রীরামকৃষ্ণ: 'না, ওকে।' তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে আবার বলেন: 'আগে পেটের ব্যামোর সময় ছয় হপ্তা তাগা পরেছিলুম আর হবিষ্যি করেছিলুম।

'তা একবার ওকে বলে আয় না, দেখ না কি বলে।'

লাটু: 'তা তিনি আবার কি বলবেন? আপনি বললেই করবেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ: 'তা দোষ কি?'

লাটু: 'কে দোষ বলছে?'

শ্রীরামকৃষ্ণ: 'তাহ'লে কাঁচাকলা ভাতে, রাঙ্গালু ভাতে খাবে।'

সেবক লাটু শ্রীমায়ের নিকট গিয়ে সব কিছু নিবেদন করেন। তিনিও প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন।

বালকস্বভাব ঠাকুর পরপর কয়েকটি টুকরো হরিতকী চিবিয়ে খান। মাষ্টার বিনীতভাবে বলেন: 'ওতে আবার পেটের অসুখ করবে না তো?' শ্রীরামকৃষ্ণ: 'হাঁ, তা বটে।' তিনি হরিতকী খাওয়া বন্ধ করেন।

ঠাকুরের গলরোগের বৃদ্ধিতে চিন্তিত হয়ে নরেন্দ্র ডাক্তার প্রতাপকে নিয়ে উপস্থিত হন।

---

১ 'সারদা পিতার নির্যাতনে মধ্যে মধ্যে আসিয়া দুই একদিন মাত্র (কাশীপুরে) থাকিতে সমর্থ হইত।' (লীলাপ্রসঙ্গ, ৫।৩৮৬ পাদটীকা)।

ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করেন ডাক্তার, নরেন্দ্র, হরিশ, শর্মা প্রভৃতি। ডাক্তার ঠাকুরের গলার ক্ষত সাধারণভাবে পরীক্ষা করেন, রোগের উপসর্গ সম্বন্ধে খোঁজখবর নেন। সুযোগমত হরিশ প্রস্তাব করেন, ঠাকুরের ব্যাধি নিরাময়ের জন্য একটি চৌম্বকচক্রের (Magnetic circle) আয়োজন করা যেতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ হরিশের বক্তব্য শুনে ডাক্তার প্রতাপকে লক্ষ্য করে বলেন: 'এ যে ললিতের মত।'[১] একটু থেমে তিনি আবার বলেন: 'ওসব কি ?—এসব আমার ভাল লাগে না।' প্রস্তাবকারী একটু দমে যান। আরও কিছুক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: 'এখন সবাই নীচে যাও।'

বহিরাগতেরা একে একে ঠাকুরকে প্রণাম করেন। সকলে দোতলা হতে চলে যান। শুধু নিত্যগোপাল[২] ঠাকুরের কাছে থাকেন। [ক্রমশঃ]

---

১ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের একটি নিয়ম, তারা কোনরূপ ঔষধ ব্যবহার করবে না। অসুখ বিসুখ হলে তারা মন্ত্রতাবিজ ইত্যাদির সাহায্য নেয়, (বসুমতী, ১৩৬০, পৌষ)। তদানীন্তন বাংলাদেশে এই সকল প্রক্রিয়া বিশেষ প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মসমাজের সভাদের মধ্যেও এর প্রচলন লক্ষ্য করেছেন লীলাপ্রসঙ্গকার। (লীলাপ্রসঙ্গ, ৫।২৪)। অনুরূপ আরেকটি ঘটনার উল্লেখ পাই লীলাপ্রসঙ্গ, ৫।২৯৩ ৪ পৃষ্ঠায়।

২ মাষ্টার মশায়ের ডায়েরীতে নামটির বানান দেখি 'নৃত্যগোপাল', কিন্তু কথামৃতে দেখি 'নিত্যগোপাল'। তিনি 'নিত্যগোপাল' নামেই সমধিক পরিচিত।

যদি আমায়

শ্রীঅসীম কুমার মুখোপাধ্যায়

যদি আমায় এতই কষ্ট দেবে,
কেন তুমি দেখাও আমায়
সুদূর সমুদ্দুর,
হাওয়ায় ফোলা সাত মহলা পাল
ময়ূরপঙ্খী নাও।

যখন আমি বালির মধ্যে
অট্টালিকা গড়ি,
কেন তুমি দেখাও হঠাৎ
সুদূর সবুজ মাঠ,—
তার ওপরে নীল আকাশে
একটি শঙ্খচিল
যাচ্ছে উড়ে দূরে,— অনেক দূরে।

যখন আমি আপন মনে
এক্কা দোক্কা খেলি,
ছক্কা থেকে লাফিয়ে ঘুরে আসি,
কেন তুমি হঠাৎ আমায়
অন্যমনা করো,—
পা ছড়িয়ে ভাবতে শুরু করি
খেলবনা কক্ষনো।

রাসলীলা

স্বামী কৃপানন্দ

আকাশ আজ মেঘমুক্ত। বর্ষার শতধারায় রজঃকণা নিঃশেষে অপসারিত। নব নব পুষ্পে সজ্জিতা হাস্যময়ী প্রকৃতি, শত শত বিহগকণ্ঠের সুমিষ্ট কাকলীতে, বিশ্বে নূতন জীবনের মধুর বার্তা ঘোষণায় মুখরা। শরৎ সমাগত। মাঝে মাঝে আকাশে মেঘগর্জন শ্রুত হয় বটে, কিন্তু অনন্ত-প্রসারি নভোমণ্ডলের কোথায়ও একবিন্দু মেঘও দৃষ্ট হয় না। ইহা মেঘগর্জন নয়। ইহা ঐ রজঃকণ-হীন, স্বচ্ছ নির্মলা কমনীয়া প্রকৃতির আনন্দ-ধ্বনি। প্রকৃতি যেন তাহার প্রাণ-রমণকে পাইবার জন্য নব বেশে সজ্জিতা। সমস্ত বৃন্দাবন আজ অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত। বৃন্দাবনে এই শরৎকালের রজনীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত রাসক্রীড়া করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তাই আজ রসরাজ কৃষ্ণ জ্যোৎস্নাবিধৌত নির্জন কাননে বসিয়া সুমধুর বংশীধ্বনি করিতে লাগিলেন। ভগবানের আনন্দোদ্দীপক সেই বংশীধ্বনি শ্রবণে বিমোহিত-চিত্ত গোপবধূগণ সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত হইলেন। ব্রজকামিনীদিগকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সুমধুর যুক্তিগর্ভ বাক্যে প্রবোধিত করিয়া স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ভগবানের এই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণে, কৃষ্ণে সর্বস্ব-উৎসৃষ্ট-হৃদয় গোপীগণ গৃহে ফিরিয়া যাইতে অসম্মত হইলে, যোগেশ্বর আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের সহিত রাস-ক্রীড়া করিতে ইচ্ছুক হইলেন। ভগবৎ-স্পর্শে গোপবধূগণ ভাগবতী তনু লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। গোপিকাগণ ভগবানের নিকট এইরূপ মান লাভ করিয়া মানিনী হইয়া আপনাদিগকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বোধ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপিকা-দিগের এই অভিমান দূর করিবার নিমিত্ত সহসা অন্তর্হিত হইলে, গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে লইয়া কালিন্দীর সুখময় পুলিনে গমনপূর্বক রাসলীলা আরম্ভ করিলেন।

রাসলীলা রসতত্ত্বের সার। আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত এই রাসলীলা। ভগবানের সহিত এই মিলন অহরহঃ হইতেছে। এই মিলন নিত্য। জীবের চিত্ত যখন বিশুদ্ধ হয়, রজস্তমের লেশমাত্রও যখন থাকে না, তখন সেই জ্ঞানোদ্ভাসিত চিত্তাকাশে, স্নিগ্ধ বিশুদ্ধ ভক্তিরসাপ্লুত হৃদয়ে, জীব রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমমাধুর্য উপলব্ধি করিয়া কৃতকৃত্য হয়। রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য সর্বদাই ত আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু আমাদের চিত্তাকাশ যে শত শত কামনারূপ মেঘে আচ্ছন্ন। শরৎকালের আকাশের ন্যায় চিত্ত যখন নির্মল হয় তখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর আহ্বান শ্রুতিগোচর হয়।

> দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং
> রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্।
> বনঞ্চ তৎকোমলগোভিরঞ্জিতং
> জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্॥"
>
> (ভাগবত, ১০।২৯।৩)

রসস্বরূপ ভগবান কমলার মুখকমলের তুল্য লাবণ্যময় অরুণবর্ণ পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে বৃন্দাবন উদ্ভাসিত অবলোকন করিয়া নির্মল-নয়না

ব্রজাঙ্গনাদিগের মনোহরণ করিবার জন্য মধুর স্বরে মুরলীতে গান করিতে লাগিলেন। মনপ্রাণ যখন ভগবন্মুখী হয়, যখন চন্দ্রকোটি-সুশীতল স্নিগ্ধ জ্যোতিতে অন্তর বাহির উদ্ভাসিত, তখন মুরলী-ধ্বনির ন্যায় এক প্রকার অনাহত ধ্বনি সাধকের শ্রুতিগোচর হয়। মনপ্রাণ সেই ধ্বনিতে তন্ময় হইলে সাধক অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দ উপলব্ধি করেন। এই প্রণবধ্বনি— কৃষ্ণের এই বংশীরব যিনি একবার শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহার চিত্ত পার্থিব কোন বস্তুতেই আসক্ত হইতে পারে না। তাঁহার চক্ষে স্ত্রী পুত্র ধন মান যশ—সবই অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। কৃষ্ণের এই বংশীরব— এই নাদ সাধকের নির্মল চিত্তে ভগবৎপ্রেমের উদ্দীপক। তখন ভগবৎপ্রেম তাঁহার সবটা অধিকার করে। এইজন্য তাঁহার চিত্ত "সব তেয়াগিয়া একমন হইয়া" ভগবানের দিকে ছুটিয়া যায়।

> নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্ধনং
> ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
> আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ
> স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ॥
>
> (ঐ, ১০।২৯।৪)

কামোদ্দীপক সেই গীত শ্রবণ করিয়া গোপবধূ-দিগের চিত্ত কৃষ্ণে আকৃষ্ট হইল। তাঁহাদের কান্ত কমনীয় কৃষ্ণ যে স্থানে ছিলেন, তাঁহারা সত্বর সেই স্থানে আগমন করিলেন। দ্রুত গমনে তাঁহাদের কুণ্ডল দুলিতে লাগিল। তাঁহাদের মধ্যে একে অপরের গমনের উদ্যম জানিতে পারিলেন না। জীব ভগবানকে পায় না। ভগবানই জীবকে পান, সেইজন্য "কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ"— কথাটি বলা হইয়াছে; গোপীদিগের মন কৃষ্ণ দ্বারাই গৃহীত হইয়াছিল, ভগবানই তাঁহাদের সবটা অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন— তাঁহাদের আর পলায়ন করিবার উপায় ছিল না। সাধক যখন তাঁহার মন প্রাণ দেহ— সর্বস্ব ভগবানে নিবেদন করিয়া দেন, তখন কৃষ্ণে উৎসর্গীকৃত-সর্বস্ব সাধকের সকল ভার ভগবানই স্বয়ং গ্রহণ করেন। সাধকের তখন কোন এষণাই থাকে না। ভগবানে স্থির-নিশ্চয় মন কোন যুক্তি তর্কের ধার ধারে না। লোকলজ্জা মান ভয় জাতি কোনটাই তাঁহার চিত্তে স্থান পায় না।

সাধকের মনে অভিমানের ভাব মাঝে মাঝে উদিত হয়; 'আমি বড় সাধক', 'আমি বড় ভক্ত,' 'আমি বড় জ্ঞানী'— এইরূপ অভিমান যখন জাগে, তখন সাধকের নিকট হইতে পরমানন্দ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আনন্দঘন মূর্তি নিমেষের জন্য অন্তর্হিত করেন।

> তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
> প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥
>
> (ঐ, ১০।২৯।৪৮)

কেশব গোপীদিগের সৌভাগ্যজনিত মত্ততা ও মান অবলোকন করিয়া তাহা প্রশমনপূর্বক তাঁহাদিগের উপর কৃপা করিবার নিমিত্ত সেই স্থানেই অদৃশ্য হইলেন। কিন্তু যিনি একবার সেই আনন্দঘনমূর্তি শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শ অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার চিত্তে অহঙ্কারের উদয় ক্ষণিক। অনুতাপ-অশ্রুতে বিবেক-বৈরাগ্যে তাঁহার চিত্ত শীঘ্রই নির্মল হয় এবং বিশুদ্ধসত্ত্ব সেই সাধক সত্ত্বগুণময়ী সুষুম্নায়, জ্ঞানোদ্ভাসিত হৃদয়রূপ যমুনাপুলিনে পুনরায় স্বরূপকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়া আত্মরতি আত্মক্রীড় হন।

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে সেই প্রেমস্বরূপ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের রাস-লীলা চলিয়াছে। ঘটে ঘটে সেই আত্মারামই ক্রীড়া করিতেছেন।

> কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ।
> রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া॥
>
> (ঐ, ১০।৩৩।২০)

ততশ্চ কৃষ্ণোপবনে জল-স্থল-
প্রসূনগন্ধানিলজুষ্টদিক্তটে।
চচার ভৃঙ্গপ্রমদাগণাবৃতো
যথা মদচ্যুদ্দ্বিরদঃ করেণুভিঃ॥

(ঐ, ১০।৩৩।২৫)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও রাসমণ্ডলে যত গোপী তত রূপ ধারণ করিয়া লীলা-নিমিত্ত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। করিণী-পরিবৃত মদস্রাবি মাতঙ্গের ন্যায় গোপীগণের সহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, জলজ ও স্থলজ পুষ্পের সৌরভে আমোদিত অনিল-সেবিত যমুনাতটে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া শ্রুতি বলিতেছেন—

'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।' (ভৃগু) আনন্দই ব্রহ্ম, ইহা জানিলেন। আনন্দ হইতেই এই ভূতবর্গের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়। রসরূপ আনন্দঘন এই কৃষ্ণে সমস্ত বিশ্ব রসিয়া আছে। সর্বলোক 'অরা ইব রথনাভৌ' এই আনন্দে আকৃষ্ট হইয়া জীবিত রহিয়াছে। 'দ্যৌশ্চান্তরীক্ষ-মোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ।' যাঁহাতে দ্যুলোক অন্তরীক্ষ মন প্রাণ সব ওতপ্রোত হইয়া আছে, তিনি আত্মা। এই জীবজগৎ তাঁহার লীলা। এইজন্য শ্রুতি আত্মার কথা বলিতে গিয়া বলিলেন, 'স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ।...স...আত্মানম্ দ্বেধাঽপাতয়ৎ।' সেই আনন্দস্বরূপ আত্মা স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়াও নিজেকে জগদ্রূপে প্রকাশিত করিলেন —দ্বৈতের সৃষ্টি করিলেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রসরূপ তাঁহার রাসলীলা। 'তৎসৃষ্ট্বা তদেবানু-প্রাবিশৎ।' তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। 'তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পিঃ'—তিলেতে তৈলের ন্যায়, দধিতে ঘৃতের ন্যায় এই আত্মা, এই আনন্দঘন কৃষ্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন। তিনি 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' হইয়াও নরলীলা করেন। গোপবধূগণের ন্যায় 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' ভগবৎপ্রেমে জাতি কুল শীল অভিমান ভস্মসাৎ করিতে পারিলেই সেই আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের— বেদবেদ্য সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দের রাসলীলার মর্ম উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

দাও মোরে তুমি দেখা

শ্রীসূর্যকান্ত মাহাতো

দিন যে আমার হ'ল অবসান ; মিলিল না দরশন
শ্রীরামকৃষ্ণ ! প্রণমি তোমায়, করো কৃপা বরিষণ।
শুনিয়াছি আমি, ওগো ভগবান ; ভক্ত-আর্তিহারী
ভক্তেরে তুমি দেখা দাও ওগো—অজ্ঞান অপসারি।
তোমারে না পেয়ে থাকিতে না পারি এসো অন্তর্যামী
কৃপা করে তুমি হও একবার নয়নের পথগামী।
তোমারে না হেরি বড়ো যন্ত্রণা পাইতেছি আমি সখা
হৃদয়-মাঝারে এসো ওগো প্রভু,—দাও মোরে তুমি দেখা॥

ভারতীয় দর্শনে দুঃখবাদ

শ্রীসুধাংশু শেখর কুণ্ডু

পশ্চিমী দর্শনে দুঃখবাদ (pessimism বলে একটি মতবাদ আছে। এই মতবাদ অনুসারে এ জগৎ দুঃখময়। সংসার অসার (vanity of vanities)। জীবন-বীণার সুর করুণ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ নিয়ত দুঃখের অনলে দগ্ধ হচ্ছে। হাইনের (Hiene) একটি কবিতায় এই ভাবটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে —

"Sweet is sleep, but death is better
Best of it all is never to be born."

এ মতবাদ খুবই প্রাচীন। হোমারের লেখায় আমরা পাই—'There is nothing more wretched than man of all things that breathe and are.' দুঃখবাদের আধুনিক সমর্থকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শোপেন-হাওয়ার (Schopenhauer) এবং হার্ট্‌ম্যান্ (Hartmann)। শোপেনহাওয়ারের মতে জীবন মন্দ (evil), অনিবার্যভাবে ও স্বরূপত মন্দ। জীবন হল বাসনা (will), বাসনা থেকেই কামনা, কামনার অভাবও ত্রুটি, তা হল অপূর্ণতা, তাই দুঃখ। সংক্ষেপে এই হল পশ্চিমী দুঃখবাদ।

পাশ্চাত্ত্য কোন কোন লেখকের মতে ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদী (pessimistic)। ভারতের ঋষিরা জগৎকে দুঃখের আলয়রূপে দেখেছেন। জীবন দুঃখময় এই চিত্রই ভারতীয় দার্শনিকরা তাঁদের দর্শনে তুলে ধরেছেন। এই হল অভিযোগ।

তাঁরা বলেন, উপনিষদে বলা হয়েছে সৎ-চিৎ-আনন্দ ব্রহ্ম ছাড়া সবই দুঃখময়। গীতায় জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু -- এই সব দুঃখের কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর দুঃখ রাজপুত্র সিদ্ধার্থকে মুক্তির সন্ধানে ঘরছাড়া করেছিল। ভারতীয় দার্শনিকরা প্রসারিত দৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছেন, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, কামনার ব্যাঘাত— এ সব মানুষের জীবনে নিত্য সহচর। সুখ যে নাই তা নয়, তবে তা হল ঘনবর্ষার আকাশে সৌদামিনীর মত। অর্থের মত সুখ অর্জনে দুঃখ, রক্ষণে দুঃখ, নাশে দুঃখ, নাশের চিন্তাতেও দুঃখ। এই দুঃখানুভূতি থেকে, এই আধ্যাত্মিক অতৃপ্তি থেকে ভারতীয় দর্শনের সূত্রপাত। তাই ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদী—এই অভিযোগ।

চেইলী (Chailley) তাঁর "Administrative Problems" নামক গ্রন্থে বলেছেন, ভারতীয় দর্শনের উদ্ভব হয়েছে অবসাদ ও শাশ্বত শান্তির আকাঙ্ক্ষা থেকে।[১]

বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনে যে দুঃখবাদ আমরা দেখতে পাই তা আলোচনা করা যেতে পারে। চার্বাক ছাড়া সব ভারতীয় দর্শনে দুঃখবাদ আছে। কিন্তু এ ঠিক নিছক অবসাদবোধ নয়, জাগতিক দুঃখময় অস্তিত্ব সম্বন্ধে গভীর চেতনা।

বুদ্ধের আর্যসত্যচতুষ্টয়ের প্রথম সত্য হচ্ছে, সর্বং দুঃখম্। তবে কি জগতে সুখ নাই? যে সুখ আছে তা হল দুঃখমিশ্রিত সুখ। এ সুখে অগ্নির দাহ আছে, সাগরের প্রশান্তি নাই।[২] বুদ্ধের মতে জগতে আট প্রকারের দুঃখ আছে।

---

১ 'From lassitude and a desire for eternal rest'—Dr. Radhakrishnan : Indian Philosophy, Vol I, p. 49n.

২ তুলনীয় পাশ্চাত্ত্য কবি শেলী ও কীট্‌সের চিন্তাধারা :

"Our sincerest laughter
With some pain is fraught ;
Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts." (Shelley).

"In the very temple of Delight, Veil'd Melancholy has her sovereign shrine." (Keats).

জন্ম, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, প্রিয়-বিপ্রয়োগ, অপ্রিয়-সম্প্রয়োগ, ঈপ্সিত বস্তুর অলাভ ও পঞ্চোপাদান বা পঞ্চেন্দ্রিয়ের গ্রহণীয় বস্তু। প্রতিটি জীবেরই জন্ম, ব্যাধি, জরা ও মরণ আছে। প্রত্যেকেরই প্রিয়-বিয়োগ হয় ও প্রত্যেককেই অপ্রিয় বিষয়ের সংস্পর্শে আসতে হয়। যা সে চায় তা সব সময় সে পায় না। পঞ্চেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তুও দুঃখদায়ক।

সাংখ্য দর্শনে ত্রিতাপের কথা বলা হয়েছে। জীব ত্রিবিধ দুঃখের অধীন—আধ্যাত্মিক, আধি-দৈবিক ও আধিভৌতিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক দুঃখ। আধিদৈবিক দুঃখ অর্থে দৈবদুর্বিপাকবশত অর্থাৎ বজ্রপাত, ভূমিকম্প প্রভৃতি থেকে যে দুঃখ হয়। মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদি ভূতজনিত দুঃখকে আধি-ভৌতিক দুঃখ বলে।

পতঞ্জলির যোগদর্শনে পঞ্চক্লেশের কথা বলা হয়েছে। যথা অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। যেটা যা নয় তাকে তাই বলে জ্ঞান অর্থাৎ অনিত্য, অশুচি, দুঃখ ও অনাত্ম পদার্থকে নিত্য, শুচি, সুখ ও আত্মবোধের নাম অবিদ্যা। অস্মিতা হচ্ছে জীববুদ্ধি ও স্বরূপচৈতন্যকে এক বলে বোঝা। যে সুখ একবার ভোগ করা হয়েছে তার স্মরণ হলে আবার তা ভোগ করার যে আকাঙ্ক্ষা, তাই হল রাগ। আর যে দুঃখ একবার ভোগ করা হয়েছে তার ওপর যে বিরাগ, এ হল দ্বেষ। আর পূর্ব পূর্ব জন্মার্জিত মৃত্যুভয়রূপ সংস্কার হল অভিনিবেশ।

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনেও আমরা দুঃখবাদ পাই। জীবের দুঃখের আয়তন শরীর এবং সেই দুঃখের সাধন ঘ্রাণাদি ষড়িন্দ্রিয় এবং সেই ষড়িন্দ্রিয়ের গ্রহণীয় ষড়্‌বিষয় এবং সেই ষড়্‌বিষয়ে ষড়্‌বুদ্ধি এবং সুখ এই বিশ প্রকার গৌণ দুঃখ এবং মুখ্য দুঃখ নিয়ে একুশ প্রকার দুঃখের কথা বলা হয়েছে। সুখকেও দুঃখ বলা হয়েছে এই কারণে যে, দুঃখ সুখের সঙ্গে অনুসম্বদ্ধ হয়ে থাকে। চণ্ডীদাস যেমন গেয়েছেন,

'সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুখ যায় তার ঠাঁই।'

জৈন, মীমাংসা ও বেদান্ত-দর্শনেও দেখি জগৎ ও জীবন দুঃখে ভরা— এ উপলব্ধি।

জড়বাদী চার্বাক বলেছেন, জীবনে দুঃখ যেমন আছে, সুখও তো আছে। আঁশ ও কাঁটার ভয়ে কি আমরা মাছ খাব না? পদ্মবনে কাঁটা আছে বলে কি আমরা পদ্ম তুলব না? তুস আছে বলে কি আমরা পুষ্টিকর চাল সংগ্রহ করব না? দুঃখ মিশে আছে বলে কি আমরা সুখভোগ করব না? অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকরা এ বিষয়ে বলেছেন, যাকে আমরা সুখ বলছি তা প্রকৃত সুখ নয়। এ সুখ অনিত্য। সুখ লাভ করলে যাতে চলে না যায় তার জন্য উদ্বেগে থাকতে হয়, চলে গেলে হা-হুতাশ করতে হয়। এ সুখ, দুঃখ ছাড়া আর কিছু নয়।

ভারতীয় দর্শনে দুঃখবাদ সম্পর্কে আমরা কিছুটা আলোচনা করলাম। তবে ভারতীয় দার্শনিকরা কখনও বলেননি দুঃখই জীবনের প্রথম ও শেষ কথা যা পাশ্চাত্ত্য দুঃখবাদে বলা হয়েছে। ভারতীয় দার্শনিকরা গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে দেখেছেন কান্নাভরা এ জগৎ। কঠিন সত্যকে তাঁরা অস্বীকার করেননি। তবে এখানেই তাঁদের দর্শন শেষ নয়। তাঁরা দুঃখজয়ের সাধনা করেছেন, দুঃখকে অতিক্রম করেছেন।

দুঃখানুভূতি থেকে জিজ্ঞাসা এসেছে কেন এই বন্ধন বা দুঃখ? কিসে দুঃখের চির অবসান? দুঃখজয়ের অমোঘ মন্ত্র তাঁরা পেয়েছেন। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের মত তাঁরা সন্তানধারণ বন্ধ করা ও

আত্মহত্যা করা দুঃখনিরোধের উপায় হিসেবে নির্দেশ করেননি। সর্বসারোপনিষদে বলা হয়েছে—'অনাত্মানাং দেহাদীনামাত্মত্বেনাভিমন্যতে সোঽভিমান আত্মনো বন্ধঃ। তন্নিবৃত্তির্মোক্ষঃ।' অর্থাৎ অনাত্মদেহাদিতে আত্মাভিমানই আত্মার বন্ধন। বিষয়াসক্তিনাশ, বাসনাক্ষয় প্রভৃতিকে বলা হয়েছে মোক্ষ।

সব ভারতীয় দর্শনেই বলা হয়েছে, তত্ত্ববিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানই বন্ধন বা দুঃখের কারণ। আর তত্ত্বজ্ঞানে মুক্তি। জৈন দর্শনে বলা হয়েছে, রাগদ্বেষাদি কষায় থেকে জীবের পুদ্গলগ্রহণ। আর ঐ পুদ্গলত্যাগই মুক্তি। ধম্মপদে বলা হয়েছে, তৃষ্ণা (তণ্হা) থেকে জন্ম ও দুঃখ, তৃষ্ণার ক্ষয়ে নির্বাণ।

> "অনেক জাতিসংসারং সংধাবিস্সং অনিব্বিসং।
> গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং॥
> গহকারক দিট্ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি।
> সব্বা তে ফাসুকা ভগ্গা গহকূটং বিসংখিতং।
> বিসংখারগতং চিত্তং তণ্হানং খয়মজ্ঝগা॥"

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়—

> জন্মজন্মান্তর-পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান
> সে কোথা গোপন আছে, এ গৃহ কে করেছে নির্মাণ।
> পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
> হে গৃহকারক, গৃহ না পারিবি রচিবারে আর;
> ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহভিত্তিচয়,—
> সংস্কারবিগতচিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়॥

সাংখ্য-যোগ, ন্যায়-বৈশেষিক, বেদান্ত সব দর্শনেই ভ্রান্তজ্ঞানকে দুঃখকারণ বলে নির্দেশ করা হয়েছে। কেহ বলেছেন অবিবেক, কেহ মিথ্যাজ্ঞান, কেহ অবিদ্যা। আর বিদ্যা থেকে মুক্তি। পরা শান্তি। **Encyclopaedia of Religion and Ethics**-গ্রন্থের নবম খণ্ডে ভারতীয় দুঃখবাদ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করা হয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

বলা হয়েছে, দুঃখবাদ তিন প্রকারের হতে পারে—পরিবেশগত (environmental), আয়ানগত (temperamental) ও দার্শনিক (philosophical)। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা থেকে আসে প্রথম প্রকারের দুঃখবাদ, জীবনের মন্দ বিষয়গুলি দেখে আসে দ্বিতীয় প্রকারের দুঃখবাদ। তাত্ত্বিক বিচার থেকে আসে তৃতীয় প্রকারের দুঃখবাদ। তাঁরা বলেছেন, ভারতীয় দুঃখবাদ তৃতীয় প্রকারের। অবশ্য প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বিষাদবোধ থেকে এই দুঃখবাদের জন্ম হতে পারে। ওল্ডেনবার্গ ও বার্থের এই হল মত।

অনেকে মনে করেন, ভারতবর্ষে 'কর্মে'র ধারণা দুঃখবাদের জনক। কর্মবাদ অনুসারে মানুষকে শুভ-অশুভ কর্মের ফল ভোগ করতে হবে। কর্ম থেকেই জন্মজন্মান্তর। এ থেকে নিষ্কৃতি নাই। এটা কর্মবাদের ঠিক ব্যাখ্যা নয়; বর্তমান জীবন অতীত কর্ম দ্বারা নির্ধারিত হলেও শুভ কর্মের দ্বারা আমরা আমাদের ভাবিজীবনকে শুভ করতে পারি, ভারতীয় দর্শন এ আশ্বাস দেয়।

ব্লুম্‌ফীল্ড্ (Bloomfield) বলেন, 'There is in all Hindu thought no expression of hope for the race, no theory of betterment all along the line.'

হিন্দুদের চতুর্যুগের ধারণার মধ্যে দুঃখবাদ দেখতে পাওয়া যায়। যুগের গতি অবরোহিণী। কিন্তু হিন্দু দার্শনিকরা সর্বজনমুক্তির কথা মেনেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে সুন্দরভাবে বলেছেন: 'সকলে তাঁকে জানতে পারবে—সকলেই উদ্ধার হবে; তবে কেহ সকাল সকাল খেতে পায়, কেহ দুপুরবেলা, কেউ বা সন্ধ্যার সময়, কিন্তু কেহ অভুক্ত থাকবে না। সকলেই আপনার স্বরূপকে জানতে পারবে।' (কথামৃত ৩।১৮।২)।

পাশ্চাত্ত্য লেখকেরা মনে করেন, ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে এসে এদেশের মানুষের মনে দুঃখবোধ দূর করেছে। তারা এদেশকে সুশাসন দিয়েছে, স্বাধীনতা দিয়েছে, সাম্যভাব প্রচার করেছে, শিক্ষা-বিস্তার করেছে, সমাজ সংস্কার করেছে, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধন করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাময়িক কিছু সুখের আয়োজন হলেও জাগতিক কোন ব্যবস্থাই মানুষের ত্রিতাপ জ্বালার আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটাতে পারে না।

বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষে এসেও আজকের দার্শনিক চিন্তায় ভারতীয় দুঃখবাদের ছায়া দেখা যায়। শিল্প-যন্ত্র-যুগের মানুষ আমরা। আজকের অস্তিবাদী দার্শনিকরাও (Existentialists) বলছেন, আমাদের অস্তিত্বকে আমরা উপলব্ধি করি সংকটের (crisis) মধ্যে। মানুষের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় তার চিন্তায় নয়, কর্মে (action)। বিকল্প বেছে নেওয়ার মধ্যে স্বাধীনতা আছে। তবে সেখানে আছে ভীতি, শঙ্কা ও বিরক্তিবোধ। যখন মানুষ সংকটের মধ্যে থাকে, সেখানে প্রয়োজন অনুভূতি। এই ভীতি, শঙ্কা ও বিরক্তি-বোধের পরিবর্তন ঘটে যখন সে বোঝে, সে স্বাধীন। সে তার প্রাথমিক অভিজ্ঞতাকে উত্তরণ ক'রে ভীতি, শঙ্কা ও বিরক্তি থেকে মুক্ত হয়। একে বলে বর্জন (abandonment)। অস্তিবাদী দার্শনিকরা সংকটমুক্তির সঠিক পথ নির্দেশ করতে পারেননি। ভারতীয় দার্শনিকরা দেখিয়েছেন শান্তির রাজপথ।

উপনিষদের ঋষি উদাত্তকণ্ঠে বলেছেন, 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।'

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

'শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ,
দিব্যধামবাসী। আমি জেনেছি তাঁহারে,
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।'

তাই ভারতের দার্শনিক অশ্রুবাদী (Il penseroso) নন, তিনি আনন্দবাদী (L'allegro)। পৃথিবীর কোন দেশের কোন দর্শন তপ্ত, রিক্ত, ক্লান্ত মানুষকে তার দুঃখের দরজায় এমন করে শান্তির বাণী শোনায়নি। ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদী নয়, চরম আশাবাদী (Optimistic)।

প্রার্থনা

ডক্টর শ্রীকৃষ্ণকান্ত চট্টোপাধ্যায়

জননী সারদা! তুমি বীণাপাণি, প্রজ্ঞা দাও,
অবিদ্যা নাশিয়া তব স্নেহক্রোড়ে টেনে নাও।
অকাতরে তুমি দাও মা ভক্তে অসীম স্নেহ,
স'পিলাম আমি তোমার চরণে এ দীন দেহ।
তোমার জ্যোতিতে অন্তর হোক্ জ্যোতির্ময়,
তোমার কৃপাতে এজীবন যেন ধন্য হয়।

নেপালের একটি উৎসব

শ্রীঅশোক সেন

বঙ্গদেশ সম্বন্ধে বলা হয়, এটা নাকি বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ। আমাদের প্রতিবেশী নেপাল সম্বন্ধে একথা বললে বোধ হয় খুব ভুল হবে না; বরং বলা যায়, নেপালে পূজা-পার্বণের সংখ্যা অনেক দেশের চেয়ে কিছু বেশীই হবে বোধ হয়। ঋতু এবং তিথি অনুযায়ী সেখানে যে সব উৎসব প্রচলিত আছে সেগুলির সংখ্যা নির্ণয় করা বেশ কঠিন। নেপালের ধর্মানুষ্ঠানগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি এবং ধর্মমতের সমন্বয়; অবশ্য স্থানীয় রীতিনীতি ও সংস্কারের প্রভাবে এগুলি এমনভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে যার ফলে, বর্তমানে এই পার্থক্য বুঝতে পারা যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে, একই মূর্তি হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের নরনারী সমান ভক্তি এবং বিশ্বাস সহকারে দীর্ঘদিন ধরে পূজা করে আসছেন। এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, মহাকাল; এই দেবতাকে হিন্দুরা পূজা করেন মহাকাল শিবজ্ঞানে। আবার বজ্রপাণি বলে বৌদ্ধদের দ্বারাও তিনি পূজিত হয়ে থাকেন। সেখানকার বিখ্যাত পশুপতিনাথকেও এমনি হিন্দু এবং বৌদ্ধ উভয়েই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের দেবতা বলে পূজা করেন। পশুপতিনাথের মন্দিরের কাছে আর একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র গুহ্যেশ্বরী দেবীর মন্দির। এটি হিন্দুদের ৫১ পীঠের অন্যতম বলে পরিচিত। তবে কেবল হিন্দু নয়, দূরবর্তী বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পুণ্যকামী বহু বৌদ্ধ ভিক্ষুও প্রতি বছর দুর্গম পথ অতিক্রম করে দেবীদর্শনে আসেন। এখানকার পূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, প্রতি শনি এবং মঙ্গলবারে মন্দিরে ভোগ হিসাবে মুরগির ডিম নিবেদন করা হয়। কবে থেকে, কী ভাবে যে এই বিচিত্র রীতি এখানে প্রচলিত হয়েছে, এখন তা বলা শক্ত।

নেপালের অন্যতম প্রধান এবং জনপ্রিয় উৎসব হচ্ছে ইন্দ্রযাত্রা বা কুমারীযাত্রা। নেপালে বসবাসকারী সকল ধর্মের নরনারীই এতে অংশ গ্রহণ করেন। এটি পালিত হয় প্রতি ভাদ্রমাসে। উৎসবটির পিছনে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক কাহিনী প্রচলিত আছে। এর আনুষঙ্গিক আমোদপ্রমোদ শুরু হয়ে যায় উৎসবের বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই। শুনতে পাওয়া যায়, পূর্বে এই উৎসবের সময় সেখানকার নরনারী আনন্দে এতই মত্ত হয়ে উঠতো যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি দেবার মত অবসরও তখন তাদের থাকত না। এই মত্ততার সুযোগ নিয়ে আজ থেকে দু'শো বছর আগে এই কুমারীযাত্রা উৎসবের দিন বর্তমান গোর্খা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা পৃথ্বীরাজ শাহ অতর্কিতে নেপাল আক্রমণ করেন এবং সামান্য বাধা ও প্রায় বিনা রক্তপাতেই নেপাল অধিকার করে নেন। সেই থেকে এই অনুষ্ঠানটি জয়ের উৎসব এবং বর্তমান রাজবংশ প্রতিষ্ঠার স্মারক অনুষ্ঠান হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।

আসল উৎসবের দিন রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে এক বিরাট বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। এর প্রধান আকর্ষণ দেবী কুমারী এবং তাঁর দুই প্রহরী গণেশ এবং ভৈরব। এঁদের তিনজনকেই নেপালের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নির্বাচিত করা হয়। এর মধ্যে কুমারী নির্বাচন পদ্ধতিটি অত্যন্ত জটিল ও কঠিন; সেখানকার মাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট

পরিবার থেকে অত্যন্ত বিরল. বিশেষ দৈহিক শুভলক্ষণযুক্ত একজন কুমারীকে এর জন্য বেছে নেওয়া হয়, গণেশ ও ভৈরব হিসেবে দু'জন কিশোর মনোনয়নের বেলাতেও এই একই রকম চিহ্ন দেখে বিচার করার রীতি প্রচলিত আছে। নির্বাচনের পর কুমারীকে নিয়ে আসা হয় রাজপ্রাসাদের অদূরে তাঁরই জন্য বিশেষভাবে নির্মিত প্রাসাদে, সেদিন থেকে নিজস্ব আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে তাঁর আর কোন সম্পর্ক থাকে না। লোকচক্ষুর অন্তরালে রাজপ্রাসাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তাঁকে রাখা হয় এবং তাঁর ভরণপোষণ, ভালমন্দ সব কিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন সরকার ; তারপর রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেই তাঁর নামে বিস্তৃত জমি ইত্যাদি লিখে দেওয়া হয় যাতে বাকী জীবন তাঁর মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যেই কেটে যায়। এই সব কুমারীর পতিগ্রহণের বাধা নেই ; কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এঁদের অবিবাহিতাই থেকে যেতে হয়। কারণ রাজাসমেত দেশের সকল সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ নরনারী একদিন যাঁকে সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে পূজো করেছে, দেশের কোন যুবক স্বভাবতই তাঁকে নিজের সহধর্মিণী বলে গ্রহণ করতে সহজে রাজী হয় না।

কুমারীযাত্রার দিন সকালে একটি বড় রথে দামী অলংকার ও পোষাকে সজ্জিতা কুমারী এবং তাঁর দু'পাশে দু'টি অপেক্ষাকৃত ছোট রথে গণেশ ও ভৈরবকে বসিয়ে এক বিরাট শোভাযাত্রা বের করা হয়। রথ তিনটির ঠিক পিছনেই একাধিক গাড়িতে থাকেন মহামান্য নেপালরাজ, তাঁর পরিবারের লোকজন এবং উচ্চ রাজকর্মচারীরা। এঁদের পিছনে রথগুলির অনুগমন করেন অগণিত নরনারী। কাঠমাণ্ডু শহরের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি ঘুরে সন্ধ্যের পর রথ তিনটি সেখানকার একটি জায়গায় এসে থামে। গাড়ী থেকে রাজা নেমে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট স্থানে বসলে কয়েকবার তোপ-ধ্বনি করে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। রথগুলি সেখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে শোভাযাত্রা শেষ হয় এবং সেবারের মত কুমারীযাত্রা উৎসবেরও পরিসমাপ্তি ঘটে !

কুমারীযাত্রা একটি জনপ্রিয় উৎসব হলেও এটি কিন্তু খুব পুরানো নয়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, এর উৎপত্তি হয়েছে মাত্র দু'শো বছর আগে। এবিষয়ে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজা জয়প্রকাশ মল্লের রাজত্বকালে স্থানীয় জনৈক কৃষকের এক কিশোরী কন্যার স্বভাবে এক বিচিত্র পরিবর্তন দেখা দেয়। কিছুটা মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় সে অনবরত বলতে থাকে, সে হচ্ছে সাক্ষাৎ কুমারী মাতা ; ভগবান তাকে মরজগতে পাঠিয়েছেন নরনারী উদ্ধারের জন্য। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখার জন্য সেখানে প্রত্যহ প্রচুর ভীড় হতে শুরু হল। লোকমারফত কথাটা রাজার কানে পৌছতে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই কৃষক ও তার কন্যা দুজনকেই ডেকে পাঠালেন রাজপ্রাসাদে। তাদের কাছে রাজা আগাগোড়া সব কিছু নিজে শুনলেন বটে, কিন্তু ব্যাপারটা তিনি ঠিক মতো বিশ্বাস করতে পারলেন না ; সমস্তটা একটা লোক ঠকান বিরাট ফাঁকি বলে তাঁর মনে হল। সুতরাং মিথ্যা ভাষণ এবং প্রতারণার অপরাধে সেই কৃষক পরিবারকে তিনি নির্বাসনে পাঠালেন। শুধু তা-ই নয়, সেই দরিদ্র কৃষকের যে সামান্য জমিটুকু ছিল, রাজার আদেশে তা-ও বাজেয়াপ্ত করা হল। কিন্তু তখনই দেখা দিল বিপদ, সেই সন্ধ্যাবেলাতেই রাজার স্ত্রীরও ঠিক একই রকম লক্ষণ প্রকাশ পেল। রাজা তখন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন ; অনুতপ্ত রাজা তখুনই নিজে গিয়ে সসম্মানে সেই কৃষক পরিবারকে ফিরিয়ে আনলেন এবং সমগ্র রাজ্যে দেবী কুমারীর পূজার আদেশ দিলেন। তখন থেকেই সারা নেপাল রাজ্যে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

ধীরামাতা

স্বামী তথাগতানন্দ

উপনিষদে দেখা যায় তপস্যা দ্বারা ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন। নব-ভারত গঠনের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ যে কি কঠোর তপস্যা করেছেন তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর জীবনী আলোচনা করলে। সাধারণে সে-তপস্যার কল্পনাও করতে পারবে না। পাশ্চাত্যে তাঁর সংগ্রাম যে কি ভীষণ, কি অমানুষিক ছিল, তার সংবাদ কিছু কিছু পাই তাঁরই পত্রে। "এই ঘোর শীতে পর্বত-পাহাড়ে বরফ ঠেলে— এই ঘোর শীতে রাত্রির দুটো-একটা পর্যন্ত রাস্তা ঠেলে লেকচার ক'রে দু-চার হাজার টাকা করেছি— মা-ঠাকুরানীর জন্য জায়গা কিনলেই আমি নিশ্চিন্ত।" (১৮৯৫-এর ৯ই ফেব্রুআরির চিঠি)। অপর এক পত্রে (মে, ১৮৯৫) —"ক্লাসগুলি চলছে বটে, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি— যদিও ক্লাসে বহু ছাত্রের সমাগম হয়, তারা যা দেয়, তাতে ঘরভাড়াও উঠে না। এ সপ্তাহটা চেষ্টা ক'রে দেখব, তারপর ছেড়ে দেব।" ১৮.১১.১৮৯৫-এর পত্রে—"'আমার মরবার পর্যন্ত সময় নেই।' দিবারাত্র কাজ, কাজ, কাজ। ·· বাস্তবিক আমি অবিরাম কাজ ক'রে ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করেছি, আর কোন হিন্দুকে এরূপ করতে হ'লে সে এতদিনে রক্ত বমি ক'রে মরে যেত।" ১১ই এপ্রিল, ১৮৯৯-এর পত্রে—"দু বৎসরের শারীরিক কষ্ট আমার বিশ বৎসরের আয়ু হরণ করেছে।" স্বামী বিবেকানন্দের প্রাণের আসল আকাঙ্ক্ষা— "নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্তি ও বিশ্রামের জন্য আমার হৃদয় তৃষিত। সেই ছিন্ন বস্ত্র (কৌপীন), মুণ্ডিত মস্তক, তরুতলে শয়ন ও ভিক্ষান্ন ভোজন—হায়! এগুলিই এখন আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষার বিষয়।" (২৪.১.১৮৯৫-এর পত্র)।

পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচার ও নব-ভারত গঠনের কাজে তিনি কি ভীষণ সংগ্রাম করেছিলেন এবং হৃদয়হীন ও স্বার্থপর লোকের সমালোচনা তাঁর জীবনকে কত ব্যথাতুর করেছিল তার কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁর ৪৩০ নং পত্রে। অবশ্য তাঁর গুরুর আশীর্বাদে তিনি ওদেশে কয়েকজন সত্যিকারের দরদী বন্ধুকেও পেয়েছিলেন। এঁরা তাঁর আদর্শে শ্রদ্ধাশীল, তাঁর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ এবং তাঁর অশেষ ক্লান্তিপূর্ণ জীবনকে একটু সেবা, স্বাচ্ছন্দ্য ও উৎসাহ দিতে তৎপর। সেই জন-কয়েক চিহ্নিত সমব্যথীদের মধ্যে মিসেস্ ওলি বুল অন্যতমা। স্বামীজীর সঙ্গে ১৮৯৪-এর কোন এক সময়ে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁর উদারতা, বদান্যতা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আমেরিকার সর্বত্র পরিচিত ছিলেন। স্বামীজী তাঁকে 'মা' বলে ডাকতেন, তাঁর অকৃত্রিম মাতৃত্ব, ধীর-স্থির ব্যবহার ও বয়সোচিত গাম্ভীর্যের জন্য স্বামীজী তাঁকে "ধীরামাতা" বলেও সম্বোধন করতেন। প্রত্যেক পত্রে তাঁর সন্তানোচিত শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও আনুগত্যের বিশেষ উল্লেখ আছে। তিনি তাঁর মধ্যে দেখেছিলেন এক "আধ্যাত্মিক ভাব।" তাঁর দান সাত্ত্বিক এ কথাও বলেছেন। এই মহীয়সী, সহৃদয়া নারীকে তিনি কি গভীর শ্রদ্ধা করতেন তার উল্লেখ আছে ২৪.১.১৮৯৫-এর এক পত্রে—"এদেশে আপনিই আমার একমাত্র সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন বন্ধু।" "জননীর ন্যায়" তাঁর সৎ পরামর্শের জন্য স্বামীজী বার বার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি যে তাঁর গুরুর প্রেরিত এ সম্পর্কে তিনি জানান ২৫.৪.১৮৯৫-এর এক পত্রে "আপনি আমাকে যে সাহায্য করেছেন, শুধু তার দরুন নয়—আমার

স্বাভাবিক সংস্কারবশতই (অথবা যাকে আমি আমার গুরু মহারাজের প্রেরণা বলে থাকি) আপনাকে আমি আমার মায়ের মতো দেখে থাকি। সুতরাং আপনি আমাকে যে-কোন উপদেশ দেবেন, তা আমি সর্বদাই মেনে চ'লব।" তাঁর বিচক্ষণতা, কার্যকুশলতা ও ধীর-স্থির বুদ্ধির জন্য স্বামীজী তাঁকে বেলুড় মঠের একজন ট্রাস্টি পর্যন্ত করতে চেয়েছিলেন।

তাঁর জন্ম আমেরিকায়—আনুমানিক ১৮৫০-এ। বাবা ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী ও ম্যাডিসনের (Madison) সেনেটর; মায়ের ছিল সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি। বাল্যের নাম "সারা থরপ" (Sara Thorp)। গানের প্রতি সারার ঝোঁক ছিল খুবই। এঁদের প্রাসাদোপম বাড়ীতে বহু গণ্য মান্য ব্যক্তির আনাগোনা ছিল। এই ভাবেই সারা নরওয়ের বিখ্যাত (Violin) ভায়ওলিন শিল্পী ওলি বুলের সংস্পর্শে আসেন।

সেপ্টেম্বর, ১৮৭০-এ তাঁর বিয়ে হয় ওলি বুলের সঙ্গে। স্বামীর বয়স তখন ৬০। তাঁর কন্যা—সারা ওলিয়া—১৮৭১ সালে জন্মগ্রহণ করে। সারা তাঁর স্বামীর কনসার্টের সঙ্গে বহু দেশ ঘুরেছেন। স্বামী অত্যন্ত খেয়ালী, ধনী ও বিলাসী। সারা তাঁর বাস্তববুদ্ধি ও প্রতিভাবলে এই সব কনসার্ট ভ্রমণগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতেন। ১৮৮০ খ্রী: তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়। বোস্টনের কেমব্রিজ সহরে তাঁর স্বামীর প্রাসাদোপম বাড়ীতে তিনি আমৃত্যু বাস করেছেন।

তাঁর বাড়ীতে সেকালের বিখ্যাত চিন্তাবিদ্‌দের প্রায়ই নানান্ বিষয়ে আলোচনা হ'ত। ধীরামাতা এগুলিকে বলতেন—"The Cambridge Conferences". Prof. William James, Thomas Wentworth Higginson, Jossiah Royce, Jane Addams প্রভৃতি মনীষীগণের নানান্ বিষয়ে আলোচনা চলত। গ্রীনএকারে স্বামীজী তিন সপ্তাহ ক্লাশ করেন। অন্যদের সঙ্গে ধীরামাতাও ছিলেন। (অগস্ট ৮৯৪)। এখানের কাজের সাফল্যের পশ্চাতে ছিল ধীরামাতার উচ্চ আদর্শবোধ। "You have been consecrated and chosen by the Lord as a channel for converting this thought into life, and every one that helps you in this wonderful work is serving the Lord." এখানের কাজে স্বামীজী অত্যন্ত উৎসাহ পান। তিনি ধীরামাতার নামে জমি কিনতে চেয়েছিলেন তাঁর আশ্রমের জন্য। এখানে পরে স্বামী সারদানন্দ ও অভেদানন্দজী ক্লাস করেন। এখানেই সর্বপ্রথম স্বামীজী অবধূত গীতার অদ্বৈততত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন।

ধীরামাতার বাড়ীতে এলোমেলোভাবে সুধীবৃন্দের আলোচনা হোত না। ধারাবাহিক-ভাবে রীতিমত আলোচনা চল্‌ত। Dr. Lewis G. Janes-এর প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে, "He later became the director of the Cambridge Conferences, an annual series of lectures for the 'Comparative study of ethics, religion and philosophy' that Mrs. Bull had started in her home". স্বামীজী অত্যন্ত ক্লান্ত – মানসিক ও শারীরিক, বিশ্রাম চান। ধীরামাতার আমন্ত্রণে তাঁর বাড়ীতে তিনি ৯।১০ দিন ছিলেন ১৮৯৪-এর অক্টোবরে। দ্বিতীয় বার আসেন ৫ই ডিসেম্বর ১৮৯৪-এ, তিন সপ্তাহ ছিলেন। প্রথমবারেই বোধ হয় অধ্যাপক জেম্‌স-এর সঙ্গে তাঁর এখানেই সাক্ষাৎ হয়। আলোচনা ও সমাধির প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে জেম্‌স্ অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হন। তাঁর বিখ্যাত "Varieties of Religious Experience"-এর পাঠক মাত্রেই এ সব জানেন।

দ্বিতীয়বারে (৫.১২.১৮৯৪—২৮.১২.১৮৯৪) তিনি রীতিমত ক্লাস নিয়েছেন প্রত্যেক দিন সকালে ধীরামাতার বাড়ীতে। ১৮৯৬-এর ২৫শে মার্চ বিখ্যাত হার্ভার্ড (Harvard) বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়ে তিনি যে সম্মান পেয়েছিলেন এখানেই তার সূত্রপাত। প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছিল তাঁকে। তাঁর প্রিয় ভগিনী মেরী হেলকে লেখা এ সময়ের চিঠিতে পাই…"I am kept pretty busy the whole day." বহু ছাত্র ও অধ্যাপকের প্রচুর লাভ হয়েছিল এখানে তাঁর সঙ্গে দার্শনিক আলোচনার ফলে। অন্য একটি বিশেষ ঘটনা এখানে (১৮৯৪ খৃঃ-এর শেষে) ঘটে। ধীরামাতার অনুরোধে তিনি "ভারতীয় নারীর আদর্শ" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। শ্রোতৃমণ্ডলী অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং তাঁরা স্বামীজীর মাকে (শ্রীযুক্তা ভুবনেশ্বরী দেবীকে) শ্রদ্ধা জানিয়ে এক অভিনন্দন পত্র পাঠান, কারণ হিন্দু নারী সম্পর্কে মিশনারীদের প্রচার শোনার পর স্বামীজীর বক্তৃতায় তাঁরা অত্যন্ত আনন্দ পান। (যুগনায়ক ২।২৭৪)। বলা বাহুল্য, স্বামীজী পরে জানতে পেরে স্বভাবতই অত্যন্ত আনন্দিত হন। স্বামীজী ভারতে আসার পূর্বেই তাঁর কাজের জন্য ধীরামাতার নিকট থেকে উদার দানের প্রতিশ্রুতি পান। স্বামীজী তা তখনই গ্রহণ করেননি। স্বামীজী ভারতে ফিরে এলেন ১৮৯৭-এর জানুআরিতে। পরের বছর এলেন নিবেদিতা। ধীরামাতা আসতে চান ভারতে। স্বামীজী তাঁর স্বভাবসুলভ ভাষায় জানালেন: "বলাই বাহুল্য আপনাদের এখানে দেখতে পেলে আমি আনন্দিত হবো; কিন্তু গোড়া থেকেই জেনে রাখা ভাল যে, ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর।" মিস্ ম্যাকলাউড ও ধীরামাতা এলেন ১৪ই ফেব্রুআরি ১৮৯৮। বেলুড় মঠের নূতন জমি কেনা হয়েছে। সেখানের পুরানো বাড়ীটিকে বসবাসের উপযুক্ত করে বাস করতে লাগলেন এঁরা। এঁরাই মঠের প্রথম বাসিন্দা—মার্চ ১৮৯৮।

৬ই মে, ১৮৯৮। স্বামীজীর সঙ্গে এঁরা চলেছেন আলমোড়া ও নৈনিতাল দর্শনে। জুন মাসে আলমোড়া ত্যাগ করে সবাই যান কাশ্মীরের পথে। প্রায় এক মাস তাঁরা কাশ্মীরের হাউস-বোটে বাস করেন। স্বামীজী অক্টোবরে মঠে চলে আসেন, স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে এঁরা তিন জন উত্তর ভারতের বিশেষ দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে নভেম্বরের মাঝামাঝি কলকাতা ফেরেন। অবশ্য নিবেদিতা আগেই চলে আসেন। এঁরা তিন জনেই শ্রীশ্রীমার সঙ্গে আলাপ করে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন। ধীরামাতার বিশেষ আগ্রহেই শ্রীশ্রীমার প্রথম ফটো তোলা হয়। এক চাঁদনি রাতে এঁরা তিন জনে নৌকাযোগে কামারহাটীর গোপালের মাকে দর্শন করেন এবং তাঁর হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহারে বিশেষভাবে আনন্দিত হন। ধীরামাতা ১৮৯৯-এর জানুআরিতে মিস্ ম্যাকলাউডের সঙ্গে ভারত ত্যাগ করেন। আবার দ্বিতীয়বার আসেন নিবেদিতার সঙ্গে ১৯০২-এর ফেব্রুআরিতে। এপ্রিল মাসে আবার চলে যান মিস্ ম্যাকলাউডের সঙ্গে। স্বামীজীকে এই তাঁদের শেষ দেখা।

১৮৯৮-এর গোড়ায় মঠের সূচনাকালে ধীরামাতার অর্থসাহায্যেই ঠাকুরঘর তৈরী হয়। তাঁর দানের পরিমাণ ছিল প্রায় তিরিশ হাজার টাকা। এছাড়াও তিনি স্বামীজীর আত্মীয়দেরও সাহায্য করতেন। নিবেদিতাকে তিনি মেয়ের চেয়ে বেশী ভালবাসতেন। রামকৃষ্ণগোষ্ঠী ছাড়াও ভারতের উন্নতিকল্পে তিনি শুধু দানই করেননি, দিয়েছেন উৎসাহ এবং জানিয়েছেন তাঁর গভীর সহানুভূতি। সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র তাঁর বাড়ীর লোকের মতই বিভিন্ন সময়ে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছেন।

নিবেদিতার স্কুল, ডাঃ বোসের বিজ্ঞানচর্চা, নিবেদিতার নানান্ পরিকল্পনা সবই তাঁর দানে পুষ্ট। ১৯১০-এর এক পত্রে নিবেদিতা কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন—"···You know this School is yours, and my writings are really yours, and the Science books are yours, the 'laboratory will be yours." মৃত্যুর পূর্বে উইল করে ডাঃ বোসের ল্যাবরেটরি ও নিবেদিতার স্কুলের জন্য টাকা রেখে যান। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯১১ সালে। নিবেদিতা ছিলেন তাঁর মৃত্যুশয্যা-পার্শ্বে।

তাঁর মাতৃত্ব সর্বজনবিদিত। প্রথমে আল-মোড়ায় এবং পরে (১৯০০-এর সেপ্টেম্বরে) ব্রিটানীতে নিবেদিতার মানসিক উদ্বেগের দিন-গুলিতে ধীরামাতার সান্নিধ্য ও বিচক্ষণতা নিবেদিতাকে দিয়েছে শান্তি। স্বামীজীকে মাতৃ-সুলভ উপদেশ দেবার অধিকার ছিল তাঁর। এঁর উপদেশই নিবেদিতাকে শান্তি পাওয়ার পথে সাহায্য করে। তাঁর মাতৃসুলভ অকৃত্রিম স্নেহ ও বিচক্ষণতা শুধু নিবেদিতাকে নয়, স্বামীজী ও সারদানন্দজীর জীবনেও স্বস্তি ও প্রেরণা দিয়েছে। বলা বাহুল্য, সারদানন্দজী তাঁকে "দিদিমা" বলে ডাকতেন ও মঠ মিশনের কাজে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং অনেক সংবাদ দিয়ে তাঁকে চিঠি লিখতেন। সময়মত তিনি স্বামীজীকে কিছু কিছু বলতেন। স্বামীজীর প্রখর আদর্শবাদ, অতিশয় বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যুৎ-গতিতে কাজ করার শক্তি সবার পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। তিনি নেতা, তাঁর গুরুভাইরা প্রায়ই তাঁর অভিপ্রায় মত দ্রুত কাজ করতে পারতেন না। এজন্য স্বামীজী তাঁর ভাইদের ভীষণ তিরস্কার করতেন। নিবেদিতার মত সারদানন্দজীও এই সব প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণার দিনগুলিতে ধীরামাতার স্নেহ ও বিচক্ষণতায় অশেষ তৃপ্তি লাভ করেছেন। তিনি দরদী মায়ের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন বহুবার। স্বামীজীকে উপদেশ দিয়েছেন কখন বা "তিরস্কার" করেছেন। মিস্ ম্যাকলাউড ও ধীরামাতার অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসা স্বামীজীর গুরুভাইদের সেকালে অশেষ শান্তি দিয়েছে। আত্মভোলা স্বামীজী তাঁর শিশু-সুলভ মনোভাব নিয়ে মিস্ ম্যাক-লাউডকে এক পত্রে (৫০৮) লেখেন: "মিসেস্ বুলকে এ সকল সংবাদ লিখো এবং ব'লো যে, তিনিই বরাবর ঠিক বলেছেন, আর আমারই ভুল হয়েছে। সেজন্য আমি সহস্রবার তাঁর নিকট ক্ষমা চাইছি।" ধীরামাতা লেখেন, "কিন্তু মা, রামকৃষ্ণের কৃপায় কোন মানুষের মুখ দেখলেই আমি যেন স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার বলে তার ভিতর কি আছে, তা প্রায় অভ্রান্তভাবে জানতে পারি, আর এর ফলে এই দাঁড়িয়েছে যে, আপনি আমার সব ব্যাপার নিয়ে যা খুশি করতে পারেন, আমি তাতে এতটুকু অসন্তোষ পর্যন্ত প্রকাশ করব না।" নানান্ বিষয়ে পরামর্শ ছাড়াও আমেরিকার পূর্ব উপকূলে বেদান্ত প্রচারের কাজ দেখাশুনার জন্য তিনি ধীরা-মাতাকে ভার দিয়েছিলেন। ১৯০০-এর ২ই এপ্রিলের পত্রে তাঁকে লিখছেন, "Her (Mother's) power is on you. I am sure she willlead you to what is right."

'নিবেদিতা লোকমাতা'য় একটি নূতন সংবাদ পাওয়া যায়। ১৮৯৯-এর ৫ই নভেম্বর স্বামীজী নিবেদিতা ও ধীরামাতাকে এক টুকরো গেরুয়া বস্ত্র দিয়ে বলেছিলেন: রামকৃষ্ণের দেওয়া শক্তি আমি তোমাদের সব দিচ্ছি। মার (কালী) কাছ থেকে যা এসেছিল তা তোমাদের দিয়ে শান্তি বোধ করছি। "Women's hands will be the best anyway to hold what came from a woman—from Mother."

ধীরামাতাকে এক পত্রে স্বামীজী লিখ্ছেন—"তোমার ধার আমি কোন কালে শুধ্তে

পারব না।" আবার—"এ-যাবৎ আমি আপনাকে কেবল শ্রদ্ধাই করেছি, কিন্তু এখন ঘটনা-পরম্পরায় মনে হচ্ছে যে, মহামায়া আপনাকে আমার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য নিযুক্ত করেছেন ; সুতরাং এখন শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রগাঢ় বিশ্বাস যুক্ত হয়েছে। এখন থেকে আমি আমার নিজের জীবন এবং কর্ম-প্রণালী বিষয়ে মনে ক'রব যে, আপনি মায়ের আজ্ঞাপ্রাপ্ত, সুতরাং সকল দায়িত্ববোধ নিজের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে আপনার ভেতর দিয়ে মহামায়া যে নির্দেশ দেবেন, তাই মেনে চ'লব।" আবার লিখছেন—"আমি আমার নিজের চেয়ে আপনার পরিচালনায় বেশি বিশ্বাস করি।"

একথা মনে করা ঠিক নয় যে, সর্ব বিষয়েই তাঁদের মধ্যে মতৈক্য ছিল। মতভেদ থাকাই খুব স্বাভাবিক। স্বামীজী সর্বদাই ভাবতেন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের হাতের যন্ত্রমাত্র। ঈশ্বরের বাণী প্রচারই করেছেন তিনি। মেরী হেলকে লেখেন—"তুমিও যদি মিসেস্ বুলের মতো ভাবিয়া থাকো, আমার কোন বিশেষ কার্য আছে, তাহা হইলে ভুল বুঝিয়াছ, সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়াছ। এ জগতে বা অন্য কোন জগতে আমার কোনই কায নাই। আমার কিছু বলিবার আছে, আমি উহা নিজের ভাবে বলিব…।" এই পত্রটিতে কঠোর সন্ন্যাসীর সত্য স্বরূপটি প্রকাশ পেয়েছে। এখানেও দেখা যায় ধীরামাতা ও স্বামীজীর সঙ্গে "দীর্ঘ-তুমুল তর্ক" এবং স্বামীজীকে "ভর্ৎসনা"র কারণ স্বামীজীরই কাজের সাফল্যের জন্য। তার অন্য কোন কারণ ছিল না,— স্বামীজী তাই তাঁর উপর সর্বদাই নির্ভর করতেন। দেশ ছেড়ে ১৫০০০ মাইল দূরে একলা থাকা এবং সর্বদাই গোঁড়া শত্রু-ভাবাপন্ন খ্রীষ্টানদের সঙ্গে লড়াই করা সেদিনে কি ভীষণ ব্যাপার, তা আমরা অনুমান করতে পারি। এতে "বীর সন্ন্যাসী"ও মাঝে মাঝে খুব "ঘাবড়ে যেতেন"। ধীরামাতার স্নেহ, উৎসাহ এবং সাহায্য স্বামীজীকে শান্তি দিয়েছে। তাঁর কাছেই স্বামীজী তাঁর প্রাণের বেদনা নানা সময়ে জানিয়েছেন। পুত্রের আবদার নিয়ে মায়ের উপর রাগ করেছেন। ধীরামাতা সর্বদাই দেবতার মত তাঁকে নানান্ বেদনাদায়ক অবস্থা থেকে রক্ষা করেছেন। বোধ হয়, এই জন্যই একবার স্বামীজী তাঁকে "Sacred Cow" বলে সম্বোধন করেন। সত্যিই তিনি ছিলেন "কামধেনু।" শ্রীরামকৃষ্ণভাব প্রচারে তাঁর অবদান ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। স্বামীজীর ভাষায় সত্যিই তিনি "মহীয়সী নারী ও অকৃত্রিম বন্ধু"। তাঁর পুণ্য জীবন-কাহিনী আমাদের প্রত্যেকের বিশেষভাবে জানা দরকার। তাঁর অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাই।

৩৯, ভিক্টোরিয়া স্ট্রীট, লণ্ডন
৯ই ডিসেম্বর, ১৮৯৬

প্রিয় মিসেস্ বুল,

আপনার অতি উদার দানের প্রতিশ্রুতির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন। কার্যারম্ভেই অনেক অর্থ হাতে নিয়ে আমি নিজেকে বিব্রত করতে চাই না ; তবে কাজের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ অর্থকে খাটাতে পারলেই আমি সুখী হবো। খুব সামান্যভাবে কাজ আরম্ভ করাই আমার ইচ্ছা। …

… আপনার সম্বন্ধে এইটুকু বলতে পারি যে, আপনাকে আমি সর্বদাই সবচেয়ে বড় বন্ধু ব'লে মনে ক'রে এসেছি এবং আজীবন তাই ক'রব। … ইতি

ভবদীয়
বিবেকানন্দ

ঔপনিষদ অমৃত

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

কারণগুলো তুচ্ছ। কিন্তু মনের ওপর তার চাপটা অস্বস্তিকর। ক্ষোভবিরাগময় একটা কাঁটার খোঁচা মনের ভিতর অকারণেই বাসা বেঁধেছে যেন। বুদ্ধি দিয়ে বিচার দিয়ে তাকে সরাতে পারা যাচ্ছে না।

এমন সময়ে জ্যৈষ্ঠ মাসের উদ্বোধন এলো (১৩৮১)। আর চোখে পড়ল "ঈশোপনিষদ্ অনুধ্যান"। মাত্র চারটি পাতায় প্রথম শ্লোকটির বিভিন্ন মনীষীর নানারকম ব্যাখ্যা ধরে দেওয়া হয়েছে পাঠকপাঠিকার সামনে। বলা হয়েছে "মনের এক এক স্তরে এক এক প্রকার অর্থের প্রকাশ, এইগুলির মধ্যে আমরা নিজেদেরই মনের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই··· যেটি আজ সাগ্রহে গ্রহণ করিতেছি, সেটির দ্বারাই আমার মনের বর্তমান অবস্থা ধরা পড়িতেছে। অন্যগুলি - হয় আমি অতিক্রম করিয়াছি, না হয় ভবিষ্যতে করিব। কোনটি ভুল বলিয়া এখনই ফেলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই।" আশ্চর্য সূক্ষ্ম বিচারময় মন্তব্য!

প্রায় শতবর্ষ আগে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন-চরিতে পাই ঐ শ্লোকটির ছেঁড়া পাতা তাঁর সামনে উড়ে এসে পড়ে তাঁর পিতামহীর (দিদিমা বলে উল্লিখিত) গঙ্গাযাত্রার সময়ে— অথবা অন্তর্জলীর প্রাক্কালে। সে সময়ে তিনি অত্যন্ত বিচলিত মনে গঙ্গাতীরে বসেছিলেন। তাতেই তাঁর মনের ও জীবনের ধারার এক আশ্চর্য পরিবর্তন হয়।

রাজা রামমোহন রায় (বাংলায় প্রথম উপ-নিষদ্ অনুবাদক), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, শ্রীঅরবিন্দ, বিনোবাজী, আচার্য শংকর এবং স্বামী বিবেকানন্দের বিস্তৃত ব্যাখ্যা— এক জায়গায় চারখানি পাতার মধ্যে এমন অমূল্য সম্পদ পাওয়া যেমন দুর্লভ বস্তু তেমনি সৌভাগ্যের বিষয়।

সেদিন আমার বিকল মনে তার প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব কি হয়েছিল বলছি। মুখে বলার অতীত সে জিনিস।

সংসার জীবন। কারণে অকারণেই তার পাওয়া চাওয়ার দ্বন্দ্ব। পাওয়া না পাওয়ার ক্ষোভ। যেন কি পাওয়ার মোহ। না পাওয়ার ক্ষুব্ধতা। তুচ্ছ ছোট্ট সে কাঁটার খোঁচা আর মন থেকে মিলায় না।

এমন সময় উপনিষদের ঐ বিখ্যাত শ্লোকটির অনুধ্যান— ব্যাখ্যা, ভাষ্য, টীকার আবির্ভাব! এক নিমেষে যে এমন করে মনের কাঁটা উৎপাটিত হয়ে যায়, ক্ষোভ মুছে যায়, মোহমুক্তি হয়— এই অসামান্য অনুভূতির ব্যাপার কোনো দিন জানা ছিল না।

ঐ শ্লোকটি তো কতবারই পড়েছি কত জায়গায়। "ঈশ্বরে সব আবৃত করা," "আচ্ছাদন করা" যে কি বস্তু তা তো আজো আমরা জন-সাধারণ জানি না। "বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ"— শ্লোকটিও গীতায় দেখা আছে। শোনা আছে। সে অনুভূতি কি রকম তাও তো সাধারণ বুদ্ধিমনের মানুষের মনের অতীত।

তবু 'মনীষার আলোকে' চোখের সামনের অন্ধকার দূর হয়ে গেল এক নিমেষে। এক মুহূর্তে মনের তুচ্ছ মোহ ক্ষোভ উপেক্ষাবোধ একেবারে মিলিয়ে গেল। কোন এক শান্ত আনন্দ অমৃত-লোকের বাণী মনের সামনে মূর্তি ধরে এসে দাঁড়াল! মা গৃধঃ! মা গৃধঃ! আকাঙ্ক্ষা কোরো না। মোহমুগ্ধ হয়ো না। ক্ষোভ রেখো না। কি এক অনুভূতি কোনো কিছুর প্রয়োজনবোধের আর না পাওয়ার ক্ষোভের "মর্মের মলিন" দুয়ার একেবারে যেন রুদ্ধ করে দিল।

আর মনে হ'ল বোধ হয় একেই বলে পরমপ্রাপ্তি!

গানযোগ*

শ্রীঅজিত কুমার চট্টোপাধ্যায়

সাধকেরা বলেন এবং পুরাণেও দেখিতে পাওয়া যায়, নাম-সংকীর্তন— তাহা কালীনামই হউক আর হরিনামই হউক, রামনামই হউক বা শিবনামই হউক— সাধনার একটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, প্রেমিক, বিদ্যাপতি, সুরদাস, মীরাবাঈ, কবীর, নানক, ত্যাগরাজ, পুরন্দরদাস, জ্ঞানেশ্বর, তুকারাম প্রভৃতি সাধকেরা সঙ্গীতকে সাধনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, 'ধ্যানের দ্বারা যে ফল লাভ হয়, সঙ্গীতেও তাহাই হইয়া থাকে।' শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। কি শ্যামাসঙ্গীত, কি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, কি হরিসংকীর্তন সবই তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি নিজেও সুগায়ক ছিলেন এবং সঙ্গীত শ্রবণকালে সমাধিস্থ হইতেন।

মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন— চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ। সঙ্গীতে বা সংকীর্তনে গায়কের মন যদি তদ্‌গত হইয়া যায়, তবে বোধ করি তাহা অন্য কোনরকম যোগ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। সঙ্গীত যে ভক্তিযোগ, কর্মযোগ বা জ্ঞানযোগের ন্যায় একটি যোগ[১] এবং ইহার মাধ্যমে ভগবৎসান্নিধ্যলাভ যে বরং অপেক্ষাকৃত সহজতর, ইহা আমরা সাধারণত মনে রাখি না। যাঁহারা যোগশাস্ত্রে বর্ণিত বিভিন্ন রকম যোগ ব্যতীত মনের একাগ্রতা দ্বারা এবং নিষ্ঠাসহকারে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বা নামসংকীর্তন করেন, তাঁহারা যে উপাসনার একটি বিশিষ্ট পথ ধরিয়া সাধনক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

দেবাদিদেব নারায়ণ নারদকে বলিয়াছিলেন :

'নাহং দানৈর্ন তপসা নেজ্যয়া নাপি তীর্থতঃ।
সন্তুষ্যামি দ্বিজশ্রেষ্ঠ যথা নাম্নাং প্রকীর্তনাৎ॥'

—অদ্ভুত রামায়ণ, ৬।২৭

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, নামকীর্তন দ্বারা আমাকে যেরূপ সন্তুষ্ট করা যায়—দান, তপস্যা, যজ্ঞ ও তীর্থসেবা দ্বারা সেরূপ তুষ্ট করা যায় না।

'গানেন নামগুণয়োর্মম সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।
নিদর্শনং কৌশিকোঽত্র গানান্মল্লোকমাপ্নুয়াৎ॥'

—ঐ, ৬।২৮

আমার নাম গুণগান করিলে আমার সাযুজ্য লাভ করিবে। নিদর্শন হিসাবে দেখ কৌশিক গান দ্বারাই আমার নিকট বাসের অধিকার পাইয়াছিল।

মহর্ষি বাল্মীকি সীতার জন্মকারণ বিবরণ প্রসঙ্গে স্বীয় শিষ্য ভরদ্বাজকে কৌশিক সংক্রান্ত এই আখ্যানটি বলিয়াছিলেন :

'ত্রেতাযুগে কৌশিক নামে এক বাসুদেব-পরায়ণ ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি সর্বসময়ে

---

* অদ্ভুত রামায়ণে 'গানযোগ' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে।—সঃ

১ সঙ্গীতের মাধ্যমে ঈশ্বরের সহিত যে যোগ, তাহা ভক্তিযোগেরই অন্তর্গত—ভক্তিযোগ হইতে স্বতন্ত্র একটি যোগ নহে। শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥—এই নববিধা ভক্তির মধ্যে কীর্তন একটি অঙ্গ। আর, যে কোন একটি অঙ্গ লইয়া সাধন করিবার স্বাধীনতাও সাধকদের দেওয়া হইয়াছে। তুলনীয় : 'এক অঙ্গ সাধে কিম্বা সাধে বহু অঙ্গ / নিষ্ঠা হৈতে উপজায় প্রেমের তরঙ্গ / এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ / অম্বরীষাদি ভক্তের বহু অঙ্গসাধন।'—সঃ

মূর্চ্ছিত মূর্চ্ছনা যোগে শ্রুতিমণ্ডলানুসারে মধুর তানলয়-সহকারে নিরত শ্রীহরির নাম গান করিতেন। একদা তিনি নামগান করিতে করিতে বিষ্ণুস্থলীতে গমন করিলেন। তাঁহার অপূর্ব ভক্তিযুক্ত হরিসঙ্কীর্তন শ্রবণ করিয়া পদ্মাক্ষ নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার সেবার ভার লইলেন। অবসর পাইলেই তিনি ভক্তিযুক্ত চিত্তে কৌশিকের হরিগুণগান শ্রবণ করিতেন। কালক্রমে কৌশিকের ত্রৈবর্ণিক সাতজন শিষ্য হইল। মালব নামে একজন বাসুদেব-পরায়ণ বৈশ্য ও তৎপত্নী মালতী এবং কুশস্থলীদেশের পঞ্চাশ জন ব্রাহ্মণ হরিকীর্তন শ্রবণ ইচ্ছায় তথায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। প্রশংসার সহিত কৌশিকের গান সর্বত্র প্রচারিত হইলে কলিঙ্গ নামে এক রাজা সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া কৌশিককে স্বীয় সম্প্রদায়সহ তাঁহার গুণগান করিবার জন্য আহ্বান জানাইলেন। কিন্তু কৌশিক বিনয়ের সহিত রাজাকে নিবেদন করিলেন, শ্রীহরি ভিন্ন অন্যের নাম বা স্তব করিতে তাঁহার জিহ্বা ও বাণী অপারগ। তাঁহার একান্ত অনুরাগী ভক্তগণও জানাইলেন, হরিগুণগান ব্যতীত অন্য কাহারও গুণগান শ্রবণ করিতে তাঁহারা অনভ্যস্ত এবং অনিচ্ছুক। কুপিত রাজা তখন ভৃত্যগণকে উচ্চৈঃস্বরে আপন কীর্তি-গাথা গান করিতে আদেশ দিলেন, যাহাতে কৌশিক ও তাঁহাদের সম্প্রায়ভুক্ত বিষ্ণুভক্তেরা উহা শ্রবণ করিতে পারেন। ইহাতে কীর্তন-শ্রবণ-পিপাসু ব্রাহ্মণেরা কীলক দ্বারা কর্ণ বিদ্ধ করিয়া বধির হইলেন এবং কৌশিকাদি সঙ্গীত-পরায়ণ সাধুগণ রাজার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আপন আপন জিহ্বা কর্তন করিয়া ফেলিলেন। তখন রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সকলের সম্পত্তি হরণপূর্বক স্বদেশ হইতে নির্বাসিত করিয়া দিলেন। এই অবস্থায় তাঁহারা উত্তরাভিমুখে গমন করিতে শুরু করিলেন এবং যথাকালে কালধর্ম প্রাপ্ত হইলেন।

ভগবান কমলযোনি এই সমস্ত বিষ্ণুভক্তকে কালপ্রাপ্ত দেখিয়া যম প্রভৃতি সুরাধিপতিদিগকে কহিলেন:

কৌশিকাদিদ্বিজানস্থ বাসুদেবপরায়ণান্।
গানযোগেন যে নিত্যং পূজয়ন্তি জনার্দনম্॥
তানানয়ত ভদ্রং বো যদি দেবত্বমিচ্ছথ॥

—ঐ, ৫।২৯,৩০

অতঃপর সুরাধিপতিগণ তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করিয়া বিষ্ণুলোকে স্বয়ং নারায়ণ সমীপে হাজির করিলেন। প্রভু নারায়ণ তখন কৌশিকাদি বিষ্ণুভক্তদিগকে প্রীতিসহকারে সম্বোধন করিলেন এবং সঙ্গীততত্ত্বনিপুণ সাধ্যসাধনতৎপর কৌশিকের সংকীর্তনপ্রিয় ব্রাহ্মণগণকে দেবত্ব প্রদান করিলেন। কৌশিক স্বয়ং দিগন্ধ নামে গণাধিপতি হইয়া শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে নারায়ণের আবাসস্থলে বসবাস করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে বীণাগুণতত্ত্বজ্ঞ বাদ্যবিদ্যাবিশারদ গায়কগণ কৌশিকের তুষ্টি সম্পাদনার্থ মহামহোৎসব আরম্ভ করিলেন। বিষ্ণুভার্যা লক্ষ্মী ঐ মহোৎসবে গান শ্রবণার্থ অসংখ্য পরিচারক পরিচারিকাগণে পরিবৃত হইয়া তথায় আগমন করিলেন। মহোৎসবে যোগদানেচ্ছু ব্রহ্মাদি দেবগণের অতি নিবিড় জনতা দ্বারে অপেক্ষমান দর্শন করিয়া ভূষণ্ডী- ও পরিঘ-ধারিণী চেটীগণের নায়িকাগণ তাঁহাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতে বাধা দিলেন। সভায় গায়কোত্তম তুম্বুরু বহুমানপূর্বক আহূত হইয়া দেবদেবীগণের সমীপে আগমন করিলেন এবং কৌশিকের প্রীতিসাধনার্থ নারায়ণ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া উপবেশন পূর্বক নানা মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছিত করিয়া তান লয় মান সহকারে মধুর স্বরে গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সঙ্গীতশেষে নানারত্ন, বিবিধ দ্রব্য, উৎকৃষ্ট আভরণ, মাল্য ও বসন পুরস্কার পাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সঙ্গীত শ্রবণে বিফলমনোরথ হইয়াও ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং মুনিগণ

নারায়ণকে প্রণাম করিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে যথাস্থানে গমন করিলেন। কিন্তু তুম্বুরুর এবংবিধ ভাগ্যদর্শনে নারদ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ঈর্ষান্বিত হইলেন এবং লক্ষ্মীর দাসীগণ তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল বলিয়া সহসা লক্ষ্মীকে অভিসম্পাত করিলেন। অনন্তর দেবাদিদেব নারায়ণ নারদকে কহিলেন, 'হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, নাম-সংকীর্তন দ্বারা আমাকে যেরূপ সন্তুষ্ট করা যায়, দান, তপস্যা, যজ্ঞ ও তীর্থসেবাদ্বারা সেরূপ তুষ্ট করা যায় না। তুম্বুরু সঙ্গীত দ্বারা আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে, তাই সে আমার সান্নিধ্য লাভ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছে। আমার গুণগান করিলে আমার সাযুজ্য লাভ করিবে। মূর্চ্ছনাসমন্বিত নাম-সংকীর্তন আমার অতীব প্রিয়। তুমি মূর্চ্ছনা- ও তাল-সমন্বিত গানে তুম্বুরুসদৃশ হও। যদি গান শিখিতে ইচ্ছা থাকে মানস-সরোবরের উত্তরবর্তী পর্বতে গানবন্ধু নামে পরিচিত উলূকের সহিত দেখা কর।

(২)

ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ এই কথা শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং মানসের উত্তর-শৈলে গমন করিয়া দেখিলেন গানবন্ধু বহু গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর ও অপ্সরাগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাদিগকে গান শিক্ষা দিতেছেন। নারদকে দেখিয়া উলূক প্রণতিপূর্বক পূজা করিলেন ও তাঁহার আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। ধীমান নারদমুনি তখন বৈকুণ্ঠধামে তিনি কিভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছেন ও তুম্বুরু কিভাবে সমাদৃত হইয়াছেন সমুদয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন ও কহিলেন, 'আমি যখন দেখিলাম কৌশিক গানযোগে হরির তুষ্টি সাধন করিয়া অনায়াসে গাণপত্য লাভ করিল এবং তুম্বুরু সভামধ্যে হরিগুণগান কীর্তন করিয়া নারায়ণ ও লক্ষ্মীর স্নেহভাজন হইল তখন ভাবিলাম :

যদ্দত্তং যদ্ধুতঞ্চৈব যচ্চাপি শ্রুতমেব হি।
যদধীতঞ্চ গানস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥
বিষ্ণোর্মাহাত্ম্যযুক্তস্য গানযোগস্য বৈ ততঃ।
(ঐ, ৬।৪২-৪৩)।

—আমি যে তপস্যা করিয়াছি, যে দান করিয়াছি, যে হোম করিয়াছি, যে বেদাধ্যয়ন বা শাস্ত্রপাঠ করিয়াছি সমস্ত একত্রে বিষ্ণুমাহাত্ম্য-বিষয়ক গানযোগের ষোড়শ অংশের একাংশেরও সমান নহে।

অতঃপর নারায়ণের পরামর্শে তোমার নিকট গান শিক্ষা করিতে আসিয়াছি। এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণান্তর গানবন্ধু নারদকে কহিলেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠ আমি একটী ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন।

(৩)

পুরাকালে ভুবনেশ নামে এক অতি ধার্মিক রাজা ছিলেন। তিনি যাগযজ্ঞ দানধ্যানাদি করিয়া পৃথিবী পালন করিতেন। কিন্তু তিনি রাজ্য মধ্যে ঘোষণা করিলেন যে, গানযোগে কেহ কেশবের বা অন্য কাহারও আরাধনা করিতে পারিবে না। অপ্সরাগণ গায়িকাগণ প্রভৃতি সকলেই গানযোগে তাঁহারই অর্চনা করিবে। ঐ রাজার নগর-সন্নিকটে হরিমিত্র নামে এক বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন এবং তিনি তদ্গতচিত্তে অতীব ভক্তিভাবে তান মান ও লয় সহকারে হরিগুণগান করিতেন। অনন্তর রাজার আজ্ঞাক্রমে রাজপুরুষগণ ব্রাহ্মণের পূজাসামগ্রী সমস্ত দূর করিয়া তাঁহাকে রাজসমীপে হাজির করিলেন। ক্রুদ্ধ রাজা ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করিয়া ও তাঁহার সমস্ত ধনসম্পত্তি অপহরণ করিয়া রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিলেন। বহুকাল পরে ঐ রাজা দেহত্যাগ পূর্বক পরলোকে গমন করিয়া উলূকদেহ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াও কোথাও ভক্ষ্যদ্রব্য দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর

একদিন অতি দুঃখের সহিত যমরাজকে তাঁহার কষ্টের কথা নিবেদন করাতে ধর্মরাজ তাঁহাকে কহিলেন, 'তুমি অজ্ঞানতাবশতঃ বাসুদেব-পরায়ণ হরিমিত্রের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছিলে। সেই পাপে নিয়তই তুমি ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছ। হরিমিত্র সর্বদা হরি-সংকীর্তন করিত, তুমি তাহা নিবারণ করিয়াছিলে। তোমার যাহা কিছু পুণ্য সঞ্চিত হইয়াছিল সবই বিনষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে তুমি পর্বত-কোটরে গমন কর। ঐ দেহ নাশ পাইলে তুমি মন্বন্তর পর্যন্ত সেই স্থানে থাকিয়া ক্ষুধা পাইলেই তোমার সেই গলিত দেহ ভক্ষণ করিবে।' হে নারদ, আমিই ছিলাম সেই রাজা ভুবনেশ। এক্ষণে হরিমিত্রবিষয়ক দুষ্কর্মদোষে এই উলূক দেহ প্রাপ্ত হইয়াছি। মানসপর্বতের এক কোটরে বসবাসকালে ক্ষুধার্ত হইয়া ঐ দেহ ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে দৈবযোগে মহাযশা হরিমিত্র দেবতুল্য কলেবর ধারণ করিয়া বিষ্ণুদূত সমভিব্যাহারে এই পথে বিমানযোগে আগমন করেন। আমার সম্মুখে ভুবনেশের মৃতদেহ দেখিয়া এবং তাহা ভক্ষণ করিতে উদ্যত দেখিয়া আমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় আমি পূর্ব-বৃত্তান্ত সমস্ত তাঁহাকে নিবেদন করিলাম এবং কহিলাম, আমি পূর্বে আপনার প্রতি যে অপরাধ করিয়াছিলাম ইহা তাহারই পরিণাম। করুণস্বভাব হরিমিত্র এই কথা শুনিয়া আমাকে ক্ষমা করিলেন আর কহিলেন, 'আমার প্রসাদে আজ গানবিদ্যা লাভ কর। তুমি সেই গানযোগে হরিসংকীর্তন করিলেই তোমার জিহ্বার জড়তা দূর হইবে এবং তুমি দেবতা, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব, অপ্সরাদিগের গানাচার্য হইবে।' আমার গানাচার্য হইবার ইহাই ইতিহাস। তখন ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ উলূকের নিকট সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

নারদের সঙ্গীত শিক্ষার পশ্চাতে আরও অনেক কাহিনী আছে, তবে সে সব এই স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে বর্ণনা করা সম্ভব নহে। সঙ্গীতবিদ্যা পূর্ণায়ত্ত হইবার পর নারদ বেশ বুঝিয়াছিলেন, গানযোগই ভগবানকে আরাধনা করিবার শ্রেষ্ঠ পথ। শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্যে আছে, 'ভক্তির' সহিত কথোপকথনের সময় নারদ বলিয়াছিলেন —

'যৎ ফলং নাস্তি তপসা ন যোগেন সমাধিনা।
তৎ ফলং লভতে সম্যক্ কলৌ কেশবকীর্তনাৎ॥'

অর্থাৎ যে ফল তপস্যা যোগ ও সমাধি দ্বারা লাভ করা যায় না, এই কলিযুগে সেই ফল কেবল শ্রীহরির নাম-কীর্তনে উত্তমরূপে লাভ করা যায়।

এই পৌরাণিক কাহিনীটি হইতে দেখা যায় যাঁহারা একান্ত ভক্তি এবং নিষ্ঠার সহিত সঙ্গীত বা কীর্তন করিয়া থাকেন তাঁহারা যে একটি যোগ অবলম্বন করিয়া ভগবানের আরাধনাই করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা ভক্তি ও আগ্রহ সহকারে সেই সঙ্গীত ও কীর্তন শ্রবণ করেন, তাঁহারাও যে ভগবদ্ আরাধনার ফল লাভ করেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।*

---

* অদ্ভুত রামায়ণ হইতে সঙ্কলিত।—সঃ

সমালোচনা

Srimad Bhagavad-Gita : Translated by Swami Vireswarananda. প্রকাশক : শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাদ্রাজ। পৃঃ ৩৬৯, পকেট সাইজ, মূল্য ২.৫০।

ধর্মের নামে পৃথিবীতে যত রক্তপাত হয়েছে আর কোন চিন্তার নামে বোধ হয় তত রক্তপাত হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় বলতে গেলে এর একমাত্র কারণ 'মতুয়ার বুদ্ধি'। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই 'মতুয়ার বুদ্ধির' অসারতা প্রমাণ করে প্রতিষ্ঠা করেছেন এক অপূর্ব সমন্বয়ের পথ, যেখানে ভক্ত ও কর্মী, জ্ঞানী ও যোগী সকলেই শুনতে পান আশার বাণী। যে চিন্তায় ভক্ত ও কর্মীর, জ্ঞানী ও যোগীর ঘটেছে অপূর্ব সমন্বয় সে চিন্তা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও মিলনের সেতু রচনা করতে সক্ষম, একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন জগতের উদারমনা সুধীবৃন্দ। তাই দেখতে পাই প্রতি বছর পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় গীতার নূতন নূতন অনুবাদ ও ভাষ্যাদি প্রকাশিত হতে। গীতা আজ আর শুধু হিন্দুরই জীবনবেদ নয়, গীতা তাঁদের সকলেরই জীবনবেদ যাঁরা ধর্মকে গোঁড়ামির উর্ধ্বে স্থান দিতে পেরেছেন।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজের শ্রীধর স্বামীর টীকা-সম্বলিত গীতার ইংরেজী অনুবাদ সুধী-সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। কিন্তু সময়াভাবে সকলের পক্ষে টীকা-সম্বলিত বড় অনুবাদগ্রন্থটি পড়া সম্ভব নয়। আবার অনেকে চান শুধুমাত্র গীতার মূল চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হতে। যাঁরা অল্প আয়াসে গীতার মূল চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হতে চান, তাঁরা স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর পূর্বোক্ত গীতা থেকে সংকলিত গীতার মূল শ্লোক ও অনুবাদের এই ছোট্ট বইটি পড়ে খুবই উপকৃত হবেন। অনুবাদ যত সহজ ও প্রাঞ্জল করা সম্ভব, স্বামীজী তা করেছেন। যাঁরা প্রতিদিন গীতা আবৃত্তি করেন, তাঁদের কাছে বইটি খুবই আদরণীয় হবে। বোধ হয়, তাঁদের দিকেই লক্ষ্য রেখে প্রকাশক মূল শ্লোকগুলি বড় হরফে ছাপিয়েছেন। গীতাটির ছাপা ও বাঁধাই খুবই সুন্দর হয়েছে। এই ছোট্ট সানুবাদ গীতাটির জন্য প্রকাশক গীতানুরাগীদের ধন্যবাদ-ভাজন হয়েছেন।

স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ

বম্বে রামকৃষ্ণ মিশন ও আশ্রমের সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা। বম্বে রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ আশ্রমের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে এই সুন্দর স্মারক-গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। সাধারণতঃ এ-জাতীয় গ্রন্থ বিজ্ঞাপন-বহুল হয়ে থাকে এবং পড়ার মত প্রবন্ধাদি যা থাকে তাও বিজ্ঞাপনের ভীড়ে হারিয়ে যায়। কিন্তু এ গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, বিজ্ঞাপনের প্রাচুর্য থাকলেও এখানে বিজ্ঞাপন প্রাধান্য পায়নি। ফলে প্রতিটি পৃষ্ঠায় পাঠক পাবেন পড়ার মত প্রচুর সামগ্রী যা অতি যত্নে সংগ্রহ করা হয়েছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী থেকে। স্বামী গৌতমানন্দের লেখনীতে বম্বে আশ্রমের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের একটি সুন্দর বর্ণনা ফুটে উঠেছে। এ ছাড়া বইটিতে রয়েছে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রচুর ছবি।

আর্ট পেপারে ছাপা এই সুন্দর স্মারক-গ্রন্থটি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা প্রচারে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ

ফাল্গুনী। প্রকাশক: স্বামী মুমুক্ষানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর। ত্রয়োদশ সংখ্যা, ১৩৮০।

'ফাল্গুনী' নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা। ছাত্র ও শিক্ষকদের লেখায় সমৃদ্ধ এ পত্রিকাটিতে রয়েছে বাংলা ইংরেজী, অসমীয়া, হিন্দী ও সংস্কৃত বিভাগ। ছাত্রদের কয়েকটি লেখায় মধ্যে বেশ মুনশীয়ানার পরিচয় রয়েছে। নরেন্দ্রপুরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গ্রাম্য দেবতা ও পীরদের নিয়ে গবেষণামূলক লেখাগুলি লেখকদের গবেষণাধর্মী মনের পরিচয় দেয়। পত্রিকাটির ছাপা সুন্দর হয়েছে। "শ্রীশ্রীঠাকুরের কথামৃত" বলে প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর যে সঙ্কলনটি ছাপা হয়েছে তা 'কথামৃতের' ভাষায় দিলেই বোধ হয় ভাল হত।

স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জনক-জননী: শ্রীনিত্যরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক: শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, ৪এ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা ৯। (১৯৭৪); পৃ: ২০, মূল্য ১'৫০।

লেখকের ভাষা আছে। শ্রদ্ধার সহিত যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জনক শ্রীক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ও জননী চন্দ্রমণি দেবীর পূত চরিত্রদ্বয় অঙ্কনে প্রয়াসী হয়েছেন। বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ্ গ্রেগর জোহান্ মেণ্ডেলের মতে, 'মানবের ক্ষেত্রে, সাধারণতঃ বংশানুক্রমিক ধারাই গ্রহণযোগ্য' এই মতানুসারে মহান পিতৃপুরুষদের সংগুণাবলীর ধারাই যে, যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনেও প্রতিফলিত হয়েছিল, তা লেখকের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জনক-জননী' গ্রন্থে সুন্দরভাবে পরিবেশন করা হয়েছে।

পরমপুরুষের জনক-জননীর জীবনচর্যায় যে অনাসক্তি, অপূর্ব সংযম ও ত্যাগের নিদর্শন পাওয়া যায়, তা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও ফুটে উঠেছিল এবং এই পুস্তক পাঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনেরও বিভিন্ন দিক পাঠকদের কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

প্রচ্ছদপটে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধিস্থ মূর্তি সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থের প্রারম্ভে বর্তমান কামারপুকুরের আলোকচিত্র থাকায় পুস্তকের আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাঁধাই ও ছাপা মন্দ নয়। পুস্তকের প্রথমে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও শেষে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সমালোচনা রয়েছে।

সব কিছু নিয়ে এ গ্রন্থটির প্রকাশনায় যে শ্রদ্ধা ও যত্নের নিদর্শন মেলে, সেজন্য লেখক ও প্রকাশক আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদার্হ।

শ্রীবিমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

সেবাকার্য

খরা- ও খাদ্যাভাব-ত্রাণ

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে খরা ও খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ায় রাজকোট (গুজরাত) ও মনসাদ্বীপ (পশ্চিমবঙ্গ) কেন্দ্রদ্বয় ত্রাণকার্য আরম্ভ করে। রাজকোট কেন্দ্র ৯,৯৪৫ কেজি বজরা এবং ১০৫ কেজি গম বিতরণ করে। মনসাদ্বীপ কেন্দ্র ৯৮১'৭৫ কেজি আটা বিতরণ করে। বাঁকুড়া কেন্দ্র এইরূপ ত্রাণকার্য সেপ্টেম্বর মাসে আরম্ভ করে এবং সেইখানে প্রতিদিন ৫০০ জনকে গম দেওয়া হয়।

বন্যাত্রাণ

মেদিনীপুর জেলার কাঁথিতে, কুচবিহার জেলার বলভূতে, আসামের ধুবড়িতে, বিহারের কাটিহার জেলার মণিহারী ও রায়ঘাটে মিশনের কেন্দ্রগুলি বন্যাত্রাণকার্য আরম্ভ করে। গত অগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ঐ সকল অঞ্চলে বিতরিত দ্রব্যাদির পরিমাণ একসঙ্গে দেওয়া হইল:

কাঁথি: গম ১৮৪'১২ কুইন্টাল, ডাল ২৬ কেজি, ও গামছা ১২৭৪।

বলভূত: চাল ৬,৪০৭'৫ কেজি, চিড়া ৯৫৮'৭৫ কেজি, গুড় ৭৬'৭ কেজি, শিশুখাদ্য ৭৫ কেজি এবং লবণ ১৬০ কেজি।

ধুবড়ি: চাল ৮'৫ কুইন্টাল, আটা ১৬২৩ কেজি, শিশুখাদ্য ৫৯৩ কেজি, বার্লি ৬৫'৫ কেজি, চিনি ১৩৭'৫ কেজি, আমূল ২০ কেজি, ধুতি ১,১৪৮, শাড়ী ১,৩২৮, লুঙ্গি ১২০, পুরাতন বস্ত্রাদি ৪২১, বাসনপত্র ১২৪০ এবং দিয়াশলাই ২৫১০ বাক্স। ৪৬,১৩৭ জনকে ঔষধ দেওয়া হয়।

মণিহারী: ছাতু ১,৬৪৬.৭৫ কেজি, ছাতু ৪৮০ কেজি, চাল ৫,২৭৭.২৫ কেজি, আটা ৪৪ কেজি, লবণ ৫৯ কেজি, বিস্কুট ১৯৬টি, ধুতি ১৫৩, শাড়ী ৭৭, পুরাতন বস্ত্রাদি ৯৪ এবং লংক্লথ ৮৬৪ মিটার। রায়ঘাট কেন্দ্রে ২১২ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

আরো ও দুইটি নূতন কেন্দ্রের মাধ্যমে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি বিতরিত হয়। করদহ (পশ্চিম দিনাজপুর): চাল ৬,৪০০ কেজি, ধুতি ৩৭৬, শাড়ী ৩৭৬ টি।

লাহেরিসরাই (দ্বারভাঙ্গা): বার্লি ৬৮১০ কেজি ও ঔষধ। এখানে ৬,৫৮৮ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়।

এতদ্ব্যতীত সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে নিম্নলিখিত লঙ্গরখানাগুলি খোলা হইয়াছে: সরিষা আশ্রম কর্তৃক ডায়মণ্ডহারবারে; জলপাইগুড়ি আশ্রম কর্তৃক পদ্মাটি, ধরমপুর, মাধবডাঙ্গা এবং বার্নেসে, রহড়া আশ্রম কর্তৃক কুচবিহারের পুন্ডিমারি, দেওয়ানহাট প্রভৃতি ৬টি স্থানে এবং পুরুলিয়া আশ্রম কর্তৃক পুরুলিয়া অঞ্চলের ৪টি স্থানে। উক্ত কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সরিষা, জলপাইগুড়ি, রহড়া ও পুরুলিয়া আশ্রম যথাক্রমে ২,০০০, ১,০০০, ১০,০০০ ও ৪,০০০ জনকে প্রতিদিন খিচুড়ি পরিবেশন করিয়াছে। ইহা ছাড়া, জয়রামবাটী আশ্রম ঐ অঞ্চলে ৪টি ও কাঁথি আশ্রম ১টি লঙ্গরখানা এবং মালদহ আশ্রম একটি সস্তায় খাদ্য-বিক্রয়-কেন্দ্র পরিচালনা করে।

সেপ্টেম্বর মাস হইতে রামহরিপুর আশ্রম রামহরিপুরে শ্রম-বিনিময়ে ত্রাণকার্য আরম্ভ করিয়াছে।

বাংলাদেশে কৃত সেবাকার্যের জুলাই, অগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের বিবরণী পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

উৎসব

আলমোড়া রামকৃষ্ণ কুটিরে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে গত ১০ই অগস্ট ভাগবতাচার্য শ্রীদুর্গাপ্রসাদজী ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্বামী মুখ্যানন্দ ও শ্রীউমেশচন্দ্র পাণ্ডে ভাষণ দেন। শ্রীগঙ্গাসিংজী শ্যামনাম সঙ্কীর্তন ও শ্রীধর্মানন্দ পাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করেন। ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গত করেন শ্রীলীলাধর পাণ্ডে। সভান্তে সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়। রাত্রিতে শ্রীরাম-কৃষ্ণ মন্দিরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা হয়।

কার্যবিবরণী

সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের ১৯৭২ সালের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমটি একটি ছাত্রাবাস ও তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করে। নৈশ ক্লাস, ত্রাণমূলক সেবাকার্য এবং ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচারও এই কেন্দ্রের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য বর্ষে ছাত্রাবাসে ৪৭ জন ছাত্র ছিল। বিবেকানন্দ তামিল স্কুল, সারদাদেবী তামিল স্কুল ও কলাইমঙ্গল স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৮০, ৯১ ও ৮৬। এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ স্থানীয় নানাবিধ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয়াদি স্থান অধিকার করে। সরস্বতী পূজা জাতীয় দিবস ও ও বাল-দিবস যথারীতি পালিত হয়। ছয়টি নৈশ ক্লাসে মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ১১১।

ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচার উদ্দেশ্যে নিম্নোদ্ধৃত কার্যসূচী পালিত হয়: সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা; বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা; ধর্মীয় শিবির পরিচালনা; হিন্দুধর্ম অধ্যয়নে উৎসাহী, ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক সমস্যা সমাধানে ইচ্ছুক ও সাধন প্রণালী জানিতে আগ্রহান্বিত ব্যক্তিগণের সঙ্গে আশ্রম-প্রধানের সাক্ষাৎকার; সংস্কৃত শিক্ষার প্রচার ব্যবস্থা; মিশনের প্রকাশিত ধর্মীয় পুস্তকাবলী বিক্রয় ও আন্তর্জাতিক পুস্তক-প্রদর্শনীতে প্রদর্শন।

ইহা ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উৎসব, শ্রীশ্রীদুর্গা-পূজা, শিবরাত্রি, রামনবমী, কৃষ্ণজয়ন্তী প্রভৃতি এবং যীশু ও মোহম্মদের আবির্ভাব উৎসবও সুষ্ঠু-ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আশ্রমের একটি পুস্তকাগার ও পাঠাগার আছে। পুস্তক সংখ্যা ৫,২৩৮। ১২৭০ জন পাঠাগারে পড়াশুনা করিয়াছেন। পাঠাগারে ২৪টি সাময়িক পত্র-পত্রিকা ও ৬টি দৈনিক পত্রিকা রাখা হয়। বালক-বালিকাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র পাঠাগার আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ-শতবর্ষ জন্মজয়ন্তীর স্মৃতি-হিসাবে 'স্বামী বিবেকানন্দ-শতবর্ষ স্মারক' ভবনটি ১৯৬৯ সালে নির্মিত হয়। উক্ত ভবনে ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৭২ সিঙ্গাপুর জাতীয় পাঠাগারের ডিরেক্টর একটি পাঠগৃহ বিভাগের উদ্বোধন করেন।

উক্ত শতবর্ষস্মারকের অন্যতম কর্মসূচী একটি চিকিৎসালয় স্থাপন করা। তাহার জন্য এবং অন্যান্য কর্মসূচীর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের কাছে সাহায্যের আবেদন জানাইয়াছেন।

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত আমরা দুইজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগের সংবাদ জানাইতেছি:

স্বামী জয়ানন্দ গত ১লা সেপ্টেম্বর রাত্রি ১১'২০ মিনিটে কলিকাতায় সেবাপ্রতিষ্ঠানে মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। কিছুদিন পূর্বে নরেন্দ্রপুর আশ্রমে সাংঘাতিক হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহাকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। শেষ কয়দিন ধরিয়া তিনি খুবই কষ্ট পান, কিন্তু হাসিমুখে রোগযন্ত্রণা সহ্য করেন। হৃদ্- ও শ্বাস-যন্ত্রের বিকলতাহেতু তাঁহার দেহান্ত হয়। ১৯৫৬ সালে তিনি জামসেদপুর কেন্দ্রে

যোগদান করেন। শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের নিকট তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন ও ১৯৬৬ সালে বর্তমান প্রেসিডেন্ট মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা প্রাপ্ত হন। জামসেদপুর, কলিকাতা অদ্বৈত আশ্রম, কানপুর, সারদাপীঠ, পুরুলিয়া ও নরেন্দ্রপুর প্রভৃতি সংঘের বিভিন্ন কেন্দ্রে তিনি কাজ করেন। তাঁহার মধুর স্বভাবের জন্য তিনি সকলেরই প্রীতিভাজন ছিলেন।

স্বামী রাঘবেশ্বরানন্দ গত ২৮শে সেপ্টেম্বর বেলা ১'৪০ মিনিটে ৭৮ বৎসর বয়সে কলিকাতায় সেবাপ্রতিষ্ঠানে গলদেশের কর্কট-রোগে দেহত্যাগ করেন। শেষ কয়েকমাস তিনি উক্ত রোগে ভুগিতেছিলেন।

১৯১৯ সালে তিনি ঢাকা কেন্দ্রে যোগদান করেন ও শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট মন্ত্র দীক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১৯২৪ সালে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট তাঁহার সন্ন্যাস-দীক্ষা হয়। কিছুকাল তিনি ঢাকা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ছিলেন। বেলুড় মঠ, রেঙ্গুন সেবাশ্রম, ভুবনেশ্বর এবং বোম্বাই কেন্দ্রেও তিনি কাজ করেন। বিভিন্ন স্থানে সংঘ কর্তৃক পরিচালিত বিবিধ ত্রাণকার্যের কর্মী হিসাবেও তিনি সংঘ সেবা করেন। শেষ কয়েক বৎসর তিনি বেলুড় মঠে অবসর-জীবন যাপন করিতেছিলেন। তাঁহার সরলতা ও আমোদপূর্ণ স্বভাবের জন্য তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন।

ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

বিবিধ সংবাদ

কার্যবিবরণী

বাগবাজার রামকৃষ্ণ সারদা মিশন ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় ও সারদামন্দিরের কার্যবিবরণী (১৯৭২-৭৩) প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগে ছাত্রীসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৯৫ ও ২২৭ এবং মাধ্যমিক বিভাগে ৫৭৪ ও ৫৫৯।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল: ১৯৭১-এ পরীক্ষার্থিনী ৭০, পাশ ৭০; ১৯৭২-এ পরীক্ষার্থিনী ৫২, পাশ ৫০। তন্মধ্যে ১৯৭১ সালের পরীক্ষায় মানবিক শাখায় একজন ৫ম স্থান এবং ১৯৭২-এর পরীক্ষায় গৃহস্থালি-বিজ্ঞানে একজন ৩য় স্থান অধিকার করে।

পুস্তকাগারে মোট পুস্তক সংখ্যা ৮,৭১২। পাঠাগারে ২৩টি সাময়িকী ও ৩টি দৈনিক পত্র-পত্রিকা রাখা হয়। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে ছাত্রীগণ ১২,২১৪ ও শিক্ষিকাগণ ১,৪৮৪ খানি পুস্তক পড়িবার জন্য লইয়াছিলেন।

সর্বাঙ্গীণ বিকাশের মাধ্যম হিসাবে নানা বিষয়ে প্রতিযোগিতা, জাতীয় মহামানবদের জীবনী আলোচনা, পত্রিকা প্রকাশন প্রভৃতি কাজে ছাত্রীগণ অংশগ্রহণ করে।

শিল্প বিভাগে: আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে ছাত্রী সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭৫ ও ৮৮; লেডী ব্রেবোর্ন সীবন-কার্যের ডিপ্লোমা পরীক্ষার আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য পরীক্ষার ফল: ১৯৭১-৭২-এ উক্ত পরীক্ষাত্রয়ে পরীক্ষার্থিনী ৮০, পাশ ৩১ এবং ১৯৭২-৭৩-এ পরীক্ষার্থিনী ৪১, পাশ ২৮। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে বিভিন্ন পর্যায়ের পরীক্ষায় প্রথম হইতে দশজনের মধ্যে বিভিন্ন স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কারাদি পাইয়াছেন। প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার পূর্বে আয়োজিত শিল্প, সীবনাদি কার্যের প্রদর্শনীতে ছাত্রীদের শিল্পকার্য প্রদর্শিত হয় ও তাহাদের তৈয়ারী দ্রব্যাদি বিক্রয় করা হইয়া থাকে।

আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে যথাক্রমে ২,৩০০ টাকার ও ৩,১৫০ টাকার দ্রব্যাদি বিক্রয় করা হয়। দরিদ্রা

পুরস্ত্রীদের আত্মনির্ভরশীল হইতে সাহায্য করিবার জন্য ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ভগিনী নিবেদিতা এই বিভাগটি আরম্ভ করেন। বিভাগটি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সাহায্য পাইয়া থাকে।

সারদামন্দির: এইটি নিবেদিতা বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানরতা সন্ন্যাসিনীদের ও পাঠনিরতা ছাত্রীদের আবাস। আবাসিক ছাত্রীগণ মন্দিরে পূজা-সেবাদিতে ও পাঠ-আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে ও যাবতীয় গৃহস্থালির কার্যাদি স্বয়ং সম্পাদন করে। বর্তমানে ৪০ জন ছাত্রী আবাসে থাকে, তন্মধ্যে ৫ জনের বিনা খরচায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে ধর্মোৎসব, সর্বধর্মের অবতারদের জন্মতিথি এবং জাতীয় দিবস-আদি যোগ্য সমারোহে পালিত হইয়াছে।

উৎসব

তেজপুর: রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গত ৪ঠা জুলাই গুরুপূর্ণিমা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সাড়ম্বরে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

যাদবপুর: পশ্চিমরাজাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে গত ২১শে মে শ্রীশ্রীফলহারিণী কালিকা পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

যাদবপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র কর্তৃক গত ২৪শে ও ২৫শে অগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন বৈকালে ধর্মসভা, আলোকচিত্রে রামায়ণ-কাহিনী প্রদর্শন, শ্রীমা সারদাদেবীর গীতি-আলেখ্য পরিবেশন ও রাত্রে শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা হয়। দ্বিতীয় দিন মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, স্বামী শ্রুত্যানন্দ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ পূজা, কালীকীর্তন ও প্রসাদ বিতরণ হয়। বৈকালে ধর্মসভার সভাপতি স্বামী চিৎসুখানন্দ, প্রধান অতিথি স্বামী মুমুক্ষানন্দ, প্রধান বক্তা স্বামী জ্যোতীরূপানন্দ ও অন্যান্য বক্তাগণ ভাষণ দেন। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ, শ্রীশ্রীমায়ের বাণী পাঠ, আরতি স্তব এবং কালীকীর্তনসহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণগীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। উভয় দিবসই অগণিত ভক্তের সমাবেশে উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হয়।

দ্বারোদ্‌ঘাটন

গত ৭ই জুলাই দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীশ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (কসবা) কর্তৃক একটি হোমিও-প্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ এই উপলক্ষে একটি আশীর্বাদী বাণী প্রেরণ করেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সভাপতি স্বামী নিবৃত্ত্যানন্দ উহা পাঠ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ভোগারতি ও সংঘের ভক্তগণ কর্তৃক ভজন গান ছিল এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ। শতাধিক ভক্ত এবং স্থানীয় গণ্য মান্য ব্যক্তিগণ এই উৎসবে যোগদান করেন। সভাপতি মহারাজ চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'রূপ স্বামীজীর প্রচারিত উপদেশের উপর ভাষণ দেন। উপস্থিত সকলকে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পরলোকে মানবকৃষ্ণ মিত্র

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত তেজচন্দ্র মিত্রের একমাত্র সন্তান মানবকৃষ্ণ মিত্র গত ২৮শে অগস্ট ১৯৭৪, ৮৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার ৩৪ নং বোসপাড়া লেনে পিত্রালয়ে মানবকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন সন্ন্যাসি-সন্তানের, বিশেষ করিয়া স্বামী সারদানন্দজীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শলাভের সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল; 'বলরাম মন্দির' ও উদ্বোধনে তিনি বৃদ্ধকাল পর্যন্ত প্রায় নিত্য যাতায়াত করিতেন। অমায়িক, মধুরভাষী, শান্তস্বভাব ছিলেন তিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণচরণে তাঁহার বিদেহী আত্মার সদ্গতি প্রার্থনা করি।

দিব্য বাণী

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্বসৃষ্টং হি কর্মভির্বর্ণতাং গতম্॥
ন যোনি র্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥
সর্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি॥

—মহাভারত, ১২।১৮৮।১০, ১৩।১৪৩।৪৯-৫০

ক্ষত্রিয়াদি বর্ণভেদ ছিল না জগতে—
ব্রহ্মসৃষ্ট ছিল শুধু ব্রাহ্মণ ইহাতে।
ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিহেতু ব্রাহ্মণজাতিতে
ক্রমে হ'ল বর্ণভেদ কালের গতিতে।
উচ্চবংশে জন্ম কিংবা বংশজ সন্তান,
শাস্ত্রীয় সংস্কার কিংবা বহুশাস্ত্রজ্ঞান—
এ-সকল দ্বিজত্বের কারণ না হয়;
বৃত্তিই কারণ তার— নাহিক সংশয়।
সকল ব্রাহ্মণ হন কর্মেতে স্বীকৃত;
শূদ্রও ব্রাহ্মণ, যদি দ্বিজবৃত্তে স্থিত।

কথাপ্রসঙ্গে

চাতুর্বর্ণ্য ও স্বামী বিবেকানন্দ

'পরতত্ত্বে সদা লীনো
রামকৃষ্ণ-সমাজ্ঞয়া।
যো ধর্মস্থাপনায়াতো
বীরেশং তং নমাম্যহম্।'

—নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বে যিনি সতত ধ্যানলীন থাকিয়াও শ্রীরামকৃষ্ণের সম্যক্ আদেশে ধর্ম-স্থাপনের জন্ম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই বীরেশ্বরকে প্রণাম করি। স্বামী সারদানন্দ রচিত স্বামী বিবেকানন্দের এই প্রণাম-মন্ত্রে বলা হইয়াছে, স্বামীজী ধর্মস্থাপনের উদ্দেশ্যে এই মর্ত্যলোকে আগমন করিয়াছিলেন। ধর্মস্থাপনের অর্থ কী? এক কথায় বলিতে গেলে— ব্রাহ্মণত্বে উন্নয়ন। ইহার বিশদ আলোচনা পরে করা হইবে। আপাততঃ আমরা হিন্দুর বর্ণবিভাগ-সম্পর্কিত স্বামীজীর কালানুক্রমিক জীবনবৃত্তান্ত অনুসরণ করিতেছি।

'অখণ্ডের ঘরে' ধ্যানমগ্ন সপ্তর্ষির অন্যতম প্রধান ঋষি ব্রহ্মণ্য-সংরক্ষণের জন্ম বিশ্বনাথ দত্তের আত্মজ-রূপে দেহ-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। বালকবেশী সেই ঋষির বাললীলার মাধ্যমে জাত-যায়-কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখার ঘটনা সকলেরই সুবিদিত। এটর্নি বিশ্বনাথ দত্তের বৈঠকখানায় ভিন্ন ভিন্ন জাতির মক্কেলের জন্ম সারি সারি হুঁকা থাকিত। পুত্রের মাথায় কিন্তু জাতিভেদ জিনিসটা কিছুতেই ঢুকিত না। 'একজন আর একজনের সহিত খাইবে না কেন? ভিন্ন জাতি হইলেই বা দোষ কি? যদি জাতিভেদ না মানা যায় তো কি হয়? আকাশটা কি মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়ে, না মানুষ মরিয়া যায়?'— এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে একদিন নরেন্দ্রনাথ পিতার অনুপস্থিতির সুযোগে দ্রুতগতি সকল মক্কেলের হুঁকা টানিলেন এবং সবিস্ময়ে দেখিলেন, তিনি জীবিতই আছেন, পৃথিবীটা ভাঙ্গিয়া তাঁহার ঘাড়ে পড়ে নাই - সব জিনিস পূর্বেও যেমন ছিল, তখনও তেমনি বর্তমান।

এক মুসলমান মক্কেল নরেন্দ্রনাথকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তাঁহার হুঁকাটি নরেন্দ্রনাথ একটু বেশী আগ্রহের সহিতই টানিয়াছিলেন। তাহার এক কারণ, উহা হইতে খোশবায় নির্গত হইতেছিল; অন্য কারণ, সেটি যে প্রিয় 'চাচা'র হুঁকা!—যে চাচা তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে মিঠাই খাইতে দেন এবং তিনিও নির্দ্বিধায় সেগুলি উদরস্থ করেন, যদিও হিন্দু মক্কেলগণ উহা দেখিয়া ভ্রষ্টাচার বালকটির ভবিষ্যৎ দুর্গতির কথা স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিতেন।

তাহার পর স্কুল-কলেজের ছাত্র নরেন্দ্রনাথের জীবনে এই জাতি-বিভাগ কি ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। জীবনীতে আর কয়টি ঘটনাই বা পাওয়া যায়— বিশেষতঃ বাল্য ও কৈশোরের? তবে তিনি নিজে বলিয়াছেন যে, বাল্যকালে তিনি ডোমপাড়ায় যাইয়া তাহাদের কল্যাণসাধন করিতেন। হয়তো এইরূপ অতিগুরুত্বপূর্ণ অনেক ঘটনাই আছে, যাহা আমাদের অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে— কিন্তু ইহা কে নির্ণয় করিবে! তবে এইরূপ অনুমান করা অসমীচীন হইবে না যে, ইতিহাস-সচেতন নরেন্দ্রনাথ— বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন নরেন্দ্রনাথ ছাত্রাবস্থাতেও এই বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ প্রবেশিকা পরীক্ষার পূর্ব হইতেই যখন ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার

সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম দর্শনলাভ করেন এবং প্রায় পাঁচ বৎসর তাঁহার পূতসঙ্গলাভে ধন্য হন। অদ্ভুত পর্যবেক্ষণশক্তি-সম্পন্ন নরেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল এই দেবমানবের সর্ববিধ আচরণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে, হিন্দুর চাতুর্বর্ণ্যের মর্মকথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদমূলেই তিনি সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেতর বর্ণের হস্তপক্ক অন্ন গ্রহণ না করিলেও কায়স্থবংশজ তাঁহার পাক করা চচ্চুইভাতির অন্নব্যঞ্জনাদি সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছিলেন, দেখিয়াছিলেন, এমন কি তাঁহার উচ্ছিষ্ট তামাকের কল্কে হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিঃসঙ্কোচে তামাক সেবন করিয়াছিলেন— বারংবার প্রতিবাদেও নিরস্ত হন নাই; দেখিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমাধিস্থ হইলে কায়স্থ-সন্তান বাবুরাম তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতেন, যাহাতে তিনি পড়িয়া না যান—যে-কার্য পূর্বে হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ই করিতেন; দেখিয়াছিলেন, তিলক-কণ্ঠিধারী ব্যক্তি কর্তৃক আনীত স্বচ্ছ জল শ্রীরামকৃষ্ণদেব পান করিতে পারেন নাই, অথচ অপর এক ব্যক্তি সেই জল ফেলিয়া দিয়া পুনরায় জল আনিলে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অতি নিকটেই বসিয়া সব দেখিতেছিলেন এবং অনুমান করিয়াছিলেন যে, ঐ জল স্পর্শদোষদুষ্ট— নিমিত্তদোষদুষ্ট নহে। ঐ অনুমান যে সত্য, তাহা তিনি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়া তবেই নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ দেখিয়াছিলেন, মাড়োয়ারী ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য উপহার দিলে, তিনি স্বয়ং উহা গ্রহণ করিতেন না বা অন্যান্য ভক্তদেরও দিতেন না, বলিতেন— 'যা, নরেন্দ্রকে ঐ সকল দিয়ে আয়, সে ঐ সকল খাইলেও তাহার কোন হানি হইবে না', দেখিয়াছিলেন, তিনি হোটেলে খাইয়া আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জানাইলে, তিনি অসন্তুষ্ট হইতেন না— বলিতেন, 'তুই অখাদ্য খাইয়াছিস তাহাতে আমার কিছুই মনে হইতেছে না কিন্তু (অন্য সকলকে দেখাইয়া) ইহাদিগের কেহ যদি আসিয়া ঐ কথা বলিত, তাহা হইলে তাহাকে স্পর্শ পর্যন্ত করিতে পারিতাম না।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন, 'ভাবে দেখলাম —অধরের বাড়ি, বলরামের বাড়ি, সুরেন্দ্রের বাড়ি, এ-সব আমার আড্ডা।' ইহারা কেহই জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন না। অধরলাল সেন ছিলেন সুবর্ণবণিক। প্রবীণ ভক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, যুবক ভক্ত শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে অধর সেনের বাটীতে দর্শন করিতে আসিলে আহারের সময়ে সরিয়া পড়িতেন বা আহার করিতে ইতস্ততঃ করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজেই একদিন কেদারনাথ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া আহার করিতে বসেন। আহারান্তে কেদারনাথ বলেন 'মাপ করুন, যা ইতস্ততঃ করেছিলাম।' শ্রীম লিখিয়াছেন —'শরৎ ও সান্ন্যাল, এঁরা ব্রাহ্মণ, অধর সুবর্ণবণিক। পাছে গৃহস্বামী খাইতে ডাকেন, তাই তাড়াতাড়ি পলাইয়া গেলেন। তাঁহারা নূতন আসিতেছেন, এখনও জানেন না, ঠাকুর অধরকে কত ভালবাসেন। ঠাকুর বলেন, 'ভক্ত একটি পৃথক্ জাতি। সকলেই এক জাতীয়।'

সুরেন্দ্রের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বলিয়াছিলেন, 'জাতিভেদ? কেবল এক উপায়ে জাতিভেদ উঠতে পারে। সেটি ভক্তি। ভক্তের জাতি নাই। অস্পৃশ্য শুদ্ধ হয়— চণ্ডাল ভক্তি হলে আর চণ্ডাল থাকে না। চৈতন্যদেব আচণ্ডালে কোল দিয়েছিলেন।'

কেশবচন্দ্র সেনকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন,

"ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই - কি ! আমি তাঁর নাম করেছি, আমার এখনও পাপ থাকবে ! আমার আবার বন্ধন কি, পাপ কি ? কৃষ্ণকিশোর পরম হিন্দু, সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। সে বৃন্দাবনে গিয়েছিল। একদিন ভ্রমণ করতে করতে তার জলতৃষ্ণা পেয়েছিল। একটা কুয়ার কাছে গিয়ে দেখলে, একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে বললে, 'ওরে, তুই আমায় এক ঘটি জল দিতে পারিস ? তুই কি জাত ?' সে বললে, 'ঠাকুর মশাই, আমি হীন জাত মুচি।' কৃষ্ণকিশোর বললে, 'তুই বল্ শিব, আর জল তুলে দে'।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য সংস্পর্শে আসিয়া নরেন্দ্রনাথ শুধু যে কালী মানিয়াছিলেন বা নির্বিকল্প সমাধির মাধ্যমে অদ্বৈতানুভূতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে ; তাঁহার জীবন-বীণার যে অভিনব ঝঙ্কারে আমরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হই, তাহার মূল সুরগুলিও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেব হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হিন্দুর জাতিবিভাগ ও তৎসম্পর্কিত স্পৃশ্যাস্পৃশ্যবিচার, খাদ্যাখাদ্যের বিধিনিষেধ— এই সকলেরই প্রকৃত রহস্য কি— কি উদ্দেশ্যে ঋষিগণ-কর্তৃক ইহাদের প্রবর্তন এবং 'কালবশে সদাচারভ্রষ্ট, বৈরাগ্যবিহীন একমাত্র লোকাচারনিষ্ঠ ও ক্ষীণবুদ্ধি আর্যসন্তান' কর্তৃক ইহাদের কি দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি ঘটিয়াছে, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আচরণ প্রত্যক্ষ করিয়াই তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কথামৃতের পঞ্চম ভাগের পরিশিষ্টে দশটি পরিচ্ছেদে শ্রীম দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, স্বামীজীর বহু বক্তৃতারই মূলে বীজরূপে রহিয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তিনিচয়। কথামৃতকার ঐ দশটি পরিচ্ছেদ দিগ্‌দর্শনরূপে উপস্থাপিত করিয়া একটি অতি প্রয়োজনীয় ও প্রশংসনীয় কার্য করিয়াছেন। বাস্তবিক আমরা যদি স্বামীজীর বাণী ও রচনা এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণীর তুলনামূলক আলোচনা করি, তাহা হইলে, মনে হয় বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক তথ্যকে বাদ দিলে প্রায় সর্ববিষয়েই স্বামীজীর উক্তিসমূহের উৎসের সন্ধান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণীতেই পাওয়া যাইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসংবরণের প্রায় তিন বৎসর পরে ৭ই অগস্ট ১৮৮৯ নরেন্দ্রনাথ কাশীর জমিদার, শাস্ত্রনিষ্ণাত প্রমদাদাস মিত্রকে একখানি পত্রে চারিটি শাস্ত্রীয় প্রশ্ন করেন। চারিটি প্রশ্নই হিন্দুর জাতিবিভাগ-সম্পর্কিত এবং ঐগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, নরেন্দ্রনাথ গুণগত ও বংশগত চাতুর্বর্ণ্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে কি আছে তাহা জানিতে সবিশেষ আগ্রহী। সবগুলি প্রশ্নই অতিশয় চিত্তাকর্ষক, প্রতিভা ও মননশীলতার স্বাক্ষরবাহী এবং প্রাসঙ্গিকত্বহেতু এখানে উদ্ধৃতি-যোগ্য, কিন্তু এই স্বল্পকায় নিবন্ধে তাহার সম্পূর্ণ সুযোগ নাই। বস্তুতঃ স্বামীজীর বাণী ও রচনায় চাতুর্বর্ণ্য সম্বন্ধে অজস্র কথা ছড়ানো আছে, তাহার অতি সামান্য অংশমাত্রই উদ্ধৃত করিয়া আলোচনা করা সম্ভব হইবে। যাহা হউক, উল্লিখিত প্রশ্ন-গুলির অন্যতম দুইটি প্রশ্ন নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

১। 'পুরুষসূক্তের জাতি পুরুষানুগত নহে — বেদের কোন্ কোন্ অংশে ইহাকে ধারা-বাহিক পুরুষানুগত করা হইয়াছে ?'

২। 'শংকরাচার্য বেদান্তভাষ্যের অধিকাংশ স্থলেই স্মৃতি উদ্ধৃত করিতে গেলেই মহাভারতের প্রমাণ প্রয়োগ করেন। কিন্তু বনপর্বে অজগরোপাখ্যানে এবং উমামহেশ্বর-সংবাদে, তথা ভীষ্মপর্বে যে গুণগত জাতিত্ব অতি স্পষ্টই প্রমাণিত, তৎসম্বন্ধে তাঁহার কোন পুস্তকে কোন কথা বলিয়াছেন কি না ?'

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, চাতুর্বর্ণ্যের সমগ্র মর্মকথা নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলেই অবগত হইয়াছিলেন। সুতরাং প্রশ্ন হইতে পারে,

নরেন্দ্রনাথ শ্রীগুরুর অন্তর্ধানের তিনি বৎসর পরে আবার এই সকল প্রশ্ন করিতেছেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, লৌকিক বিষয়ে তো কথাই নাই, আধ্যাত্মিক বিষয়েও নিজের অনুভূতি, শাস্ত্র ও মহাজনগণের আচরণের সহিত মিলাইয়া দেখিবার ইচ্ছা মানুষমাত্রেরই হইয়া থাকে। অতএব নরেন্দ্রনাথের চাতুর্বর্ণ্য-বিষয়ক সিদ্ধান্তসমূহ হইয়া গেলেও, শাস্ত্রে কি আছে তাহার জিজ্ঞাসা খুবই স্বাভাবিক। প্রমদাবাবুকে পরবর্তী পত্রেই (১৭ই অগস্ট, ১৮৮৯) নরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন— 'এই সকল বিষয়ে গুরুকৃপায় আমার এক প্রকার বুদ্ধি আছে, কিন্তু মহাশয়ের মতামত জানিলে কোন স্থানে সেই সকলকে দৃঢ় এবং কোন স্থানে সংশোধিত করিয়া লইব।' এখানে মনে রাখিতে হইবে, স্বামীজী যে-সংশোধনের কথা বলিতেছেন তাহা শাস্ত্রের মতামত লইয়া— পাঁচ বৎসর ধরিয়া শ্রীগুরুর আচরণ লক্ষ্য করিয়া তিনি চাতুর্বর্ণ্য সম্বন্ধে যে-সকল মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহার সম্পর্কে নহে। সেই সিদ্ধান্তগুলিকে পুরোভাগে রাখিয়া তিনি শাস্ত্রানুশীলন করিতেছিলেন এবং শাস্ত্রচর্চা করিবার সময়ে যে-সকল শঙ্কা স্বাভাবিকভাবেই মনে উঠিয়া থাকে, তাহার সমাধান খুঁজিতেছিলেন। এই পত্রেই আছে:

> 'মহাশয় আমার প্রশ্ন কয়েকটির যে উত্তর দিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি সম্বন্ধে আমার ভ্রম সংশোধিত হইল। মহাশয়ের নিকট তজ্জন্য আমি চিরঋণবদ্ধ রহিলাম। আর একটি প্রশ্ন ছিল যে, ভারতাদি পুরাণোক্ত গুণগত জাতি সম্বন্ধে আচার্য কোন মীমাংসাদি করিয়াছেন কি না? যদি করিয়া থাকেন, কোন্ পুস্তকে? এতদ্দেশীয় প্রাচীন মত যে বংশগত, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই, এবং স্পার্টানরা যে প্রকার হেলট্ [দের উপর ব্যবহার করিত] অথবা মার্কিনদেশে কাফ্রীদের উপর যে প্রকার ব্যবহার হইত, সময়ে সময়ে শূদ্রেরা যে তদপেক্ষাও নিগৃহীত হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর জাত্যাদি সম্বন্ধে আমার কোনও পক্ষে পক্ষপাতিত্ব নাই। কারণ আমি জানি, উহা সামাজিক নিয়ম— গুণ এবং কর্ম-প্রসূত।'

প্রমদাবাবু স্বামীজীর এই সব প্রশ্নের উত্তরে কি লিখিয়াছিলেন, তাহা আমাদের জানা নাই। কিন্তু স্বামীজীর চাতুর্বর্ণ্যসম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসা বা অনুসন্ধিৎসা রুদ্ধ বা স্তিমিত হইয়া যায় নাই। ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত তিনি আসমুদ্র-হিমাচল ভারতের সর্বত্র পথে প্রান্তরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পদব্রজে ভ্রমণ করিবার সময়ে এই বিষয়ে মূল্যবান তথ্যসমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যাহার কিছু উল্লেখ আমরা 'ভারতের ভবিষ্যৎ'-বক্তৃতায় পাই। যথাস্থানে আমরা উহার আলোচনা করিব।

২রা নভেম্বর ১৮৯৩, স্বামীজী চিকাগো হইতে আলাসিঙ্গাকে একটি সুদীর্ঘ পত্র লেখেন। উহার এক স্থানে আছে:

> 'পুরোহিতগণ যতই আবোল-তাবোল বলুন না কেন, জাতি একটি অচলায়তনে পরিণত সামাজিক বিধান ছাড়া কিছুই নহে। উহা নিজের কায শেষ করিয়া এক্ষণে ভারতগগনকে দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ইহা দূর হইতে পারে, কেবল যদি লোকের হারানো সামাজিক স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি ফিরাইয়া আনা যায়। এখানে যে-কেহ জন্মিয়াছে, সেই জানে - সে একজন মানুষ। ভারতে যে-কেহ জন্মায়, সেই জানে— সে সমাজের একজন ক্রীতদাস মাত্র। স্বাধীনতাই উন্নতির একমাত্র সহায়ক। স্বাধীনতা হরণ করিয়া লও, তাহার ফল অবনতি। আধুনিক প্রতিযোগিতা প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কত দ্রুতবেগে জাতিভেদ উঠিয়া যাইতেছে। এখন উহাকে নাশ

করিতে হইলে কোন ধর্মের আবশ্যকতা নাই। আর্যাবর্তে ব্রাহ্মণ দোকানদার, জুতাব্যবসায়ী ও শুঁড়ি খুব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ কেবল প্রতিযোগিতা। বর্তমান গভর্নমেণ্টের অধীনে কাহারও আর জীবিকার জন্য যে-কোন বৃত্তি আশ্রয় করিতে কোনরূপ বাধা নাই। ইহার ফল প্রবল প্রতিযোগিতা! এইরূপে সহস্র সহস্র ব্যক্তি -- জড়ের মতো নীচে পড়িয়া না থাকিয়া, যে উচ্চ সম্ভাবনা লইয়া তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা পাইবার চেষ্টা করিয়া সেই স্তরে উপনীত হইতেছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আচরণ লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বুঝিয়াছিলেন, একমাত্র উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তি-সম্পন্ন যোগীরাই স্পর্শদোষ বুঝিতে পারেন এবং সেই কারণে সাধারণ জীবের পক্ষে শুধু উচ্চ বংশের দোহাই দিয়া ছুঁৎমার্গীয় কথা বলা দুরারোগ্য ব্যাধিবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ২৮শে ডিসেম্বর ১৮৯৩, শিষ্য হরিপদ মিত্রকে স্বামীজী চিকাগো হইতে লেখেন :

"ঐ যে পশুবৎ হাড়ি-ডোম তোমার বাড়ীর চারিদিকে, তাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করেছ, তাদের মুখে একগ্রাস অন্ন দেবার জন্য কি করেছ, বলতে পারো? তোমরা তাদের ছোঁও না, 'দূর দূর' কর। আমরা কি মানুষ? ঐ যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু-ব্রাহ্মণ ফিরছেন, তাঁরা এই অধঃপতিত দরিদ্র পদ-দলিত গরীবদের জন্য কি করছেন? খালি বলছেন, 'ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না'। এমন সনাতন ধর্মকে কি ক'রে ফেলেছে! এখন ধর্ম কোথায়? খালি ছুঁৎমার্গ— আমায় ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না।"

আমাদের মনে রাখিতে হইবে, যদিও স্বামীজী সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, শিক্ষার উপরই তিনি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন। ২৪শে জানুআরি ১৮৯৪, স্বামীজী চিকাগো হইতে মাদ্রাজী ভক্তদিগকে যে দীর্ঘ পত্র লেখেন, তাহাতে আছে :

'জাতিভেদ উঠিয়া যাইবে কি থাকিবে, এ সম্বন্ধে আমার কিছুই করিবার নাই। আমার উদ্দেশ্য এই যে, ভারতে বা ভারতের বাহিরে মনুষ্যজাতি যে মহৎ চিন্তারাশি উদ্ভাবন করিয়াছে, তাহা অতি হীন, অতি দরিদ্রের নিকট পর্যন্ত প্রচার করা। তারপর তারা নিজেরা ভাবুক।'

২০শে জুন ১৮৯৪-এর একটি সুদীর্ঘ পত্রে ঐ কথারই পুনরাবৃত্তি দেখা যায় :

'জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন-গঠনের পন্থা।... জাতিভেদ-প্রথা ভাল কি মন্দ, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার আমার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেককেই তাহার নিজের মুক্তির পথ করিয়া লইতে হইবে। রাসায়নিক দ্রব্যের একত্র সমাবেশ করাই আমাদের কর্তব্য— দানাবাঁধার কার্য ঐশ্বরিক বিধানে স্বতই হইয়া যাইবে। আসুন, আমরা তাহাদের মাথায় ভাব প্রবেশ করাইয়া দিই— বাকীটুকু তাহারা নিজেরাই করিবে। ইহার অর্থ, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিতে হইবে।'

২৩শে জুন ১৮৯৪, মহীশূরের মহারাজাকে লিখিত দীর্ঘ পত্রেও অনুরূপ কথার উল্লেখ দেখা যায়।

স্বামীজী ছিলেন স্পষ্টবক্তা, কিন্তু তাঁহার সব স্পষ্টোক্তিরই মূলে থাকিত কল্যাণচিকীর্ষা। এদেশের দোষের কথা এদেশেই বলিতেন, এদেশের গুণের কথা ওদেশে বলিতেন। আবার ওদেশের দোষগুণ সম্বন্ধেও একই নিয়ম অনুসরণ করিতেন। এইজন্য হিন্দুর চাতুর্বর্ণ্যের গুণের কথা স্বামীজী

পাশ্চাত্যদেশে বলিতেন। ১৫ই ফেব্রুআরি ১৮৯৪, ডেট্রয়েটে প্রদত্ত বক্তৃতায় আছে :

'জাতিভেদ-প্রথার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। লোকের বৃত্তি বংশগত— একজন ছুতোর-মিস্ত্রীর ছেলে ছুতোর হয়েই জন্মায়, স্বর্ণকারের ছেলে স্বর্ণকার, কারিগরের ছেলে কারিগর এবং পুরোহিতের ছেলে পুরোহিত। ...সামাজিক দোস-ত্রুটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের, এ প্রায় এক হাজার বছর ধরে চলে আসছে মাত্র।'

১৪ই মে ১৮৯৪, স্বামীজী আমেরিকাতে আর একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন :

'বর্ণাধীন ব্যক্তি আত্মচিন্তার সময় পায়, আর ভারতীয় সমাজ ইহারই জন্য উদ্‌গ্রীব।... যে মানুষ যত উচ্চ বর্ণে জন্ম লয়, তাহার সামাজিক শাসন ততই অধিক। বর্ণবিভাগ আমাদিগকে হিন্দুজাতি হিসাবে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে এবং ইহাতে ত্রুটি প্রচুর থাকিলেও ইহার গুণ তদপেক্ষা অধিক।'

১৮৯৭ সালের জানুআরি মাসে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বামীজী কুম্ভকোণম্, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে যে-সকল বক্তৃতায় ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিয়াছিলেন, সেগুলি আমরা পরে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিব। অন্যান্য বক্তৃতায় জাতিবিভাগ সম্পর্কে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করিতেছি। মনমাদুরাতে স্বামীজী বলিয়াছিলেন :

"যে অর্থহীন বিষয়গুলি লইয়া প্রাচীনকাল হইতেই বাদানুবাদ চলিতেছে, তাহা পরিত্যাগ কর। গত ছয়-সাত শত বৎসর ধরিয়া কি ঘোর অবনতি হইয়াছে দেখ!... আমাদের ধর্মটা যে রান্নাঘরে ঢুকিয়া সেইখানেই আবদ্ধ থাকিবে— এইরূপ এক আশঙ্কা রহিয়াছে। আমরা এখন বৈদান্তিকও নই, পৌরাণিকও নই, তান্ত্রিকও নই, আমরা এখন কেবল 'ছুঁৎমার্গী', আমাদের ধর্ম এখন রান্নাঘরে। ভাতের হাঁড়ি আমাদের ঈশ্বর, আর ধর্মমত— 'আমায় ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, আমি মহাপবিত্র।' যদি আমাদের দেশে আর এক শতাব্দী ধরিয়া এই ভাব চলে, তবে আমাদের প্রত্যেককেই পাগলা গারদে যাইতে হইবে।"

১৪ই ফেব্রুআরি ১৮৯৭, মাদ্রাজে প্রদত্ত 'ভারতের ভবিষ্যৎ'-শীর্ষক বক্তৃতায় স্বামীজী বলিয়াছিলেন :

'শংকরাচার্য প্রভৃতি যুগাচার্য— জাতিগঠনকারী ছিলেন। তাঁহারা যে-সব অদ্ভুত ব্যাপার করিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমাদিগকে বলিতে পারি না, আর তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ, আমি যাহা বলিতে যাইতেছি, তাহাতে বিরক্ত হইতে পারো। কিন্তু আমার ভ্রমণ ও অভিজ্ঞতায় আমি ইহার সন্ধান পাইয়াছি, আর আমি ঐ গবেষণায় অদ্ভুত ফল লাভ করিয়াছি। সময়ে সময়ে তাঁহারা দলকে দল বেলুচি লইয়া এক মুহূর্তে তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় করিয়া ফেলিতেন, দলকে দল জেলে লইয়া এক মুহূর্তে ব্রাহ্মণ করিয়া ফেলিতেন। তাঁহারা সকলেই ঋষি-মুনি ছিলেন— আমাদিগকে তাঁহাদের কার্যকলাপ ভক্তিশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে।'

বস্তুতঃ চাতুর্বর্ণ্য সুদীর্ঘকাল বংশানুক্রমিক থাকিলেও কোনও সময়েই বিবর্তনরহিত একটি অনড় অপরিবর্তনীয় প্রথা ছিল না। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে বিদেশী অনেক জাতি যে ভারতে আসিয়া বসবাস করার ফলে ভারতীয় বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত হইয়াছে, ইহার যথেষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। গুর্জর

ও হূণ জাতি ভারতে আসিয়া ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল এবং হূণ জাতি রাজপুতদের এক শাখা বলিয়া গণ্য হইত। অনেকে মনে করেন যে, রাজপুত-বলিয়া পরিচিত মধ্যযুগের যে ৩৬টি শাখার নাম পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে এইরূপ অনেক বিদেশীয় জাতি আছে। মুসলমানদের পূর্বে বিদেশ হইতে আগত আক্রমণকারী শক কুষাণ হূণ গ্রীক পার্থিয়ান প্রভৃতি জাতি ভারতবর্ষে বহু সংখ্যায় বাস করিত, অথচ তাহাদের কোন পৃথক্ অস্তিত্বের নিদর্শন নাই— তাহারা বিরাট হিন্দু সমাজে মিশিয়া গিয়াছে। মনুসংহিতায় (১০।৪৩-৪৪) চীন পারদ প্রভৃতি সুপরিচিত বিদেশী জাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। শূদ্র মহাপদ্ম রাজা হইয়াছিলেন, ইহাও ঐতিহাসিক সত্য। কৈবর্ত-জাতীয় এক বংশ বাংলায় একাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষার গুণে স্বামীজী কোন বিষয়েই 'মতুয়ার বুদ্ধি' পোষণ করিতেন না। জগতে কোন কিছুই অবিমিশ্র ভাল বা অবিমিশ্র মন্দ নহে। বংশগত জাতিভেদেরও গুণ অবশ্যই আছে, স্বামীজী তাহা স্বীকার করিতেন। তবে জাতিবিভাগ গুণগতই হউক বা বংশগতই হউক, ভোগাধিকার-তারতম্য সর্বথা পরিবর্জনীয়, ইহা তিনি বারংবার বলিয়া গিয়াছেন। ২৮শে অক্টোবর ১৮৯৭, পাঞ্জাবে স্বামীজী বলিয়াছিলেন :

> 'বংশগত বা গুণগত জাতিভেদে ভোগ বা অধিকারের তারতম্য উঠিয়া যাওয়া উচিত। তবে বংশগত জাতিভেদের কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে। যেমন, কোন ব্যক্তি যতই গুণবান ধনবান হউক না কেন, বংশগত জাতি থাকিলে স্বজাতিকে পরিত্যাগ করিতে পারে না; সুতরাং তাহার জাতি, তাহার গুণ ও ধনের কিছু না কিছু অংশভাগী হইয়া থাকে। গুণগত জাতিতে তাহা হইতে পারে না।'

স্বামীজী এই সময়ে উত্তর ভারতে যে-সকল শিক্ষা ও উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা সেই সময়কার প্রত্যেক সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রমথনাথ বসু লিখিত স্বামীজীর 'জীবনীতে তাহার সারমর্ম যে ৮টি পর্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে পাওয়া যায় :

> (১) 'আন্তর্জাতিক বিবাহ প্রথার প্রচলন দ্বারা জাতিভেদের উচ্ছেদসাধন।'
>
> (২) ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে আন্দোলন বা তাঁহাদের নিন্দা না করা, কারণ তাঁহারাই সংস্কৃতবিদ্যাকে রক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত ভারতের কুত্রাপি সংস্কৃতবিদ্যার অস্তিত্ব থাকিত না।

'যুগনায়ক বিবেকানন্দে' স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রথমোক্ত বিষয়ে মন্তব্য করিয়াছেন 'আন্তর্জাতিক বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার মত খুব সুস্পষ্ট বলিয়া মনে হয় না।' বস্তুতঃ সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় নির্ভুল তথ্য প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা সন্দেহের অবকাশ থাকা স্বাভাবিক এবং সঠিক বিবরণী প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও, সেগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও গবেষণা ব্যতীত এই বিষয়ে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। 'আন্তর্জাতিক'-শব্দটি সাধারণতঃ যে-অর্থে (International) ব্যবহৃত হয়, তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে এই মন্তব্য। যদি উহার অর্থ হয় চাতুর্বর্ণ্যের অন্তর্গত এক বর্ণের পুরুষ বা স্ত্রীর অন্য বর্ণের স্ত্রী বা পুরুষের সহিত বিবাহ (Intercaste marriage), তাহা হইলে এই বিষয়ে স্বামীজীর মত সুস্পষ্ট। বর্ণভেদে বিবাহ স্থগিত হওয়ায় ও এক এক বর্ণের মধ্যে বহু শাখাভেদ হইয়া তাহাদের মধ্যে আদান প্রদান বন্ধ হওয়ায় বিবাহের পরিধি সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ায় হিন্দুজাতি দুর্বলশরীরধারী হইয়া পড়িয়াছে; অতএব প্রথমতঃ প্রত্যেক বর্ণের মধ্যে যে অবান্তর বিভাগ আছে, তাহাদের মধ্যে যাহাতে আদান

প্রদান হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত— ইহাই ছিল স্বামীজীর মত।

বস্তুতঃ স্বামীজী জাতিভেদ ও তৎপ্রসূত ভোগাধিকার-তারতম্যের উচ্ছেদসাধন চাহিলেও, জাতিবিভাগ নষ্ট করিতে বলেন নাই। তিনি চাহিয়াছিলেন, চাতুর্বর্ণ্যপ্রথা প্রথমতঃ সুপ্রাচীন-কালের ন্যায় গুণগত হউক, পরে সকলেই এক জাতিতে— ব্রাহ্মণজাতিতে পরিণত হউক। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে স্বামীজী বলিয়া-ছিলেন :

"ঋষিগণের মত চালাতে হবে ; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিদের মন্ত্রে দেশটাকে দীক্ষিত করতে হবে। তবে সময়োপযোগী কিছু কিছু পরিবর্তন ক'রে দিতে হবে। এই দেখ না, ভারতের কোথাও আর চাতুর্বর্ণ্য-বিভাগ দেখা যায় না। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র — এই চার জাতে দেশের লোকগুলোকে ভাগ করতে হবে। সব বামুন এক ক'রে একটি ব্রাহ্মণজাত গড়তে হবে। এইরূপ সব ক্ষত্রিয়, সব বৈশ্য, সব শূদ্রদের নিয়ে অন্য তিনটি জাত ক'রে সকল জাতিকে বৈদিক প্রণালীতে আনতে হবে। নতুবা শুধু 'তোমায় ছোঁব না' বললেই কি দেশের কল্যাণ হবে রে ? কখনই নয়।"

'আর্য ও তামিল'-শীর্ষক প্রবন্ধে স্বামীজী লিখিয়াছিলেন :

'আমরা বিশ্বাস করি যে, ভারতবর্ষের বর্ণা-শ্রমধর্ম মানবজাতিকে প্রদত্ত ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সম্পদসমূহের অন্যতম। আমরা ইহাও বিশ্বাস করি যে, অনিবার্য ক্রটিবিচ্যুতি, বৈদেশিক অত্যাচার, সর্বোপরি ব্রাহ্মণ-নামের অযোগ্য কিছুসংখ্যক ব্রাহ্মণের পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা ও দম্ভের দ্বারা বর্ণাশ্রমধর্মের স্বাভাবিক সুফল-লাভ ব্যাহত হইলেও এই বর্ণাশ্রমধর্ম ভারতে আশ্চর্য কীর্তি স্থাপন করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও ভারতবাসীকে পরম লক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালিত করিবে।

'ভারতের আদর্শ পবিত্রতাস্বরূপ ভগবৎকল্প ব্রাহ্মণদের একটি জগৎসৃষ্টি মহাভারতের মতে পূর্বে এইরূপ ছিল, ভবিষ্যতেও এইরূপ হইবে।

'যিনি নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া দাবি করেন, তিনি নিজের সেই পবিত্রতার দ্বারা এবং অপরকেও অনুরূপ পবিত্র করিয়া নিজের দাবি প্রমাণ করুন। ইহার বদলে বেশীর ভাগ ব্রাহ্মণই ভ্রান্ত জন্মগর্ব লালন করিতেই ব্যস্ত ; ...

'ব্রাহ্মণগণ, সাবধান, ইহাই মৃত্যুর চিহ্ন। তোমাদের চারিপাশের অব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করিয়া তোমাদের মনুষ্যত্ব— ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণ কর।'

'হিন্দু'-পত্রিকার প্রতিনিধিকে স্বামীজী বলিয়াছিলেন :

'জাতিবিভাগ খুব ভাল। এই জাতিবিভাগ-প্রণালীই আমরা অনুসরণ করতে চাই। জাতিবিভাগ যথার্থ কি, তা লাখে একজন বোঝে কিনা সন্দেহ। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই, যেখানে জাত নেই। ভারতে আমরা জাতিবিভাগের মধ্য দিয়ে জাতির অতীত অবস্থায় গিয়ে থাকি। জাতিবিভাগ ঐ মূলসূত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ভারতে এই জাতিবিভাগ-প্রণালীর উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলকে ব্রাহ্মণ করা— ব্রাহ্মণই আদর্শ মানুষ। যদি ভারতের ইতিহাস পড়ো, তবে দেখবে— এখানে বরাবরই নিম্নজাতিকে উন্নত করবার চেষ্টা হয়েছে। অনেক জাতিকে উন্নত করা হয়েছেও। আরও অনেক হবে। শেষে সকলেই ব্রাহ্মণ হবে। এই আমাদের কার্য-

প্রণালী। কাকেও নামাতে হবে না—সকলকে ওঠাতে হবে। আর এইটি প্রধানতঃ ব্রাহ্মণদের করতে হবে··· যদি জাতিবিভাগ না থাকত, তবে তোমরা থাকতে কোথায়? জাতিবিভাগ না থাকলে তোমাদের বিদ্যা ও আর আর জিনিস কোথায় থাকত?··· ভারতীয় সমাজ স্থিতিশীল কবে দেখেছ? এ সমাজ সর্বদাই গতিশীল। কখন কখন, যেমন বিজাতীয় আক্রমণের সময়, এই গতি খুব মৃদু হয়েছিল, অন্য সময়ে আবার দ্রুত।··· জাতি-বিভাগ-প্রণালীও ক্রমাগত বদলাচ্ছে, ক্রিয়া-কাণ্ডও ক্রমাগত বদলাচ্ছে! কেবল মূল তত্ত্ব বদলাচ্ছে না।··· কয়েকজন মহাপুরুষ নিম্ন-জাতির উন্নতির চেষ্টা করে গেছেন। কেউ কেউ, যেমন মধ্বাচার্য নারীদের বেদ পড়বার অধিকার দিয়েছেন। জাতিবিভাগ কখনও যেতে পারে না, তবে মাঝে মাঝে একে নূতন ছাঁচে ঢালতে হবে। প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার ভেতর এমন প্রাণশক্তি আছে, যাতে দু লক্ষ নূতন সমাজ-ব্যবস্থা গঠিত হ'তে পারে। জাতিবিভাগ উঠিয়ে দেবার ইচ্ছা করাও পাগলামি মাত্র। পুরাতনেরই নব বিবর্তন বা বিকাশ— এই হ'ল নূতন কার্যপ্রণালী।'

'ভারতের ভবিষ্যৎ'-শীর্ষক বক্তৃতায় স্বামীজী বলিয়াছিলেন:

'জাতিভেদের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা মহাভারতেই পাওয়া যায়। মহাভারতে লিখিত আছে; সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণজাতি ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন। জাতিভেদ-সমস্যার যত প্রকার ব্যাখ্যা শুনা যায়, তন্মধ্যে ইহাই একমাত্র সত্য ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা। আগামী সত্যযুগে আবার ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই ব্রাহ্মণে পরিণত হইবেন।

'সুতরাং ভারতের জাতিভেদ-সমস্যার মীমাংসা এরূপ দাঁড়াইতেছে— উচ্চবর্ণগুলিকে হীনতর করিতে হইবে না, ব্রাহ্মণজাতিকে ধ্বংস করিতে হইবে না। ভারতে ব্রাহ্মণই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ— শংকরাচার্য তাঁহার গীতাভাষ্যের ভূমিকায় ইহা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের কারণ বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ইহাই তাঁহার অবতরণের মহান্ উদ্দেশ্য। এই ব্রাহ্মণ, এই দিব্যমানব, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ এই আদর্শ ও পূর্ণমানবকে থাকিতে হইবে, তাঁহার লোপ হইলে চলিবে না। আধুনিক জাতিভেদ-প্রথার যতই দোষ থাকুক, আমরা জানি— ব্রাহ্মণজাতির পক্ষে এইটুকু বলিতেই হইবে যে, অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তাঁহাদেরই মধ্যে অধিকতর সংখ্যার প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব-সম্পন্ন মানুষের জন্ম হইয়াছে, ইহা সত্য। অন্যান্য জাতির নিকট ব্রাহ্মণদের এ গৌরব প্রাপ্য। যথেষ্ট সাহস অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে তাঁহাদের দোষ দেখাইতে হইবে, কিন্তু যেটুকু প্রশংসা—যেটুকু গৌরব তাঁহাদের প্রাপ্য, সেটুকু তাঁহাদিগকে দিতে হইবে।'

'ব্রাহ্মণজাতির কর্তব্য — ভারতের অন্যান্য সকলজাতির উদ্ধারের চেষ্টা করা; ব্রাহ্মণ যদি উদ্ধারের চেষ্টা করেন এবং যতদিনই ইহা করেন, ততদিনই তিনি ব্রাহ্মণ; তিনি যদি টাকার চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ান, তবে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ, যিনি বৈষয়িক কোন কর্ম করেন না। সাংসারিক কার্য অপর জাতির জন্য, ব্রাহ্মণের জন্য নহে। ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া আমি বলিতেছি— তাঁহারা যাহা

জানেন অপর জাতিকে তাহা শিখাইয়া, শত শতাব্দীর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহারা যাহা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা অপরকে দান করিয়া ভারতবাসীকে উন্নত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রাণপণ কাজ করিতে হইবে। ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের কর্তব্য— প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব কি, তাহা স্মরণ করা। মনু বলিয়াছেন :

ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে॥

—ব্রাহ্মণকে যে এত সম্মান ও বিশেষ অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহার কারণ— তাঁহার নিকট ধর্মের ভাণ্ডার রহিয়াছে। তাঁহাকে ঐ ভাণ্ডার খুলিয়া রত্নরাজি জগতে বিতরণ করিতে হইবে। এ কথা সত্য যে, ভারতীয় অন্যান্য জাতির নিকট ব্রাহ্মণই প্রথম ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ করেন, আর তিনিই সর্বাগ্রে জীবনের গূঢ়তম সমস্যাগুলির রহস্য উপলব্ধি করিবার জন্য সর্বত্যাগ করিয়াছিলেন।'

এই ব্রাহ্মণত্ব কেবলমাত্র ভারতেই সীমাবদ্ধ রাখা চলিবে না— সমগ্র পৃথিবীতে ইহার বিস্তার ঘটাইতে হইবে, ইহাই ছিল স্বামীজীর সুস্পষ্ট অভিপ্রায়। কুম্ভকোণমে বক্তৃতায় স্বামীজী বলিয়াছিলেন :

"ব্রাহ্মণই আমাদের পূর্বপুরুষগণের আদর্শ ছিলেন। আমাদের সকল শাস্ত্রেই এই ব্রাহ্মণের আদর্শ চরিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।... আধ্যাত্মিক-সাধনসম্পন্ন ও মহাত্যাগী ব্রাহ্মণই আমাদের আদর্শ। 'ব্রাহ্মণ আদর্শ' আমি কি অর্থে বুঝিতেছি?—যাহাতে সাংসারিকতা একেবারে নাই এবং প্রকৃত জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে বর্তমান, তাহাই আদর্শ ব্রাহ্মণত্ব। ইহাই হিন্দুজাতির আদর্শ।... শাস্ত্রে দেখিতে পাই— সত্যযুগে একমাত্র এই ব্রাহ্মণ জাতিই ছিলেন। আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই প্রথমে পৃথিবীর সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন, ক্রমে যতই তাঁহাদের অবনতি হইতে লাগিল, ততই তাঁহারা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন; আবার যখন যুগচক্র ঘুরিয়া সেই সত্যযুগের অভ্যুদয় হইবে, তখন আবার সকলেই ব্রাহ্মণ হইবেন। সম্প্রতি যুগচক্র ঘুরিয়া সত্যযুগের অভ্যুদয় সূচিত হইতেছে— আমি তোমাদের দৃষ্টি এ-বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি।... প্রত্যেকেই যদি আদর্শ ব্রাহ্মণ হয়, তবেই এই জাতিভেদ-সমস্যার সমাধান হইবে। তোমরা আর্য, অনার্য, ঋষি, ব্রাহ্মণ অথবা নীচ অন্ত্যজ জাতি— যাহাই হও, ভারতবাসী সকলেরই প্রতি তোমাদের পূর্বপুরুষগণের এক মহান্ আদেশ রহিয়াছে। তোমাদের সকলেরই প্রতি এই এক আদেশ, সে আদেশ এই— 'চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, ক্রমাগত উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। উচ্চতম জাতি হইতে নিম্নতম পারিয়া (চণ্ডাল) পর্যন্ত সকলকেই আদর্শ ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে।' বেদান্তের এই আদর্শ শুধু যে ভারতেই খাটিবে তাহা নহে— সমগ্র পৃথিবীকে এই আদর্শ অনুযায়ী গঠন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের জাতিভেদের ইহাই লক্ষ্য। ইহার উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে সমগ্র মানবজাতি যাহাতে আদর্শ ধার্মিক হয়— অর্থাৎ ক্ষমা ধৃতি শৌচ শান্তিতে পূর্ণ হয়, উপাসনা ও ধ্যান পরায়ণ হয়। এই আদর্শ অবলম্বন করিলেই মানবজাতি ক্রমশঃ ঈশ্বর লাভ করিতে পারে।"

'যুগনায়ক বিবেকানন্দ'-গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের প্রাগ্বাণীতে গ্রন্থকার স্বামী গম্ভীরানন্দ স্বামীজীর এই আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা স্বামীজীরই ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন :

'এই জগতের আদর্শ সেই অবস্থা যখন 'সর্ব'

ব্রহ্মময়ং জগৎ' পুনরায় হইবে, যখন শূদ্রবল, বৈশ্যবল ও ক্ষত্রিয়বলের আর আবশ্যকতা থাকিবে না, যখন মানবসন্তান যোগবিভূতিতে বিভূষিত হইয়াই জন্ম-পরিগ্রহ করিবে, যখন চৈতন্যময়ী শক্তি জড়া শক্তির উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করিবে, যখন রোগশোক আর মনুষ্যশরীরকে আক্রমণ করিতে পারিবে না, পশুবল প্রয়োগ পুরাকালের স্বপ্নের ন্যায় লোকস্মৃতি হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইবে, যখন এই ভূমণ্ডলে প্রেমই একমাত্র সর্বকার্যের প্রেরয়িতা হইবে— তখনই সমগ্র মনুষ্যজাতি ব্রহ্মণ্যবিশিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ হইয়া যাইবে, তখনই জাতিভেদ লুপ্ত হইয়া প্রাচীন ঋষিদিগের দৃষ্ট সত্যযুগ সমুপস্থিত হইবে।'

স্বামী শিবানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[বিনোদেশ্বর দাশগুপ্তকে লিখিত]

Sri Hathiramjee Mutt
Ootacamund (Madras)
11. 6. 1926.

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

শ্রীমান্ বিনোদেশ্বর,

তোমার ৫ তারিখের পত্র এখানে পাইলাম। উহাতে তোমাদের এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব বিবরণ পাইয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি। তোমরা তাঁহার ভক্ত, আপনার লোক, বিশ্বাসবান, চরিত্রবান—তোমাদের উদ্দেশ্য সৎ, স্বার্থগন্ধহীন তোমরা তাঁহার নাম করিয়া, তাঁহার প্রীত্যর্থে যে কাজ করিবে, তাহার উত্তরোত্তর উন্নতি ও প্রসার হইতেই হইবে। তোমরা মা, বাবুরাম মহারাজ, মহারাজ প্রভৃতির কত স্নেহ ভালবাসা পাইয়াছ ও আমরা তোমাদের আন্তরিক স্নেহ ও ভালবাসিয়া থাকি। তোমাদের সহিত যাহারা মিশিবে তাহাদের আধ্যাত্মিক এবং সর্ব্ববিষয়ে কল্যাণ হইবে, তাহা ছাড়া তোমাদের কৃত কর্ম্মের দ্বারা জগতের প্রকৃত কল্যাণ হইবে জানিবে। তোমরা যে তাঁহার দাস— তাঁহার যন্ত্রস্বরূপ। তিনি তোমাদের শুদ্ধ-সত্ত্ব আবাস অবলম্বন করিয়াই ত এজগতে লীলা করিতেছেন— ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি ও প্রভুর মহিমা দেখিয়া বিস্ময়ে আনন্দে অধীর হইতেছি। আমি তোমাদের হৃদয় হইতে আশীর্ব্বাদ করিতেছি— তোমরা অহংশূন্য হইয়া, তাঁহার কার্য্য করিয়া তাঁহাতে ডুবিয়া যাইয়া এই জীবনে কৃতার্থস্মন্য হইয়া যাও। তিনি যুগাবতার ত বটেই, তিনি স্বয়ং ভগবান— ধরাধামে আমাদের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন— এই বিশ্বাস তোমাদের মনে দৃঢ়বদ্ধ হউক। তাঁহাকে সদা সর্ব্বদা, সর্ব্ব ব্যাপারে স্মরণ করিয়া কার্য্য করিয়া যাও— মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল তোমাদের কাছেই আসিতেই পারিবে না। এই দেখ না, আমরা তাঁহার নাম করিয়া জীবন যাপন করিব বলিয়া বাহির হইয়াছিলাম আমাদেরই কত না তিনি কাজ করাইয়া লইতেছেন— এই বুড়া হইয়াছি— আজ এদেশ, কাল ওদেশ কতনাই

ঘুরাইতেছেন যেমন কাজ করাচ্ছেন, শক্তিও তিনি দিচ্ছেন নচেৎ এ সব কি আমাদের কাজ। জান ত স্বামীজি প্রভৃতিকে দিয়া কত না খাটাইয়া লইয়াছেন— বিশ্রাম যে কি জিনিষ তাহা তিনি জানিতেন কিনা সন্দেহ। সবই ঠাকুর— আমরাও তাঁর— ইহা ধারণা করিবে।

তোমরা স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ মিলিত হইয়া ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালী এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাও জানিয়া অতিশয় সুখী হইলাম। নিমন্ত্রণ পত্রও পড়িয়া দেখিয়াছি। এইরূপ হওয়া মাঝে মাঝে বিশেষ বাঞ্ছনীয়। ইহা ঠিক ঠিক উদ্দেশ্যে করিলে হুজুগ কেন হইবে? বরং এইরূপ ভাবে মিলিত হইয়া আলোচনা না করিলে আদর্শ হারাইয়া কার্য্য বন্ধনেরই কারণ হইবে। দেশময় এই সকল সৎ অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য নিজেদের প্রচার ত নয় ঐ সকলের দ্বারা সর্ব্বভূতে নারায়ণের সেবা করিয়া নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ ও সেইসঙ্গে অপরের যতটা হয় কল্যাণ করা। যদি কোন স্থানে একজন উন্নত ভক্ত সাধক বাস করেন তাহা হইলে তাঁহার উপস্থিতিতে সেই স্থানের অধিবাসীদের সর্ব্ব বিষয়ে কল্যাণ হইতেই হইবে। সেইজন্য এই সকল কার্য্যের মধ্যে আমরা ঐ উদ্দেশ্য কতটা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেছি তাহা দেখিতে হইবে বৈ কি! তবে সকল বিষয় সরলভাবে আলোচনা করিতে হইবে—এবং প্রার্থনা করিতে হইবে তিনি যেন আমাদের আলোচনা সভায় উপস্থিত হইয়া আমাদের সৎ বুদ্ধি সরলতা ইত্যাদি দান করিয়া আমাদের উদ্দেশ্য সফল করেন। তোমাদের এ সম্মেলনের উদ্দেশ্য সফল হউক ইহা আমার আন্তরিক প্রার্থনা জানিবে। ভয় কি, তাঁহার আশীর্ব্বাদে সকল বিষয়েই মঙ্গল হইবে।

আমি গত ৪ঠা মান্দ্রাজ হইতে এখানে আসিয়াছি— ইহা অতিশয় স্বাস্থ্যকর ও অতি চমৎকার স্থান। এখানে মাসাবধি থাকিবার ইচ্ছা - দেখা যাক্ কি হয়। তাঁহার কৃপায় শরীর মন্দ নাই। এখানেও একটি মঠ স্থাপিত হইয়াছে। বাড়ীর কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আমি থাকিতে থাকিতেই বোধহয় শেষ হইবে। তোমরা সকলে আমার আন্তরিক স্নেহ আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

শিবানন্দ

স্বামী প্রেমানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[বিনোদেশ্বর দাশগুপ্তকে লিখিত]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

বৈদ্যনাথ ধাম, পোঃ দেওঘর,
সারদা প্রসাদ রায়ের বাঙ্গলো
ইং ৭।৫।১৮

কল্যাণবরেষু—

ইতিপূর্ব্বে ভূপতি বাবাজির কার্ড পাইয়াছি, গতকল্য তোমার ও ভূপতির প্রেরিত ৬৲ টাকা পাইয়াছি। আজ তোমার পত্র পাইলাম। গত ৪।৫ দিন হইতে শরীর একটু সুস্থ বোধ

করিতেছি। এখানকার আর আর সকলে ভাল আছে। আমার সঙ্গে এখানে আসিবার সময় সতীশ, মতিলাল ও কানাই নামে তিনটি ব্রহ্মচারী আসিয়াছে, পরে রামবাবুও এখানে আসিয়াছেন। আজ এখানে আসিয়া ৮।১০ দিন বেশ ভালই ছিলাম, তখন বেশ বেড়াইতাম, পরে আবার বিকেলে একটু একটু জ্বর হইতেছিল, সেটা আজকাল একটু কম আছে। দিনের বেলা পাঁচতোলা চাউলের ভাত ও রাত্রে কোন দিন সাগু, বার্লি, কি সুজির রুটি এইসব এবং প্রাতঃকালে সাগু ও বিকালেও সাগু কি বার্লি, কোনও দিন হয়ত একটু ফল টল খাই। তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে, এবং ভূপতি, কামিনীবাবু, পণ্ডিত মহাশয় ও সুরেন প্রভৃতিকে দিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

প্রেমানন্দ

স্বামী সুবোধানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[বিনোদেশ্বর দাশগুপ্তকে লিখিত]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

মঙ্গলবার।

Ramakrishna Math

Belur P. O., Howrah Dist.,

Dated the ২৭শে আশ্বিন।

1925.

প্রিয় বিনোদবাবু—

আপনার ও বাড়ীর মেয়েদের পত্র পাইয়া আনন্দিত ও সুখী হইলাম। মহাপুরুষ মহারাজ ও আমরা সকলে ভাল আছি। আপনারা সকলে তাঁর শুভাশীর্ব্বাদ জানিবেন, মহাপুরুষ মহারাজ ৺কালী পূজার পর এখান হইতে ৺কাশীধাম যাইবেন।

বাগবাজারে সারদানন্দ স্বামী ও সকলে ভাল আছেন। আমার এখান হইতে রওনা হইবার দিন ২রা কার্ত্তিক, যদি জল ঝড় থাকে তো সেদিন যাইব না, আজকাল এখানে বৃষ্টি হইতেছে। গত রবিবার এখানে গোপাল আসিয়াছিল, সে ভাল আছে।

আমাকে বালিয়াটী যাইতে হবে. সেখানে যামিনীবাবুর বাড়ী শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করা হইবে, সেইজন্য যাওয়া।

আন্তরিক ভালবাসা শুভ ইত্যাদি আপনারা জানিবেন, নলিনী, ভোলানাথ ও হেমন্তকে জানাবেন।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

শ্রীসুবোধানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা

স্বামী সারদেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

হেমন্তকাল, মাঠ তখনও পাকা-আধপাকা ধানে ভরা, আলপথ ঘুরিয়া মাঠ অতিক্রম করিতে হয়। গড়বেতা হইতে এক ভক্ত-দম্পতি শিশু-সন্তানসহ গরুর গাড়ীতে বিকালে যাত্রা করিয়া সারারাত্রি চলিয়া আট-নয় ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া পরদিন সকালবেলা জয়রামবাটীর দক্ষিণে গিষ্টে গ্রামের পূর্বপ্রান্তে বড় রাস্তায় গাড়ী রাখিয়া প্রায় দেড় মাইল মাঠ পায়ে হাঁটিয়া নয়-দশটার সময় মায়ের বাড়ী উপস্থিত। সঙ্গে চারিটি কন্যা-সন্তান, ছোটটি দুগ্ধপোষ্য কোলের ছেলে, তাহার আবার শরীর অসুস্থ— ম্যালেরিয়া জ্বর। গাড়ীতে কষ্টে আসা, তাহার উপর এতটা পথ হাঁটা,— তাঁহারা অতিশয় ক্লান্তদেহে মায়ের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান, পথে লোককে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে আসিয়াছেন। মায়ের বাড়ী পৌছিয়াছেন সত্য, কিন্তু কাহাকেও ত চিনেন না, কিছুই জানেন না। কি করিবেন, কি বলিবেন, কোথায় বসিবেন, বুঝিতে না পারিয়া হতভম্ব হইয়া চুপ করিয়া সংশয়াকুল চিত্তে দাঁড়াইয়া আছেন! মায়ের কথা শুনিয়াছেন, কত আশা বুকে লইয়া এত কষ্ট সহ্য করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাকে দর্শন করিবেন, কৃপালাভ করিবেন। এখন কি হয় না হয়! কোথায় মা? দাঁড়াইয়া আছেন নির্বাক, কোথায় বসিবেন, কোথায় থাইবেন, কোথায়ই বা শিশুদের লইয়া থাকিবেন— এ তো অতি ছোট একটি খড়ো বাড়ী, তাও আবার লোকে ভরতি। মা সংবাদ পাইয়াছেন, ডাকাইয়া ভিতরে নেওয়াইলেন। অগ্রসর হইয়া আসিয়া পরম স্নেহে আদরে শিশুসহ কন্যাকে নিজের ঘরের বারান্দায় তুলিলেন। মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া, স্নেহের 'মা এসো' ডাক শুনিয়াই বিপন্না বিহ্বলা কন্যার হৃদয় ভরিয়া উঠিল, বদন প্রফুল্ল হইল। অশ্রুপূর্ণলোচনে চরণে প্রণতা হইলে মা স্নেহার্দ্র-স্বরে শুভাশীর্বাদ করিয়া হাত ধরিয়া উঠাইলেন, মুখে হাত দিয়ে চুমো খেয়ে' আদর প্রদর্শন করিলেন। ভক্তও ভক্তিভরে প্রণত হইলেন, মা 'এসো বাবা' বলিয়া তাহাকে সমাদর এবং শুভাশীর্বাদ করিলেন। কন্যা শিশুগণকেও একে একে মায়ের চরণে প্রণাম করাইয়া আশীর্বাদ লওয়াইলেন। মুহূর্তের মধ্যে মায়ের স্নেহের ইন্দ্রজালে সমস্ত দৃশ্য পরিবর্তিত হইয়াছে। ভক্ত-দম্পতির আর ভাবনা চিন্তা নাই— হৃদয় আনন্দে ভরপুর, বদন উৎফুল্ল। কন্যা মায়ের বাড়ীতে আসিয়াছেন, মাকে পাইয়াছেন, আর কি ভাবনা! হইলই বা শিশুর অসুখ, ভয় কি আছে? যিনি অকূলের ত্রাণকর্ত্রী, সকল বিপদে রক্ষা করেন, আজ ত তাঁহারই পদতলে! মা নিজের ঘরের বারান্দার দরজার একপাশে মাদুর বিছাইয়া দিলেন, শিশুকে শোয়াইবার জন্য, তাহাদের বসিবার, বিশ্রাম করিবার সব ব্যবস্থা মুহূর্ত মধ্যেই হইয়া গিয়াছে, শুধু তাহাই নহে, শিশুর দুধ, এমন কি ঔষধ পর্যন্ত। মায়ের ঘরে কন্যার কি কোন অভাব থাকে? কি সঙ্কোচ? মুহূর্তের মধ্যেই ভক্তমহিলার সঙ্গে মায়ের বাড়ীর অন্যান্য মহিলাগণের আলাপ পরিচয় সৌহার্দ্য হইয়া গেল। একটু পরেই দেখা গেল, তিনি কলসী কাঁকে করিয়া অপর ভগিনীগণের সঙ্গে আনন্দে কথা বলিতে বলিতে স্নানে চলিয়াছেন পল্লীর প্রান্তদেশে বাঁড়ুয্যে পুকুরে। ভক্তটিও বাহিরের ঘরে স্থান লইয়াছেন— তাঁহারও

মজলিস জমিয়া গিয়াছে ছেলেদের সঙ্গে। কিছুক্ষণ পরে তাঁহাদের সঙ্গে তিনিও স্নান করিয়া আসিলেন। ঠাকুরের পূজার পর মা দম্পতিকে কৃপা করিলেন। দীক্ষাগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের বহুকালের মনোভিলাষ, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল, মানবজন্ম সার্থক আজ! মা ছেলেদিগকে বারান্দায় বসাইয়া স্বহস্তে পূজার প্রসাদ ফল-মিষ্টি মুড়ি জলখাবার খাওয়াইলেন। তারপর কন্যাগণ-সহ নিজেও কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলেন।

সেই দিন আরও ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। ভক্তেরা জিনিসপত্র আনিয়াছেন— রান্নার পরিমাণ বেশী, আয়োজনও অধিক। রাঁধুনী মাসীকে জলখাবার অবসর দিতে মা প্রত্যহই হেঁসেলে যান, স্বয়ং খুন্তি ধরেন। মা ভোরে শয্যাত্যাগাদি সারিয়া ঠাকুর তুলিয়া স্বয়ং কুটনো কুটিয়া দেন, ঠাকুরের পূজার আয়োজন, ফলাদি থাকিলে খোসা ছাড়াইয়া কাটিয়া নৈবেদ্য তৈয়ার, স্বহস্তেই করেন। পূজান্তে সকলকে প্রসাদ বাঁটিয়া দিয়া, নিজে সামান্য কিছু মুখে দিয়া রান্নার তদারক করিয়া পান সাজিতে বসেন। এই সকল কাজেই প্রয়োজনমত অপর মেয়েরাও সাহায্য করেন। উপস্থিত থাকিলে বিশেষ ভক্তিমতী কেহ কেহ সচেষ্ট থাকিয়া বেশী সহায়তা করেন বটে, তবে মা নিজেই এসব করিতে ভালবাসেন। পূর্বে যখন শরীর সমর্থ ছিল তখন স্বহস্তে রাঁধিয়া পরিবেশন করিয়া সন্তানদিগকে খাওয়াইতেন,— এঁটো পাতা পর্যন্ত পরিষ্কার করিতেন, ইদানীং আর সেইরূপ করা সম্ভব না হইলেও, একটু তফাতে বসিয়া ছেলেদের আহার স্বচক্ষে দেখিতেন, বলিয়া কহিয়া পেট ভরিয়া খাওয়াইতেন, রুচি বুঝিয়া বিভিন্ন জিনিস দেওয়াইতেন বিভিন্ন ছেলেদের। আহারান্তে স্বহস্তে পান দিতেন, যাহারা একটা চায়, তাহাদের দুটি; দুটি চাহিলে চারিটি। ছেলেরা মুখ ভরিয়া পান চিবাইতেছে দেখিলে মা ভারী খুশী। পানসাজার পর অবসর থাকিলে, মা কোন কোন দিন মামাদের ঘরে গিয়া তাহাদের ঘর সংসারের খোঁজখবর লইতেন, কাজে সহায়তা করিতেন। কোন কোন দিন আবশ্যকীয় জিনিসপত্র ভালমন্দ জিনিস— সময় সময় রান্না তরকারি মিষ্টান্নাদিও দিয়া আসিতেন। রান্না হইলে সকল জিনিস রান্নাঘরে সাজাইয়া রাখা হয়, মা স্বয়ং ঠাকুরকে নিবেদন করেন। ছেলেদের খাওয়ার পর মেয়েদের সঙ্গে নিজে বসিয়া, খাইয়া খাওয়াইয়া, মার অবসর। আর কোন দিন দৈবাৎ কেহ পরে খাইলে— মা মুখে গুল দিতে দিতে বারান্দায় বসিয়া, পা মেলিয়া তাহার সঙ্গে কথা-বার্তা বলিয়া আদর করিয়া খাওয়ান, তৎপরে শুইয়া অপরাহ্নে বিশ্রাম।

আজ মেয়েরা বিশেষ সহায়তা করিলেও রান্না, ভোগ-নিবেদন করিতে, প্রসাদ পাইতে দেরী হইয়া গেল। ভক্তদম্পতি স্বগ্রামে বর্ধমান চলিয়া যাইবেন, অনেকদূর, সেই রাত্রিও তাঁহাদের গাড়ীতে চলিতে হইবে। আহারের পরই, তাঁহারা মায়ের পদতলে প্রণামানন্তর স্নেহাশীর্বাদ লইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে যাত্রা করিলেন। মাও পিছনে পিছনে আসিয়া কন্যাকে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদায় দিয়া সদর দরজায় দাঁড়াইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন, যতক্ষণ তাঁহাদের দেখা গেল। তাঁহারা দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাইবার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, ফিরিয়া আসিয়া নলিনী দিদির ঘরের বারান্দায় উত্তরাস্য হইয়া পা মেলিয়া কোলের উপর হস্তদ্বয় রাখিয়া অত্যন্ত বিমর্ষভাবে মাটিতেই বসিয়া পড়িলেন। সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত থাকিলেও ঘরে বিছানায় বিশ্রাম করিতে গেলেন না। স্থির দৃষ্টিতে বসিয়া আছেন, দেখিয়া মনে হইল বিদায়ী বিদেশগামী সন্তান-গণের কথাই ভাবিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে জনৈক মহিলা দেখিতে পাইলেন ভক্তের স্ত্রী তাঁহার

গামছাখানি ফেলিয়া গিয়াছেন, তিনি উহা মায়ের নিকটে হইয়া আসিলে মা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া খেদ করিতে লাগিলেন দেখিয়া অনৈক সন্তান উহা হাতে লইয়া ছুটিয়া চলিলেন তাঁহাদের দিয়া আসিতে। তাঁহারা তখনও বেশীদূরে যান নাই, গ্রামের প্রান্তে বাড়ুয্যে পুকুর পার হইয়া মাঠের পথ ধরিয়াছেন মাত্র। তাঁহারা গামছা দেখিয়া লজ্জিত হইলেন এবং সন্তানের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ-পূর্বক গামছা লইয়া সহর্ষে আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। সন্তান ফিরিয়া সংবাদ দিলে মায়েরও মন প্রসন্ন হইল।

মা তখনও সেইখানে বসিয়া আছেন শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে, স্বগত দু'একটি উক্তি করিয়া হৃদয়ের তাপ কমাইতেছেন। সন্তানটি বাহিরের ঘরে বিশ্রাম করিতে যাইবেন, হঠাৎ শুনিলেন মায়ের শোকার্ত-কণ্ঠে কান্নার উচ্চরব, আহা-হা বাছা আমার, কালকে সে স্নান করে পরতে পাবে না! যখনই শাড়ী খুঁজতে যাবে, তখনই মনে হবে মায়ের বাড়ী ফেলে এসেছি।' সন্তান ব্যগ্র হইয়া ছুটিয়া মায়ের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। ভক্ত মহিলা স্নানান্তে আর্দ্র শাড়ীখানি পুণ্যপুকুরের পারে শুকাইতে দিয়াছিলেন, মনে নাই. যাইবার সময় ভুলিয়া ফেলিয়া গিয়াছেন। মা ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেছেন; এতক্ষণ যে শোকোচ্ছ্বাস হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন তাহা ফুটিয়া বাহির হইল. খেদ করিতে লাগিলেন। একজন নিঃসন্তানা রূঢ়ভাবে বলিলেন, 'কোন্ দিক সামলায়, এতগুলো কাচ্চাবাচ্চা!' তাঁহার কর্কশ স্বর, কঠোর বাণী মায়ের শোকের মাত্রা বাড়াইয়া তুলিল, অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে ভগ্নস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'ভুল ত হবারই কথা। মন কি ছেড়ে যেতে চায়? একবারও থাকতে পেলে না. প্রাণ খুলে কথা বলতে পেলে না' ইত্যাদি। সন্তানটি কাপড়ের দিকে চাহিতেই নলিনী-দিদি মুরুব্বীয়ানার সুরে বলিলেন, 'এই একবার ছুটে এলো, আর যেতে হবে না, তারা এতক্ষণ অনেক দূর চলে গেছে!' মায়ের দিকে চাহিয়া সন্তান স্থির থাকিতে পারিলেন না। শাড়ীখানি হাতে লইয়া মাকে বলিলেন, 'বেশীদূর যাননি এক্ষুনি দিয়ে আসছি।' মার মুখ প্রসন্ন হইল. স্নেহস্বরে বলিলেন, 'বাবা! রোদ আছে, ছাতা নিয়ে যাও।' ভক্তেরা অনেক দূর গিয়াছিলেন সত্য, গিয়ে গ্রাম পার হইয়া বড় রাস্তায়, প্রায় তাঁহাদের রাখা গাড়ীর নিকটে। ভক্তেরা তাঁহাকে দৌড়াইয়া আসিতে দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন এবং শাড়ী দেখিয়া তখন ভক্তপরিবারের মনে পড়িল— শাড়ী রোদে শুকাইতে দিয়াছিলেন, আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। ভক্তেরা লজ্জা ও বিনয় প্রকাশ এবং আপশোষ করিয়া বলিলেন যে, এত কষ্ট করিয়া শাড়ী আনিবার প্রয়োজন ছিল না। সন্তান যখন মায়ের দুঃখ ও উদ্বেগের কথা জানাইলেন, তখন প্রথমে তাঁহাদের মন বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল, পরে মাতৃস্নেহে দেহ পুলকিত ও হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। জয় মা! এ কি আর পাতানো মার সন্তানের প্রতি স্নেহ! এক মুহূর্তের দেখাতে এমন সম্পর্ক পাতানো সম্ভব নয়! মুহূর্তের মিলন! চোখের দেখা জীবনে আর হইবে কিনা কে জানে! কিন্তু যে স্নেহের স্পর্শ তাঁহারা পাইলেন তাহা চিরস্থায়ী অটুট। এ যেন মাতৃহারা পথে-ঘোরা সন্তান দীর্ঘকাল পরে মাকে পাইয়াছে।

[ক্রমশঃ]

কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী প্রভানন্দ

দ্বিতীয় পর্ব

[পূর্বানুবৃত্তি]

দিন গড়িয়ে চলে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহের ব্যাধি বেড়েই চলেছে।

৪ঠা জানুআরি- সোমবার। এদিনের একটি মনোজ্ঞ চিত্র 'শ্রীম' উপহার দিয়েছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত-গ্রন্থের তৃতীয় ভাগ, ত্রয়োবিংশ খণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে।

নরেন্দ্রনাথ ও মাষ্টার মশায়ের কথোপকথন হতে জানতে পারা যায়, বিগত ২রা জানুআরি, শনিবার নরেন্দ্রনাথ কাশীপুর বাগানে ধ্যান করতে করতে কুলকুণ্ডলিনী-জাগরণের সুস্পষ্ট আভাস পেয়েছিলেন। নরেন্দ্র বলেন: "···বেশ বোধ হলো— ইড়া, পিঙ্গলা। হাজরাকে বললাম, বুকে হাত দিয়ে দেখতে। কাল রবিবার উপরে গিয়ে এঁর (ঠাকুরের) সঙ্গে দেখা কল্লাম ;— ওঁকে সব বললাম। আমি বললাম, 'সব্বাই-এর হ'লো, আমায় কিছু দিন। সব্বাই-এর হ'লো আমার হবে না ?' "

নরেন্দ্র আরও বলেন: "তিনি বললেন, 'তুই বাড়ীর একটা ঠিক্ করে আয় না, সব হবে। তুই কি চাস্ ?' "

নরেন্দ্র ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেন: 'আমার ইচ্ছা অমনি তিনচার দিন সমাধিস্থ হয়ে থাকবো! কখন কখনও এক একবার খেতে উঠ্‌বো!'

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরে বলেন: "তুই ত বড হীনবুদ্ধি! ও অবস্থার উঁচু অবস্থা আছে। তুই ত' গান গাস, 'যো কুচ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়'।"

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আশা-ভরসা দিয়ে আরও বলেন: 'তুই বাড়ির একটা ঠিক ক'রে আয়, সমাধিলাভের অবস্থার চেয়েও উঁচু অবস্থা হতে পারবে।'[১]

৪ঠা সকালবেলা নরেন্দ্রনাথ বাড়ী গিয়েছিলেন। জটিল কয়েকটি ভাবনা নিয়ে তিনি ভাবিত। বাড়ীতে মা ও ভাইবোনেরা ভরণপোষণের জন্য তাঁর মুখাপেক্ষী। এদিকে পৈতৃক সম্পত্তির পার্টিশন মামলায় মদত তাঁকেই দিতে হচ্ছে। মহামায়ার বিচিত্র রঙ্গ। আজ হতে নব্বই বছর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হয়েও নরেন্দ্রনাথ চাকরী জোগাড় করতে পারেননি; তিনি আইন-পরীক্ষা দেবার সঙ্কল্প করেছিলেন।

প্রতিবেশী রামচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে[২] যেতেই আত্মীয়-স্বজনেরা বকাবকি করতে থাকে: 'কি হো হো ক'রে বেড়াচ্ছিস্? আইন একজামিন্ এত নিকটে, পড়াশুনা নাই, হো হো করে বেড়াচ্ছ।'

---

১ মনে হয় আলোচ্য দিনের পরবর্তী কোন একদিন নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, যাতে তিনি শুকদেবের মত সমাধিতে ডুবে থাকতে পারেন। ঠাকুর উত্তেজিত কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন: 'ছি ছি, তুই এতবড় আধার, তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস! ...আমি বা [ ] সব ভালবাসি। ... তুইও তাই কর—একাধারে জ্ঞানী ও ভক্ত দুই হ।' (স্বামী গম্ভীরানন্দের যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১।১৭৯;পৃঃ পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

২ মাষ্টার মশাইয়ের ডায়েরী, পৃঃ ৬৩২

নরেন্দ্র বাড়ীতে যান। জননী ভুবনেশ্বরীদেবী পুত্রকে আদর করে হরিণের মাংস খাওয়ান। খাওয়া সেরে নরেন্দ্র যান তাঁর পড়বার ঘরে। তিনি পড়তে বসেন। এমন সময় ঘটে একটি ঘটনা। অকস্মাৎ একটি ভাবান্তর তাঁর চিত্তকে গ্রাস করে। অনন্যভূতপূর্ব তাঁর এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা তিনি স্বমুখে বলেছেন : 'দিদিমার বাড়ীতে, সেই পড়বার ঘরে, পড়তে গেলাম। পড়তে গিয়ে পড়াতে একটা ভয়ানক আতঙ্ক এলো,— পড়াটা যেন কি ভয়ের জিনিষ! বুক আটুপাটু করতে লাগলো।— অমন কান্না কখনও কাঁদি নাই। তারপব বই-টই ফেলে দৌড়!— রাস্তা দিয়ে ছুট। জুতো টুতো রাস্তায় কোথায় একদিকে পড়ে রইলো! খড়ের গাদার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম,— গায়েময়ে খড়,— আমি দৌড়ুচ্ছি,— কাশীপুরের রাস্তায়।'

এই ঘটনার কিছু বাড়তি তথ্য পাই স্বামী সারদানন্দের স্মৃতিকথা হতে। তিনি বলেছিলেন : "আইন পড়বার জন্য স্বামীজী ফিস জমা দিয়েছিলেন। · ন'বাবু (গিরিশবাবুর ভাই) তাঁকে খালি পায়ে যেতে দেখে কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন, 'আমার আমি মরেছে।' স্বামীজী গিরিশবাবুকে গোপনে মনের অবস্থা জানিয়ে এসেছিলেন।" (ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য : স্বামী সারদানন্দের জীবনী, পৃঃ ৩৬৬)।

৪ঠা জানুআরি বিকাল সাড়ে চারটার সময় মাষ্টার মশাই কাশীপুর বাগানে এসেছিলেন। দোতলায় ঠাকুরের ঘরে ঢুকে দেখেন তিনি ঘরে নেই, শৌচাগারে গেছেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর ঘরে এলে মাষ্টার মশাই ও দক্ষিণেশ্বর হতে আগত রামলালদাদা তাঁর পাদবন্দনা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ রামলালদাদাকে জিজ্ঞাসা করেন : ওখানে (দক্ষিণেশ্বরে) কি এখন বড় ঠাণ্ডা?

এমন সময় নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘরে এসে বসেন। ত্যাগীর রাজা শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের বৈরাগ্যের স্ফূর্তি দেখে মহাখুশী। নরেন্দ্রকে দেখে তিনি তাঁর ব্যাধির যন্ত্রণা ভুলে যান, নরেন্দ্রের জন্য তাঁর স্নেহ শতধারে উথলিয়ে ওঠে। নরেন্দ্রের ইচ্ছা তিনি দক্ষিণেশ্বরে বেলতলায় ধুনি জ্বেলে বসবেন, পঞ্চমুণ্ডীতে বসে ধ্যান করবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বুঝিয়ে বলেন যে, বেলতলায় আগুন জ্বালালে ম্যাগাজিন কর্তৃপক্ষীয়েরা আপত্তি করবে। তার চাইতে 'পঞ্চবটী ভাল জায়গা— অনেক সাধু ধ্যানজপ করেছে। কিন্তু বড় শীত আর অন্ধকার।'

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ যেন কৌতুক করেই জিজ্ঞাসা করেন : 'পড়বি না?'

নরেন্দ্র : 'একটা ঔষধ পেলে বাঁচি, যাতে পড়াটড়া যা হয়েছে সব ভুলে যাই।' উপস্থিত সেবক বুড়োগোপাল প্রার্থনা জানান নরেন্দ্রনাথের সঙ্গী হবার জন্য। ঠাকুর ভক্ত কালীপদ ঘোষ-আনীত আঙ্গুর নরেন্দ্রকে দেন তারপর হরিলুটের মত ছড়িয়ে দেন, ভক্তেরা কুড়িয়ে নেন।

রাত্রি আটটার সময় মাষ্টার মশাই সেবক শশীকে দেখতে পান পাচক ঠাকুরের ঘরে। তিনি জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে ঠাকুরের কণ্ঠক্ষত হতে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে।[১]

রাত্রি নয়টা নাগাদ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্রাম করে উঠেছেন। নিরঞ্জন, শশী, মাষ্টার মশাই প্রভৃতি ঠাকুরের কাছে বসেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের তীব্র বৈরাগ্যের বিষয়ে বলতে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্কেত করে বলেন : 'নরেন্দ্রের অবস্থা কি আশ্চর্য! দেখো এই নরেন্দ্র আগে সাকার মানত না! এর প্রাণ কিরূপ আটু পাটু হ'য়েছে দেখছিস্! ··· ঈশ্বরের জন্য প্রাণ আটু পাটু করলে

---

১ মাষ্টার মশায়ের ডায়েরী, পৃঃ ৬৩৩

জানবে যে দর্শনের আর দেরী নাই। অরুণ উদয় হ'লে— পূর্বদিক লাল হ'লে,— বুঝা যায় সূর্য উঠবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ সাধকের ব্যাকুলতার উপর খুবই গুরুত্ব দিতেন। তিনি বলেন : 'ব্যাকুলতা থাকলে তাঁর কৃপা হয়। ··· তাই বলছি, ব্যাকুলতা থাকলে সব হ'য়ে যায়।' (কথামৃত ১।১৩।৩)। 'ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজলে তাঁকে দর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয়, যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা কচ্ছি। সত্য বলছি দর্শন হয়।' (কথামৃত ১।১২।৩)। ইদানীং নরেন্দ্রের মধ্যে সেই তীব্র ব্যাকুলতা দেখে লোকগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ হৃষ্ট হয়েছেন, নরেন্দ্রের ব্যাকুলতার আবেগ বারংবার উল্লেখ করে তিনি অপর সাধকদের উৎসাহ দান করেছেন।

নরেন্দ্রনাথের সাধকজীবনে জ্ঞানসূর্যের উদয় হতে প্রচণ্ড মার্তণ্ডরূপ ধারণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিজের অভিজ্ঞতা হতে বর্ণনা করেছেন স্বামী সারদানন্দ : 'ঈশ্বরলাভের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের আকুল আগ্রহ আমরা কাশীপুরে স্বচক্ষে দর্শন করিতেছিলাম। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য নির্ধারিত টাকা জমা দিতে যাইয়া কেমন করিয়া তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল, উহার প্রেরণায় অস্থির হইয়া কেমন করিয়া তিনি একবস্ত্রে নগ্নপদে জ্ঞানশূন্যের ন্যায় শহরের রাস্তা দিয়া ছুটিয়া কাশীপুরে শ্রীগুরুর পদপ্রান্তে উপস্থিত এবং উন্মত্তের ন্যায় নিজ মনোবেদনা নিবেদনপূর্বক তাঁহার কৃপালাভ করিলেন, আহার-নিদ্রা ত্যাগপূর্বক কেমন করিয়া তিনি ঐ সময় হইতে দিবারাত্র ধ্যান, জপ, ভজন ও ঈশ্বরচর্চায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন,··· এবং কেমন করিয়া শ্রীগুরুপ্রদর্শিত সাধনপথে দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হইয়া তিনি দর্শনের পর দর্শন লাভ করিতে করিতে তিনচারি মাসের অন্তেই নির্বিকল্প-সমাধিসুখ প্রথম অনুভব করিলেন— এই সকল বিষয় তখন আমাদের চক্ষের সমক্ষে অভিনীত হইয়া আমাদিগকে স্তম্ভিত করিতেছিল।' (লীলাপ্রসঙ্গ ২।২১৭-৮)। এই অননুকরণীয় 'অভিনয়ে'র প্রথমাঙ্কেই দেখি, ব্যাকুলতার আবেগে বিক্ষুব্ধ নরেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের গুরুতর পীড়ার বিষয় যেন সাময়িকভাবে ভুলে বসেছেন, তিনি বাগানবাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছেন দক্ষিণেশ্বরের তপোবনে। সম্ভবতঃ ৪ঠা জানুআরি হতেই তিনি কাশীপুর হতে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ধ্যান ভজন আরম্ভ করেছিলেন।

অমা স্যার নীরব নিথর তিমির রাত্রি। রাত্রি নটার পরে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করে যাত্রা করেন নরেন্দ্রনাথ। যতদূর জানা যায়, প্রথম রাত্রির অভিযানে তাঁর সঙ্গী ছিলেন বুড়োগোপাল ও শরৎ।

সম্ভবতঃ এই রাত্রেরই একটি ঘটনা পরবর্তী কালে বিবৃত করেছিলেন স্বামী সারদানন্দ শরৎ।

"নরেন্দ্রনাথ ও আমি একবার দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটীতে ধুনি জ্বালিয়া বসিয়া জপধ্যান করিতেছিলাম। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব পূর্বেই ঐখানে রাত্রিকালে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন,[১] কিন্তু সে কথায় তখন কেহ বিশেষ মনোযোগ করে নাই। নরেন্দ্রনাথ ও আমি ধুনি জেলে বসে ধ্যান করছি। রাত্রি একটা কি দেড়টা হয়েছে। আমাদের ধ্যানটা বেশ জমে গেছে। হঠাৎ নরেন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে দেখি যে, নরেন্দ্রনাথ একদৃষ্টে কটমট করে চেয়ে রয়েছে। একি! নরেন এমন বিকট দৃষ্টি করে চেয়ে রয়েছে কেন? মাথাটা কিছু

১ 'কথামৃত' হতে উদ্ধৃত পূর্বের আলোচনায় মধ্যে এই সাবধানবাণী দেখতে পাই না। সম্ভবতঃ পূর্বে কোন একদিন ঠাকুর এবিষয়ে বলেছিলেন।

খারাপ হল নাকি? আমি একটু উদ্বিগ্ন হলুম কিন্তু স্থির হয়ে রইলুম। তারপর দেখলুম নরেন কার উপর রেগেছে এবং সমুখে কাকে দেখছে আর তার উপর রেগে, খেঁকিয়ে চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে। আমি বুঝলুম অনাহার, অনিদ্রা, ও সারা দিনরাত জপধ্যান করে নরেনের মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। একটু পরে দেখি না নরেন একখানা জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে, 'তবে রে শালা' ব'লে অন্ধকারে যেন কাকে মারতে উঠলো। আমার তখন ঠিক ধারণা হলো যে, নরেন ঠিক ক্ষেপে গেছে। আমি ত একটানে দৌড় দিয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরের দিকে পালালুম অথচ নরেনের তখন এরকম অবস্থা দেখে পালাতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। — যাক একটু পরে দেখি নরেন কাঠটা ধুনিতে রেখে স্থির হয়ে বসলো। আমাকে কাছে না দেখে ডাকল 'ও শরৎ, কোথা গেলি? আয় না।' আমি অপ্রস্তুত হয়ে ধুনির কাছে গিয়ে আবার বসলুম। নরেন বললে, 'ভয় করতে হবে না, সে শালাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। শালা আর ভয় দেখাতে আসবে না।' আমি বললুম, 'সে আবার কে?' নরেন বললে, 'ভাবে যে শালার কথা উনি বলেছেন, শালা উৎপাত করতে এসেছিল।' তারপর আমরা আবার জপধ্যান করতে বসেছিলুম।" (হেমেন্দ্রনাথ দত্ত: শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, পৃঃ ৪১-২)।

পরদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে এই ঘটনা বলতেই তিনি সহাস্যে নিজের অভিজ্ঞতার কিছু কিছু বর্ণনা করেছিলেন।[১]

এদিক রাত্রিবেলা নীচের হলঘরে মাষ্টার মশাই শুয়েছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখেন যে নরেন্দ্র প্রভৃতি সন্ন্যাসী হয়েছেন, ধুনি জ্বেলে বসে আছেন। ভোর প্রায় ছটার সময় তিনি ঠাকুরের ঘরে গিয়ে দেখেন তিনি নিদ্রাভিভূত। তিনি সেবক শশীকে বলে বিদায় নেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহের ব্যাধি বেড়েই চলেছে। কথা বলতে কষ্ট পান। আহার্য প্রায়ই গলাধঃকরণ করতে পারেন না। ডাক্তারেরা তাঁকে ব্যবস্থা দেন, গুগলির ঝোল খাবার জন্য। শ্রীমা গুগলির ঝোল রাঁধতে ইতস্তত করছেন লক্ষ্য করে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেন: 'আমি খাব, আমার জন্য রাঁধবে, তাতে কোন দোষ হবে না। ছেলেরা পুকুর থেকে গুগলি এনে তৈরী করে দেবে, তুমি রান্না করবে।' সেবক কালীপ্রসাদ ছোট পুষ্করিণীর ঘাটের পাশ থেকে গুগলি সংগ্রহ করতেন ও খোলা ভেঙে প্রস্তুত করে শ্রীমাকে রান্নার জন্য দিতেন। শ্রীমা সেগুলি সিদ্ধ করে ঝোল তৈরী করতেন ও ভাতের মণ্ডের সঙ্গে ঠাকুরকে খাওয়াতেন। (স্বামী অভেদানন্দ: আমার জীবনকথা, পৃঃ ৮৩ দ্রষ্টব্য)।

৫ই জানুআরি, ২১শে পৌষ, মঙ্গলবার বিকাল চারটার পর মাষ্টার মশাই কাশীপুরে উপস্থিত হয়েছেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেন: 'আচ্ছা, ছোকরাদের একি হচ্ছে বল দেখি? কেউ শ্রীক্ষেত্রে পালাচ্ছে— কেউ গঙ্গাসাগরে![২] বাড়ী ত্যাগ করে করে সব আসছে। দেখ না নরেন্দ্র।

---

১ লীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেন যে শ্রীমৎ তোতাপুরী ঐ দেবযোনি ভৈরবের দর্শন পেয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তোতাপুরীকে বলেছিলেন: 'হাঁ, উনি ঐখানে থাকেন বটে। আমিও উঁহার দর্শন অনেকবার পেয়েছি।' (লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় খণ্ড, পৃঃ)

২ ওরা জানুআরি সারদাপ্রসন্ন শ্রীক্ষেত্রের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন। গঙ্গাসাগরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন ক্ষীরোদ। যে কোন কারণেই হোক সে-যাত্রায় ক্ষীরোদের যাওয়া হয় না। পৌষ সংক্রান্তির দিন— গঙ্গাসাগরে যাবেন দিন— তাঁকে আমরা দেখতে পাব কাশীপুরে।

তীব্র বৈরাগ্য হলে সংসার পাতকুয়ো বোধ হয়, আত্মীয়েরা কালসাপ বোধ হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহীভক্ত মাষ্টার মশাইকে আশ্বস্ত করে বলছেন: 'মনে ত্যাগ হলেই হ'লো, তা হ'লেও সন্ন্যাসী।' কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বলেন: 'কিন্তু বাসনায় আগুন দিতে হয় তবে ত!'

আবার নিজের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেন: '...আচ্ছা, এত আনন্দ ভাব—এ সব কোথায় গেল?'

মাষ্টার: 'বোধ হয় গীতায় যে ত্রিগুণাতীতের কথা বলা আছে সেই অবস্থা হয়েছে। সত্ত্ব রজঃ তমো গুণ নিজে নিজে কাজ করছে, আপনি স্বয়ং নির্লিপ্ত—সত্ত্ব গুণেতেও নির্লিপ্ত।'

শ্রীরামকৃষ্ণ: 'হাঁ! বালকের অবস্থায় রেখেছে। আচ্ছা, দেহ কি এবার থাকবে না!'

(কথামৃত ৩।১৩।৩)।

এমন সময় নরেন্দ্রনাথ উপস্থিত হন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর মা ও ভাইরা অতি কষ্টে দিনাতিপাত করছিলেন। নরেন্দ্র আজ একবার বাড়ী যাবেন, ব্যবস্থা করে আসবেন। 'একজন বন্ধু' তাঁকে এক'শ টাকা দিতে রাজি হয়েছেন। সেই টাকায় বাড়ীর তিন মাসের খাওয়ার জোগাড় করে দিয়ে আসবেন। (ঐ)। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, 'বন্ধুটি' মাষ্টার মশাই স্বয়ং।

পরদিন ৬ই জানুআরি, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ, ২৩শে পৌষ, ১২৯২ বঙ্গাব্দ, বুধবার শুক্লা প্রতিপদ। মাষ্টার মশাই স্কুল ছুটির পর কাশীপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন সঙ্গে তাঁর স্ত্রী নিকুঞ্জদেবী ও পুত্র নটি।[১] তাঁরা কাশীপুর বাগানবাড়ীতে পৌছান, তখন বেলা সাড়ে তিনটা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দোতলায় তাঁর ঘরে বিশ্রাম করছেন। বালক ভক্ত সুবোধও কাশীপুর বাগানে উপস্থিত। মাষ্টার মশাই সুবোধ ও নটিকে নিয়ে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যান। কিছুক্ষণ বেড়িয়ে তাঁরা ফিরে আসেন বাগানবাড়ীতে।

ঠাকুরের দেহে কঠিন ব্যাধি, তবুও সদানন্দ ঠাকুরকে কেন্দ্র করে কতভাবেই না বিমল হাস্যরসের সৃষ্টি হচ্ছে। মাষ্টার মশাই ও অন্যান্য ভক্তেরা জানতে পারেন যে, অপরাপর আগ্রহী ভক্তসেবকদের মত সরলপ্রাণ সুবোধও ঠাকুরের রোগ-নিরাময়ের জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি ঠাকুরকে বলেছিলেন: 'আপনি দক্ষিণেশ্বরে যে সাঁৎসেঁতে ঘরে থাকতেন তাই আপনার গলা-ব্যথা হয়েছে। আপনি চা খান। আমাদের গলা-ব্যথা হলে আমরা চা খাই, আমাদের গলা-ব্যথা সেরে যায়।' শ্রীরামকৃষ্ণ ততোধিক সরল। তিনি চা পান করতে সম্মত হন। তখন সেবক রাখাল এগিয়ে এসে বলেন: 'সে কি আপনার সহ্য হবে? সে যে গরম জিনিস।' শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে বলেন: 'না বাপু, তাহলে আবার উলটে গরম হয়ে যাবে।' তিনি সুবোধকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন: 'ওরে সইল না।'[২] সুবোধ কি আর করেন, তাঁর সুচিন্তিত বিধিব্যবস্থাটা একবার প্রয়োগই করা গেল না দেখে সুবোধ বোধ করি একটু হতাশ হলেন।

মাষ্টার মশাই দোতলায় ঠাকুরের ঘরে ঢুকে দেখেন, সেখানে উপস্থিত মহিমা চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনাথ, নিরঞ্জন প্রভৃতি। মাষ্টার মশাই আসন গ্রহণ করেন, তাঁর ডাইনে ভক্ত কালীপদ।

শীতের অপরাহ্ণ ক্ষিপ্রগতিতে ক্ষয় হয়ে চলেছে। সূর্যাস্তকাল সমাগতপ্রায়। ক্ষীণদেহ শ্রীরামকৃষ্ণ শয্যার উপর উপাসীন, তাঁর অধরে স্ফুরিত হাসি।

---

১ নটি মাষ্টার মশায়ের পুত্র প্রভাস।

২ স্বামী গম্ভীরানন্দ: শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা, ২।৭১-৭২ দ্রষ্টব্য।

উপস্থিত সকলে চোখ বন্ধ করে ধ্যান করছেন; মাষ্টার মশাই চোখ মেলে চেয়ে থাকেন। নিশ্ছিদ্র নিঃশব্দ পরিবেশ। অকস্মাৎ মহিমাচরণ বলেন: 'ধ্যানে সব লেগে গেছে— আর আশ্চর্য সব ক্রিয়া হচ্ছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিতে বলেন: 'মগ্ন হও।' সময় বয়ে চলে।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টার মশায়ের দিকে তাকিয়ে বলেন: 'চক্ষু বুজলেই ধ্যান আর খুললেই নাই ?— চেয়ে থাকলেও ধ্যান হয়।'

মহিমা: 'তবে প্রথম প্রথম চোখ বুজেই ধ্যান করতে হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ চুপচাপ বসে থাকেন। উপস্থিত সকলের দৃষ্টি তাঁর প্রফুল্ল-আননের দিকে। আবার কথা শুরু করেন মহিমাচরণ: 'এখন কি নামাদি এসব কম পড়বে ?'

উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলেছিলেন জানা যায় না। প্রাণায়াম সম্বন্ধে কথা ওঠে। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাণায়ামের তথ্য ও মর্মদ্রষ্টা। পণ্ডিতম্মন্য মহিমাচরণ বলতে থাকেন: 'ওটা পরিশ্রমের সাধন— ওটা অভ্যাস করা সহজ নয়, নিরাপদ নয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ: 'তা কেন, আপনি হয়— ওঁকারধ্বনি আপনি ওঠে।

'ধ্বনি নাভি থেকে আপনি ওঠে। যেমন ভেজা কাঠের আগুন জ্বাললে ফর ফর শব্দ করতে থাকে। আবার দুকান হাত দিয়ে চেপে ধরলে যেমন শোঁ শোঁ শব্দ করে।

'তবে ওঁকার একটা অবলম্বন বৈ ত নয়।

'কাপ্তেনের বাড়ীতে হঠাৎ দর্শন হ'ল। ক্ষীরোদশায়ী মহাবিষ্ণু। মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে ওঁকার ধ্বনি উঠে আসতে আসতে আমার নাভিতে আঘাত করল। তারপর কাঁপতে কাঁপতে সব লীন হয়ে গেল।'

শ্রীরামকৃষ্ণের বিশাল ও গভীর অধ্যাত্মজীবন অনন্ত ভাবৈশ্বর্যে ভরপুর। অতুলনীয় তাদের অভিব্যক্তি। তাঁর শ্রীমুখে সে সকল ভাবৈশ্বর্যের বর্ণনা শুনে ভক্তরা বিস্মিত হন, অজানা ভাবব্যঞ্জনায় পুলকিত হন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বুকে গলায় ব্যথা যন্ত্রণা, ক্যান্সারের তীক্ষ্ণ তীব্র যন্ত্রণা। তিনি সে-সব কিছু ভুলে গিয়ে সৎপ্রসঙ্গে মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন। যথাসম্ভব আকারে ইঙ্গিতে বলেন, কখনও স্খলিতকণ্ঠে ক্ষীণস্বরে কিছু কথা বলেন। তিনি তাঁর ডান হাত মুঠো করে দেখান বদ্ধ জীবের আবদ্ধ অবস্থা। হাতের মুঠো খুলে তিনি বলেন: 'জীব বন্ধন মুক্ত হয়ে শেষে অখণ্ডে লীন হয়ে যায়। যেমন খাল বিল নদী সব সমুদ্রে এসে পড়ে— সেখানে সব একাকার হয়ে যায়।'

মহিমা চক্রবর্তী নিজেকে জ্ঞানমার্গী অগ্রসর সাধক বলে মনে করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন: 'সংসারী কি সাধন করে ঐ বাঁধন খুলতে পারে ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ: 'সংসারে ক্রিয়াদিও এসব কঠিন সাধ্য, সংসারীদের মনে মনে ত্যাগ করলেই চলবে।'

মহিমা: 'হ্যাঁ, মনে ঠিক ঠিক ত্যাগ হলে আর বন্ধন থাকে না। সংসারে থেকে জনকত্ব অবস্থা অর্জন যে সম্ভব, নরেন্দ্র একথা মানে না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ: 'চৈতন্যদেবের ভক্তদের কেউ কেউ গৃহী ছিল, কিন্তু তাদের ভিতর ছিল ফাঁকা। যেমন, বাঁশের ভিতরটা ফোপড়া।'

নরেন্দ্র খাপ-খোলা তলোয়ার। বৈরাগ্যের দীপ্তিতে ঝলমল করে তাঁর ব্যক্তিত্ব। নরেন্দ্রনাথ বলেন: 'সংসার নিঃশেষে ত্যাগ করতেই হবে। সাংসারিকতা ফিকে করে ভিতরটা ফাঁকা করতেই হবে। লাখের ভিতর একজন কি দুইজন ঠিক ঠিক ত্যাগ করতে পারে!'

শ্রীরামকৃষ্ণ চুপচাপ বসে থাকেন। শান্ত আনন্দমূর্তি, করুণার বিমল কিরণে উজ্জ্বল আনন।

তিনি লক্ষ্য করেন নরেন্দ্রকে। নরেন্দ্রের অন্তর তীব্র বৈরাগ্যের দহনে প্রজ্বলিত, সাংসারিকতার বীজ পর্যন্ত সেই অনলে প্রায়-ভস্মীভূত। বেশ কিছুক্ষণ সময় চলে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ মৃদুস্বরে বলেন: 'ওঁকে আমোক্তারি দাও। সংসারের বাঁধন ভাঙা ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর করছে।'

কিয়ৎক্ষণপরে শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমাকে লক্ষ্য করে বলেন: 'আচ্ছা, ওটা কি কিছুতে আছে?'

মহিমা: 'আজ্ঞে, ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর বিষয় বিষ্ণুপুরাণে আছে।'

মহিমাচরণ সম্ভবতঃ বিষ্ণুপুরাণের প্রলয়ের বিষয় উল্লেখ করেছেন। সেখানে পরাশর মৈত্রেয়কে বলছেন যে, নৈমিত্তিক প্রলয়ের সময় সপ্তর্ষিগণের স্থান পর্যন্ত জলমগ্ন হবে অখিল ভুবনকে দেখাবে যেন একটি মহাসমুদ্র। ভগবান বিষ্ণুর মুখ হতে উৎসারিত প্রবল বায়ু প্রচণ্ডবেগে শতবৎসর ধরে প্রবাহিত হবে। অতঃপর সমস্ত বিশ্বের আদিপুরুষ অনাদিনিধন ভূতভাবন বিষ্ণু সেই বায়ুকে নিঃশেষে পান করে একার্ণব সেই সমুদ্রমধ্যে শেষশয্যায় শয়ন করবেন।[১]

মহিমাচরণের কথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: 'মাইরি বলছি, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি আমি আগে কখনও শুনি নি— এরকম দু'একবার মা দেখিয়ে দিয়েছে।'

শাস্ত্রে বর্ণিত তত্ত্ব ও তথ্যের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধির সাযুজ্য দেখে ভক্তগণ উৎফুল্ল হন, আর এই দিব্যকাহিনী শ্রীরামকৃষ্ণের স্বমুখে শুনে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করেন।

প্রীত বিস্মিত ভক্তগণ নিজ নিজ ভাব ও সামর্থ্য অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যকাহিনীর নিগূঢ় অবধারণের চেষ্টা করছিলেন, ঠিক সেই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরূপ পটভূমিকায় পূর্বে যা করতেন তাই করতে সুরু করলেন। তিনি তাঁর দেহের রোগের বিষয়ে ভক্তগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন: 'এতো হ'লো— কিন্তু ব্যারামটা—।' এবং কাতরতা প্রকাশ করেন।[২]

ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণে অধিকতর বিস্মিত হন, কতকটা বিমূঢ় বোধ করেন। অবতার পুরুষের রহস্যঘন জীবনের তাৎপর্য সামগ্রিকভাবে নিরূপণে তাঁরা ব্যর্থ হন। কিন্তু রোগ-ক্লিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণের কাতর কণ্ঠ শুনে প্রাণে ব্যথা অনুভব করেন, কারুর কারুর চোখে জল এসে যায়।

মাষ্টার মশাই ও অন্যান্য ভক্তেরা শোনেন প্রতাপ হাজরা মশাইয়ের নূতন এক কীর্তি। হাজরা মশাই উপোস করেছিলেন। উপস্থিত হয়েছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে। ঠাকুর তাঁর মতলব বুঝে সেবককে ডেকে বলেন: 'ওকে যেতে বল এখান থেকে।'

হাজরা মশাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পা-দুটো জড়িয়ে ধরেন। ঠাকুর অত্যধিক বিরক্ত বোধ করেন। তিনি হাজরাকে বলেন: 'এসব কি ঢঙ্ করছ? পা ছাড়— লাটুকে ডেকে দাও।'

এত বলাতেও হাজরা মশাই ঠাকুরের পা

---

১ সর্বভূতময়োঽচিন্ত্যো ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
অনাদিরাদির্বিশ্বস্য পীত্বা বায়ুমশেষতঃ॥
একার্ণবে ততস্তস্মিন্ শেষশয্যাস্থিতঃ প্রভুঃ।
ব্রহ্মরূপধরঃ শেতে ভগবানাদিকৃদ্ধরিঃ॥ বিষ্ণুপুরাণ ৬।৪।৩-৪

২ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের একটি মন্তব্য: 'কোন কোন ব্যক্তির নিকট তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) রোগের কথা কহিয়া চিন্তাকুল হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা তাঁহার মনোগত ভাব ছিল না।' (পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ১৭৩)

ধরে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ: 'ছাড়, ছাড় লোকে দেখবে, নানান কথা বলবে।' এবার হাজরা মশাই নিরস্ত হন: তিনি বিদায় নেন।

সন্ধ্যা হয়েছে। নরেন্দ্র ও মাষ্টার মশাই ছুটকো গোপালের ঘরে যান। সে-সময়ে দোতলার হলঘরের পাশের ছোট ঘরটিতে তিনি থাকতেন। গোপাল ধূপ-ধুনো হাতে নিয়ে ঠাকুরের ঘরে ঢোকেন।

তখন রাত্রি প্রায় সাতটা। নরেন্দ্র ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হয়েছেন। নরেন্দ্রের হৃদয়ে বৈরাগ্যের ধুনি দাউ দাউ করে জ্বলছে। সেইসঙ্গে ঈশ্বরদর্শনের জন্য হৃদয়ের ব্যাকুলতা ও প্রাণের আকুলতা তাঁর আচার-আচরণে উপছিয়ে পড়ছে। গত কয়েকদিন ধরে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে তিনি সারারাত জপধ্যান করছেন।

নরেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেন: 'আজও পঞ্চবটীতে ধ্যান করবো, কিছু হবে কিনা বলুন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সস্নেহে বলেন: 'তুটি লোকের বেশী সঙ্গে নিয়ে যাস না।'

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রণাম করে দক্ষিণেশ্বরে রওয়ানা হন। ঠাকুর স্নেহাকুল জননীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন তাঁর পথের দিকে। [ক্রমশঃ]

হিন্দুর বর্ণবিভাগ গুণগত কি বংশগত ?

শ্রীঅমূল্যপদ চট্টোপাধ্যায়

আজকাল অনেকে বলেন, ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ"—অতএব গুণ ও কর্মের বিচার করিয়াই ব্রাহ্মণাদি বর্ণের নির্ণয় করা উচিত, উহাই গীতার ঐ বাক্যের তাৎপর্য। তাঁহারা আরও প্রমাণ দেখান যে, মহাভারতে যুধিষ্ঠির-অজগর-সংবাদে বলা হইয়াছে—"ন শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণঃ ন চ ব্রাহ্মণঃ। যত্রৈতৎ লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ॥ যত্রৈতৎ ন ভবেৎ সর্প স শূদ্রমিতি নির্দিশেৎ॥" অর্থাৎ 'শূদ্র, শূদ্র নহে এবং ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ নহে। হে সর্প! যাহার মধ্যে ব্রাহ্মণের গুণ (সত্য, অহিংসা প্রভৃতি) দেখিতে পাইবে, তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে এবং ঐগুলি যাহাতে থাকিবে না, তাহাকে শূদ্র বলিয়া জানিবে।' এই বাক্য তো গুণকর্ম দেখিয়া বর্ণবিভাগের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বর্ণবিভাগ সম্বন্ধে মাত্র এই দুইটি শঙ্কার উত্তরই এই প্রবন্ধে আমরা দিতেছি—(১) "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ" এই বাক্যের আক্ষরিক অর্থ—'আমি গুণকর্মবিভাগানুসারে চারি-বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি।' এখানে ভগবান্ বলিলেন, চাতুর্বর্ণ্য আমি সৃষ্টি করিয়াছি, তিনি তো ইহা বলেন নাই যে, মনুষ্যগণ গুণকর্মের বিচার করিয়া চারটি বর্ণবিভাগ ঠিক করিয়া লইবে। ভগবান্ যে চাতুর্বর্ণ্যের সৃষ্টি করিলেন, উহাতে গুণকর্ম-বিভাগশঃ বলা হইল কেন? ইহার উত্তর—সৃষ্টিতে দেখা যায় কেহ পুণ্যবান্, কেহ পাপী, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কাহারও জন্ম উত্তম ব্রাহ্মণাদি কুলে, কাহারও জন্ম নীচ কুলে—ইত্যাদি বৈষম্য দেখিয়া মনে সংশয় আসিতে পারে, ভগবান্ যদি সৃষ্টি করেন, তবে

তো সেই সৃষ্টিকার্যে তাঁহার পক্ষপাতিত্ব নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি দোষ আছে। সেই শঙ্কার নিবারণার্থ ভগবান্ বলিলেন, আমি রাগদ্বেষের বশীভূত হইয়া পক্ষপাতবশতঃ সৃষ্টি করি না, জীবসকলের পূর্ব পূর্ব জন্মের গুণ ও কর্মসকলের বিচার করিয়া জীবসকলকে উহাদের কর্মানুযায়ী ফলপ্রদানের জন্ম নিরপেক্ষভাবে সৃষ্টি করি। (মনে রাখিতে হইবে হিন্দুধর্মে পুনর্জন্মবাদ স্বীকৃত)। বেদান্তসূত্রকার ব্যাসদেবও সেইজন্ম বলিয়াছেন— "বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি" (২।১।৩৪) অর্থাৎ, 'যদি বল, সৃষ্টিকার্যে ঈশ্বরের বৈষম্য, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি দোষ আছে, তবে তাহার উত্তর এই যে, ঈশ্বরে উক্তপ্রকার দোষ নাই; কারণ, ঈশ্বরসৃষ্টি জীবের কর্মসাপেক্ষ, ইহা শ্রুতিতে দেখা যায়।' মেঘ যেমন বর্ষণদ্বারা সকল বীজকে সমানভাবে অনুগ্রহ করিলেও বীজসকলের বিশেষ বিশেষ শক্তি বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষের উৎপত্তির কারণ হয়, এইরূপ ঈশ্বর সচ্চিদানন্দরূপে সকল জীবসৃষ্টির সাধারণ কারণ হইলেও জীবগণের পূর্ব পূর্ব গুণ ও কর্ম উহাদের ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে বিশেষ বিশেষ রূপের অভিব্যক্তির কারণ। মনে রাখিতে হইবে সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি।

এখন দেখা যাক্ মানুষ যদি গুণকর্মের বিচার করিয়া বর্ণ নির্ণয় করিতে যায়, তবে উহাতে কি দোষ হয়— (১) সেই গুণ ও কর্মের বিচার কিরূপে করা হইবে? পরীক্ষা দ্বারা বা ভোট দ্বারা? মানুষ অসৎ হইলে অথবা লোকবল বা অর্থের প্রভাবে অনেকক্ষেত্রে গুণ ও কর্মকে পদদলিত করিয়া অনায়াসে উচ্চ জাতিতে স্থান লাভ করিতে পারে। (২) কত বৎসর বয়সে ঐ গুণকর্মের নির্ধারণ করা হইবে? কারণ শিশুকালে তো গুণকর্ম বুঝিবার উপায় নাই। যদি বালক সাবালক হইলে ঐ গুণকর্মের নির্ণয় করা হয়, তবে সাবালক হইবার পূর্বে শাস্ত্রে যে অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কারগুলি আছে, উহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে, কারণ শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের জন্ম ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা ও মন্ত্র আছে, পূর্বে বর্ণের নিরূপণ না থাকিলে কিরূপে উহা করা যাইবে? আর যদি বালক সাবালক হইলে পরীক্ষা বা 'ভোট' দ্বারা বর্ণ নিরূপণ করা হয়, তথাপি ঐ বর্ণব্যবস্থা ঠিক রাখা যাইবে না। কারণ মানুষের গুণকর্ম নিয়ত পরিবর্তনশীল। আজ আমাকে গুণকর্মের বিচার করিয়া ব্রাহ্মণ করা হইল, কিছুদিন পরে অসৎসঙ্গে পড়িয়া আমি অসৎ কাজ করিতে লাগিলাম, তখন আমাকে ব্রাহ্মণ হইতে নামাইতে হইবে কিন্তু আমার যদি অর্থ ও লোকবল থাকে, তবে আমিই বা অত সহজে নামিব কেন? বাধা দিব। ইহাতে সমাজে নিত্য কলহের ও বিবাদের সৃষ্টি হইবে। যদি বলা যায়, তবে বর্ণবিভাগ না থাকাই ভাল পাশ্চাত্য জাতিগণের মধ্যে জাতিভেদ না থাকায় তাহারা উন্নত। এতদুত্তরে বলি, পাশ্চাত্য জাতিগণের মধ্যেও নানাকারে জাতিভেদ রহিয়া গিয়াছে যেমন কৃষ্ণকায়, শ্বেতকায়, পীতকায় প্রভৃতি জাতি— উহাদের মধ্যে পরস্পরের আধিপত্য স্থাপনের প্রয়াস ও বিবাদ। আবার দেশ হিসাবে কেহ ইংরাজ, কেহ জার্মান, কেহ চীন ইত্যাদি অন্যপ্রকার জাতিবিভাগ এবং তজ্জন্ম পূর্বোক্ত প্রকারে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ও গণ্ডগোল। আবার ধনী, দরিদ্র; ইহাও একপ্রকার জাতিবিভাগ, তজ্জন্যও অশান্তির সৃষ্টি। ইউরোপ প্রভৃতি দেশে সকলে এক খ্রীষ্টান জাতি হইলেও তাহাদের মধ্যে এত যুদ্ধ হইল কেন? পাশ্চাত্যের এই ভোগমুখীন উন্নতি পৃথিবীতে শান্তি আনিতে পারে নাই, বরং ভোগের কাড়াকাড়ি এবং নিজ নিজ প্রভুত্বস্পৃহা পৃথিবীতে দিন দিন অশান্তির কারণ হইয়া উঠিতেছে। ইহা মানবজাতির উন্নতির লক্ষণ নয়— ইহা ধ্বংসের পথ। ভেদের বীজ অতি গভীরে এবং ব্রহ্মবিবর্জক

অজ্ঞানের মধ্যে নিহিত। একসঙ্গে আহার-বিহার করিলেই উহা নষ্ট হইয়া যাইবে না।

যাঁহারা গীতার "গুণকর্মবিভাগশঃ" ইত্যাদি বাক্য হইতে প্রমাণ করিতে যান যে, বর্ণবিভাগ গুণ ও কর্ম দেখিয়াই ঠিক করিতে হইবে, উহা বংশগত নয়, তাঁহাদের দৃষ্টি আমরা গীতার ৯।৩২ শ্লোকের দিকে আকর্ষণ করিতেছি। উহাতে বলা হইয়াছে—"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথাশূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥" অর্থাৎ আমাকে সম্যক্ আশ্রয় করিলে যাহারা পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্রও পরাগতি লাভ করিতে পারে।' এখানে তো জাতিকে বংশগতই করা হইল। মহর্ষি অত্রি আচারহিসাবে ব্রাহ্মণকে দশ-ভাগে ভাগ করিয়াছেন—"দেবোমুনির্দ্বিজোরাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ। পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥" অর্থাৎ 'আচারহিসাবে ব্রাহ্মণের দশটি বিভাগ আছে—'দেব, মুনি, দ্বিজ, রাজা, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, ম্লেচ্ছ ও চণ্ডাল।' আচারহিসাবে এইসকল ব্রাহ্মণের সমাজে আদরেরও তারতম্য হয়। গুণকর্মের সমাজে আদর থাকা স্বাভাবিক—উহা বরাবরই ছিল, আছে ও থাকিবে। মহাত্মা বিদুর, ভীষ্ম, ধর্মব্যাধ প্রভৃতির অনেক সদ্গুণ থাকায় তাঁহাদের সমাজে যে আদর ছিল তাহা সাধারণ ব্রাহ্মণের ছিল না —কিন্তু তজ্জন্য উঁহাদিগকে জাতি-ব্রাহ্মণ বলা হয় নাই। ভীষ্মদেবের তর্পণমন্ত্রে ব্রাহ্মণগণও "আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াম্" অর্থাৎ 'এই জলদ্বারা পুত্রপৌত্রোচিত ক্রিয়া প্রাপ্ত হও' এই মন্ত্রে মহাত্মা ভীষ্মকে পিতা, পিতামহের ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করেন। কিন্তু ঐ তর্পণ-মন্ত্রে "অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্মণে" এই মন্ত্রে ভীষ্মকে 'বর্মণে' শব্দের দ্বারা ক্ষত্রিয়ই বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ মাতাপিতা হইতে জাত পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় মাতাপিতা হইতে জাত পুত্র ক্ষত্রিয় প্রভৃতি হইয়া থাকে। এক জন্মেই জাতির পরিবর্তনের কথা হিন্দুশাস্ত্রে অতি বিরল। পূর্বকালে ধার্মিক হিন্দু-রাজার অধীনে থাকিয়া চারিটি বর্ণ স্ব স্ব বৃত্তিতে ব্যবস্থিত থাকিয়া আপনাদের বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিত এবং একে অপরের বৃত্তিতে হস্তক্ষেপ না করায় সমাজেও সুশৃঙ্খলা ছিল। নিষ্কামভাবে ঈশ্বরে ফলার্পণপূর্বক কর্ম করায় শেষে সকল বর্ণই মুক্তি লাভ করিত। গীতায় ভগবান স্বধর্ম (প্রত্যেক বর্ণের শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্ম) ত্যাগ করিয়া পরধর্ম-গ্রহণকে ভয়াবহ (নরকের কারণ) বলিয়াছেন।

স্বধর্মপালনকরতঃ চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া প্রত্যেক বর্ণই জ্ঞানলাভ করিতে ও মুক্ত হইতে পারে। সেইজন্য পূর্বে সকল বর্ণের মধ্যেই জ্ঞানী ছিল। বিদুর, জনক, অজাতশত্রু প্রভৃতি ব্রাহ্মণদেহ না হইলেও জ্ঞানী ছিলেন। তথাপি তাঁহারা শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রমবিধির মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের নিকট অধ্যাত্মবিদ্যা শুনিতে চাহিলে শূদ্রদেহে অধ্যাত্ম-বিদ্যা প্রচারে শাস্ত্রমর্যাদা লঙ্ঘন করা হইবে এবং ব্রাহ্মণের বৃত্তির উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে ভাবিয়া বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে অধ্যাত্মবিদ্যার উপদেশ করিবার জন্য সনৎসুজাতকে আহ্বান করিয়া-ছিলেন। বস্তুতঃ বিদুর জ্ঞানী ছিলেন, তিনি যে উহা জানিতেন না, তাহা নহে। তিনি কেবল শাস্ত্রমর্যাদা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন—ইহাতে বিদুরের মর্যাদা কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। কিন্তু আজকাল আমরা শাস্ত্রের মর্যাদা না দিয়া অহংকারের মর্যাদা দিতে যাই এবং উহাতে নিজেকে বড় করিতে গিয়া ছোট করিয়া ফেলি। সনৎসুজাত ধৃতরাষ্ট্রকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, উহা মহাভারতে সন্নিবিষ্ট আছে। উহা গভীর জ্ঞানের কথায় পূর্ণ, আচার্য শঙ্কর উহার ভাষ্য

করিয়াছেন। আবার বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখা যায় যে, গর্গবংশীয় গর্বিত বালাকিকে কাশী-রাজ অজাতশত্রু ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু জানিতেন যে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ-প্রদান বিপরীত ক্রম, তথাপি বালাকির অনুরোধেই উহা করিয়াছিলেন। তিনি কিন্তু শাস্ত্রমর্যাদা লঙ্ঘন করেন নাই— বালাকিকে গুরুর আসনে রাখিয়াই তিনি তাঁহাকে উপদেশ করিয়াছিলেন। আরও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লোকশিক্ষার জন্য যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের পদধৌত করিয়া শাস্ত্রমর্যাদা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অবতারত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

(২) এখন দেখা যাক্, মহাভারতের "শূদ্রো ন ভবেচ্ছূদ্রঃ" ইত্যাদি বাক্যের প্রকৃত অর্থ কি? যুধিষ্ঠির-অজগর-সংবাদে ব্রাহ্মণকে যে আচার-হিসাবে শূদ্র বলা হইয়াছে, উহার তাৎপর্য ব্রাহ্মণকে নিন্দিত কর্ম হইতে নিবৃত্ত করা এবং শূদ্রকে যে আচরণহিসাবে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে উহার তাৎপর্য সদ্গুণসম্পন্ন শূদ্রের প্রশংসাদ্বারা উহাকে উৎসাহ প্রদান— কিন্তু ঐ বাক্যদ্বারা উহাদের জাতি-ব্রাহ্মণত্বের বা জাতি-শূদ্রত্বের অস্বীকার করা হয় নাই। মহাভারতের পূর্বোক্ত বাক্যটি অর্থবাদ, উহাতে শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য নাই। উক্ত শাস্ত্রবাক্যে ব্রাহ্মণ জাতিতে যে শূদ্রের প্রয়োগ এবং শূদ্র জাতিতে ব্রাহ্মণের প্রয়োগ, উহা মুখ্য নহে, গৌণ। যেমন কোন শক্তিমান্ পুরুষ সত্য সিংহ না হইলেও উহাতে পুরুষসিংহ এই প্রকার গৌণপ্রয়োগ করা হয়। 'শূদ্র, শূদ্র নয়' ইহার অর্থ —জাতিতে শূদ্র হইলেও আচারে শূদ্র নয় এবং 'ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়' ইহার অর্থ জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও আচারে ব্রাহ্মণ নয়। এই প্রকার অর্থ না করিলে 'শূদ্র, শূদ্র নয়' এবং 'ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ নয়' ইত্যাদি বাক্য 'ঘট, ঘট নয়' এই বাক্যের ন্যায় ব্যাঘাতদোষদুষ্ট হয়। যে মহাভারতে উক্তপ্রকার বাক্য বলা হইয়াছে, সেই মহাভারতে তো ইহাও বলা হইয়াছে— "জন্মনৈব মহাভাগ ব্রাহ্মণো নাম জায়তে" (অনুশাসনপর্ব ৩৫।১) অর্থাৎ 'হে মহাভাগ! জন্মদ্বারাই ব্রাহ্মণ' এই নাম হয়।' আরও বলা হইয়াছে— ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ন সংশয়ঃ" (অনুশাসনপর্ব ৪৭।২৮) অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণীর গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে জাত সন্তান ব্রাহ্মণ হন, উহাতে সংশয় নাই।' এখন একই মহাভারতের পূর্বোক্ত বিরোধী বাক্যসকলের কিরূপে সামঞ্জস্য হইবে? পূর্বোক্ত প্রকার ব্যাখ্যাদ্বারা উহাদের সামঞ্জস্য হইতে পারে। যদি বলা যায় স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণভেদের কথা থাকিলেও শ্রুতিতে বা বেদে উহা নাই। এতদুত্তরে বলি, যাঁহারা ঐপ্রকার বলেন, তাঁহারা শ্রুতিবিষয়ে সম্যক্ অনভিজ্ঞ। বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ বা উপনিষদে সর্বত্রই বর্ণভেদের কথা আছে। পুরাণ ও স্মৃতিগ্রন্থে উহার অনুবৃত্তিমাত্র করা হইয়াছে। বেদে এই বর্ণভেদের কথা এত আছে যে, উহাদের সব উল্লেখ করিতে গেলে এক প্রকাণ্ড প্রবন্ধ লিখিতে হয়। সেইজন্য এখানে উহাদের উল্লেখে বিরত থাকিলাম। বস্তুতঃ বর্ণাশ্রম বাদ দিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। বেদাদি শাস্ত্রের বিচার করিয়াই পূর্বাচার্যগণ বর্ণ-বিভাগকে বংশগতই বলিয়াছেন।

পাশ্চাত্য জাতিগণ হিন্দুর এই বর্ণবিভাগকে সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক মনে করেন এবং তাঁহাদের মতের অনুকরণ করিয়া আজকাল আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও ঐরূপ বলিয়া থাকেন। অবশ্য কোন কোন পাশ্চাত্য সুধী হিন্দুর এই বর্ণবিভাগের প্রশংসাও করিয়াছেন। বস্তুতঃ হিন্দুর এই বর্ণবিভাগ উদার ঈশ্বরদৃষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত— ইহা সঙ্কীর্ণ স্বার্থদৃষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। সৃষ্টি-সৌকর্যের নিমিত্ত ভগবানই ব্রাহ্মণাদি

চারিটি মূর্তি ধারণ করিয়াছেন। এ বিষয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদের ১।৪।১১ হইতে ১।৪।১৪ মন্ত্র দ্রষ্টব্য এবং ঐ বর্ণবিভাগ যে বংশগত উহার জন্য ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫।১০।৭ মন্ত্র দ্রষ্টব্য। চারিটি বর্ণই এক অদ্বৈত ভগবানের বিস্তার ইহা বিস্মৃত হইলে আমরা অহংকারের কবলে পড়ি, এবং আমাদের মধ্যে জাত্যভিমান, স্বার্থপরতা ঘৃণা প্রভৃতি দোষ আসিয়া সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির সৃষ্টি করে। বর্ণাশ্রমধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝিয়া সমাজে যে-সব দোষ প্রবেশ করিয়াছে, ঐ গুলিই পরিত্যাজ্য, বর্ণাশ্রমধর্ম পরিত্যাজ্য নহে। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে হিন্দুর এই চারিটি বর্ণকে বিরাট্ পুরুষের চারিটি অঙ্গরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বা চিন্তাশীলতা সেই বিরাট্ পুরুষের মস্তক। ক্ষত্রিয় সেই বিরাট্ পুরুষের বাহু বা বক্ষের প্রতীক। ক্ষত্রিয় ক্ষত বা অনর্থ হইতে দেশকে রক্ষা করে। উপদ্রবশূন্য দেশেই চাতুর্বর্ণ্যের প্রতিষ্ঠা হয় কিন্তু কৃষি-বাণিজ্যাদির অভাবে দেশে খাদ্যাদির অনটনে দেশের চিন্তাশক্তি বা ক্ষাত্রশক্তির বৃদ্ধি হইতে পারে না—তাই বিরাট্ পুরুষের উরুদ্বয়ের বৈশ্যরূপে কল্পনা। কিন্তু সেবা দ্বারা শূদ্র তিন বর্ণের পোষণ না করিলেও উহাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া পড়ে—তাই বিরাট্ পুরুষের পাদদ্বয়ের শূদ্ররূপে কল্পনা। বৃহদারণ্যকে দেখা যায় ভগবান্ চারিটি বর্ণকে সৃষ্টি করিয়া নিজসৃষ্টির রক্ষার জন্য পরে ধর্মকে সৃষ্টি করিলেন। রাজা সেই ধর্মদ্বারা দেশ শাসন করিবেন এবং নিজেও উহার পালন করিবেন। সুশৃঙ্খলভাবে সমাজের পরিচালনের জন্য চারিটি বর্ণেরই সমান প্রয়োজন—কাহারও প্রয়োজন কম নয়, একটিকে বাদ দিয়া অপরটি থাকিতে পারে না। যখন সমাজের এই অঙ্গগুলি উহারা যে একই বিরাট্ পুরুষের অংশ ইহা ভুলিয়া অহংকারবশে স্বার্থের জন্য পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করে, তখন সমাজে ধ্বংস আসে। প্রত্যেক বর্ণই ঈশ্বরে দৃষ্টি রাখিয়া সদ্ভাবে নিজ নিজ কর্তব্য-পালনে মহীয়ান্ এবং সমাজে সকলের নিকট আদরণীয় হয়। বর্ণাশ্রমধর্মে হিংসা দ্বেষ স্বার্থ-পরতা ঘৃণা প্রভৃতির অবকাশ নাই—আছে কেবল শাস্ত্রীয় ধারায় স্ব স্ব ধর্মের নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান। কর্মপ্রধান গৃহস্থাশ্রমেই চিত্তশুদ্ধির জন্য এই বর্ণভেদ ব্যবস্থা, জ্ঞানপ্রধান সংন্যাসাশ্রমে বর্ণভেদের চিন্তা করাও দূষণীয়। সর্বত্র সমদৃষ্টিতে হিন্দুশাস্ত্রের চরম তাৎপর্য—ভেদে তাৎপর্য নাই:

"সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥"

গীতা ৬।২৯॥

অর্থাৎ 'সমাহিতান্তঃকরণ সর্বত্র সমদর্শী যোগী আত্মাকে সর্বভূতে স্থিত এবং সমস্ত ভূতকেও আত্মাতে একতাপ্রাপ্তরূপে দর্শন করেন।'

'ব্রাহ্মণ যে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার অপরাধ কি? অন্য জাতিরা কেন জ্ঞান লাভ করিল না, তাঁহাদের মতো অনুষ্ঠান করিল না? কেন তাহারা প্রথমে অলসভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া ব্রাহ্মণদিগকে জয়লাভের সুযোগ দিয়াছিল? ·· ব্রাহ্মণেতর জাতিকে আমি বলিতেছি—অপেক্ষা কর, ব্যস্ত হইও না। সুবিধা পাইলেই ব্রাহ্মণজাতিকে আক্রমণ করিতে যাইও না। ··· তোমাদিগকে আধ্যাত্মিকতা অর্জন করিতে ও সংস্কৃত শিখিতে কে নিষেধ করিয়াছিল? · ব্রাহ্মণ যে-শিক্ষাবলে এত গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন, তাহা অর্জন করিবার চেষ্টা কর, তবেই তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। তোমরা সংস্কৃত-ভাষায় পণ্ডিত হও না কেন? তোমরা ভারতের সকল বর্ণের মধ্যে সংস্কৃতশিক্ষা-বিস্তারের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় কর না কেন? ·· যখনই এইগুলি করিবে, তখনই তোমরা ব্রাহ্মণের তুল্য হইবে। ভারতে শক্তিলাভের ইহাই রহস্য।'

—স্বামী বিবেকানন্দ

মাতৃভাবসাধনা ও শিবনাথ শাস্ত্রী

অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

রাজা রামমোহন রায় নিরাকার পরব্রহ্ম সাধনায় মূর্তিপূজা- ও পৌত্তলিকতা-বর্জিত উপাসনার পথনির্দেশ করেছিলেন। উপাসনার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি লেখেন: 'পরব্রহ্ম-বিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসনা কহি।'[১] কিন্তু কি প্রকারে এ উপাসনা সম্ভব হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন: 'এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান যে জগৎ ইহার কারণ ও নির্বাহকর্তা পরমেশ্বর হন, শাস্ত্রত ও যুক্তিত এইরূপ যে চিন্তন, তাহা পরমেশ্বরের উপাসনা হয়।'[২] রামমোহন যে 'একেকে জলে স্থলে শূন্যে' সর্বত্র বিধৃত দেখেছেন এবং তাঁকেই ভাবতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেই পরমেশ্বর 'এক'কে 'প্রাণস্য প্রাণ'-রূপে অর্চনা করার পথ দেখিয়েছেন; কেশবচন্দ্র সেন সেই 'এক'কে প্রাণে প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর আদেশকে বিবেকের নির্দেশ বলে পালন করতে বলেছেন। ব্যক্তিগতভাবে ও সামাজিকভাবে এঁরা সকলেই রূপহীন পরব্রহ্মের প্রতীক-বিহীন উপাসনা-পদ্ধতিই গ্রহণ করেছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শিবনাথ শাস্ত্রী পারিবারিক ও সামাজিক উপাসনায় ঐ পদ্ধতিই অনুসরণ করেছিলেন। 'ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানুষের ভ্রাতৃত্ব'— এই আদর্শকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তাঁর পারিবারিক ও সামাজিক ধর্ম সাধনে।

কিন্তু মানুষের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক সাধনা কোনো সুনির্দিষ্ট পূর্ব-পরিকল্পিত ছকে বাঁধা পথে বা নিয়ম-পদ্ধতির বশবর্তী হয়ে অগ্রসর হয় না। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি অন্তরের সামগ্রী ভক্ত-প্রাণের নিভৃত সাধনার ফলশ্রুতি। মহাপুরুষগণ ঐ উপলব্ধির পথ দেখান, কিন্তু ভক্তকে নিজের পথেই চলতে হয়। ধর্ম-সাধনার মূল লক্ষ্য ঈশ্বর লাভ। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণী 'যত মত তত পথ' সেই লক্ষ্যের অভিমুখে এক উদার পথ-নির্দেশ। স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির যদি একটা নিজস্ব ধর্ম থাকে এবং আন্তরিকভাবে সেই ধর্মের সাধনা করে, তবে সে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে এবং অন্য জনের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ থাকে না। রবীন্দ্রনাথও সত্যই বলেছেন: "ঈশ্বর কোনো মতেই আমাদের সকলকেই একটা বাঁধা পথে চলিতে দিবেন না। অনায়াসে চোখ বুজিয়া আমরা একজনের পশ্চাতে আর একজন চলিব, ঈশ্বর আমাদের পথকে এত সহজ কোনোদিন করিবেন না। কোনো ব্যক্তি, তাঁহার যত বড়ো ক্ষমতাই থাক্, পৃথিবীর সমস্ত মানবাত্মার জন্য নিশ্চেষ্ট জড়ত্বের সুগমতা চির-দিনের জন্য বানাইয়া দিয়া যাইবেন, মানুষের এমন দুর্গতি বিশ্ববিধাতা কখনোই সহ্য করিতে পারেন না।

"এইজন্য প্রত্যেক মানুষের মনের গভীর স্তরে ঈশ্বর একটি স্বাতন্ত্র্য দিয়াছেন; অন্তত সেখানে একজনের উপর আর একজনের কোনো অধিকার নাই।... বিধাতার বিধানে ধর্ম জিনিষটাকে নিজের স্বাধীন শক্তির দ্বারাই পাইতে হয়, অন্যের কাছ

---

১ রামমোহন রায়: ব্রহ্মোপাসনা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ১৯৪০, অনুষ্ঠান, পৃঃ ৮

২ ঐ, পৃঃ ১৬

হইতে তাহা আরামের ভিক্ষা মাগিয়া লইবার জো নাই।"[৩]

সাধক শিবনাথ শাস্ত্রী ব্যক্তিগত ধর্ম সাধনায় তাই ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত সাধন পদ্ধতির আক্ষরিক নির্দেশ অনুসরণ করেননি। তিনি যে মাতৃভাবে পরব্রহ্মের সাধনা করেছিলেন, সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। নারীজাতিকে তিনি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখেছিলেন। তৎকালীন যুগের কু-প্রথা ও রীতি-নীতির জন্য নারীজাতির অবর্ণনীয় অশেষ ক্লেশ তিনি লক্ষ্য করেছেন। তাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন এবং তাদের বন্ধন মুক্তির জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

১৮৬৫ সালে পিতার আদেশক্রমে দ্বিতীয়বার বিবাহের ফলে তাঁর মনে তীব্র অনুশোচনা উপস্থিত হয়। মনের সেই অস্থির যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তিনি ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। সেই সময়ে উমেশচন্দ্র দত্ত তাঁকে থিওডোর পার্কারের Ten Sermons and Prayers দেন। পার্কারের সেই প্রার্থনাগুলিই তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবৃত্ত করে এবং ধর্মের পথ প্রদর্শন করে। পার্কার জগৎকে জড় বলে গ্রহণ করেননি, সর্বত্রই তিনি প্রাণের এক অপূর্ব প্রকাশ দেখেছেন। বিশ্বের প্রানিজগতের মাঝে তিনি বিশ্বজননীর অপার করুণা উপলব্ধি করেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর চিন্তা-ধারায় মাতৃভাবে উপাসনার অন্যতম উৎসরূপে আমরা পার্কারের রচনাকে গ্রহণ করতে পারি। তাছাড়া বাংলার ধর্মসংস্কৃতিতে মাতৃভাবসাধনার ঐতিহ্য এবং সমকালীন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রভাব তো ছিলই।

২৩ শে জুলাই ১৮৮৮ ইংলণ্ডের ডায়েরিতে তিনি লেখেন: "জড় জগতে, প্রাণিরাজ্যে ও মানবরাজ্যে প্রভু পরমেশ্বরের যে করুণা— তাহা আমি সর্বদা স্মরণ করিয়া থাকি। জগতের ধন-ধান্যে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে, ঊষার আলোকে, শরতের সুনীল গগনে, বসন্তের কোমল পুষ্পদলে তাঁহার প্রেম কতই অনুভব করি। পশু-পক্ষীর বিশেষতঃ পক্ষীর নির্দোষ, শান্তিপূর্ণ আনন্দে আমি সেই আনন্দদায়িনী বিশ্বজননীকে বড়ই দেখিতে পাই।" এই বিশ্বজননীর প্রেমধারায় সমগ্র জগৎ প্লাবিত। এই ভাব নিয়ে তিনি একটি গান লিখেছিলেন:

"ওমা জননী, প্রেমদায়িনী একাকিনী
পরম আদরে বিশ্বে পালিছেন যিনি।
দেখ বাঁধি প্রেম পাশে, দশ দিশে কিবা
কোলেতে ধরেছেন তিনি।"

ঐ দিনের ডায়েরিতে তিনি লিখ্‌ছেন: "এ পথে আর কাহাকেও দেখিতে পাই না— আমি যখন না দেখিতে পাই— তখন মার্জার শিশুর মত চক্ষু মুদিয়া আঁধারে কাঁদিব। আমার মা— আমার মা — আমার মা আমাকে উদ্ধার করিবেন।" তাঁর ব্যক্তিগত প্রার্থনার মধ্যেও সেই মাতৃভাবে আরাধনা। নিম্নলিখিত প্রার্থনাটি তারই প্রমাণ:—

"পরম জননী! আমায় দূরে রাখিও না— আঁধারে রাখিও না—অপরাধ ক্ষমা করিয়া নিজের প্রসন্ন মুখের জ্যোতির মধ্যে রাখ।"[৪] আর একটা ব্যক্তিগত প্রার্থনায় তিনি লিখছেন: "আমি সম্পূর্ণ-রূপে তোমার অনুগত হইতে পারি নাই, পদস্খলিত হইয়া পড়িয়াছি, প্রাণে ব্যথা পাইয়াছি, কিন্তু তোমার কৃপাতে কখনও নিরাশ হই নাই; তুমি মা, আমার নিকটে আছ আমি একটী দিনের জন্য ভুলি নাই। আমি তোমার

---

৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, গ্রন্থ বিভাগ, ১৩৭৫, পৃঃ ৪০।

৪ ইংলণ্ডের ডায়েরি, ২৩শে জুলাই ১৮৮৮। অপ্রকাশিত প্রার্থনা।

নামের শক্তি আশ্চর্য্য দেখিয়াছি। ঘোর প্রলোভনের মধ্যে অসাধুভাব সকল যখন তরঙ্গের ন্যায় উঠিয়াছে, আমি চক্ষু মুদিয়া তোমার নাম করিয়াছি আর অমনি সেই প্রবল তরঙ্গ থামিয়া গিয়াছে।"[৫]

আধ্যাত্মিক সাধনায় মন অনেক সময় অবসন্ন হয়, প্রাণের মধ্যে প্রেমের তরঙ্গ ওঠে না, হৃদয়ে অবসাদ আসে। তখনও শিবনাথের পরম নির্ভর সেই বিশ্বজননী। তিনি লিখছেন: "এ যেন মায়ের খেলা। আঁধার ঘরে সন্তানকে ছাড়িয়া দিয়া মা পাশেই দাঁড়াইয়া থাকেন-- ছেলে যখন 'মা, ওমা কোথায় গেলে, ওমা কোথায় গেলে, ওমা ভয় করে বলিয়া খুব কাঁদিয়া উঠে তখন জননী ঝুপ করিয়া ঝাকিয়া পড়েন ও ছেলেকে বুকে ধরিয়া মুখে চুম্বন করিয়া অভয় দান করেন। তেমনি করিয়া কি মা আসিবেন? তাই কি আঁধারে ফেলিয়াছেন? আমি যে সেয়ানা ছেলে— আমি যে কাঁদি না।"[৬] এই ভাব তিনি প্রার্থনায় সঙ্গীতাকারে ব্যক্ত করেন:

"জানিলাম না মা বুঝিলাম না মা,
এ তোর খেলা কেমন ধারা,
থাক থাক যাও মা কোথায়
মন করে আমার দিশেহারা।
আমি আঁচল ধরা ছেলে
যেতে হয় কি একলা ফেলে
মায়ের মুখ না দেখতে পেলে
ভয়ে ছাওয়াল হয় যে সারা।
অমি যদি ধরি জোরে
ঠেলিতে কি পার মোরে
ছেলের জোরে মা যে হারে
চিরদিন ত আছে ধরা।
যদি বল কি গুণ আছে,
বাঁধা রবে মোর কাছে
আপনার প্রেমে আপনি বাঁধা
ও আমার মা চমৎকারা॥
জন্ম দিয়েছ যবে
কাছে ত রাখিতেই হবে
শিবের গতি হবেই হবে
এ ভবে পাবে কিনারা॥"[৭]

ব্যক্তিগত চিঠিপত্রেও শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতৃভাবে সাধনা সপ্রমাণ। ২১শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৮, লণ্ডন থেকে কন্যা হেমলতা দেবীকে এক পত্রে (অপ্রকাশিত) লেখেন: "আমাকে আমার পরম মাতা খাওয়াইতেছেন পরাইতেছেন; আমি তাঁহার প্রসাদে বেশ আছি। কেবল এই দুঃখ যেমন করিয়া তাঁহার সেবাতে প্রাণমন সমর্পণ করা উচিত তাহা করিতে পারিতেছি না।"

মাতৃভাবসাধনাপ্রসঙ্গে তিনি ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মাতৃভাবে সাধনার কথা স্মরণ করেছেন এবং এই সাধনার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেছেন। ইংলণ্ডের ডায়রিতে তিনি লিখছেন:

.. "নরনারীর সম্বন্ধ বিষয়ে···একটি চিন্তা কল্য উদিত হইয়াছে। গতকল্য National Gallery-তে বেড়াইতে গেলাম। ছবিগুলি আর একবার মনোযোগ দিয়া দেখিতে লাগিলাম। অন্যান্য ছবির মধ্যে Madonna in Prayer— যীশুর মাতা মেরীর প্রার্থনা। কি সুন্দর! কি অপূর্ব্ব পবিত্র ভাব! মুখে কি বিনয়ের মাধুর্য্য ও নির্ভরের একাগ্রতা! চিত্রকর ধন্য যে এমন ভাব রসে বাহির করিয়াছে। তাহারি এক পার্শ্বে Mary

[৫] ঐ, ১৮ই জুলাই ১৮৮৮। অপ্রকাশিত প্রার্থনাংশ।
[৬] ঐ, ২০শে জুলাই ১৮৮৮।
[৭] ঐ

Magdalene in Prayer—ইহার মুখে সে কমনীয়তা নাই, অনেক বিপদের রেখা মুখের উপরে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা হইবেই ত, কি জীবন হইতে আসিয়াছে। কিন্তু এই ছবিখানি মেরীর ছবি অপেক্ষা ভাল লাগিল না। নারীর জীবনের পরিবর্ত্তনের বিষয় ভাবিয়া অন্তরে এক অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইতে লাগিল। নারী হৃদয়ে এই ধর্ম্ম-সংগ্রাম কি অমৃত ফল প্রসব করে। মানব জীবনে ইহাতেই ধর্ম্মের মহিমা জানিতে পারা যায়। দেখিতে দেখিতে নারীজীবন সম্বন্ধে হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব পবিত্র ভাব উদিত হইল।

"তৎপর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার সময় রাস্তাতে মনে মনে 'জানিলাম না মা, বুঝিলাম না মা' এই গানটি গাইতে গাইতে আসিতেছি—গাইতে গাইতে এমন এক ভাব হৃদয়ে উঠিল যে, পথে যে সকল স্ত্রীলোক যাইতেছে, ইচ্ছা হয় মা বলিয়া ধরি। অমনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা মনে হইল। শুনিয়াছি তিনি একটি বালিকা দেখিলেও মা বলিয়া তাহার চরণে প্রণাম করিতেন। কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বরকে মাতৃভাবে সাধন করিলে নারী জাতির প্রতি পবিত্র ভাব সাধিত হয়।"[৮]

বিগত শতাব্দীর ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে শিবনাথ শাস্ত্রী এক অবিস্মরণীয় নাম। একদিকে ধর্মের মধ্য দিয়ে মানুষের আধ্যাত্মিক কল্যাণ, অপরদিকে সমাজ উন্নয়নের আদর্শ তিনি প্রচার করেন। তাঁর ব্যক্তিগত ধর্ম-সাধনায় 'মাতৃভাবে' সাধনা ধর্ম-চিন্তার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ।

৮ ইংলণ্ডের ডায়েরি, ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৮। অপ্রকাশিত অংশ।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ অনুধ্যান

অধ্যাপক শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুরের সন্তান স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। তিনি ছিলেন মিশনের চতুর্থ প্রেসিডেণ্ট। তাঁহার জীবন ত্যাগ তিতিক্ষা বৈরাগ্য এবং ঐকান্তিক আত্মনির্ভরতার আদর্শে মহিমান্বিত। স্বামীজীর অতি আদরের 'পেসন' পূর্বাশ্রমে শ্রীহরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় স্বকীয় উচ্চশিক্ষা এবং প্রতিভাবলে অর্জন করেছিলেন সেদিনে একটি জেলার ভারপ্রাপ্ত Executive Engineer-এর পদ। স্বামীজী তাঁর সম্বন্ধে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মিস্ নোবেলকে (পরে ভগিনী নিবেদিতা) এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'ভারতে এটি একটি উচ্চপদ। সে খড়কুটোর মত ঐ পদ ত্যাগ করেছে।' বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ-বন্দনাস্তবে যখনই গীত হয়ে থাকে 'বন্ধন কামকাঞ্চন অতিনিন্দিত ইন্দ্রিয়রাগ, ত্যাগীশ্বর হে নরবর দেহ পদে অনুরাগ,' তখনই নিমেষের তরে মানসচক্ষে একবার যেন ভেসে উঠে ঠাকুরের এই সন্তানটিরও সমুজ্জ্বল প্রতিমূর্তি— যা ত্যাগ ও বৈরাগ্যে মহীয়ান্। 'গুরুর্বৈ জায়তে শিষ্যঃ' কথাটি আক্ষরিকভাবে সত্য হয়ে আছে রামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের জীবন বাণী ও আচরণে।

গুরুভাইদের দৃষ্টিতে আমরা বিজ্ঞান মহারাজের মহিমা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কতকটা উপলব্ধি করতে পারি।

মঠ ও মিশনের প্রথম প্রেসিডেণ্ট স্বামী ব্রহ্মানন্দ একদিন সমাগত কয়েকটি ভক্তকে বলেছিলেন,

'স্বামী বিজ্ঞানানন্দ এলাহাবাদ থেকে এসেছেন। তাঁকে দর্শন করেছ? যাও যাও ঐ মহাপুরুষকে দর্শন করে এস। তিনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ—ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর মুঠোর ভিতর; আত্মস্থ হয়ে, আগুল হয়ে বসে আছেন।' রাজা মহারাজের কি আশ্চর্য লোকচরিত্রজ্ঞানই না ব্যক্ত হয়েছে এ কয়টি কথার মাধ্যমে!

দীর্ঘ বার বৎসর এলাহাবাদের মুঠীগঞ্জের ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবে ক্ষুদ্র এক প্রকোষ্ঠে একান্তে নির্জনে কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলেন বিজ্ঞান মহারাজ। তীব্র ব্যাকুলতা ও অপরিমেয় অনুরাগে ভরপুর, অশেষ বৈরাগ্যদীপ্ত, কঠোরতপঃ-সমুজ্জ্বল বিজ্ঞান মহারাজের জীবনী আমরা যতই অনুধ্যান করি ততই বিস্ময়ে অভিভূত হই। ভবিষ্যতের তপস্যা ও কর্মের সমন্বয়ের প্রতীক বিজ্ঞানানন্দের কি অদ্ভুত জীবন ও নিরলস প্রস্তুতি! ভেবে অবাক হই, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর যেদিন হরিপ্রসন্নের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেছিলেন সেদিনই হয়তো বা এই সন্তানটির মধ্যে তিনি নিজেকে সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন। সৃষ্টির মূলে আত্মবিসর্জন। ঠাকুর আত্মসংক্রমণ ও আত্মবিসর্জনের মাধ্যমে কি অপূর্ব সৃষ্টিই না রেখে গেলেন হরিপ্রসন্নের মধ্যে!

স্বামীজীও বিজ্ঞানানন্দ সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'আমি যে ওর ভিতর সাক্ষাৎ ঠাকুরকে দেখতে পাই।' পরে নাকি আবার এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন, 'ঠাকুর তোমার আধারে একটু ভালরকম আস্তানা করে নিয়ে বসে আছেন—আমি প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি।'

স্বামীজীর উপলব্ধি ও প্রত্যক্ষ দৃষ্টির আলোক-সম্পাতে শ্রদ্ধার সহিত যদি আমরা এই মহা-জীবনের অনুধ্যান করি এবং তাঁর মতো জগতের একজন শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্যের আচরিত জীবনধর্মের শতাংশের এক অংশও যদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আচরণে প্রতিফলিত করে উঠতে পারি, তাহলে আমাদের অশেষ কল্যাণ হবে, এটাই আমাদের দৃঢ় প্রতীতি।

তিতিক্ষার জীবন্ত বিগ্রহ এই মহাপুরুষের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি ঠাকুরের মত শিশুর সরলতা এবং সাদাসিধে জীবন। বিজ্ঞানানন্দের মধ্যে ছিল না বিন্দুমাত্রও পাণ্ডিত্যের অভিমান। তাঁর সান্নিধ্য ও সাহচর্যলাভের সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল তাঁদের অনেকেই বলেন, 'মহাপণ্ডিত হয়েও তিনি মূর্খবৎ বিচরণ করতেন।' তিনি যেন কিছুই জানেন না কিছুই বোঝেন না, কিছুই করেন না। ঠাকুরই তাঁর সব। তিনি ঠাকুরের হাতে একটি যন্ত্রমাত্র। গুরুর উপর কি পরম নির্ভরতা! কী আত্মবিলুপ্ত সাধন! দীক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে তিনি অনেক সময়ই বলতেন, 'আমার আবার মন্ত্র দেওয়া কি? আমি শুধু ঠাকুরের কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেই। তারপর ঠাকুরই যা করবার করবেন।'

যাঁরা উপদেশ প্রার্থী হয়ে তাঁর নিকট আসতেন, তিনি প্রায়ই অল্পকথায় তাঁদের বলতেন, 'ছেলে-বেলায় বর্ণপরিচয় পুস্তকে যা যা পড়েছ তাই জীবনে সাধন কর। সদা সত্যকথা বলবে, কারুর দ্রব্য না বলে নিলেই চুরি করা হয়, অর্থাৎ লোভ পরিত্যাগ করবে। এ দুটি নীতি যদি সাধন করতে পার, আর সব তাহলে সহজ হয়ে যাবে।'

বিজ্ঞান মহারাজের এ দুটি কথার মধ্যেই নিহিত আছে সকল ধর্মের সার। জীবনের প্রতি-ক্ষেত্রে এ দুটির আচরণই যে মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব দিয়ে তার জীবন ধন্য করতে পারে, সকল ধর্মের দিশারীরাই তা স্বীকার করছেন। ঈশোপনিষদের 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ' প্রতিধ্বনিত হয়েছে রামকৃষ্ণ ও তাঁর পার্ষদগণের জীবন ও বাণীতে। ঠাকুর ব্রহ্মময়ীর পদে পাপ-পুণ্য, জ্ঞান-অজ্ঞান, শুচি-অশুচি, কর্ম-অকর্ম সব

বিসর্জন দিয়েও কিন্তু সত্যটি দিতে পারলেন না। ঠাকুরের জীবনে সত্যের প্রতি অটুট আঁটের কথা আমরা সকলেই জানি। রামের সত্য, কৃষ্ণ ও চৈতন্যের প্রেম এবং বুদ্ধের অপার কারুণ্য— এই সত্য প্রেম করুণার অপূর্ব সংমিশ্রণই ঠাকুর ও তাঁর সন্তানদের আমাদের মানসচক্ষে চির ভাস্বর করে রেখেছে।

ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের তের বৎসর পরে ১৮৯৯ সালে হরিপ্রসন্ন মহারাজ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ১৯০০ সালের শরৎকালে তপস্যার জন্য বেলুড় মঠ ত্যাগ করে তিনি প্রয়াগধামে আগমন করেন। স্বামীজীরও ইচ্ছা ছিল যে বিজ্ঞানানন্দ এলাহাবাদে থেকেই ঠাকুরের ভাব প্রচার করেন। ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল তিনি প্রথমে ব্রহ্মবাদিন্ ক্লাবে, পরে মুঠীগঞ্জের মঠে থেকে স্বামীজীর নির্দেশিত কাজে অপূর্ব নিষ্ঠার সাথে আপনাকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

মঠের বিভিন্ন মন্দির নির্মাণাদি কাজের জন্য যখন তাঁর ডাক আসত তখনই মাত্র তিনি তাঁর নীরব সাধনার ধাম প্রিয় মুঠীগঞ্জ মঠ হতে সাময়িক-ভাবে ছুটি নিতেন। ১৯৩৭ সালের ৭ই ফেব্রুআরি মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর তিরোধানের পর স্বামী বিজ্ঞানানন্দ প্রেসিডেণ্ট পদে বৃত হন। প্রেসিডেণ্ট হওয়ার পর বেলুড়ে স্বামীজীর পরিকল্পিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠা ও সেই মন্দিরে ঠাকুরকে বসানই বিজ্ঞান মহারাজের এক মহান্ কার্য।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের অমূল্য উপদেশবাণীর মধ্যে কয়েকটি সত্যিই নিত্যস্মরণীয়। উপদেশ কয়টি আমাদের জীবনে আলোকবর্তিকা ও চিরসম্পদ। সেগুলির নিত্য স্মরণ মনন অশেষ কল্যাণপ্রদ।

তাঁর দায়িত্ববোধ ছিল অতি উচ্চস্তরের। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'হাতে নিয়ে কোন কাজই আধখেঁচড়াভাবে করতে নেই।' তাঁর নিকট প্রতিটি কাজই ছিল 'পূজা'— শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠাসহকারে সে পূজা সমাপনের জন্য কি ব্যাকুলতা!

মহাপুরুষ মহারাজের দেহত্যাগের পর তাঁর দয়ার কথা মনে ভেবে প্রায়ই বলতেন— 'বেঁচে থাকলে আরও কত লোককে কৃপা করতেন। এখন ঠাকুর যেন আমার ঘাড় ধরে সেই অসমাপ্ত কাজ করিয়ে নিচ্ছেন।' ঠাকুরই সব— ঠাকুরই সব করাচ্ছেন। কি অদ্ভুত আত্মসমর্পণ— অহংকে মুছে ফেলার কি সফল প্রয়াস।

মন্দির-নির্মাণকার্য শেষ হতে যত দেরী হচ্ছিল ততই তিনি অধীর হয়ে পড়ছিলেন। বেলুড় মঠে একদিন বলেই ফেললেন, 'তোমরা বাপু বড় দেরী কর। আর দেরী করো না বাপু।' সময় বয়ে যায় – আয়ু ত পদ্মপত্রনীর— যে কাজ করতে হবে কালক্ষয় না করে অবিলম্বে শেষ করে ফেলতে হবে—এটাই বিজ্ঞান মহারাজের ইঙ্গিত।

কাজ হাতে নিয়ে কখনও আধখেঁচড়াভাবে কাজ না করা, জীবন-সারথিই ঘাড় ধরে আমাদের কাজ করিয়ে নিচ্ছেন এবং সময় বয়ে যায় 'আর দেরী করো না বাপু' স্বামী বিজ্ঞানানন্দের এই নিত্যস্মরণীয় বাণী তিনটি জীবনপথে আমাদেরও সতত উদ্বুদ্ধ করুক, এই প্রার্থনা।

রামায়ণ রচনাকালে তিনি রাম সীতা ও মহাবীরকে চোখের সামনে উপস্থিত দেখতে পেতেন। প্রায়ই তাঁকে বলতে শোনা যেত, 'ঠাকুর ও মায়ের কাছে আবার কি যাব? ঠাকুর ও মায়ের কাছেই ত রয়েছি'— কি গভীর প্রত্যয়! অদ্ভুত জীবন বিজ্ঞানানন্দের! এ মহাজীবনের স্মরণমনন ও অনুধ্যান আমাদের পক্ষে অশেষ কল্যাণপ্রদ— এই আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস।

বিশ্বামিত্রের সাধনা

শ্রীশেফালিকা দেবী

ভক্তপ্রবর বলরাম বসুর আক্ষেপোক্তির উত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ একটি পত্রে লিখেছিলেন—'ছিলেন গরু, হইয়াছেন মানুষ, হইবেন দেবতা এবং ঈশ্বর।' মানবের ক্রমোন্নতির ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে এই বাক্যে বিধৃত। সকলেই সেই চরম উন্নতির পথে চলেছে, কিন্তু সে উন্নতি ঘটে বহু বিফলতা ও ব্যর্থতার পর। যেমন গিরিচূড়া আরোহণের পথে শুধু চড়াই নয়, উৎরাইও আছে, তেমনি উন্নতির পথেও আছে বহু পতন ও স্খলন। কিন্তু সেইগুলিই শেষ নয়; ব্যর্থতা হতেই মানুষ শক্তি সংগ্রহ করে নবোদ্যমে অগ্রসর হওয়ার জন্য। বিশ্বামিত্রের সাধনা এর উজ্জ্বল উদাহরণ।

গাধির পুত্র ধর্মজ্ঞ কৃতবিদ্য প্রজাহিতৈষী বিশ্বামিত্র এক অক্ষৌহিণী সৈন্যসহ পৃথিবী পর্যটনে বার হয়েছেন। বহুদেশ ভ্রমণের পর তিনি মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হলেন। মুনিবর ফলমূল-পাদ্য-অর্ঘ্যাদির দ্বারা রাজার যথোচিত অভ্যর্থনান্তে সসৈন্যরাজার অতিথি-সৎকার করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। অসম্মত রাজা মুনির আগ্রহ দর্শনে অবশেষে সম্মতি প্রদান করলেন। বশিষ্ঠ তাঁর কামধেনু শবলার সাহায্যে ইক্ষু, মধু, মৈরেয় মদ্য, পায়স, অন্ন, সূপ প্রভৃতির দ্বারা রাজকীয় ভাবে অতিথি-সৎকার করলেন। শবলার ক্ষমতা দর্শনে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট তাকে প্রার্থনা করলেন। বলা বাহুল্য বশিষ্ঠ অসম্মত হলেন। ক্রোধাভিভূত রাজা বলপ্রয়োগে শবলাকে গ্রহণ করতে উদ্যত হলেন। ফলে শবলার সৃষ্ট সৈন্যদ্বারা সমস্ত রাজ-সৈন্য এবং বশিষ্ঠের ক্রোধাগ্নিতে বিশ্বামিত্রের শত পুত্র নিহত হল। তখন "হতপুত্রবলো দীনো লূনপক্ষ ইব দ্বিজঃ। হতসর্ববলোৎসাহো নির্বেদং সমপদ্যত॥"—পুত্র ও সৈন্য হত হওয়ায় ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় বিশ্বামিত্র বল ও উৎসাহহীন হয়ে নির্বেদ প্রাপ্ত হলেন। কিন্তু এ নির্বেদ যথার্থ নয়। তাই তিনি একটি পুত্রের হাতে রাজ্যভার দিয়ে আরও বললাভের ইচ্ছায় তপস্যায় মন দিলেন। কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে তুষ্ট করে তিনি সমগ্র ধনুর্বেদ ও ত্রিলোকের যাবতীয় অস্ত্রলাভ করলেন। তখন তিনি পুনরায় বশিষ্ঠের আশ্রম আক্রমণ করলেন। কিন্তু হায়! বশিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ডে তাঁর কালান্তক সমস্ত অস্ত্রই প্রতিহত হল। তখন বিশ্বামিত্র বললেন, "ধিগ্‌বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্ম-তেজোবলং বলম্‌। একেন ব্রহ্মদণ্ডেন সর্বাস্ত্রাণি হতানি মে॥ তদেতৎ প্রসমীক্ষ্যাহং প্রসন্নেন্দ্রিয়-মানসঃ। তপো মহৎ সমাস্থাস্যে যদ্বৈ ব্রহ্মত্ব-কারণম্‌॥"— ক্ষত্রিয়বলকে ধিক্‌! ব্রহ্মতেজই যথার্থ বল। এক ব্রহ্মদণ্ডেই আমার সমস্ত অস্ত্র প্রতিহত হল। এই সব দেখে আমি স্থির করলাম যে মন ও ইন্দ্রিয় সংযত করে ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করব।

আঘাত মানবজীবনের ধারাকে পরিবর্তিত করে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। বিশ্বামিত্র আঘাত পেয়ে উচ্চ আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হলেন— কিন্তু সে আকর্ষণ বিবেক-প্রসূত নয়। অসূয়া-সঞ্জাত, বাসনায় মলিন। তাই আরও আঘাত-প্রাপ্তি অনিবার্য।

পরাজিত বিশ্বামিত্র সন্তপ্ত হৃদয়ে স্বীয় মহিষীর সহিত দক্ষিণ দিকে গমন করলেন। ফলমূলাশী হয়ে সেখানে তিনি কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। এই সময় তাঁর ধর্মপরায়ণ চারিটি পুত্রও জন্মগ্রহণ

করে। সহস্র বৎসর তপস্যার পর দেবগণ সহ ব্রহ্মা তাঁকে রাজর্ষির মর্যাদা প্রদান করলেন। লজ্জায়, ক্রোধে ও ক্ষোভে অধীর বিশ্বামিত্র বুঝলেন তপস্যায় কোন ফল হয়নি। পুনরায় তিনি কঠোর তপস্যায় রত হলেন।

এই সময় রাজা ত্রিশঙ্কু তাঁর কুলগুরু বশিষ্ঠের নিকট সশরীরে স্বর্গগমনের নিমিত্ত যজ্ঞ করার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। বশিষ্ঠ এই অসম্ভব প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। তখন ত্রিশঙ্কু বশিষ্ঠের শত পুত্রের নিকট আপনার ইচ্ছা জানালেন। পিতার অসম্মতি জেনে পুত্রগণও তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন ত্রিশঙ্কু তাঁদের বললেন যে, তিনি অন্য পথ দেখবেন। ত্রিশঙ্কুর এই স্পর্ধিত বাক্যে ক্রুদ্ধ বশিষ্ঠপুত্রগণ রাজাকে 'চণ্ডাল হও' ব'লে অভিশাপ দিলেন।

অভিশপ্ত ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হলেন। দুর্দশাগ্রস্ত রাজার প্রতি দয়ার্দ্র হৃদয় বিশ্বামিত্র যজ্ঞ করতে সম্মত হলেন। নবলব্ধ তপোবলে দৃপ্ত রাজর্ষি এই ব'লে আশ্বাস দিলেন— "গুরুশাপকৃতং রূপং যদিদং ত্বয়ি বর্ততে। অনেন সহ রূপেণ সশরীরো গমিষ্যসি॥ হস্তপ্রাপ্তমহং মন্যে স্বর্গং তব নরাধিপ।" — যদিও গুরুশাপে তোমার এই প্রকার রূপ হয়েছে, তথাপি এই রূপেই তুমি সশরীরে স্বর্গে যাবে। হে রাজন্, আমি মনে করি স্বর্গ তোমার করতলগত।

যজ্ঞের উদ্যোগ শুরু হল। বশিষ্ঠপুত্রসহ বহু শাস্ত্রজ্ঞ ঋত্বিকগণকে আমন্ত্রণ করা হল। বশিষ্ঠপুত্রগণ নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে ব্যঙ্গ করে বললেন—"যে যজ্ঞে যাজক ক্ষত্রিয়, যজমান চণ্ডাল সেই যজ্ঞে দেব ও ঋষিগণ কি ভাবে হবি গ্রহণ করবেন?" এই কথা শ্রবণ করে ক্রোধোন্মত্ত বিশ্বামিত্র তৎক্ষণাৎ অভিসম্পাত দিলেন যে, বশিষ্ঠ-পুত্রগণ সাত জন্ম কুকুরমাংসভোজী হয়ে অতি কদর্য জীবন যাপন করবেন।

শক্তিমান্‌কে সকলেই সমীহ করে। পূর্বোক্ত ঘটনা দেখে সমবেত মুনিগণ নিজেদের মধ্যে বললেন —'অয়ং কুশিকদায়াদো মুনিঃ পরমকোপনঃ। যদাহ বচনং সম্যগেতৎ কার্যং ন সংশয়ঃ। অগ্নি-কল্পো হি ভগবান্ শাপং দাস্যতি রোষতঃ॥'—এই কুশিক-বংশোদ্ভব মুনি অত্যন্ত কোপন-স্বভাব। ইনি যা বলবেন অসঙ্কোচে তা করাই উচিত। নতুবা এই অগ্নিতুল্য ঋষি আমাদের রোষভরে অভিশাপ দেবেন।

যথাবিধি যজ্ঞ আরম্ভ হল। কিন্তু দেবগণ অনুপস্থিত। তাঁদের এই অবজ্ঞায় ক্রুদ্ধ বিশ্বামিত্র বললেন—'পশ্য মে তপসো বীর্যং স্বার্জিতস্য নরেশ্বর'—হে রাজন্, আমার স্বোপার্জিত তপস্যার শক্তি দেখ; এর বলে তোমাকে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যাব। তপস্যার অমোঘ শক্তিতে ত্রিশঙ্কু স্বর্গে উপনীত হলেন। কিন্তু ইন্দ্র ও দেবগণ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে ত্রিশঙ্কু পুনরায় অধোমস্তকে ভূতলে পতিত হতে লাগলেন। তাঁর ভীত আর্তনাদে কুপিত বিশ্বামিত্র 'তিষ্ঠ, তিষ্ঠ' বলে তাঁর পতন রোধ করলেন। শক্তির দম্ভে উন্মত্ত বিশ্বা-মিত্র তখন দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় দ্বিতীয় বিশ্ব সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলেন। আকাশের দক্ষিণ দিকে নক্ষত্রমালা, সপ্তর্ষিমণ্ডল প্রভৃতি সৃষ্টি ক'রে ইন্দ্রসৃষ্টির উদ্যোগ করলেন। তখন ভীত ঋষি ও সুরাসুরগণ বিশ্বামিত্রকে বহু অনুনয় করে প্রসন্ন করলেন। তাঁর সৃষ্ট জগৎ এবং তার অধিপতি-রূপে ত্রিশঙ্কুকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হলেন। বিশ্বা-মিত্রের জয় হল।

কিন্তু বিক্রম প্রদর্শন করে নতি স্বীকার করানো যে প্রকৃত জয় নয় তা উপলব্ধি করতে বুদ্ধিমান বিশ্বামিত্রের বিলম্ব হয়'ন। তাই তিনি বললেন —'দক্ষিণ দিকে অবস্থানকালে তপস্যায় মহাবিঘ্ন উপস্থিত হল। এখন পশ্চিম দিকে পুষ্কর তীর্থে গিয়ে তপস্যা করব।' পুষ্করে গিয়ে তিনি

কঠোর তপস্যায় রত হলেন।

এই সময় অযোধ্যাপতি অম্বরীষের যজ্ঞাশ্ব ইন্দ্র অপহরণ করলেন; পুরোহিত বিধান দিলেন, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নরবলি দিতে হবে। রাজা উপযুক্ত বলির সন্ধানে বহির্গত হলেন।

বিশ্বামিত্রের ভগিনী সত্যবতীর সঙ্গে ঋচীক মুনির বিবাহ হয়েছিল। তাঁদের মধ্যমপুত্র শুনঃশেফকে অম্বরীষ লক্ষ ধেনু ও সুবর্ণের বিনিময়ে ক্রয় করলেন। প্রত্যাবর্তনের সময় যখন অম্বরীষ পুষ্কর তীর্থে বিশ্রাম করছিলেন তখন শুনঃশেফ মাতুল বিশ্বামিত্রের কোড়ে পতিত হয়ে কাতরভাবে প্রার্থনা জানালেন, যেন রাজা কৃতকার্য এবং তিনি দীর্ঘায়ু হন। বিশ্বামিত্র এখন পূর্বাপেক্ষা অনেক শান্ত ও সংযত হয়েছেন। তাই তিনি প্রথমে তাঁর পুত্রগণের মধ্যে একজনকে শুনঃশেফের পরিবর্তে যেতে অনুরোধ করলেন। কেউ সম্মত না হওয়ায় বিশ্বামিত্র শুনঃশেফকে অভয়দানপূর্বক দুটি দিব্যগাথা শিক্ষা দিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠানকালে যূপবদ্ধ শুনঃশেফ মধুর কণ্ঠে সেই দুটি গাথাদ্বারা ইন্দ্র ও বিষ্ণুর স্তুতি করলেন। তখন ইন্দ্র পরিতুষ্ট হয়ে শুনঃশেফকে দীর্ঘায়ু দান করলেন এবং অম্বরীষও ইন্দ্রের প্রসাদে যজ্ঞে বহুগুণ ফললাভ করলেন।

ছয় রিপুর সঙ্গে মানুষের অহরহ সংগ্রাম চলছে। দেবত্বলাভ করতে গেলে তাদের জয় করা আবশ্যক। তাদের কশাঘাতে মানবচিত্ত দিবারাত্র চঞ্চল। বিশ্বামিত্রের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কামধেনুর প্রতি লোভ এবং বশিষ্ঠের প্রতি মাৎসর্য বা ঈর্ষ্যা তাঁকে ব্রহ্মবল লাভের জন্য প্রণোদিত করেছিল। কিন্তু সামান্য তপোবল অর্জন করেই শক্তিমদে মত্ত বিশ্বামিত্র মোহবশতঃ তার অপব্যবহার করলেন, নিয়মভঙ্গপূর্বক ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে প্রেরণ করে। শুনঃশেফকে রক্ষাকালে তিনি আর সে ভুল করেননি। লোভমদ বিগলিত করে তিনি স্বকার্য সিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু এখনও দুই প্রবল শত্রু অবশিষ্ট—কাম ও ক্রোধ।

শুনঃশেফকে রক্ষা করার পর বিশ্বামিত্র পুষ্কর তীর্থে সহস্র বৎসর তপস্যা করলেন। তুষ্ট ব্রহ্মা এবং দেবগণ তাঁকে ঋষিত্ব প্রদান করলেন। ক্ষুব্ধ বিশ্বামিত্র পুনরায় কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। এই সময় একদিন তিনি পুষ্কর তীর্থে স্নানরতা সুন্দরী অপ্সরা মেনকাকে দর্শন করলেন। হৃদয়ের কোন্ গহন কন্দরে একটি স্ফুলিঙ্গ লুক্কায়িত ছিল—অনুকূল বায়ুস্পর্শে তা প্রজ্বলিত দাবানল হয়ে বিশ্বামিত্রকে মুহূর্তে গ্রাস করল। কন্দর্পশরাহত ঋষি মেনকার সঙ্গে দশ বৎসর কাল যাপন করলেন।

কিন্তু উচ্চ আদর্শের প্রতি একবার যে আকৃষ্ট হয়েছে সে মার্গচ্যুত হলেও সেই চ্যুতি সাময়িক। দশ বৎসর পরে বিশ্বামিত্রের বিবেকবোধ জাগ্রত হলে তিনি দুঃখিতভাবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবলেন, 'কামমোহাভিভূতস্য বিঘ্নোঽয়ং প্রত্যুপস্থিতঃ।' মেনকাকে বিদায় দিয়ে বিশ্বামিত্র এবার উত্তর দিকে গমন করলেন। "স কৃত্বা নৈষ্ঠিকীং বুদ্ধিং জেতুকামো মহাযশাঃ। কৌশিকীতীরমাসাদ্য তপস্তেপে দুরাসদম্॥"— জিতকাম হওয়ার দৃঢ়সংকল্প নিয়ে তিনি কৌশিকীনদীর তীরে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলেন। এইভাবে সহস্র বৎসর অতীত হল। ভীত দেবগণের প্রার্থনায় ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রকে মহর্ষিত্ব প্রদান করলেন। ক্ষুব্ধচিত্তে বিশ্বামিত্র অনুযোগ করলেন, ব্রহ্মর্ষি-পদবাচ্য হওয়ার মত যোগ্যতা কি তিনি এখনও অর্জন করেননি! "তমুবাচ ততো ব্রহ্মা ন তাবৎ ত্বং জিতেন্দ্রিয়ঃ। যতস্ব মুনিশার্দূল ইত্যুক্ত্বা ত্রিদিবং গতঃ।" বিশ্বামিত্র অনেক উন্নতি করেছেন, তাই ব্রহ্মা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'তুমি এখনও জিতেন্দ্রিয় হওনি, কিন্তু মুনিশ্রেষ্ঠ তুমি যত্ন কর।'

এই বলে ব্রহ্মা স্বর্গে প্রস্থান করলেন।

কোন্ দুর্বলতা এখনও তাঁর হৃদয়ে বর্তমান ভেবে পেলেন না বিশ্বামিত্র। তাই তপস্যা আরও কঠোরতর হল। নিদাঘে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে, বর্ষায় অনাবৃত স্থানে, শীতে সলিলশায়ী হয়ে তিনি তপস্যা আরম্ভ করলেন।

বিশ্বামিত্রের কঠোর তপস্যায় ভীত ইন্দ্র রম্ভাকে প্রেরণ করলেন তপোভঙ্গের জন্য— বসন্ত ও কন্দর্প সহচর হলেন। কোকিলের মধুর স্বরে হৃষ্টচিত্ত বিশ্বামিত্রের নয়ন উন্মীলিত হল। কিন্তু রম্ভাকে দেখামাত্র তার উদ্দেশ্য বুঝে ক্রোধাভিভূত-চিত্তে অভিসম্পাত দিলেন—"যন্মাং লোভয়সে রম্ভে কাম-ক্রোধ-জয়ৈষণম্। দশবর্ষসহস্রাণি শৈলী স্থাস্যসি দুর্ভগে॥" আমি কাম ক্রোধ জয় করতে ইচ্ছুক আর তুমি আমাকে প্রলুব্ধ করতে এসেছ! দুর্ভগে! তুমি দশ হাজার বৎসর পাষাণ হয়ে থাক। কিন্তু তারপরই অনুতাপানলে দগ্ধ হতে লাগলেন বিশ্বামিত্র। ইন্দ্রিয় জয় তো হলই না, উপরন্তু তপঃক্ষয়। চিত্তের শেষ দোষটি সাধকের সামনে পরিস্ফুট হল; তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন—"নৈব ক্রোধং গমিষ্যামি ন চ বক্ষ্যে কথঞ্চন॥"—আমি আর ক্রুদ্ধ হব না, অভিশাপও দেব না। এ ছাড়া যত দিন না ব্রাহ্মণত্ব লাভ করছি ততদিন অনাহারে শ্বাসরোধ ক'রে তপস্যা করব। এইরূপে সহস্র বৎসর তপস্যা করার সংকল্প করলেন বিশ্বামিত্র।

বারংবার তপস্যায় বিঘ্ন ঘটে এবং মুনিবর স্থান পরিবর্তন করেন। দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর তিন-দিকেই তপস্যা হয়ে গেছে; এখন বাকী আছে মাত্র পূর্বদিক্। বিশ্বামিত্র সেই দিকেই গমন করলেন। পূর্ব প্রতিজ্ঞানুযায়ী তিনি শ্বাসরোধ ক'রে অনাহারে মৌনী হয়ে তপশ্চরণ করতে লাগলেন। বহু বিঘ্ন উপস্থিত হলেও তিনি ক্রুদ্ধ হলেন না। সহস্রবর্ষান্তে বিশ্বামিত্র অন্ন পাক করে আহারের উদ্যোগ করছেন, এমন সময় ইন্দ্র বিপ্রবেশে সেই অন্ন প্রার্থনা করলেন। বিশ্বামিত্র শান্তভাবে সমস্ত অন্ন তাঁকে দান ক'রে পুনরায় পূর্বের ন্যায় নিঃশ্বাস রোধ করে তপস্যায় মগ্ন হলেন। এই ভাবে আরও সহস্র বৎসর অতীত হল। তাঁর মস্তক হতে ধূম নির্গত হতে লাগল। তখন দেবতা ঋষি গন্ধর্ব পন্নগ উরগ ও রাক্ষসগণ বিশ্বামিত্রের এই অবস্থা দর্শনে মুগ্ধ ও সন্ত্রস্ত হয়ে ব্রহ্মাকে তাঁর প্রার্থনীয় বস্তু দান করার অনুরোধ করলেন। তখন ব্রহ্মা সকলের সঙ্গে বিশ্বামিত্রের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন এবং বল্লেন—"হে ব্রহ্মর্ষে! তোমার মঙ্গল হোক্। তুমি ব্রাহ্মণত্ব লাভ কর। তুমি দীর্ঘায়ু হও।"

আজ বিশ্বামিত্র কৃতার্থ। বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে তিনি সকলকাম। তিনি দুটি প্রার্থনা পিতামহকে নিবেদন করলেন—সমগ্র বেদবিদ্যার জ্ঞান এবং বশিষ্ঠের স্বীকৃতি। তখন দেবগণের প্রচেষ্টায় বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের মধ্যে সখ্য স্থাপিত হল। বশিষ্ঠ তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করলেন এবং বিশ্বামিত্রও বশিষ্ঠকে পূজা করলেন।

আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, অদম্য অধ্যবসায়, ও পুরুষকারের সাহায্যে মানব বহু পতন স্খলনের পর যে উচ্চস্তরে আরোহণ করতে পারে বিশ্বামিত্রের সাধনা তার উজ্জ্বল উদাহরণ।

অবতারপুরুষ যীশু

ডক্টর জলধি কুমার সরকার

যীশুখৃষ্ট বা ঈশা শ্রীরামকৃষ্ণভক্তদের মনোমন্দিরে যে কত উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত, তা সকলেরই জানা। এর কারণ এই যে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে ভগবানের অবতারজ্ঞান করতেন। খৃষ্টধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের বা খৃষ্টের বাণীর সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করলে অবাক্ হ'তে হয়। কিন্তু সেই সাদৃশ্য বা উভয়ের ভিন্নতা দেখান বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। যীশুখৃষ্টের জীবনী আলোচনাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁর পার্থিব জীবনের ঘটনাবলী এবং যে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় তাঁর আবির্ভাব, তার সম্যক্ পরিচয় না পেয়ে তাঁর দেবত্বের পূর্ণ উপলব্ধি হওয়া সম্ভব নয়। দেশ ও কালের প্রয়োজনেই অবতারের আবির্ভাব হয় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিভিন্নতার জন্যেই অবতারগণের মধ্যে বিভিন্নতা প্রতীয়মান হয়। কিন্তু মানবকে তার দেবত্ব স্মরণ করান এবং তাদেরই একজন হ'য়ে তাকে ঠিক পথের সন্ধান দেওয়া যে তাঁদের আগমনের প্রধান কারণ এ-কথা সব অবতারেরই জীবনে সুস্পষ্ট।

আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী প্যালেস্টাইন দেশে একটি ছোট্ট পল্লীগ্রামের ইহুদীপরিবারে যীশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইহুদীদের তৎকালীন অবস্থা বেশ শোচনীয় ছিল। তাদের দেশ প্যালেস্টাইন তখন রোমানদের অধীনে; সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা ও শাসনভার রোমানদের উপর। এদিকে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষ্টি ও শিল্পকলায় গ্রীকদের আধিপত্য। ইহুদীরা নিজ দেশে পরাধীন ও ক্ষমতাহীন অবস্থায় প্রধানতঃ কৃষি ও মেষপালনে নিযুক্ত থাকত। কঠিন পরিশ্রম করেও নিজেদের অর্ধাহারে রেখে ধনী গ্রীকদের বিলাস-ব্যসনের সামগ্রী যোগাত। অনেকে আজীবন ঋণভারে জর্জরিত থেকে গ্রীক মহাজনের সুদ যুগিয়ে যেত। ধর্মবিষয়ে কিন্তু ইহুদীদের খুব গর্ব ছিল, কারণ তারা একেশ্বরবাদী ছিল। তারা মনে মনে রোমানদের শাসক, বিদেশী ও পৌত্তলিক বলে ঘৃণা করত। এদিকে রোমানরা ইহুদীদের দুর্বল জাতি হিসাবে অবহেলার চক্ষে দেখত।

ইহুদীদের বিশ্বাস, তারা পৃথিবীর আদি জাতি। তারা 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট' (Old Testament)-এ বিশ্বাসী। এতে সৃষ্টির আদি হ'তে যীশুর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত ঘটনাবলী বর্ণিত আছে। যীশু ও তাঁর কাহিনী অবলম্বনে 'নিউ টেস্টামেণ্ট' (New Testament) রচিত। ওল্ড টেস্টামেণ্টে আছে, ভগবান স্বর্গ, পৃথিবী, আলো, জল, পশু প্রভৃতি সৃষ্টি করার পর প্রথম মানব ও মানবী— আদম ও ইভ্‌কে সৃষ্টি করেছিলেন। তারপরে আদম-ইভ্ হ'তে যে বংশপরম্পরা চলতে লাগল, তাদের মধ্যে ভগবানের বিশেষ আশীর্বাদ নিয়ে জন্ম নিয়েছিলেন ইহুদীদের পূর্বপুরুষেরা— এব্রাহাম, জেকব, মোসেস, ডেভিড প্রভৃতি। এঁদের প্রফেট (Prophet) বা মহান্ আচার্য ও ভবিষ্যদ্বক্তা বলা হয়, কারণ এঁরা যে শুধু ইহুদীধর্মের নানা অনুশাসন দিয়ে গেছেন তা নয়, এঁরা সকলেই ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, পরে একজন মেসায়া (Messiah) বা উদ্ধারকর্তা জন্মাবেন, যিনি ইহুদীদের সমস্ত অত্যাচার অনাচার হ'তে মুক্ত করবেন এবং জাতির সুখ সমৃদ্ধি এনে দেবেন। অনেকে এর অর্থ করে নিয়েছিল যে, সেই 'মেসায়া' রাজা হয়ে আসবেন এবং তাঁর আগমনের পরে

আর তাদের দৈহিক পরিশ্রম করে জীবনধারণ করতে হবে না।

এই পটভূমিকায় জন্ম হোল যীশুখৃষ্টের। প্যালেস্টাইনের গ্যালিলি (Galilee) প্রদেশের একটি ক্ষুদ্র গ্রাম, নাম নাজারেথ (Nazareth)। গ্রামবাসীরা দরিদ্র— অধিকাংশই মেষপালক অথবা মৎস্যজীবী। এই গ্রামের মেয়ে— কুমারী মেরী উপাসনাকালে দৈববাণী শুনলেন যে, ভগবান তাঁর গর্ভে জন্ম নিয়েছেন, তাঁর নাম হবে 'জিসাস' বা যীশু (যার অর্থ 'মুক্তিদাতা')। তিনি রাজা হয়ে আসবেন, তবে সাধারণ অর্থে যাকে রাজা বলে তা নয়। মেরী ভীত হলেন খানিকটা, কিন্তু গর্বে ভরে গেল তাঁর বুক, এই ভেবে যে, তাঁকে আশ্রয় ক'রে ভগবান ভূতলে অবতীর্ণ হবেন। ধর্মভীরু, সরল সূত্রধর যোসেফের সঙ্গে বিবাহে বাগ্‌দত্তা মেরী যোসেফকে সব কথা জানালেন। যোসেফ সরল বিশ্বাসে মেরীর শ্রুত দৈববাণীকে সত্য বলে মেনে নিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের বিবাহ সম্পন্ন হোল। তাঁরা আগ্রহভরে অপেক্ষা করতে লাগলেন, কবে ভগবান তাঁদের ঘর আলো করে জন্ম নেবেন। কয়েক মাস পরে যোসেফ ও মেরী বেথলেহেম শহরের দিকে তীর্থের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। ঠিক সেই সময় রোমসম্রাট্ অগাস্টাসের হুকুমে ইহুদীদের মধ্যে লোকগণনা চলছিল। বেথলেহেমের সমস্ত সরাইখানা জনাকীর্ণ। কোথাও জায়গা না পেয়ে যোসেফ আসন্নপ্রসবা মেরীকে নিয়ে শহরের বাইরে একটি পরিত্যক্ত গুহাতে আশ্রয় নিলেন। এই গুহাতে প্রয়োজন হ'লে মেষপালকরা তাদের জন্তুদের রাত্রে রাখত। এইখানেই জন্ম নিলেন যীশুখৃষ্ট। শীত হ'তে রক্ষার জন্য মেরী নবজাত শিশুকে কাপড়ে জড়িয়ে একটি ডাবায় রেখে ছিলেন। ভোরে স্বপ্নাদেশ পেয়ে দেখতে এল নিকটবর্তী মেষপালকেরা। তাদের উদ্ধারকর্তা তাদেরই একজন হয়ে দরিদ্র পরিবেশে জন্ম নিয়েছেন জেনে তারা আনন্দে অধীর হয়ে গেল। চল্লিশদিন পরে ইহুদীপ্রথানুযায়ী যোসেফ-দম্পতি যীশুকে নিয়ে গেলেন জেরুসালেমের মন্দিরে এবং তারপরে আবার ফিরে এলেন বেথলেহেমে।

এই সময় একটি ঘটনা ঘটল। কয়েকজন Magi বা শিক্ষিত লোক (একজন ভারতীয়, একজন গ্রীক এবং একজন ইথিয়পিয়ন), যাঁদের অনেক সময় Wise men from the East' বা প্রাচ্যের পণ্ডিত ব্যক্তি বলা হয়, তাঁরা আকাশে একটি অভূতপূর্ব নক্ষত্রের আবির্ভাব দেখে জানতে পারলেন যে, মেসায়া বা অবতারের জন্ম হয়েছে, যাঁর জন্য পৃথিবী এতদিন অপেক্ষা করছিল। তাঁরা সেই নক্ষত্রকে লক্ষ্য করে বেথলেহেমের কাছে এলেন এবং নবজাতকের খোঁজ করতে করতে সেখানকার রাজা হেরডকে জিজ্ঞাসা করলেন। হেরড অত্যন্ত দুষ্টপ্রকৃতি ও অত্যাচারী ছিলেন, এবং তাঁর ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী নিকটে কোথাও জন্মেছে শুনে আতঙ্কিত হলেন। রাজার কাছ হ'তে সন্ধান না পেয়ে পণ্ডিতরা আবার নক্ষত্রকে অনুসরণ ক'রে পূর্বোক্ত গুহাতে এসে নবজাত 'রাজা'কে দেখে তাঁদের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করলেন। এদিকে হেরড তাঁর সৈন্যদের হুকুম দিলেন যে, সে অঞ্চলে দু'বছরের কম বয়সের যত শিশু পাওয়া যাবে তাদের যেন হত্যা করা হয় এবং তাই করা হোল। কিন্তু এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড হেরডের কোন কাজে লাগল না, কারণ স্বপ্নাদেশ পেয়ে যোসেফ ও মেরী শিশুকে নিয়ে তখন যাত্রা করেছেন মিশরের পথে। দিনের পর দিন মরু-যাত্রী বেদুইনদের সঙ্গে, কখনও পদযাত্রায় কখনও বা গাধার পিঠে চড়ে তাঁরা মিশরে পৌঁছুলেন। এই কষ্টের মধ্যেও তাঁদের সান্ত্বনা যে 'শিশু ভগবান'কে তাঁরা রক্ষা করতে পেরেছেন।

কিন্তু বেশীদিন তাঁদের মিশরে থাকতে হয়নি।

অত্যাচারী শাসক হেরডের কাল ঘনিয়ে এসেছিল। চারিদিকে বিদ্রোহের আগুন নেবাতে গিয়ে অশান্তি ও অসুখের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হোল। লোকমুখে এই খবর পেয়ে যোসেফ সপরিবারে ফিরে গেলেন তাঁর নিজগ্রাম নাজারেথে।

গ্রামে যোসেফের পরিবার আর পাঁচজনের মতই কায়িক পরিশ্রমে দিনাতিপাত করতে লাগল। যোসেফ গ্রামের লোকদের জন্য কাঠের কাজ করতেন, মেরী ঘর-সংসারের কাজ করতেন। মাথায় কলসি করে জল আনার সময় শিশু যীশু কখনও কখনও ছোট ঘটি করে জল নিয়ে মায়ের কাজে সাহায্য করতেন। মায়ের সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে উপাসনায়ও যোগ দিতেন, আবার অন্য ছেলেদের সঙ্গে পাঠশালায়ও যেতেন। বার বৎসর বয়স পর্যন্ত যীশুর এইভাবেই সাধারণ গ্রাম্যজীবন চলল। এই সময় মা-বাবার সঙ্গে যীশু পবিত্র শহর জেরুসালেমে "পাসোভার ফিস্ট" (Passover Feast) নামে বাৎসরিক উৎসবে যোগ দিতে যান। এই মন্দিরে যীশুর যেন একটু ভাবান্তর দেখা গেল। প্রতিদিন মন্দিরে ধূপদান মেষবলি প্রভৃতি সেরে, কয়েকদিন পরে যখন যোসেফ ও মেরী বাড়ী ফিরবার জন্য যাত্রা করলেন, কিছুদূর গিয়ে সঙ্গে যীশুকে না দেখে উৎকণ্ঠিত হয়ে তাঁরা ফিরে এসে দেখেন যে, যীশু পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে বসে তাঁদের কঠিন প্রশ্নসমূহের উত্তর দিয়ে পণ্ডিতদের স্তম্ভিত করে দিচ্ছেন। যীশুকে পিতামাতার সঙ্গে না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর এল 'জান না কি, আমি এখন আমার পিতার মন্দিরে আছি!' মন্দিরটি বহুকালের পুরাতন এবং ইহুদীদের আদি রাজা সলোমনের প্রতিষ্ঠিত। যীশুর ওই কথায় যোসেফ ও মেরী একেবারে অবাক্! কিন্তু পরমুহূর্তেই বালকের সহজ সরল ব্যবহারে তাঁরা শান্ত হলেন ও গ্রামে ফিরে এলেন।

এইভাবে গ্রাম্যজীবন চলল আরও আঠার বৎসর— যীশুর বয়ঃক্রম তিরিশে পৌছুল। এই আঠার বৎসরের ঘটনাবলীর— যীশুর শিক্ষা দীক্ষা বা সাধনার কথা কোথাও লিপিবদ্ধ পাওয়া যায় না ব'লে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কেউ কেউ মনে করেন, যীশু এই সময় বহুদেশ পর্যটন করেছিলেন, এবং ভারতেও নাকি এসেছিলেন।

যাই হোক, এই সময় সারা আরবদেশে রটে গেল যে, জন নামে একজন শুদ্ধিকার (John the Baptist), দেশের মুক্তিকামীদের জর্ডন নদীর জলে অবগাহনের পরে মন্ত্রদ্বারা শুদ্ধ করছিলেন এবং প্রচার করছিলেন যে, মেসায়া বা অবতার ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন। যীশু সাম্নয়ে তাঁর মাকে জানালেন যে, এইবার যে কার্যের জন্য তাঁর পিতা অর্থাৎ ভগবান তাঁকে পাঠিয়েছেন, সেই কাজের জন্য তাঁকে গৃহত্যাগ করতে হবে। মায়ের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। সাশ্রুনয়না মাতাকে আলিঙ্গন ক'রে যীশু প্রত্যূষে যাত্রা করলেন তাঁর অভীপ্সিত পথে। পিছনে পড়ে রইল তাঁর বাল্যভূমি, মাতাপিতা, এবং আত্মীয়-স্বজন।

যীশু কয়েকদিনে তাঁর প্রদেশ গ্যালিলি (Galilee) ছেড়ে জর্ডান নদীর ধারে এসে পৌছুলেন, যেখানে জন সাধারণের মধ্যে তাঁরই আগমনবার্তা প্রচার করছিলেন। তিনি জনের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে শুদ্ধি নিতে চাইলেন। জন অবতাররূপী যীশুকে শুদ্ধি দিতে ইতস্ততঃ করছিলেন, কিন্তু যীশু বললেন, "না, সমস্তই নিয়মমাফিক হোক"। ধর্মজীবনের আগে তখন আনুষ্ঠানিক শুদ্ধির প্রচলন ছিল।

তারপরে চলল যীশুর কঠিন তপস্যা। নির্জন মরু-প্রান্তরে তিনি চল্লিশদিন অনাহারে রইলেন আশে পাশে ছিল কেবল হিংস্র বন্যজন্তু। সেইসময় শয়তান নানা ছলনায় চেষ্টা করেছিল তাঁর তপস্যা

নষ্ট করতে, অনেক প্রলোভন দেখিয়েছিল। কিন্তু যীশু অটল রইলেন তাঁর ধ্যানে। তারপর তপস্যাশেষে প্রচারের জন্য লোকালয়ে ফিরে এলেন।

তিনি মন্দিরেও প্রচার করতেন আবার সঙ্গীদের নিয়ে এর জন্য গ্রামে গ্রামেও ঘুরতেন। ধর্মবিষয়ে তিনি প্রথম বক্তৃতা করেছিলেন একটি ছোট পাহাড়ের উপর, সেইজন্য প্রথম দিনের সেই উপদেশগুলিকে বলে 'শৈলোপদেশ' বা Sermon on the mount. প্রতিদিন বক্তৃতার শেষে তিনি অনেকের রোগও আরোগ্য করে দিতেন তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতার দ্বারা। তাঁর সব উপদেশগুলিই ছোট ছোট গ্রাম্য উপকথার মাধ্যমে বলতেন। তিনি জানালেন যে, তিনি এক অভিনব রাজ্যের সৃষ্টি করবার জন্য ধরায় এসেছেন, যে-রাজ্য প্রেমের রাজ্য। তিনি যে ভগবানের পুত্র এবং তাঁরই চাপরাস-প্রাপ্ত এটা জানাবার জন্য অনেক সময় আলৌকিকতার সাহায্য নিতেন। তিনি অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং তার সবগুলিই সত্য হয়েছিল। এর একটি ছিল—জেরুসালেম ধ্বংসের কথা। এটা ঘটেছিল যীশুর দেহত্যাগের চল্লিশ বৎসর পরে। ইহুদীরা রোমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল কিন্তু রোমান সৈন্যরা সে-বিদ্রোহ শুধু দমনই করেনি, বহু ইহুদীর প্রাণনাশ করেছিল এবং অনেকে বিদেশে পালাতে বাধ্য হয়েছিল। এর একশো বছর পরে—আর একবার সেই রকমের পরিস্থিতি ঘটলে রোমানরা পুরানো জেরুসালেম শহরের চিহ্নমাত্র রাখেনি। সেই সময়েই ইহুদীরা বিতাড়িত হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ইহুদীরা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেনি, কারণ যীশুকে তারা তাদের বহু-প্রত্যাশিত মুক্তিদাতা বা অবতার ব'লে মানতে পারেনি। আজও তারা আশা করছে, তাদের ধর্মশাস্ত্রে অর্থাৎ Old Testament-এ বর্ণিত মেসায়া বা উদ্ধারকর্তা এসে সুখসমৃদ্ধ রাষ্ট্র সৃষ্টি করে তাদের সব দুঃখকষ্ট দূর করে দেবেন।

[ক্রমশঃ]

অভীক চেতনা

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

সজাগ চেতনা খাপখোলা তরোয়াল
ঋজু সততার বুকে পিঠে বাঁধা ঢাল
রক্তে মাংসে ঢাকা শ্বেত কঙ্কাল
মুক্ত শুদ্ধ সাধনার দেবালয়।
ক্ষাত্রবীর্যে পরিমণ্ডল দীপ্ত
স্বপ্নকামনা অমিত অপরিতৃপ্ত
অখিল কর্মসাধনে প্রজ্ঞা লিপ্ত
প্রলয়তিমিরে নির্মম নির্ভয়॥

অস্তিত্বের ক্ষণমিহলোকতীর্থে
শরীরকে করে সাধনা অতিক্রম,
সুপরিশীলিত ভাবনাপুঞ্জ চিত্তে
ভাবসৌধের গড়ে রূপ নিরুপম।

সহৃদয়তার শাণিতসত্যে স্থিতি
অভীক প্রাণের সুস্থ ধারণা ধৃতি॥

সমালোচনা

রামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি: শ্রীধ্রুব চৌধুরী ও শ্রীশম্ভু নাথ ঘোষ। প্রকাশিকা: শ্রীমতী আরতি চৌধুরী, পি-২২৮, সি. আই. টি. রোড, কলিকাতা ১০। (১৯৭৪); পৃঃ ৫২, মূল্য ছয় টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে স্বরলিপিসহ ২৬টি গান আছে। গানগুলি ৫টি পর্যায়ে বিভক্ত: গুরুবন্দনা, রামকৃষ্ণ-বন্দনা, সারদেশ্বরী-বন্দনা, সারদা-রামকৃষ্ণ-বন্দনা ও স্বামীজী-বন্দনা। উক্ত পর্যায়গুলিতে গানের সংখ্যা যথাক্রমে ৫, ১০, ৭, ২ ও ২। গীতিকার শ্রীধ্রুব চৌধুরী ও সুরকার সঙ্গীত-বিশারদ সঙ্গীত-প্রভাকর শ্রীশম্ভু নাথ ঘোষের যুগ্ম শুভ প্রচেষ্টার আকর্ষণীয় ফলশ্রুতি এই ভজনাঞ্জলি। গুণী সঙ্গীতজ্ঞের হাতে পড়িয়া ভজনগুলি যথাযোগ্য রাগ ও তালে অলংকৃত হইয়াছে। প্রত্যেকটি গান তাহার নিজস্ব রাগরূপ পাইয়াছে, অর্থাৎ ২৬টি গানে ২৬টি পৃথক্ পৃথক্ রাগ ব্যবহৃত হইয়াছে। রচনাও ভক্তিভাবপূর্ণ এবং অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ভাবই সঙ্গীতের প্রাণ, কথা ও সুরের মাধ্যমে তাহা আত্মপ্রকাশ করে এবং তাল ঐ সুরকে সংযম-শুদ্ধ করে। এই গ্রন্থে ভাব বাণী রাগ ও তাল-এর সুন্দর সমন্বয় ঘটিয়াছে। Art for Art's sake—শিল্পকলার জন্যই শিল্পকলা—ইহা ভারতের মর্মবাণী নহে। সকল কলাই পরিপূর্ণতা লাভ করে ঈশ্বরে সমর্পিত হইলে। সঙ্গীত চিত্রকলা ভাস্কর্যের মাধ্যমে ভারত চির-কালই সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্-এর নিকটে আত্ম-নিবেদন করিয়া ধন্য হইয়াছে। স্বামীজী বলিতেন, এদেশে রাজনৈতিক বা সমাজতাত্ত্বিক ধ্যানধারণার প্রচারের পূর্বে আধ্যাত্মিক ভাব-প্লাবনের প্রয়োজন। সমগ্র ভারতে আজ যে এত অশান্তি, তাহার মূল কারণ এই যে, দেশবাসী স্বামীজীর বাণী যথাযথ অনুসরণ করিতে পারে নাই। প্রার্থনা করি, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষিত আধ্যাত্মিক ভাববন্যায় প্লাবিত হউক। প্রার্থনা করি, বাঙলা ভাষায় রচিত এই অধ্যাত্ম-ভাবশ্রীমণ্ডিত সুমধুর সঙ্গীতাবলী আবালবৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া বাঙালীর ব্যথিত পীড়িত অশান্ত শুষ্ক হৃদয় শান্তি-আনন্দ-ধারায় সিক্ত করুক।

আমরা গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি। পরবর্তী খণ্ডগুলির প্রকাশের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

বিবেকানন্দ ইন্‌স্টিটিউশন্ পত্রিকা: ৪৭ বর্ষ, চৈত্র, ১৩৮০। শ্রীব্রজমোহন মজুমদার কর্তৃক ৭৫ ও ৭৭, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, হাওড়া-৪ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। পৃঃ ৫৪।

প্রবন্ধ ছোটগল্প কবিতা রম্যরচনা মিলাইয়া ২০টি কাঁচা-পাকা রচনার সঙ্কলন। এইটি বিবেকানন্দ ইন্‌স্টিটিউশনের বার্ষিক পত্রিকা। সকল রচনাগুলিই বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের রচিত। কয়েকটি গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ যথা: 'আত্মদর্শন ও স্বামীজী' 'কবি ও বিজ্ঞানী' 'দত্তকবি শ্রীমধুসূদন' 'অলৌকিকতার আলোকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ' পত্রিকাখানির মান উন্নত করিয়াছে। 'চিরন্তন ছোটগল্প' শ্রেষ্ঠ রচনার দাবি রাখে। অন্যান্য রচনা ও কবিতাগুলিও বেশ উপভোগ্য। সাদামাটা প্রচ্ছদপট হইলেও রচনা-কৌলিন্যে পত্রিকাখানি পড়িবার মত। প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম করিয়া

শান্তিবচন সর্বশেষে সংযুক্ত হইয়াছে। প্রার্থনা ও মঙ্গলসূক্ত সহায়ে সর্বকর্মের সূচনা শিষ্টাচার সম্মত। পত্রিকাখানির জন্য ছাত্রসম্পাদক ও প্রচ্ছন্ন পরিচালকদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই।

ত্রিধারা: বার্ষিক পত্রিকা (৭ম সংখ্যা, ১৩৮০) প্রকাশক: ছাত্র সংসদ, রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ, বেলঘরিয়া, কলিকাতা-৫৬। পৃষ্ঠা ৬৪।

পত্রিকার নামটি বিশেষ অর্থবহ। শিল্পপীঠ অর্থাৎ লাইসেন্সিয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল— এই তিনটি বিভাগের ছাত্র ও অধ্যাপকবৃন্দের সমবেত প্রচেষ্টায় প্রকাশিত ত্রিধারা। বাংলা, ইংরেজী— উভয় বিভাগই প্রবন্ধ কবিতা গল্প স্মৃতিকথা প্রভৃতি বিচিত্র স্বাদের রচনায় সমৃদ্ধ। শিক্ষার্থীদের রচনা-শক্তি যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে সমতালে চলেছে। অধ্যাপকবৃন্দের রচনাবলী সুচিন্তিত ও তথ্যপূর্ণ। প্রচ্ছদপট চিত্তাকর্ষক। সচিত্র সংবাদে শিল্পপীঠের ক্রমোন্নতি ফুটে উঠেছে। শ্রীবাসুদেব সিংহ

VIDYAPITH (1973): Published by Swami Chandrananda, Secretary, Ramakrishna Mission Vidyapith, Deoghar, Bihar. পৃষ্ঠা ৬৪ + ২৪ + ৮।

রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত আবাসিক বিদ্যালয়-গুলির অন্যতম দেওঘর বিদ্যাপীঠের সুসম্পাদিত ও সুমুদ্রিত বার্ষিক পত্রিকাটি পড়ে আমরা আনন্দিত হয়েছি। গত বছর বিদ্যাপীঠের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত শিক্ষামূলক প্রদর্শনীতে ছাত্রদের উদ্ভাবিত বিজ্ঞান-কুশলতার সচিত্র বর্ণনা চিত্তাকর্ষক।

বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে লেখা প্রবন্ধ গল্প কবিতায় ছাত্রদের সাহিত্যসাধনার আন্তরিক প্রচেষ্টা দেখা যায়। 'Resume of important activities of Vidyapith in the year 1973' —এই ইংরাজী রচনায় সারা বছরের কর্মধারা সুন্দরভাবে বিবৃত।

শ্রীবাসুদেব সিংহ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব

বেলুড় মঠে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা মহা-সমারোহে যথোচিত ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মহাষ্টমীর দিন গুড়িগুড়ি বৃষ্টি ও নবমীর বিকালে প্রবল বারিবর্ষণ ভিন্ন আবহাওয়া ভাল থাকায় যথেষ্ট জনসমাবেশ হয়। পূজার তিনদিন প্রত্যহ অন্নপ্রসাদ হাতে হাতে দেওয়া হয় এবং মহাষ্টমীর দিন প্রায় ৩০,০০০ ব্যক্তি প্রসাদ পান।

গত বৎসরের ন্যায় এইবারেও রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের নিম্নোক্ত ২২টি কেন্দ্রে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়:

আসানসোল, করিমগঞ্জ, কামারপুকুর, কাঁথি, গৌহাটি, জয়রামবাটী, জলপাইগুড়ি, জামসেদপুর, ঢাকা নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম, বালিয়াটি, বোম্বাই, মালদহ, মেদিনীপুর, রহড়া, লখ্নৌ, শিলং, শিলচর, শেলা (চেরাপুঞ্জি) ও শ্রীহট্ট।

সেবাকার্য

বাংলাদেশে সেবাকার্য: বাংলাদেশের সেবাকেন্দ্রগুলির মাধ্যমে অক্টোবর ১৯৭৪-এর শেষ পর্যন্ত মোট ৩৩,৭১,২৪৭ টাকা খরচ করা হয়। বিতরিত দ্রব্যাদির মূল্য উক্ত হিসাবের অন্তর্ভুক্ত নহে। জুলাই, অগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে কৃষ

সেবাকার্যের বিবরণ নিম্নে একসঙ্গে দেওয়া হইল :

ঢাকা কেন্দ্র (জুলাই ও অগস্ট) : চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ৬,৪৫২। বিতরিত হয় : বিস্কুট ২০ কেজি, গুঁড়ো দুধ ৯,৮৬৪ পাঃ, সি. এস. এম. শিশুখাদ্য ১৫০০ পাঃ, ধুতি ১৩৭, শাড়ী ১,৩৭৪, কম্বল ১৭৮, লুঙ্গি ৭৭৫, মশারি ২০, গামছা ৯, সোয়েটার ২২৫, শার্ট ২১০, পুরাতন বস্ত্র ৮২৫, শিশুদের পোশাক ১৫৪, গায়েমাখা সাবান ৪৫ খণ্ড, কাপড়কাচা সাবান ২১ খণ্ড, বাসন ১৪, জুতা ৫ জোড়া, ছুতোরের যন্ত্রপাতি ৩ প্রস্থ।

বাগেরহাট কেন্দ্র (জুলাই ও অগস্ট) : চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ১৬,৬৩১। বিতরিত হয় : গুঁড়ো দুধ ৭,০৮১'৫ পাঃ, ধুতি ৪৩, শাড়ী ২০২, শার্ট ৪০, মাছধরা জালের সুতো ১,২৯০ বাণ্ডিল, জুতা-সেলাইয়ের যন্ত্রাদি ৪৩২।

দিনাজপুর কেন্দ্রে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ৭,৭২২। বিতরিত হয় : গুঁড়ো দুধ ৪,৩০০ পাঃ, শাড়ী ১,১৩৭, লুঙ্গি ৫৪, জুতা ৫৮ জোড়া, মাল্‌টিভিটামিন ট্যাবলেট ১,০৮৫।

শ্রীহট্ট কেন্দ্রে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ২,২৯১। বিতরিত হয় : গুঁড়ো দুধ ৭,৫০০ পাঃ, কম্বল ২, শাড়ী ৭৭২, লুঙ্গি ৭১৪, ধুতি ৩।

বরিশাল কেন্দ্র (জুলাই ও সেপ্টেম্বর) : চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ১,১১১। বিতরিত হয় ৫,১৭৫ পাঃ গুঁড়ো দুধ।

এতদ্ব্যতীত গত অগস্ট মাস হইতে বাংলা-দেশে ঢাকা কেন্দ্রের মাধ্যমে বন্যাত্রাণকার্য করা হয়। অগস্ট ও সেপ্টেম্বরে ১,৫৪,৪০২ জন ব্যক্তির মধ্যে বিতরিত দ্রব্যাদির পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হইল : গুঁড়ো দুধ ৯০০০ পাঃ, বিস্কুট ৯০ কেজি, শাড়ী ৩,৪৫০, লুঙ্গি ২,১৮০, কম্বল ৩০০, সোয়েটার ১,৪৭৫, মশারি ১০০, পুরাতন বস্ত্র ১,০৩২, শার্ট ১,৬৪৫, ধুতি ২৬০, বাসন ১৪০। ইন্‌জেকশন দেওয়া হয় ৮৩১ জনকে। ঢাকা কেন্দ্র হইতে উপরোক্ত দ্রব্যাদি ফরিদপুর, ছায়া-ঘরিয়া, ফার্লিনহাট, ময়মনসিংহ, আড়িহাজার, রূপগঞ্জ, পাথালিয়া জামালপুর, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা সদর, মাণিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানে বিতরিত হয়।

ভারতে সেবাকার্য

খাদ্যাভাবত্রাণকার্যে ২৬শে অক্টোবর পর্যন্ত মনসাদ্বীপ কেন্দ্র হইতে ৪,৪২৩ কেজি আটা বিতরিত হয়। ২৭শে অক্টোবর হইতে লঙ্গর-খানা খোলা হয়।

রামহরিপুর কেন্দ্র শ্রমবিনিময়ে ৯১৮ জনকে সাহায্য করে।

বিভিন্ন লঙ্গরখানার মাধ্যমে প্রতিদিন যত সংখ্যক ব্যক্তিকে খাদ্য বিতরণ করা হইতেছে, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :

কুচবিহার	২২,০০০
জলপাইগুড়ি	১,০০০
জয়রামবাটী	৩,০০০
রামহরিপুর	৫০০
বাঁকুড়া	৫০০
কাঁথি	১,৫০০
তমলুক	১,০০০
নরেন্দ্রপুর	১,৫০০
রহড়া	৩,২০০
সরিষা	২,৫০০
মনসাদ্বীপ	১,০০০
পুরুলিয়া	৫,৫০০

মালদহ আশ্রম কর্তৃক পরিচালিত একটি সস্তার খাদ্য-বিক্রয়-কেন্দ্রে প্রতিদিন ২০০০ লোক সাহায্য পাইতেছে।

সরিষা এবং পুরুলিয়া কেন্দ্র হইতে যথাক্রমে ৬০০ খানি শিশুদের পোশাক ও ১১৬টি ধুতি ও শাড়ী বিতরিত হয়।

বন্যাত্রাণকার্যের সেপ্টেম্বর মাস অবধি বিবরণী কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

অন্যান্য সংবাদ

গত ৬ই অক্টোবর ১৯৭৪ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীজগ-জীবন রাম **সেকেন্দ্রাবাদ** রামকৃষ্ণ আশ্রমের উৎসর্গ-উৎসবের উদ্বোধন করেন। ঐ উপলক্ষে মুদ্রিত স্মরণিকাটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সি. সুব্রমনিয়ম কর্তৃক উৎসব-সভায় প্রকাশিত হয়। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহায়ক সম্পাদক স্বামী চিদাত্মানন্দ সভায় পৌরোহিত্য করেন।

গত ১৫ই অক্টোবর ১৯৭৪ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণসম্পাদক স্বামী গম্ভীরানন্দ কর্তৃক **মালদহ** রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের নবায়িত প্রার্থনাগৃহটি উৎসর্গীকৃত হয়।

কার্যবিবরণী

বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৭২-৭৩ সালের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই প্রতিষ্ঠানটি বারাণসীধামে জাতিধর্মনির্বিশেষে সর্বসাধারণের সেবা করিয়া আসিতেছে।

১৯৭২ সালে ইন্‌ডোর জেনারেল হাসপাতালে ৩,০৪৯ রোগীর চিকিৎসা করা হয়। অস্ত্রোপচার হয় ১,১৪৬ জনের। রাস্তা হইতে আনীত রোগীর সংখ্যা ছিল ৫৫। গড়ে দৈনিক ১১৪টি শয্যায় রোগী ছিল।

১৯৭২ সালে বহির্বিভাগে প্রতিদিন গড়ে ৬৭৪ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। চিকিৎসিত নূতন ও পুরাতন রোগীর সংখ্যা যথাক্রমে ৫৮,৫৬৮ ও ১,৫৫,১২৫। অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ১,৮৩৯।

হোমিওপ্যাথি বিভাগ: লাকসা ও শিবালা উভয় স্থানে ৬ জন হোমিওপ্যাথ রোগীদের চিকিৎসা করেন।

ক্লিনিক্যাল ও প্যাথলজিক্যাল লেবরেটরী এবং এক্স-রে ও ইলেক্ট্রোথেরাপি বিভাগ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।

অশক্ত ও নিরাশ্রয় বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাদের আশ্রয়-ভবন দুইটিতে ২১ জন পুরুষ ও ২৪ জন মহিলা ছিলেন। এই দুইটি নিবাস চালাইতে এই উচ্চ মূল্যমানের বাজারে গত কয়েক বৎসরে আশ্রমের ঘাটতি হইয়াছে মোট ৮,৪১৫ টাকা।

বাহিরের দুঃস্থদের সেবাকল্পে ৫৫ জন দরিদ্র অসহায় বৃদ্ধাকে মাসিক এবং ২৩ জনকে সাময়িক অর্থসাহায্য দেওয়া হয়। ইহাতে মোট ব্যয় হয় ২,০৩১ টাকা। ইহা ছাড়া ৪৪৯ টাকা মূল্যের ৫৭টি তুলোর নূতন কম্বল এবং পুরাতন কম্বল ও বস্ত্রাদি ১৯১ জনের মধ্যে বিতরিত হয়।

আশ্রমের পুস্তকাগারে ২,৭৪৬ টি বই, ৩টি দৈনিক ও ২৫টি সাময়িক পত্র-পত্রিকাও রাখা হয়।

আলোচ্য বর্ষে আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪,৮৪,৩৬৩.২৯ টাকা ও ৬,১৯,৭০৯.৭৩ টাকা। ফলে ঘাটতি হয় ১ ৩৫,০০৬.৪৪ টাকা। অতীতের ঘাটতির সহিত যোগ করিয়া ৩১.৩.১৯৭৩-এ মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১,৮২,২২২.০৩ টাকা।

হাসপাতালের ১৮৬টি শয্যার মধ্যে মাত্র কয়েকটির জন্য দান সংগ্রহ করা গিয়াছে; আশ্রয়-ভবনের অশক্তদের ভরণপোষণের জন্যও দান আবশ্যক— তাহা ছাড়া ঘাটতি পরিশোধ, অধিক-সংখ্যক চিকিৎসক, কর্মচারী ও শুশ্রূষাকারিণীর নিয়োগ এবং তাহাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ প্রভৃতি কাজেও বহু অর্থের প্রয়োজন। আশ্রম-কর্তৃপক্ষ এই সেবাযজ্ঞে অর্থ সাহায্যের জন্য সহৃদয় জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ

কার্যবিবরণী

মাতৃভবন (৭এ, শ্রীমোহন লেন, কলিকাতা ২৬): রামকৃষ্ণ সারদা মিশন কর্তৃক পরিচালিত এই প্রসূতিসদনের ১৯৭১-৭৩ এই দুই বৎসরের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। মাতৃভবনটি ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ১০টি শয্যা লইয়া রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬১ সালে ইহার কর্মভার রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের উপর ন্যস্ত হয়। বর্তমানে শয্যা-সংখ্যা ৫৪, তন্মধ্যে ২৬টি নিঃশুল্ক। প্রসবপূর্ব ও প্রসবোত্তর চিকিৎসা বহির্বিভাগে বিনামূল্যে হয়।

আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে বহির্বিভাগে যথাক্রমে ১২,৭৯৮ ও ১৩,৮২৪ জনের প্রাক্‌প্রসব এবং ১,৫৩০ ও ১,৪৬৮ জনের প্রসবোত্তর চিকিৎসা হয়। অন্তর্বিভাগে প্রসূতির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২,৩৮০ ও ২,৪৭৫। শিশুচিকিৎসা-বিভাগে চিকিৎসিত শিশুর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২,৯৯৯ ও ৩,২৭২। এই বিভাগে পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের চিকিৎসা সপ্তাহে দুই দিন হয়। দুঃস্থ ঘরের শিশুদের বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়। একমাস বয়স পর্যন্ত শিশুদের চিকিৎসাও বহির্বিভাগে হয়। প্রয়োজনে অন্তর্বিভাগেও শিশুদের ভর্তি করা হয়। ইহা ছাড়া পারবার পরিকল্পনার জন্য ২টি পৃথক্ শয্যাও আছে।

উপরে বর্ণিত সেবা ছাড়া বস্তির ৫০টি শিশুকে 'দরিদ্র শিশু-কল্যাণ প্রকল্প' অনুসারে নিয়মিত সকালের জলখাবার দেওয়া, বস্তির বালক-বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষা দিবার জন্য কোচিং ক্লাশ পরিচালনা ও বস্ত্রাদি বিতরণ করাও হয়।

১৯৭১ সালে অগস্ট মাস হইতে রবিবার ভিন্ন প্রতিদিন পুষ্টিকর পাঁউরুটি পঃ বঙ্গ সমাজ কল্যাণ বোর্ডের সহযোগিতায় ২০০ শিশু ও ৫৭ সন্তানসম্ভবা ও প্রসবোত্তরকালীন মাতাকে দেওয়া হয়। ভারতীয় রেড ক্রশ সমিতির পঃ বঙ্গ শাখার সহায়তায় ১৯৭১ সালের এপ্রিল হইতে জুন মাস পর্যন্ত রবিবার ভিন্ন প্রতিদিন এক কাপ করিয়া দুধ ২০০টি শিশুকে দেওয়া হয়।

রোগিণী ও স্থানীয় মহিলাদিগের জন্য একটি পুস্তকাগার আছে,—পুস্তক সংখ্যা ১,৩০৬।

মাতৃ-ভবনের কর্তৃপক্ষ ২৬টি নিঃশুল্ক শয্যার আংশিক ব্যয় বাবত ১৫ হাজার ও পরিকল্পিত শল্যচিকিৎসা ভবন নির্মাণ বাবত ৭৫ হাজার টাকার জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন।

উৎসব

ত্রিবেণী (হুগলী) বিবেকানন্দ সংঘ কর্তৃক গত ১৩ই অক্টোবর স্বামী অভেদানন্দজীর জন্ম-জয়ন্তী পূজা ভজন ও ধর্মসভার মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে পালিত হয়। শ্রীমতী স্নেহ মুখোপাধ্যায়, সর্বশ্রী বিমল কুমার, জয়দেব চট্টোপাধ্যায় ও পবিত্রকুমার ঘোষ (সভাপতি) বক্তৃতা দেন।

দিব্য বাণী

যা বিদ্যেত্যভিধীয়তে শ্রুতিপথে
শক্তিঃ সদাদ্যা পরা
সর্বজ্ঞা ভববন্ধছিত্তিনিপুণা
সর্বাশয়ে সংস্থিতা।
দুর্জ্ঞেয়া সুদুরাত্মভিশ্চ মুনিভি-
র্ধ্যানাস্পদং প্রাপিতা
প্রত্যক্ষা ভবতীহ সা ভগবতী
বুদ্ধিপ্রদা স্যাৎ সদা ॥

—দেবীভাগবত, ১।২।৪

আদ্যাশকতি ব্রহ্মবিদ্যা পরম পদ
সর্বজ্ঞা—বলি বন্দনা গায় উপনিষদ্।
সকল জীবের হৃদয়-গুহায় বসতি যাঁর
ভববন্ধন ছিন্ন করে যে করুণা তাঁর।
সাধনভজন ত্যাগতিতিক্ষা নাই যাদের—
অজিতেন্দ্রিয়, দুর্জ্ঞেয়া তিনি হন তাদের।
ধ্যানযোগপথে প্রত্যক্ষা যিনি মুনিগণের
সেই ভগবতী বুদ্ধিদায়িনী হোন মোদের।

কথাপ্রসঙ্গে

শ্রীশ্রীমা—ত্যাগে ও সেবায়

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুন। ফলহারিণী কালিকাপূজার অমাবস্যা রজনী। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নির্দেশে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার ঘরে শ্রীশ্রীমা দেবীর আসনে সমাসীনা। পূজক শ্রীরামকৃষ্ণদেব দশ মহাবিদ্যার অন্তর্গত তৃতীয় মহাবিদ্যা ষোড়শী দেবীকে আবাহন করিয়া প্রার্থনা করিলেন: হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইহার শরীরমনকে পবিত্র করিয়া ইহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর।

তন্ত্রসাধনকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অপূর্বরূপ-লাবণ্যময়ী অসংখ্য দেবীমূর্তির দর্শনলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ষোড়শী মূর্তির সৌন্দর্য অতুলনীয়। ইহার অপর নাম রাজরাজেশ্বরী। ত্রিপুরাসুন্দরী, বালা ইত্যাদি নামেও ইনি অভিহিতা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রার্থনা ব্যর্থ হইবার নয়। শ্রীশ্রীমা অতঃপর স্থূলদেহে ৪৮ বৎসর বর্তমান থাকিয়া রাজরাজেশ্বরীরূপে নানাভাবে লোককল্যাণ করিয়া গিয়াছেন এবং আমাদের বিশ্বাস, এখনও সেইরূপেই বিশ্বকল্যাণে নিরতা আছেন।

স্বামী প্রেমানন্দজীর একটি পত্রে শ্রীশ্রীমাকে 'রাজরাজেশ্বরী' বলা হইয়াছে—অবশ্য ইহা পারিভাষিক অর্থে নাও হইতে পারে। স্বামী শিবানন্দজীর একটি পত্রে আছে: শ্রীশ্রীমা সাধারণ মানবী ন'ন বা সাধিকা ন'ন বা সিদ্ধা ন'ন; তিনি নিত্যসিদ্ধা—জগজ্জননীর এক বিশেষরূপ, যেমন দশমহাবিদ্যা, তিনিই এবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহায়িকা শ্রীমতী সারদামণি দেবী হইয়া জীব উদ্ধারের জন্য শুদ্ধ সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া জগতে অবতীর্ণা।

যুবক ভক্ত সারদাপ্রসন্নকে (ভাবী স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণদেব দীক্ষাগ্রহণের জন্য শ্রীশ্রীমায়ের নিকট পাঠাইয়া বলিয়াছিলেন: অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায় / কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয় যায় রয়। 'রাধার মায়া'—সম্বন্ধে ষষ্ঠী নয়—অভেদে ষষ্ঠী। রাধাই মায়া—যেমন 'রাহুর শির'-এর অর্থ শিরোরূপী রাহু—রাহুর সবটাই শির, শির ব্যতীত আর অন্য অঙ্গ নাই। রাধাই মায়া, শক্তি, প্রকৃতি—'মায়া শক্তিঃ প্রকৃতিরিতি চ' (শংকর)। উক্ত পয়ারের দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমাকে 'মায়া' বলিয়া সূচিত করিয়াছেন।

আবার দেখি, শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেছেন: ও সারদা—সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে।

শ্রীশ্রীসারদাদেবীর একটি জীবনীতে পাওয়া যায়, স্বামী বিবেকানন্দ একদা বেলুড় মঠে সুরেন্দ্র-কুমার সেনকে বলিয়াছিলেন: শ্রীমা বগলার অবতার, বর্তমানে সরস্বতীমূর্তিতে আবির্ভূতা—উপরে মহা শান্তভাব, কিন্তু ভিতরে সংহার-মূর্তি। সুতরাং স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথার প্রতিধ্বনি তো করিয়াছেনই, অধিকন্তু দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত অষ্টমী সিদ্ধবিদ্যা বগলাকেও মায়ের স্বরূপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জনৈক উন্মাদরোগগ্রস্ত ভক্তের কথা উল্লেখনীয়। কামারপুকুরে একদিন শ্রীশ্রীমা যখন পাশের বাড়ী হইতে নিজ বাড়ীতে যাইতেছিলেন, তখন সেই পাগল তাঁহার পশ্চাতে ছুটিল। পাগলের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মা ধানের মরাইয়ের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলেন।

সাতবার ঘুরিয়া অবসন্না মা 'নিজ মূর্তি' দেখিতে পাইলেন এবং পাগলের বুকে হাঁটু দিয়া জিভ টানিয়া ধরিয়া গালে এমন চড় মারিতে লাগিলেন যে, সে হাঁপাইয়া উঠিল। মায়ের হাতের আঙুলই লাল হইয়া গিয়াছিল। 'জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং বামেন শত্রুং পরিপীড়য়ন্তীং · দ্বিভুজাং নমামি'— বগলার এই ধ্যানমূর্তির সহিত শ্রীশ্রীমায়ের উপরি-উক্ত 'নিজ মূর্তি'র বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

আবার দেখি, স্বামীজী একটি পত্রে শ্রীশ্রীমাকে 'জ্যান্ত দুর্গা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

এখন দেখা যাক্ শ্রীশ্রীমা তাঁহার নিজের সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন।

একবার কয়েকটি স্ত্রীলোক মাকে দর্শন করিতে আসিয়া যখন দেখিলেন যে, তিনি তাঁহার ভাইপো ভাইঝিদের লইয়া খুব ব্যস্ত, তখন তাঁহাদের মধ্যে একজন মন্তব্য করিয়াছিলেন: মা, আপনি দেখছি মায়ায় ঘোর বদ্ধ। সেই মন্তব্য শুনিয়া মা অস্ফুটস্বরে বলিয়াছিলেন: কি করবো মা, নিজেই মায়া।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার শ্রীশ্রীমাকে বলিয়াছিলেন যে, ভক্তগণ তাঁহাকে কালী, আদ্যাশক্তি, ভগবতী — এই সব বলেন, কিন্তু তিনি যদি স্বয়ং ঐ সকল কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন, তবেই নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায়। উত্তরে শ্রীশ্রীমা পরিষ্কার বলিয়াছিলেন: হ্যাঁ, সত্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র শিবরাম চট্টোপাধ্যায় একদা শ্রীশ্রীমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন: তুমি কে বলতে পার? মা বলিয়াছিলেন: লোকে বলে কালী। শিবরাম: কালী তো? ঠিক? মা: হ্যাঁ।

জনৈক সন্ন্যাসী মাকে প্রশ্ন করেন: মা, ঠাকুর যদি স্বয়ং ভগবান, তবে আপনি কে? বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া মা উত্তর দেন: আমি আর কে, আমিও ভগবতী।

এক ভক্ত মহিলা শ্রীশ্রীমাকে প্রশ্ন করেন: মা, আপনি যে ভগবতী তা' আমরা বুঝতে পারিনা কেন? মা উত্তর দেন: সকলেই কি চিনতে পারে, মা! ঘাটে একখানা হীরে পড়ে ছিল। সবাই পাথর মনে ক'রে তাঁতে পা ঘসে স্নান ক'রে উঠে যেত। একদিন এক জহুরী সেই ঘাটে এসে দেখে চিনলে যে, সেখানা একটা প্রকাণ্ড মহামূল্য হীরে।

শ্রীশ্রীমায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধারাণীর অত্যাচারে একদিন মা জনৈক ভক্ত মহিলাকে বলিয়াছিলেন: দেখো মা, এ শরীর দেবশরীর জেনো…ভগবান না হলে কি মানুষে এত সহ্য করতে পারে?

জনৈক সন্ন্যাসী কথাপ্রসঙ্গে মাকে একদিন বলেন: মা, আপনাদের পরে ষষ্ঠী শীতলা প্রভৃতি দেবতাকে আর কেউ মানবে না। মা উত্তর দেন: মানবে না কেন? তারা তো আমারই অংশ।

অপর একজন সন্ন্যাসীকে মা বলিয়াছিলেন, মায়া অবলম্বন করিয়াই তিনি সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো রুটি-বেলা ইত্যাদি সাংসারিক কার্য করিতেছেন, নতুবা তিনি বৈকুণ্ঠে নারায়ণের পার্শ্বে লক্ষ্মীরূপেই বিরাজ করিতেন।

শ্রীশ্রীমা দাক্ষিণাত্যের তীর্থসমূহ দর্শন করিয়া কলিকাতায় ফিরিলে, তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল তিনি রামেশ্বর প্রভৃতি কেমন দেখিলেন। উত্তরে মা বলিয়াছিলেন: বাবা, যেমনটি রেখে এসেছিলুম, ঠিক তেমনটিই আছেন। শ্রীশ্রীমায়ের এই উক্তিতে তিনি যে সীতা, ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে।

এক ভক্ত মহিলা মাকে প্রশ্ন করেন: মা, ঠাকুরের জপ তো আমাকে বলে দিয়েছেন, আপনার জপ কি ক'রে করবো? মা উত্তর দেন: রাধা ব'লে পারো, কি অন্য কিছু ব'লে পারো, যা তোমার সুবিধা হয় তাই করবে; কিছু না পারো, শুধু মা ব'লে করলেই হবে।

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীকার স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখিয়াছেন: শোনা যায়, এক সময় জনৈক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, 'আমিই রাধা'।

শ্রীশ্রীমায়ের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের এই সকল উক্তি এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতির উক্তিসমূহের নিষ্কর্ষ এই যে, শ্রীশ্রীমা সীতা ও রাধা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী, ষোড়শী ও বগলা, আদ্যাশক্তি কালী মায়া ভগবতী ইত্যাদি। সহজেই প্রশ্ন উঠিতে পারে—এই সকল কথার সামঞ্জস্য কোথায়?

সামঞ্জস্য—গিরিরাজকে পার্বতীর সেই নানা-রূপে দর্শন দেওয়াতে—শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত পুরাণোক্ত সেই কাহিনীতে। পার্বতী হিমালয়ের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়া পিতাকে নানা ঐশ্বরীয় রূপে দর্শন দিলে, গিরিরাজ সকল রূপ দর্শন করিয়া বলিলেন: মা, তোমার এসব রূপ তো দেখলাম, কিন্তু তোমার আরেকটি রূপ আছে—সেই অরূপ ব্রহ্মস্বরূপটি একবার দেখাও। পার্বতী বলিলেন: বাবা, তুমি যদি বেদে যে ব্রহ্মদর্শনের কথা আছে, তা চাও, তো সংসারত্যাগ ক'রে সাধুসঙ্গ করো।

এক পার্বতীর অনন্ত রূপ—সব রূপেরই উৎস সেই অরূপ ব্রহ্মস্বরূপ!

সামঞ্জস্য—শ্রীশ্রীচণ্ডীর সেই 'মেধাসি দেবি'-শ্লোকে যেখানে বলা হইয়াছে যে, মহিষাসুরমর্দিনীই সরস্বতী, লক্ষ্মী ও গৌরী। সামঞ্জস্য—'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা', শ্রীশ্রীচণ্ডীর এই অদ্বৈততত্ত্বপ্রকাশক মহামন্ত্রে। সামঞ্জস্য—'একোঽহং বহু স্যাম্', বেদান্তের এই বাণীতে। বস্তুতঃ 'গোলোকে সর্বমঙ্গলা মা, ব্রজে কাত্যায়নী/ কাশীতে মা অন্নপূর্ণা, অনন্তরূপিণী'—এই জাতীয় শত শত বাংলা পয়ার হইতে শুরু করিয়া 'ত্বং দুর্গা ছিন্নমস্তা ত্বমসি চ ভুবনা ত্বং চ লক্ষ্মীঃ শিবা ত্বং / মাতঙ্গী ত্বং চ ধূমা ত্বমসি বগলা মঙ্গলা হিঙ্গুলাখ্যা', ইত্যাদি অজস্র সংস্কৃত স্তবে ও শ্লোকে পদে পদে অভিলষিত সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়।

আবার প্রশ্ন উঠিবে—এত দার্শনিকতার প্রয়োজন কি? 'ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ', এই জাতীয় তত্ত্ববিচার ছাড়িয়া মানবীরূপেই মা কি করিলেন, কি বলিলেন, সেই আলোচনাই বাঞ্ছনীয় নয় কি?

ঠিক কথা। সেই আলোচনা নিঃসন্দেহে অশেষ কল্যাণপ্রদ—যদিও দার্শনিক আলোচনা সকলেরই পক্ষে একান্ত নিষ্প্রয়োজন নয়। ভক্ত গায়কের গান মনে পড়িয়া যায়—'জলে অবতরি / কার কে কুমারী / তৃণদল ধরি কাটিছে রে।' জয়রামবাটীতে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গোয়ালে গরুগুলি ক্ষুধার জ্বালায় হাম্বা হাম্বা রব তুলিয়াছে। মমতাময়ী বালিকা কন্যা সারদা কি করিয়া স্থির থাকিতে পারে! কাস্তে হাতে লইয়া ছুটিয়া পুকুরে নামিয়া সে দলঘাস কাটিতেছে—ইহাতে কি মাধুর্য নাই? ক্ষেতে মজুররা কাজ করিতেছে, সারদা নিজেই তাহাদিগের নিকট মুড়ি গুড় পৌঁছাইয়া দিতেছে, অবসর সময়ে গাছ হইতে তুলা আনিয়া মাতার নিকট পৈতার সুতা কাটা শিখিতেছে—ইহাতে কি সৌন্দর্য নাই—সুষমা নাই? অবশ্যই আছে। আমরা সেই আলোচনাই করিব। তবে অসংখ্য যাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তাঁহার জীবনে ত্যাগ ও সেবা কিভাবে বাস্তবায়িত হইয়াছিল, শুধু তাহাই আমরা দেখিতে প্রয়াস পাইব।

প্রায় শত বৎসর পূর্বে লক্ষ্মীনারায়ণ নামে জনৈক সূক্ষ্মবুদ্ধি বেদান্তবাদী মাড়োয়ারী দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট প্রায়ই আসিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শয্যা মলিন দেখিয়া একদিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দশ হাজার টাকা দিতে চাহিয়া-ছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, ঐ টাকা ব্যাঙ্কে রাখিয়া তাহার সুদ হইতে যেন তাঁহার সেবার

ব্যয়নির্বাহ করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব উহা প্রত্যাখ্যান করিলে লক্ষ্মীনারায়ণ উক্ত দশ হাজার টাকা শ্রীশ্রীমায়ের নামে দিতে চাহিলেন। শ্রীশ্রীমাও ঐ প্রস্তাবিত দান প্রত্যাখ্যান করেন। স্বামীর আয় মাসিক পাঁচ টাকা, নিজে নহবতখানার স্বল্প-পরিসর কক্ষে দারিদ্র্যের মধ্যে কালাতিপাত করিতেছেন, তথাপি মা ঐ টাকা গ্রহণ করেন নাই। মা বলিয়াছিলেন, উক্ত টাকা তাঁহার নামে থাকিলেও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সেবায় উহা ব্যয় করিতে বাধ্য হইবেন, ফলে উহা শ্রীরামকৃষ্ণদেব কর্তৃকই গৃহীত হইবে; লোকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে তাঁহার ত্যাগের জন্য— অতএব টাকা কিছুতেই লওয়া হইবে না। মা নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়াও টাকাটা রাখিতে পারিতেন। তাহাও করেন নাই। সুতরাং সকল দিক দিয়া বিচার করিলে শ্রীশ্রীমায়ের এই ত্যাগ অভূতপূর্ব, সন্দেহ নাই।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমা ৺রামেশ্বর দর্শন করিতে যান। ঐ সময়ে ৺রামেশ্বর মন্দির স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য,রামনাদের রাজার অধীনে ছিল। তিনি দর্শনাদির সর্বপ্রকার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন এবং কর্মচারীদের আদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহারা যেন মন্দিরের রত্নাগার খুলিয়া তাঁহার গুরুর গুরু— পরমগুরু শ্রীশ্রীমাকে দেখান এবং তিনি কোন কিছু চাহিলে তাহা যেন তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উপহার দেন। কর্মচারীদের নিকট রাজার ঐ নির্দেশ শুনিয়াও মা কিছুই গ্রহণ করেন নাই— বলিয়াছিলেন, তাঁহার কোন কিছুরই প্রয়োজন নাই। পরে তাঁহারা ক্ষুণ্ণ হইবেন ভাবিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধারাণীর যদি কিছু প্রয়োজন হয় তো সে যাহা ইচ্ছা লইতে পারে। রাধারাণীকেও মা ঐ কথা বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উন্মুক্ত কোষাগারে হীরা-জহরত দেখিয়া মা শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপদে আকুল প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন যে, রাধারাণীর মনে যেন কোন বাসনা না জাগে। ফলতঃ এগার বৎসর বয়স্কা বালিকা রাধারাণী বলিয়াছিল, তাহার ঐ সকল অলংকারের কোনই প্রয়োজন নাই, তাহার পেন্সিলটি হারাইয়া গিয়াছে, একটি পেন্সিল চাই। শ্রীশ্রীমাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া রাস্তার দোকান হইতে দুই পয়সার একটি পেন্সিল কিনিয়া রাধারাণীকে দিয়াছিলেন। ইহাই ত্যাগ, অপরিগ্রহ—প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর মহামহিমময় আদর্শ যাহা পুনরুজ্জীবিত করিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও তাঁহাদের জনকজননীদের এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণের শুভাবির্ভাব।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমা ৺জগন্নাথ দর্শন করিতে পুরীধামে গমন করিয়াছিলেন এবং সেখানে ভক্তপ্রবর বলরাম বসুদের 'ক্ষেত্রবাসীর মঠে' প্রায় দুই মাস ছিলেন। বলরামবাবুদের পাণ্ডা গোবিন্দ শিঙ্গারী ৺জগন্নাথমন্দিরে যাইতে শ্রীশ্রীমায়ের জন্য পালকির ব্যবস্থা করিতে চাহিলে, তিনি সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিলেন: না, গোবিন্দ, তুমি আগে আগে পথ দেখিয়ে চলবে, আমি দীন হীন কাঙ্গালিনীর মতো তোমার পেছনে পেছনে ৺জগন্নাথ দর্শনে যাব। কার্যতও মা ঐ সম্মান ও ঐশ্বর্য বর্জন করিয়াছিলেন। ভগবদ্‌ভক্তিতে মানুষ যে 'তৃণাদপি সুনীচ' হইয়া যায়, এই ঘটনা তাহারও একটি মাধুর্যময় দৃষ্টান্ত। বস্তুতঃ আমরা যে-সকল ঘটনার উল্লেখ করিতেছি সেগুলিতে ত্যাগের অতিরিক্ত অন্য দিকও আছে— যেমন প্রথমোক্ত ঘটনাটি মায়ের আদর্শ সহধর্মিণীত্বের, পবিত্র পাতিব্রত্যধর্মেরও সমুজ্জ্বল নিদর্শন। তবে আমরা এখন ত্যাগের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি, এইজন্য সেই দিকটিরই উল্লেখ করিতেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোভাবের পর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীশ্রীমা কামারপুকুরে

স্বামীর ভিটায় বাস করিতে থাকেন, কারণ শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'বরং পরভাতা ভাল, পরঘোরো ভাল নয়'। শ্রীশ্রীমাকে এই সময়ে নিঃসঙ্গ ও নিঃসম্বল অবস্থায় জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইয়াছিল। এমন দিনও গিয়াছে, যখন শুধু দুটি ভাত সিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু লবণ জোটে নাই। তথাপি তিনি কাহারও নিকট কিছু যাচ্ঞা করেন নাই। ত্যাগীশ্বর স্বামীর নিকট ত্যাগের যে অনুপম শিক্ষা তিনি পাইয়াছিলেন—'কারও কাছে একটি পয়সার জন্যও চিৎহাত কোরো না' তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

উত্তরকালে শ্রীশ্রীমাকেও দেখা যায় অনুরূপভাবে ত্যাগের উপদেশ দিতে। জনৈক ভক্ত মহিলাকে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন: কারো কাছে কিছু চেও না— বাপের কাছে তো নয়ই, স্বামীর কাছেও নয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের ত্যাগের উপদেশ অপেক্ষা শ্রীশ্রীমায়ের এই ত্যাগের উপদেশ আরও বিস্ময়কর, সন্দেহ নাই। স্বামী তো ভর্তা, স্ত্রী ভার্যা— যদিও বর্তমানযুগে অনেক স্ত্রীলোকেরই এই সকল অভিধায় আপত্তি থাকিতে পারে। কিন্তু আমরা শ্রীশ্রীমায়ের যুগের কথা বলিতেছি। তাঁহার এই উপদেশ শুধু যে পারিবারিক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, তাহা নহে। ইহার গভীরতম তাৎপর্য আছে। যিনি অধ্যাত্মপথের পথিক, তাঁহার ভর্তা শুধু একজনই—গীতায় যিনি 'গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ' ইত্যাদি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। 'ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ'— এইরূপ ব্যক্তি নিজের কোনও প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য কোন প্রাণীকেই আশ্রয় করেন না, কাহারও উপর বিন্দুমাত্র নির্ভর করেন না, কারণ তিনি জানেন— দিবার মালিক একজনই আছেন। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।' শ্রীশ্রীমা এই মহৎ ত্যাগব্রত নিজ জীবনে সম্যক্ আচরণ করিয়া জীবকে ত্যাগের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, এই জন্যই সেই উপদেশ এত মর্মস্পর্শী।

পিতৃগৃহে বালিকা সারদামণির সেবার কিছু আভাস আমরা পূর্বে দিয়াছি। ১৮৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে জয়রামবাটী-অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। দরিদ্র কিন্তু হৃদয়বান্ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পোষ্যবর্গের ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়াই দুর্ভিক্ষপীড়িত নিরন্ন নরনারীর জন্য অন্নসত্র খুলিয়া দিলেন। মরাই-বাঁধা সঞ্চিত ধান চাল করাইয়া ও কলায়ের ডাল দিয়া হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি রাঁধাইয়া তিনি প্রত্যহ বিতরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীমা নিজে বলিয়াছেন যে, সেই গরম খিচুড়ি ঢালা হইবামাত্র তিনি উহা জুড়াইবার জন্য দুই হাতে বাতাস করিতেন। দুর্ভিক্ষ বন্যা ইত্যাদি বিপর্যয়ে রামকৃষ্ণ মিশন যে-সেবাকার্য চালাইয়া আসিতেছে, তাহার সূত্রপাত এইভাবে ভবিষ্যৎ-সংঘজননী বালিকা সারদামণির দ্বারাই ঘটে, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণদেব মথুরামোহনের দ্বারা দেওঘর অঞ্চলের বুভুক্ষু দরিদ্রদের অন্নাদির দ্বারা যে-সেবা করাইয়াছিলেন, তাহা ১৮৬৮ সালের ঘটনা।

কন্যারূপে, বধূরূপে, ভগিনীরূপে, সংঘমাতৃরূপে, ভক্তজননীরূপে ও গুরুরূপে শ্রীশ্রীমা আদর্শ সেবাময় জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বরে এবং বিশেষতঃ শ্যামপুকুরে ও কাশীপুরে শত অসুবিধার মধ্যেও প্রাণপণে স্বামীর সেবা করিয়াছেন। নহবতের বাসের অযোগ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কক্ষে থাকিয়া সর্বান্তঃকরণে শ্বশ্রূমাতা চন্দ্রাদেবীর সেবাশুশ্রূষা করিয়াছেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তগণের জন্যও রন্ধনাদি কার্য পর্যন্ত করিয়াছেন। সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা অভয়চরণ যৌবনের প্রারম্ভেই দেহত্যাগ করিলে, তাঁহার শিশুকন্যা রাধারাণীর লালনপালনাদির ভার শ্রীশ্রীমা স্বেচ্ছায় আপন স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলেন, কারণ তাহার

মাতা অপ্রকৃতিস্থা ছিলেন ; রাধারাণী ও তাঁহার মাতার সর্বপ্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়াও তিনি আজীবন ঐ কার্য নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে তাঁহার ত্যাগী সন্তানগণ যখন একে অন্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কঠোর তপস্যায় নিরত ছিলেন, তাঁহাদের কষ্টের জীবন স্মরণ করিয়া— তাঁহাদের অনিশ্চিত আহার ও আশ্রয়ের কথা ভাবিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, তাঁহারা যেন সংঘবদ্ধভাবে মঠে থাকিয়া নিশ্চিন্তমনে সাধনভজনে ও লোক-কল্যাণে নিযুক্ত থাকেন। এইভাবে শ্রীশ্রীমায়ের সেবাবুদ্ধি ও সন্তানবাৎসল্যই শ্রীরামকৃষ্ণমঠ প্রতিষ্ঠার মূলে বিদ্যমান।

উত্তরকালে জয়রামবাটীতে সমাগত অসংখ্য ভক্ত নরনারীকে শ্রীশ্রীমা সেবা করিয়াছেন। এমনকি কখনও কখনও তাহাদের জন্য নিজে রাঁধিয়াছেন এবং তাহাদের আহারাদির পর স্বহস্তে উচ্ছিষ্ট স্থান পরিষ্কার করিয়াছেন। জয়রামবাটীতে জনৈক দীক্ষিত সন্তানকে মা বলিয়াছিলেন : বাবা, সারাদিন যেন কুস্তি করছি, এই ভক্ত আসছে তো এই ভক্ত আসছে— এ শরীরে আর বয় না। কলিকাতায় শ্রীশ্রীমা সাধুদের তত্ত্বাবধানে থাকিতেন— তাঁহাদের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া সময়ে অসময়ে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করা ভক্তগণের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না, কিন্তু জয়রামবাটীতে সে বাধা বা অসুবিধা না থাকায়, মা জয়রামবাটীতে গেলেই ভক্তগণ তাহাদের নিজেদের সুবিধামত যখন তখন মায়ের দর্শন ও কৃপালাভের জন্য সেখানে উপস্থিত হইতেন। ফলে শ্রীশ্রীমাকে তাহাদের সর্ববিধ সুখসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইত। বাতব্যাধিগ্রস্ত মা কখনও কোনও ভক্তদের জন্য ভোরের চায়ের দুধ সংগ্রহ করিতে কষ্টে সৃষ্টে গাঁয়ের পথে চলিয়াছেন, কখনও বা তাহাদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের তরিতরকারি ইত্যাদির জন্য প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছেন— এই সকল প্রায় দৈনন্দিন ঘটনা হইয়া দাঁড়াইত। সন্তানবৎসলা জননী সহস্র অসুবিধা ভোগ করিয়াও অকাতরে ভক্তসন্তানগণের সেবা করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতায় ভক্তসেবায় শ্রীশ্রীমাকে অন্য ধরণের অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। সংসারের নানা দুঃখকষ্টের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায় বহুলোক মায়ের নিকট আসিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। শেষের দিকে অসুস্থ শরীরে মা ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা'-গ্রন্থে আছে, মা বলিতেছেন : বাতাস করো তো মা, শরীর জ্বলে গেল ! গড় করি মা, কলকাতাকে— কেউ বলে আমার এ দুঃখ, কেউ বলে আমার ও দুঃখ, আর সহ্য হয় না। বেলা চারটা হতে রাত্রি অবধি লোক আসছে, লোকের দুঃখ আর দেখতে পারি না !

সকল সেবার শ্রেষ্ঠ সেবা জীবকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করিয়া মোক্ষদ্বার অপাবৃত করা। গুরুরূপে শ্রীশ্রীমা সেই সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা, স্বামীর দেহত্যাগের পর হইতে নিজ দেহান্তের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় চৌত্রিশ বৎসর সর্বান্তঃকরণে করিয়া গিয়াছেন। উহার অধিক বিশ্লেষণ করিতে গেলে শ্রীশ্রীমায়ের আলোচনা মানবী-পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখা একেবারেই সম্ভব হইবে না, এইজন্য সেই চেষ্টা আমরা করিব না। স্বামী বিবেকানন্দ যেমন শ্রীশ্রীমাকে আমেরিকাবাসীদের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের 'প্রথম শিষ্যা' বলিয়া অভিহিত করিয়া-ছিলেন, আমরাও সেইভাবে তাঁহাকে উপস্থাপিত করিতেছি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় শ্রীশ্রীমায়ের ভিতর যে-গুরুশক্তির অবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা জীবকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবায় নিয়োজিত হইয়া পরম চরিতার্থতা লাভ করিয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট

হইতে মা যে-সকল মহামন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, অধিকারী অনুযায়ী সেই সকল সিদ্ধমন্ত্রে শরণাগত নরনারীকে দীক্ষিত করিয়া শ্রীশ্রীমা তাঁহাদের ইহকাল ও পরকালের সকল পারমার্থিক ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন: দয়ায় মন্ত্র দিই; ছাড়ে না, কাঁদে, দেখে দয়া হয়; কৃপায় মন্ত্র দিই; নতুবা আমার আর কি লাভ? মন্ত্র দিলে তার পাপ গ্রহণ করতে হয়—ভাবি, শরীরটা তো যাবেই, তবু এদের হোক। স্বামী ব্রহ্মানন্দ-প্রমুখ মহা-আধ্যাত্মিক শক্তিধর পুরুষগণও যাহাদের গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন, অশেষ-করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা নিজ শরীরকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সেই সকল পাপী তাপীদেরও দীক্ষা দিয়া গুরুরূপে সেবায় অতুলনীয় আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন: ত্যাগ ও সেবাই ভারতের জাতীয় আদর্শ। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে সেই সনাতন আদর্শ পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত। সত্য কথা বলিতে কি, মা আদর্শ অপেক্ষা অধিকই করিয়াছেন—ইহা তিনি নিজ-মুখে বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীমায়ের শুভ আবির্ভাব-তিথির প্রাক্কালে প্রার্থনা করি, তাঁহার এই ত্যাগ- ও সেবা-ময় মহান্ জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া আমরা যেন আংশিকভাবেও নিজ নিজ জীবনে ভারতের জাতীয় আদর্শ অনুসরণ করিয়া ধন্য হইতে পারি।

স্বামী সারদানন্দের অপ্রকাশিত পত্র

[শ্রীপঞ্চানন প্রামাণিককে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

কলিকাতা

৬ই কার্ত্তিক *

কল্যাণবরেষু

তোমার ৩রা তারিখের পত্র পাইয়া সকল বিষয় অবগত হইলাম। দীক্ষা পাইতে হইলে নিজেকে তাহার জন্য উপযুক্ত করিতে হইবে, কারণ উহা গ্রহণ করিয়া ঠিক ঠিক পালন না করিতে পারিলে কোন ফলই হয় না। আমার শরীরও এখন তত ভাল যাইতেছে না। তিন মাস নিষ্ঠার সহিত প্রাতঃকালে বসিয়া ১০০৮ বার ··· নাম জপ কর। তাহার পর মাঘ মাসে আমাকে জানাইও উহা পালন করিয়াছ কি না। আমি তখন তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিব। না খাটিলে কিছু হয় না, সুতরাং দৃঢ়তার সহিত উহা অভ্যাস করিতে হইবে। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীসারদানন্দ

* পোস্টকার্ডটির উপর ডাকখানার ছাপ আছে: 23 Oct. 26—সঃ

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

কলিকাতা
১১।১।২৭

কল্যাণবরেষু

তোমার পত্র পাইয়াছি। কাজকর্মের ভিতর থাকিলে জপ করিবার কালে ঐ সব চিন্তাই প্রথম প্রথম আসিয়া থাকে। সেজন্য নিত্য নিয়মিত অভ্যাসের একান্ত প্রয়োজন। বৈরাগ্য ও দৃঢ় অভ্যাস ভিন্ন একদিনে কাহারও মন স্থির হয় না। যেমন করিতেছ সেইরূপ করিয়া যাও। মাঘ মাসের কোনও সময়ে এখানে আসিলে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় আমার শরীর ভাল থাকিলে তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে। এখানকার কুশল। আমার আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিবে। আমার শরীর একপ্রকার চলিয়া যাইতেছে। এখানে স্থান নাই, সুতরাং অন্যত্র থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া এখানে আসিবে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীসারদানন্দ

(৩)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

উদ্বোধন কার্য্যালয়
১নং মুখার্জ্জি লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা।
২৮।২।২৭

পরমকল্যাণীয়

তোমার ২৩শে তারিখের পত্র পাইলাম। ধ্যান করিতে করিতে জপ করিতে হয়—ইহাই নিয়ম। উহাতে জপের সংখ্যা অধিক না হইলেও ক্ষতি নাই। নিত্য অভ্যাসের ফলে এবং সংসারের অনিত্যতা যত হৃদয়ঙ্গম হইবে তত মন লক্ষ্যে স্থির হইবে।… জপ করিতে বসিয়া প্রথম আচমন, তাহার পর চিত্তশুদ্ধি, তাহার পর গুরুর ধ্যান, তাহার পর ইষ্টমূর্তির ধ্যান ও জপ—এইরূপ ক্রমে করিও।…আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে; শ্রীমান গুরুদাস, হরিপদ, পতিতপাবন প্রভৃতি সকলকে জানাইও। আমার শরীর ভাল আছে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীসারদানন্দ

(৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

কলিকাতা
২১।৩।২৭

কল্যাণবরেষু

তোমার ২০শে মার্চ্চের পত্র পাইলাম। মন্ত্রের অর্থ—

...

হে ···! তুমিই পরম পুরুষ, তুমিই পরমা প্রকৃতি। তুমিই কালী, তুমিই পরম শিব—তোমা হইতেই এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি আমার সকল দুঃখ হরণ করিয়া আমাকে শুদ্ধ জ্ঞান ভক্তি ইত্যাদি দাও।

তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে এবং গুরুদাস, হরিপদ, পতিতপাবন প্রভৃতি সকলকে দিবে। আমার শরীর ভাল আছে। এখানকার কুশল। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীসারদানন্দ

(৫)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

কলিকাতা
১২।৭।২৭

কল্যাণবরেষু

তোমার ১৪ই আষাঢ় তারিখের পত্র পাইয়া সকল কথা জানিলাম। আশ্রমের কাজ করিয়া যতটুকু সময় পাও, তখন যথাসাধ্য শ্রীভগবানের নাম করিবে। উহা হইতেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। একদিনে কিছু হয় না। ধৈর্য্য ধরিয়া সাধনে লাগিয়া থাকিতে হয়। নিরন্তর অভ্যাস ও বৈরাগ্যবলে মন শান্ত ও স্থির হইবে, নতুবা মনের দুর্ব্বলতার কথা ভাবিয়া কোনও ফল হইবে না। আশীর্ব্বাদ করি শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় তোমার সকল অসুবিধা তিনি দূর করিয়া পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দিন শ্রীমান পতিতপাবন, নলিনী, গুরুদাসবাবু প্রভৃতি সকলকে আমার শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ দিও। আমি ভাল আছি। এখানকার কুশল। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীসারদানন্দ

[শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্যকে লিখিত]

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

কলিকাতা

৬।১১।২৬

কল্যাণবরেষু

তোমার পত্র পাইয়া সকল বিষয় অবগত হইলাম। Students' Home এর নির্ব্বেদানন্দ স্বামী যাহা বলিয়াছেন তাহা জানিলাম। কি করিলে ভাল হয় তাহা বেশ করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিবে এবং শ্রীভগবানের নিকট ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিবে, যাহাতে মনের সংশয় দূর হইয়া যায় এবং সরল মনে তাঁহারই কার্য্য করিয়া ধন্য হইতে পার। আশীর্ব্বাদ করি তোমার মনবুদ্ধি শুদ্ধ হউক এবং তাঁহার পাদপদ্মে যেন মতি স্থির থাকে। আমি ভাল আছি। এখানকার কুশল। আশ্রমস্থ সকলকে আমার শুভেচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ জানাইও। ইতি

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীসারদানন্দ

পুঃ

আমার বিবেচনায় তুমি ঐ কার্য্যে যোগ কয়েক মাসের জন্য দিলে সুবিধাসুবিধা বুঝিতে পারিবে।

(২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

কলিকাতা

১২।১১।২৬

কল্যাণবরেষু

তোমার ১০।১১ তারিখের পত্র পাইয়াছি। খদ্দরের উপর যখন তোমার মনের এত ঝোঁক রহিয়াছে এবং শিক্ষাকার্য্যের সহিত উহার তুল্য প্রয়োজনীয়তা মনে করিতেছ, তখন খদ্দরের কাজ করাই তোমার পক্ষে ভাল বলিয়া মনে হয়। তবে মাসখানেকের ছুটী লইয়া দেওঘর বিদ্যাপীঠে যাইয়া সকল দেখাশুনা করিয়া আসিবে—উত্তম কথা। আশীর্ব্বাদ করি শ্রীভগবানের কাজ যথাসাধ্য করিয়া ধন্য হও। আমার শরীর ভাল আছে। এখানকার কুশল। গুরুদাসকে ও আশ্রমস্থ অন্যান্য সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ দিও। ইতি

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীসারদানন্দ

[ব্রহ্মচারী গৌরকে লিখিত]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

কলিকাতা
৩১।৭।২৭

কল্যাণবরেষু

তোমার পত্র পাইয়া সকল কথা জানিলাম। নানা অবস্থার ভিতর দিয়া মানুষ হইতে হইবে। আশ্রমে থাকা সব সময় সুবিধা হয় না। শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজির কাজের জন্য কখনও কখনও বাহিরে থাকিতে হইবে। সে সময়ে— অবস্থাবিপর্যয়ের জন্য দুঃখিত না হইয়া তাঁহাদের দিকে চাহিয়া আপনার কাজ করিয়া যাওয়া উচিত। তাঁহারা তোমার পশ্চাতে রহিয়াছেন এই বিশ্বাস মনে স্থির রাখিও। সকল অবস্থায় ঠাকুর তোমাকে রক্ষা করিতেছেন ও করিবেন। সুতরাং তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখ। আমি আশীর্ব্বাদ করি— তিনি তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন এবং শরীর ও মন সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ রাখুন। আশ্রমে যাইবার ইচ্ছা হইলে গঙ্গাধর মহারাজকে খুলিয়া সকল কথা লিখিও। আশা করি তিনি উহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। এখানকার কুশল। আমার শরীর মোটামুটী ভাল আছে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীসারদানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা

স্বামী সারদেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

সম্ভবতঃ মাঘের শেষ — শীতকালের অন্ত হইয়াছে, জড়সড় ভাব কাটিয়া গিয়াছে, মানুষ সকাল সন্ধ্যা রাস্তাঘাটে চলা-ফেরা করে। ময়মনসিং হইতে চারিজন ভক্ত আসিয়া উপস্থিত মায়ের বাড়ী জয়রামবাটীতে। তাঁহারা মায়ের শ্রীচরণাশ্রিত, কৃপাপ্রাপ্ত। কিছুদিন পূর্বে মা ম্যালেরিয়াতে অসুস্থ ছিলেন। ভক্তদের যাতায়াত প্রায় বন্ধ ছিল। এখন আবার একটু সুস্থ হইয়া উঠিতে না উঠিতেই তাঁহারা আসা-যাওয়া আরম্ভ করিয়াছেন, মাও কৃপা করিতেছেন। মায়ের অসুখের সংবাদে ভক্তগণ ব্যথিত, উৎকণ্ঠিত ছিলেন। তাই এখন তাঁহাকে একবার দেখিতে আসিয়াছেন। এক-দুই দিন থাকিয়াই চলিয়া যাইবেন। বেশী দিন থাকিলে মার কষ্ট হইবে। তাঁহারা সুদূর গ্রাম-অঞ্চলের লোক। আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত বা খুব ধনী মানী গুণীও বলা যায় না। তবে খুব ভক্তিমান লোক— সরল সাদাসিধে চাল-চলন। যিনি দলের মধ্যে প্রাচীন, তাঁহারও বয়স চল্লিশের নীচে মনে হয় এবং তাঁহার কিঞ্চিৎ শাস্ত্রজ্ঞানও আছে, কথাবার্তায় বুঝা গেল— তিনিই নেতৃস্থানীয়। মা সন্তানদের পাইয়া পরমানন্দিত, তাঁহাদের পরম সমাদরে গ্রহণ, স্নেহসম্ভাষণ, খাওয়া-থাকার সুব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত। কিন্তু পরদিন বিকাল-বেলা ভক্তগণ কামারপুকুর দর্শনের অনুমতি লইয়া তথায় যাত্রা করিবার পরই সামান্য বৃষ্টি হওয়ায় মা

তাঁহাদের কষ্ট হইবে ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। তাহার পরদিন বিকালে ভক্তেরা ফিরিয়া আসিলে দেখা গেল, মায়ের উদ্বেগ অমূলক নহে। বয়স্ক ভক্তটির জ্বর হইয়াছে। দেশ হইতে আসিবার সময়ই শরীর খুব ভাল ছিল না। কামার-পুকুরের রাস্তায় বৃষ্টিতে ভিজিয়া জ্বর হইয়াছে। ভক্তগণ জয়রামবাটী হইতে কামারপুকুর যাওয়ার কালে তিনি সেখানকার সব দর্শনাদির কথা বলিয়া দিতেন, কখনও তাহাদের হাতে গৃহদেবতা রঘুবীর, শীতলামাতার জন্য ফুল, ফল, মিষ্টি প্রভৃতিও পাঠাইতেন, এবং ফিরিয়া আসিলে সেখানকার সমাচার কুশল-সংবাদাদিও গ্রহণ করিতেন। জয়রামবাটীতেও ভক্তগণকে সিংহ-বাহিনী দর্শন, পূজা, প্রার্থনা, 'মায়ের মাটি' গ্রহণ করিতে বলিতেন—দেবী বড় জাগ্রতা, তাঁহার কৃপায় তাহাদের কল্যাণ হইবে। 'মায়ের মাটি'— সিংহবাহিনী মন্দিরের ভিত্তি-মৃত্তিকা, ঐ অঞ্চলে মায়ের মহৌষধ বিষয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। মা প্রচলিত প্রথায় সরলভাবে বিশ্বাস করেন। ভক্তগণের মুখে ঠাকুরবাড়ী-দর্শন-সমাচার পাইয়া খুশী হইলেন, কিন্তু অসুস্থ সন্তানটির জন্য বিশেষ চিন্তা, উদ্বেগ হইল।

মায়ের বাড়ীতে দাতব্য ঔষধালয় আছে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দেওয়া হয়। ম্যালেরিয়ার জন্য এলোপ্যাথিক প্রসিদ্ধ পেটেণ্ট, কুইনাইন-ঘটিত ঔষধও কিছু কিছু থাকে। ঔষধপথ্যাদির যথাসম্ভব সুব্যবস্থা হইয়াছে, মা ছেলের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা তদ্বির করিতেছেন, সবক্ষণ খোঁজ লইতেছেন। ছেলের অসুখ সারিল না, বরং বাড়িয়া চলিল, সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ছোট বাড়ী, অনেক লোক, রোগী রাখার স্থান নাই, শৌচাদির ভীষণ অসুবিধা, তাহার উপর মায়ের ভাবনা চিন্তা উদ্বেগে তাঁহার দেহ আবার না অসুস্থ হইয়া পড়ে। ভক্তগণ স্থানত্যাগ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন। ২।৩ দিন দেখিয়া বেগ না কমিলে পরামর্শক্রমে রোগীকে কোয়ালপাড়া আশ্রমে লইয়া যাওয়া স্থির হইল। রোগীও যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত। মাকে এই কথা নিবেদন করিলে তিনি স্থিরদৃষ্টিতে গভীর-ভাবে শুনিলেন, কিন্তু হাঁ না কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না। অসুস্থ শরীরে ছেলের যাওয়া তিনি পছন্দ করিবেন না, জানা কথা, তবে আর তো কোন উপায় নাই। এখানে রোগীর সুচিকিৎসা কঠিন, সঙ্গীদের থাকার অসুবিধা, স্থানাভাব, সদাসর্বদা ভক্ত অতিথি অভ্যাগত যাতায়াত করিতেছেন। কোয়ালপাড়ায় সরকারী ভাল ডাক্তার ডাক্তারখানা আছে, আশ্রমে যথেষ্ট জায়গাও আছে, সবই সুবিধা। তদ্ভিন্ন মায়ের কষ্টের জন্যই অধিক ভাবনা, তাঁহার নিকট হইতে রোগীকে তাড়াতাড়ি সরাইবার আয়োজন হইল।

সেদিন মায়ের বাড়ীতে অনেক স্ত্রীপুরুষ ভক্ত উপস্থিত, তন্মধ্যে তাঁহার বিশেষ স্নেহভাজন আরামবাগের প্রসিদ্ধ ডাক্তার প্রভাকরবাবুর মা এবং স্বামী অসিতানন্দের মা ও ভাই। বেলাতে আহার হইল, ভক্তগণ একে একে বিদায় লইতেছেন। স্বামী বিশ্বানন্দ আজ কোয়ালপাড়া আশ্রমে যাইবেন, রোগীকে সঙ্গিগণসহ পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবেন। পালকি আসিবার কথা, কিন্তু বেহারারা এখনও আসিতেছে না। উৎকণ্ঠিত হইয়া সকলে তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, পথের দিকে চাহিতেছেন, বেলা পড়িয়া আসিতেছে। মা বারান্দায় বসিয়া নীরবে সব দেখিতেছেন। দেরীতে পালকি লইয়া বেহারারা আসিল। তাড়াতাড়ি রোগীকে তুলিয়া রওয়ানা হইয়া গেল। মা অশ্রুপূর্ণলোচনে দুর্গা দুর্গা বলিয়া বিদায় দিলেন, নিতান্ত অনিচ্ছায়, কষ্টে। পালকি আসিবার কিঞ্চিৎ পূর্বেই আকাশের কোণে

একটু যেন দেখা দিয়াছিল ও ক্রমশঃ বাড়িতেছিল। অনেকেই উহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। যদিও মধ্যে মধ্যে এক একদিন এক পশলা আধ পশলা বৃষ্টি হইতেছিল, তথাপি সেই সময় বেশী ঝড় বৃষ্টির কাল নহে ভাবিয়া, আর বেশী তাড়াতাড়ি স্থানান্তরিত করার আগ্রহে আকাশের অবস্থাকে উপেক্ষা করিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সারাদিন আজ মায়ের অবসর বিশ্রাম হয় নাই। ভক্তগণকে আদর আপ্যায়ন, রান্নার ব্যবস্থা, পূজা, দীক্ষা, জল খাওয়ান, পান সাজা, ভোগ, প্রসাদ পাওয়া, তৎপরেই আবার বিদায়ের পালা—বিষাদের ব্যাপার। মা সন্তান কেহই কাহাকে ছাড়িতে অনিচ্ছুক অথচ ছাড়িতে হইবে। ঠিক যেন ৺পূজাবাড়ীতে দশমীর মতো। রুগ্ন সন্তান পালকিতে রওনা হইয়া গেল; বিষণ্ণ বদনে মা নীরব নির্জন বারান্দায় পা মেলিয়া বসিয়া সব দেখিলেন (কোলের উপর হাত দুখানি ন্যস্ত)। তৎপরে ঘরে গিয়া বিছানায় শুইলেন, সারাদিনের পর একটু বিশ্রাম। একটি সন্তান দেখাশুনা করিতেছিলেন। মা শুইলে তিনিও নিশ্চিন্ত হইয়া বৈঠকখানায় গিয়া বিশ্রাম করার কথা ভাবিতেছিলেন, কিন্তু বেলা পড়িয়া আসিয়াছে দেখিয়া আর গেলেন না। মায়ের বারান্দায় একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, কেহ আসিয়া গোলমাল করিয়া মায়ের বিশ্রামের ব্যাঘাত না করে।

দেখিতে দেখিতে আকাশ মেঘে ছাইয়া ফেলিল, চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিল, হঠাৎ প্রবল বেগে হো হো করিয়া আসিয়া ঝঞ্ঝাবায়ু সদর দরজায় আঘাত করিল, ভীষণ শব্দ হইল। সকলে চমকিয়া উঠিলেন, কালবৈশাখীর মতো প্রবল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। ঝড়ের শব্দ শুনিয়াই মা 'আমার বাছার কি হবে গো' বলিয়া আর্তস্বরে চিৎকার করিয়া বিছানা হইতে ছুটিয়া আসিয়াছেন, মাথার কাপড় খুলিয়া ভূমিতে লুটাইতেছে, এলোমেলো হইয়া মাথার কেশরাশি চারিপাশে ছড়াইয়াছে, যেন বেহুঁশ। বারান্দার কিনারায় আসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া জোড়হস্তে ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বারংবার প্রার্থনা করিতেছেন—"দোহাই ঠাকুর! আমার ছেলেকে রক্ষা কর। আমার ছেলেকে রক্ষা কর, ঠাকুর।" দুই চক্ষু হইতে অশ্রুবারি অবিরাম ধারে গড়াইয়া পড়িতেছে। সন্তানটি দেখিয়া শুনিয়া হতভম্ব, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। একটু পরেই নিজেকে সামলাইয়া মায়ের পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন, সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'কোন ভয় নাই, এতক্ষণে তাঁহারা দেশড়া পৌছে গ্যাছেন, রাজেন মহারাজ সঙ্গে আছেন—খুব বুদ্ধিমান বিচক্ষণ লোক, বেহারারা সব বিশেষ জানা-শুনা, অনুগত, বিশ্বাসী, আর ভক্তের সঙ্গীরাও সঙ্গে আছেন' ইত্যাদি ইত্যাদি। নানাপ্রকারে প্রবোধ দিয়া একটু শান্ত করিয়া সেবকটি মাকে ঘরে আনিলেন। ঘরে আসিয়া মা ঠাকুরের পটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাতরভাবে কাঁদিতেছেন, আর অশ্রুপূর্ণলোচনে বারংবার প্রার্থনা করিতেছেন, 'দোহাই ঠাকুর, একটু মুখ তুলে চাও, আমার বাছাকে রক্ষা কর।' সন্তানটি নির্বাক হইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন আর ভাবিতেছেন— এ কি সত্যই দেখিতেছি, না স্বপ্ন দেখিতেছি! ঝড়বৃষ্টি কমিয়া আসিয়াছে, আকাশ একটু পরিষ্কার দেখা যায়, সন্তান বলিয়া কহিয়া মাকে নিয়া বিছানায় শোয়াইলেন। মা চিৎ হইয়া শুইয়া বুকের উপর হাত দুইটি রাখিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, ছেলের যেন কোন কষ্ট না হয়। মাঝে মাঝে খেদ করিতেছেন,— স্বগত উক্তি— 'বাছা আমার কত সাধ করে এসেছিল মায়ের বাড়ী, মাকে দেখবে, থাকবে, খাবে, আনন্দ করবে; এমনি দুরদৃষ্ট, কুক্ষণে যাত্রা, আসতে আসতেই রাস্তায় কষ্ট, তারপর এখানে এলো।

একটু ভাল দেখে কামারপুকুর গেল আনন্দ করতে, রাস্তায় বৃষ্টি, কষ্ট। তারপর এখানে ফিরে এসে জ্বর। জ্বর আর যাচ্ছে না কিছুতেই, ওষুধপত্র কত খেলে। আজ আবার কোয়ালপাড়া গেল পালকি করে, চলবার শক্তি নাই, বেরুতে না বেরুতেই এই ঝড় আর বৃষ্টি! ঠাকুর! দোহাই তোমার, রক্ষা কর আমার ছেলেকে।' মা এক একবার চক্ষু বুজিয়া চুপ করিতেছেন, আবার খেদ করিয়া চক্ষের জলে ভাসিতেছেন। মধ্যে মধ্যে দরজার মধ্য দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন। সন্তানটি ঘরের ভিতর মায়ের পায়ের দিকে খাটের পাশে নীরবে বসিয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতেছেন, শুনিতেছেন— হৃদয় স্তব্ধপ্রায়। মনে হইল কিছুক্ষণ পরে মা একটু স্থির হইয়াছেন। হঠাৎ আবার সোঁ সোঁ করিয়া বাতাস ছুটিল, বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে মাও বিছানা ছাড়িয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন। সেই মাথার কাপড় ভূমিতে লুটাইতেছে, কেশরাশি ছড়াইয়া পড়িতেছে। নয়নে অবিরল অশ্রুধারা — কান্না। কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা— 'দোহাই ঠাকুর, আমার বাছাকে রক্ষা কর! একটিবার মুখ তুলে চাও।' একবার ঘরের ভিতর আসিয়া ঠাকুরের ছবির সম্মুখে কাতর ক্রন্দন, প্রার্থনা, আবার বাহিরে আসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া কাতর ক্রন্দন, প্রার্থনা।

এই ভাবে কিছুক্ষণ চলিল। রাত্রি হইয়াছে, ঘরে আলো জ্বলিয়াছে, ধূপ-ধুনো দেওয়া হইল। ঠাকুর-প্রণামান্তর মা বিছানায় গিয়া একটু স্থির হইবার চেষ্টা করিলেন, আকাশও একটু পরিষ্কার দেখা গেল। সন্তান অনেক প্রবোধবাক্য বলিয়া বুঝাইয়া সুঝাইয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছেন, রাস্তার পাশেই বাড়ী ঘর, রাজেন মহারাজের সব জানাশুনা। নিশ্চয়ই কোন ভাল জায়গায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। মা কিছু স্থির হইলেন বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে স্বগত খেদোক্তি শুনা যাইতে লাগিল। সে দিন দুর্যোগ সহজে থামিল না, মধ্যে মধ্যে একটু একটু ঝড়বৃষ্টি অনেকক্ষণ চলিল— মাও বিছানা ছাড়িয়া বাহির-ঘর করিতেছেন। আর ঠাকুরকে ডাকিতেছেন। অধিক রাত্রে আকাশ পরিষ্কার হইয়া ঝড়বৃষ্টি সম্পূর্ণ থামিলে স্থির হইয়া শুইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পরদিন সকালবেলা রাজেন মহারাজ ফিরিয়া আসিয়া কুশল সমাচার না দেওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। রাজেন মহারাজ জানাইলেন, তাঁহাদের কষ্ট হয় নাই। ঝড়বৃষ্টির সময় দেশড়াতে একজনের বাড়ীর বৈঠকখানায় বসিয়া বিশ্রাম করিয়াছেন। পরে ঝড়বৃষ্টি থামিলে একটি লণ্ঠন সংগ্রহ করিয়া রাত্রেই কোয়ালপাড়া আশ্রমে পৌঁছিয়া আহার নিদ্রা করিয়াছেন, রোগী এবং সঙ্গী সকলেরই কুশল।

একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে, এক পল্লীগ্রামে জনৈক বিধবার একমাত্র পুত্র (যুবক) দূর প্রান্তরে গরু চরাইতে গিয়াছিল, সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিবে। দু'প্রহরে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া ঝড়বৃষ্টির সূচনা হইলে গর্ভধারিণী প্রৌঢ়া জননী পুত্রের জন্য অস্থির হইয়া হা-হুতাশ ছটফট ঘর-বাহির করিতে লাগিলেন, শোকের উচ্ছ্বাস-উদ্বেগের সেই দৃশ্যও প্রত্যক্ষ হইতেছিল, কিন্তু আমাদের জননীর আর্তি ব্যাকুলতা ততোধিক। বিধবার পুত্র তাহাকে রোজগার করিয়া খাওয়ায়, পরায়, বাড়ীঘর রক্ষা করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিয়াছে, রাখিবে, পুত্র পুত্রবধূ নাতি নাতনি লইয়া তাহার কত সংসার-সুখের আশা আকাঙ্ক্ষা আছে। কিন্তু মাতাঠাকুরাণীর এই স্নেহের দুলালগণ তাঁহাকে কি সুখ সান্ত্বনা দিবে, কিসের প্রত্যাশা? তাঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা সন্তানের ভগবানে ভক্তি হোক, সৎপথে থাকিয়া সুখে থাকুক।

[ক্রমশঃ]

শ্রীশ্রীমাতৃস্তুতিঃ

স্বামী জীবানন্দ

দিব্যা মাতা সুশুদ্ধা হৃদয়সমুদয়ে যার্চিতা বন্দনীয়া
মায়াহীনা মদস্থী পরমসুখনিলয়া পাবনী বিশ্বপূজ্যা।
নিত্যা শ্রীসারদা সা বিতরতু বিমলং বৈ সুখং মুক্তহস্তা
বুদ্ধাং বিজ্ঞানদাত্রীং জনহিতনিরতাং চিন্তয়েৎ তাং হি নিত্যম্॥ ১

মাতা সৃষ্টিলয়স্থিতৌ সুনিপুণা কালী সুশান্তিপ্রদা
নিত্যানন্দময়ী হি যা সুখকরী দুর্গা বিপত্তারিণী।
শুদ্ধজ্ঞানবিধায়িনী সুপথদা সা সারদা মোক্ষদা
ধ্যেয়া মঙ্গলকারিণী সুতরণী দেবী হি যা ভারতী॥ ২

তস্যৈ নমামি নিতরাং মনসা চ বাচা
মাতঃ স্মরামি তব দেবি পদারবিন্দম্।
হে সারদে জননি বিশ্বজনস্য মাতঃ
দূরীকুরু ত্বমচিরং বিপদং চ দুঃখম্॥ ৩

প্রেমামৃতং তব পদং খলু চিন্তনীয়ং
ভাবাস্পদং সুবিমলং মহিমান্বিতং বৈ।
ধ্যেয়ং সদা হৃদি মহাভয়বিঘ্ননাশং
ক্লিষ্টা নরা জননি সুষ্ঠু ভজন্তু সর্বে॥ ৪

বিশ্বেশ্বরীং বিদিতবিশ্বমনোভিলাষাং
সন্তপ্তদুঃখহরণক্ষমভক্তিদাত্রীম্।
শ্রুত্যান্তবেদ্যপরমাং প্রকৃতিং ভবেশাং
শ্রীসারদাং নমতু মে জননীং সুশান্তাম্॥ ৫

বসতু বসতু নিত্যং বিশ্বমাতান্তরে মে
পিব পিব মম চিত্ত স্নেহধারাং জনন্যাঃ।
বিতরতু বিমলাং মে শান্তিধারাং সদাম্বা
বিমলচরণপদ্মে ভাতু পূতা সুভক্তিঃ॥ ৬

সদা মাতৃমূর্তিং বিমলহৃদি ধ্যায়েচ্চ চরিতং
সুধাপূর্ণাং বাণীং স্মর বিপদি মাতুর্হি পরমাম্।
ভবাব্ধৌ বিক্ষুব্ধে ত্যজ সুকঠিনং ভাবমসুখং
গৃহাণ ত্বং ভাবং সহজসরলং শান্তিসুখদম্॥ ৭

শক্তিদাত্রীং হি সংস্বস্থ শ্রীবৃদ্ধিকারিণীং তথা।
মাতরং সারদাদেবীং ভগবতীং নমাম্যহম্॥ ৮

কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী প্রভানন্দ

দ্বিতীয় পর্ব

[পূর্বানুবৃত্তি

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শরীর ক্যান্সাররোগের দাপটে পর্যুদস্ত-প্রায়, কিন্তু তাঁর বিশুদ্ধ মন শরীরের জ্বালাযন্ত্রণা উপেক্ষা করে সর্বদা নিবিষ্ট হয়ে থাকে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে। ভগবদ্‌-রসে রসায়িত তাঁর সত্তা, সেকারণে তাঁর সকল আচার-আচরণের মধ্যে সুপরিস্ফুট ভগবদ্‌-ভাবনার স্ফূর্তি। সদাসর্বদা ভগবৎপ্রসঙ্গে কাশীপুর বাগান মুখরিত, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের ভগবদনুরাগীদের সেখানে ভীড়। তাছাড়াও তদানীন্তন কলকাতায় ধর্ম-সাধনার বিষয়ে 'পরমহংসদেবে'র অতুলনীয় শক্তি ও সামর্থ্য ছিল সর্বজনস্বীকৃত। সেই কারণে ধর্ম-বিজ্ঞানের বিবিধ জটিল সমস্যা নিয়ে মানুষ তাঁর কাছে উপস্থিত হত সুষ্ঠু সমাধানের জন্য। উদাহরণস্বরূপ স্বামী সারদানন্দ-কথিত এই সময়-কার একটি কাহিনী উল্লেখ করা যেতে পারে।

একদিন কয়েকজন বৈষ্ণবভক্ত একটি উন্মনা যুবককে[১] শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হাজির করেন। যুবক শ্যামবর্ণ, দোহারা সুগঠিত চেহারা, তাঁর মাথায় শিখা, পরিধানে ময়লা সাদা ধুতি। যুবক শরীর সম্বন্ধে উদাসীন। যুবকের বুক ও মুখ লাল হয়ে আছে, দু'নয়নে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বইছে, সে দীনভাবে সকলের পদধূলি গ্রহণ করছে। হরিসংকীর্তন করতে করতে যুবকের অকস্মাৎ এই ভাব উপস্থিত হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে আহার-নিদ্রা ভুলে যুবক কান্নাকাটি করেছে, মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছে। অধ্যাত্মবিদ্যার নির্ভর-যোগ্য জ্ঞান করেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি যুবককে দেখেই বললেন, 'এ যে দেখছি মধুরভাবের পূর্বালাপ! কিন্তু এ অবস্থা এর থাকবে না, রাখতে পারবে না। এ অবস্থা রক্ষা করা বড় কঠিন। স্ত্রীলোককে ছুঁলেই এভাব আর থাকবে না। একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।' কিছুকাল পরেই খবর নিয়ে জানা গেল, শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যদ্‌-বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে, যুবকটির কপাল ভেঙেছে। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৩।২২৭-৩১)

কিন্তু সকল ঘটনাই কালাবর্তের অধীন। দিন গড়িয়ে চলে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দেহের ব্যাধি নদীর জোয়ার-ভাটার মত কম-বেশীর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমেই চরম মুহূর্তের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে থাকেন সেবকগণ, ভক্তগণ। কিন্তু যাঁকে নিয়ে ভাবনা, তিনি নির্বিকার।

৭ই জানুআরি, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। বৃহস্পতি-বার, শুক্লা দ্বিতীয়া। বিকালবেলা নরেন্দ্রনাথ বসে আছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে। অশান্ত তাঁর মন, বৈরাগ্যের ঝঞ্ঝাবাত্যায় উদ্বেলিত তাঁর হৃদয়, তাঁর চোখে মুখে উদ্বেগের ছাপ। তিনি ঈশ্বর দর্শনের জন্য বড়ই ব্যাকুল হয়েছেন। গত কয়েকদিন ধরে তিনি গভীর রাতে দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতে সাধনভজন করছিলেন। বিকাল সাড়ে চারটা নাগাদ মাষ্টার মশাই উপস্থিত হয়ে শুনছেন, নরেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে আবদার

---

১ ঐ উন্মনা যুবকটির নাম 'তুলসী সাধুখাঁ'। তাঁর বাস ছিল বাগবাজারে। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত, পৃঃ ২০৬)

করে বলছেন : 'আজ কি করব বলুন। রোজ রোজ কি করব বলে দিতে হবে।' শ্রীরামকৃষ্ণ : 'ওখানে, পঞ্চবটীতে ?' নরেন্দ্র : 'আজ্ঞে হাঁ, কি করব বলুন ?' শ্রীরামকৃষ্ণ স্নেহমধুর কণ্ঠে বলেন : 'আজ 'রাম'-চিন্তা কর।'

নরেন্দ্র : 'আজ্ঞে তা পারব। আগে ছেলে-বেলায় বড় ভালবাসতাম।[১] রামচরিত বিভোর হয়ে শুনতাম।'

শ্রীরামকৃষ্ণ : 'ওরে, সেই রামই সকলের মূলে।'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ শুনে নরেন্দ্রর মুখ-কমল উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাঁর মানসপটে ভেসে ওঠে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লীলাবিলাস। তিনি রামচন্দ্রের বিমলচরিত্রের ভাবনায় মেতে ওঠেন, তাঁর চোখে-মুখে কথাবার্তায় অভিব্যক্ত হয় নূতন ভাবোচ্ছ্বাস। এইদিন হতে নরেন্দ্রর সুরু হয় রামমন্ত্রের সাধন।

নরেন্দ্র সংসারের আর্থিক বন্দোবস্ত করার জন্য বাড়ী গিয়েছিলেন। পিতার পরলোকপ্রাপ্তির পর তাঁর মা ও ভাইয়েরা অতিকষ্টে দিন যাপন করছিলেন। নরেন্দ্র তাঁদের একমাত্র ভরসা। কিন্তু সেসময়ে নরেন্দ্র বৈরাগ্যের বানের জলে ভেসে চলেছেন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে যায় বাড়ীতে তাঁর মায়ের সঙ্গে একটি কথোপকথন। তার উল্লেখ করে তিনি মাষ্টার মশায়ের দিকে তাকিয়ে বলেন : 'মাকে বললুম, দেখ মা, ভগবানকে যদি পাই তাহলে কত টাকা হবে বলত! আর অভাব থাকবে না।— অমনি সব বুঝিয়ে বাড়ী থেকে এলুম।' সহাস্যবদন শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রের দিকে সস্নেহে দৃষ্টিপাত করেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে নরেন্দ্র মাষ্টার মশাইকে জিজ্ঞাসা করেন : 'আচ্ছা, আপনি যে একমাস বেলতলায় কাটিয়েছিলেন[২], তা কি পেয়েছিলেন ?'

মাষ্টার মশাই স্মিতহাস্য করেন, তিনি ঠাকুরকে দেখিয়ে বলেন : 'ওঁকেই পেয়েছি।'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হাসতে থাকেন। তিনি ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিত করে বলেন : 'মাষ্টার সব জানে, ভাল করে জিজ্ঞাসা কর।' নরেন্দ্র (মাষ্টারের প্রতি) : 'বলুন না, কি পেয়েছেন।'

মাষ্টার মশাই নরেন্দ্রকে লক্ষ্য করে বলেন : 'আমি ওঁকেই পেয়েছি'।"

নরেন্দ্রর আকাঙ্ক্ষা মাষ্টার মশাই বিস্তারিত-ভাবে বলেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বেশী কিছু বলতে নারাজ। নরেন্দ্র ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বলেন : "উনি তো এক কথাই বলছেন—'ওঁকেই পেয়েছি"। দ্রষ্টা-স্বরূপ ঠাকুর চুপচাপ থাকেন, তাঁর মুখের মৃদু হাসি উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে যেন।

সেবক কালীপ্রসাদ ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকে-ছিলেন। নরেন্দ্র (কালীর প্রতি) : 'কালী, তুই দক্ষিণেশ্বরে যাবি ?' (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) : 'কালী কি যাবে ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ (কালীর প্রতি) : 'তুই যাবি ? থাক্ তোর গিয়ে কাজ নেই।'

ঠাকুরের নির্দেশে বুড়োগোপাল ও শশীকে নিয়ে নরেন্দ্র দক্ষিণেশ্বর যান, সারারাত জপধ্যান করে কাটান।[৩] এই কালে নরেন্দ্রনাথের সাধন-

---

১ নরেন্দ্রর বাল্যকাল হতেই রামপ্রীতি। রামায়ণ পাঠ ও সীতারামের যুগলমূর্তির সামনে বালক নরেন্দ্রকে ধ্যান করতে দেখা যেত। তবে তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল রামগতপ্রাণ হনুমানচরিত্র।

২ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর হতে প্রায় একমাস মাষ্টার মশাই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে নিবিড়-ভাবে সাধন ভজন করেছিলেন।

৩ মাষ্টার মশায়ের ডায়েরী, পৃঃ ৭৮৯।

ভজন সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিকার লিখেছেন :

'একদিন শ্রীনরেন্দ্রে সংগোপনে কন।
করিবারে কিছুদিন রামের সাধন ॥
বৃক্ষমূলে রাত্রিকালে জ্বালাইয়া ধুনী।
রামের ধিয়ানে রহে আগোটা রজনী ॥
দিনের বেলায় যত সঙ্গীর সহিত।
বাদ্যযন্ত্রসহ হয় রাম-গুণ-গীত ॥'

(পুঁথি, পৃঃ ৬২৪)

পরদিন শুক্রবার, শুক্লা তৃতীয়া, ২৫শে পৌষ, ১২৯২ বঙ্গাব্দ। ইংরাজী ৮ই জানুআরি, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। বিকালবেলা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে উপস্থিত হয়েছেন কালীপ্রসাদের পিতা রসিকলাল চন্দ্র। আহিরীটোলায় ২১ নং নিমু গোস্বামী লেনে বসতবাড়ী। তিনি ওরিয়েন্টাল সেমিনারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাঁর প্রথম পত্নীর গর্ভে পুত্র বিহারীলাল জন্মগ্রহণ করে। বিহারীলাল গৃহত্যাগ করে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে-ছিল। দ্বিতীয় পত্নী নয়নতারার গর্ভে কালী-প্রসাদের জন্ম। কালীপ্রসাদ ছিলেন বংশের ভবিষ্যতের আশা-ভরসার মূল। রসিকপুরুষ রসিকলাল পরবর্তী কালে তাঁর তিন ছেলে সম্বন্ধে বলতেন : 'আমি ব্যাটা কি ধার্মিক! আমার এক ব্যাটা খৃষ্টান, এক ব্যাটা হল সন্ন্যাসী আর এই ব্যাটাকে (তৃতীয় পুত্রকে নির্দেশ করে) মুসলমান করে দেবো।' (শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৩)। এই রসাল মন্তব্যটি বেশ কিছুদিন লোকের মুখে মুখে ফিরত। মাষ্টার মশাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিছানার কাছেই বসেছিলেন।

রসিকলাল বিছানায় উপবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন : 'কেমন আছেন ?'

ঠাকুর রসিকলালকে দেখে যেন একটু বেজার হয়েছেন। তিনি নীরসকণ্ঠে বলেন : 'এই এক রকম।'

রসিকলালের ইচ্ছা, পুত্র কালীপ্রসাদ বাড়ী ফিরে যান ও গিয়ে নিয়মিত পড়াশুনা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ রসিকলালকে বলেন : 'কালীকে নিয়ে যেতে চাইছ, বেশ তো নিয়ে যাও না।'

বোধ হয় রসিকলাল এতটা আশা করেননি। তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল পরমহংসদেব পুত্রকে আটকাবেন। তিনি বিস্মিত হন। তাঁর বিস্ময়ের ঘোর কাটবার পূর্বেই মাষ্টার তাঁকে বুঝিয়ে বলেন : 'ঠাকুর বলছেন, পারলে কালীপ্রসাদকে বাড়ী নিয়ে যান।' পরমহংসদেব যেন পুত্রকে সুবিধামত বাড়ীতে পাঠিয়ে দেন, এই অনুরোধ করে রসিকলাল হৃষ্টমনে গৃহে ফিরে যান।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের দোতলাঘরে প্রবেশ করেন নরেন্দ্রনাথ। ঘরের একপাশে কিছু সময় পাদচারণ করেন। সম্ভবতঃ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ইঙ্গিতেই ঠাকুরের কাছে আসেন, বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসেন। নিকটেই বসেছিলেন মাষ্টার মশাই ও অপর দু' একজন ভক্ত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমানুরঞ্জিত দৃষ্টিতে তাকান নরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে বলেন : 'গা না "শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম"।'

নরেন্দ্রনাথ তাঁর দেবদুর্লভকণ্ঠে গান ধরেন :

'কাহে সই জিয়ত মরত কি বিধান!
ব্রজকি কিশোর সই, কাঁহা গেল ভাগই,
ব্রজজন টুটায়ল পরাণ ॥
মিলি সই নাগরী, ভুলিগেই মাধব,
রূপবিহীন গোপকুঙারী।
কো জানে পিয় সই, রসময় প্রেমিক,
হেন বঁধু রূপকি ভিখারী ॥
আগে নাহি বুঝনু, রূপ হেরি ভুলনু,
হৃদি কৈনু চরণযুগল।
যমুনা-সলিলে সই, অব তনু ডারব,
আন সখি ভখিব গরল ॥

কিবা কানন-বল্লরী, গল বেড়ি বাঁধই,
নবীন তমালে দিব ফাঁস।
নহে— শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম-নাম জপই,
ছার তনু করব বিনাশ॥'[১]

শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিতে বলেন গানটির প্রতি কলি দুবার করে গাইতে। নরেন্দ্র আদেশ পালন করেন। নরেন্দ্র এর পরের গান ধরেন:

'পরাণ না গেলো।
যো দিন পেখনু সই যমুনাকি তীরে,
গায়ত নাচত সুন্দর ধীরে ধীরে,
উঁহি পর পিয় সই, কাহে কালো নীরে,
জীবন না গেলো?
ফিরি ঘর আয়নু, না কহনু বোলি,
তিতায়নু আঁখিনীরে আপনা আঁচোলি,
রোই রোই পিয় সই কাহে লো পরাণি
তইখন না গেলো?
শুননু শ্রবণ-পথে মধুর বাজে,
রাধে রাধে রাধে রাধে বিপিন মাঝে;
যব শুনন্ লাগি সই, সো মধুর বোলি,
জীবন না গেলো?
ধায়নু পিয় সই, সোহি উপকূলে,
লুটায়নু কাঁদি সই শ্যামপাদমূলে,
সোহি পাদমূলে রই, কাহে লো হামারি,
মরণ না ভেল?'[২]

নরেন্দ্রনাথের সর্বাঙ্গসুন্দর তানলয়বিশিষ্ট কণ্ঠধ্বনি দিব্যানন্দের পরিবেশ রচনা করে। শ্রোতারা মোহিত হন।

নরেন্দ্র: '"রামনাম লেতে" গাইব?'

শ্রীরামকৃষ্ণ: 'বেশ তো, গা না।'

নরেন্দ্র গান ধরেন 'রামনাম লেতে' ইত্যাদি। নরেন্দ্র গান শেষ করতেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: 'আচ্ছা, যা হয় আরেকটা গা।' নরেন্দ্র গাইতে থাকেন,

'কবে তব দরশনে হে প্রেমময় হরি।
কবে উথলিবে হৃদিমাঝে চিদানন্দলহরী॥
তনু হবে রোমাঞ্চিত, প্রাণমন পুলকিত,
(ভাবরসে বিবশ হয়ে)
নয়নে বহিবে বারি। (ও রূপ-মাধুরী হেরি)॥
তোমার প্রেম-মূরতি নিরমল মুখজ্যোতি
নিরখিব প্রাণ ভরি (ভাবে প্রেমে মগ্ন হয়ে)
সব সাধ মিটাইব, স্পর্শ আলিঙ্গন করি॥'[৩]

তারপর মাষ্টার মশায়ের অনুরোধে নরেন্দ্র গান ধরেন,

'সত্যং শিব সুন্দর রূপ-ভাতি হৃদি মন্দিরে,
নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব
রূপ-সাগরে!'[৪] ইত্যাদি

গান থামে। গানের লহরীর রেশ সকলকে যেন মোহিত করে রাখে। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার শোনা যায় নরেন্দ্রর কণ্ঠস্বর: 'জ্ঞান আনন্দ না চাই! ছাই দেখেন ব্রহ্মজ্ঞানী!!'[৫] নরেন্দ্রর

---

১ বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' নাটকের তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদে: গিরিজায়া হেমচন্দ্রের সম্মুখে এই গান করেন। 'বাঙ্গালীর গান' পৃঃ ৬৯৯ অনুসারেও এই গানের রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র। কাশীপুরের বাগানে নরেন্দ্রনাথ ১৫ই মার্চ এই গানটি পুনরায় গেয়েছিলেন। (কথামৃত ৩।২৪।৩ দ্রষ্টব্য)।

২ ঐ নাটকের তৃতীয় খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদে: পুষ্করিণীর সোপানে বসে গিরিজায়া এই গান করেন।

৩ গানের রচয়িতা ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল। 'চিরঞ্জীব সঙ্গীতাবলী' পৃঃ ৬৪ দ্রষ্টব্য।

৪ গানের রচয়িতা পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়। সম্পূর্ণ গানটির জন্য 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ১।৭।৩ দ্রষ্টব্য।

৫ নরেন্দ্রনাথের এই ধরনের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ১৩।৪।১৮৮৬ তারিখের উক্তিতে। তিনি সেখানে বলেছেন: 'আমি শান্তি চাই, আমি ঈশ্বর পর্যন্ত চাই না।' আবার দেখি তিনি ২১।৪।১৮৮৬ তারিখে বলছেন: 'ঈশ্বর-টীশ্বর নাই।' শ্রোতা মাষ্টার মশাই বলছেন: 'Scepticism ঈশ্বরলাভের পথের একটা stage।'

কথা শুনে শ্রোতাদের অনেকেই বিস্মিত হন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেকথা শুনে হাসতে থাকেন, তিনি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে নরেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে থাকেন।

কিছুক্ষণ পরেই নরেন্দ্র তাঁর স্বভাবমধুর কণ্ঠে গান ধরেন,

'আমি গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিব
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
আমি যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে,
যেখানে নিঠুর হরি।'[১]

একটু সময় পরে সেবায় নিরত কালীপ্রসাদকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: 'তোর বাবা আজ এসে বলল যে, তোর মা কেঁদে কেঁদে অস্থির হচ্ছে।... তাই তোকে আমি বলছি যে, তুই একবার বাড়ী গিয়ে তোর মার সঙ্গে দেখা করে আয়।' ঠাকুরের আদেশ শিরোধার্য করে কালীপ্রসাদ সন্ধ্যার সময়ে হেঁটে আহিরীটোলার বাড়ীতে গেলেন। বাবা মা তাঁকে দেখে পরম-আনন্দিত হন। বাড়ীর সকলে বিশেষত: তাঁর মা কালীপ্রসাদকে রাত্রিতে থাকতে অনুরোধ করেন। কালীপ্রসাদের মন সায় দেয় না; ঠাকুরের কথা ভেবে তাঁর মন ছটফট করতে থাকে। কাশীপুরে ফিরে যাবার জন্য তিনি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেন। মায়ের দেওয়া মিষ্টান্নাদি কিছু খেয়ে বাবা-মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি দ্রুতপদে কাশীপুরে ফিরে যান, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করে তাঁর নিকটে বসেন। ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তরে কালীপ্রসাদ বলেন: 'আজ রাত্রে বাড়ীতে থাকব মনে করে গিছলাম। বাবা মাও থাকার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। কিন্তু আমি সেখানে ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলাম। আপনার কাছে ফিরে আসার জন্য মন ছটফট করতে লাগল।... তাই একটু মিষ্টি মুখে দিয়েই বিদায় নিয়ে দৌড়ে এখানে চলে এলুম। এখানে পৌছে তবে মনে শান্তি পেলুম।'
('আমার জীবনকথা', পৃঃ ২৪-৬ হতে গৃহীত।)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে উপস্থিত কালীপদ ঘোষ, মাষ্টার মশাই ও কয়েকজন সেবক। শীতের সন্ধ্যারাত, চারিদিক নিস্তব্ধ। ঘরের দীপালোকে দেখা যায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শয্যায় শায়িত। নিকটে উপবিষ্ট কালীপদ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে নিত্যগোপালের[২] বিশ্বাসের কথা উত্থাপন করেন। তিনি বলেন: 'নিত্যগোপাল বলে, ওঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) নিত্যদেহ, এবার সংকীর্তন খুব জমবে, দেশদেশান্তর হতে লোক আসবে। আবার আমাদের বলে, তোমরা মাগছেলে ফেলে এখানে পড়ে থাকো। তোমাদের জীবন ধন্য হয়ে যাবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ: 'বলেছে নিত্যদেহ, তা কৈ আমি তো টের পাই না।'

ভক্ত কালীপদ উচ্চস্বরে হেসে ওঠেন। কালীপদ নিজেও শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্য 'চিন্ময় দেহ, চিন্ময় ধাম'-তত্ত্বে বিশ্বাসী। তাঁর ধারণা শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মপরিচয় গোপন করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ: 'হেসো না। ঠিক বলছি, যতক্ষণ রোগ ততক্ষণ সংশয়বোধ থাকে, আবার রোগ ভাল হলে আরেক রকম।' ঈশ্বর যখন মানুষদেহ ধারণ করেন তখন অপর দশজন মানুষের মতই তাঁর সব রকম আচরণ দেখা যায়। রোগ শোক দ্বৈতবোধ প্রভৃতির জালে নিজেকে ধরা দেন তিনি। নরলীলায় তাঁকে চেনা সত্যই দুঃসাধ্য।

কালীপদ: 'চৈতন্য কি আর অমনি হয়, আপনি ছুঁয়েছেন আর সব হচ্ছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ: 'হাঁ ঐরকমই মাকে বলেছিলুম—মা আর বইতে পারব না। বলব "চৈতন্য

১ কথামৃত, ৫।১২।৪
২ নিত্যগোপাল বসু, পরে স্বামী জ্ঞানানন্দ অবধূত।

হোক", অমনি হয়ে যাবে।' মাত্র সাতদিন পূর্বে কাশীপুর বাগানে ভক্তদের চৈতন্যসম্পাদনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণবিগ্রহে যে অনন্যসাধারণ দৈবীশক্তির স্ফুরণ ঘটেছিল, তাতেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তির যাথার্থ্য বুঝা যায়।

কালীপদ: 'আপনি তো বলেছিলেন, মা, গিরিশ রাম ও মাষ্টারের মধ্যে শক্তি সঞ্চার কর।' আলোচ্য ঘটনা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেন, 'শুনা যায়, ঠাকুরের নিকটে যখন বহুলোকের সমাগম হইতে থাকে, তখন ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে পরিশ্রান্ত ও ভাবাবিষ্ট হইয়া তিনি এক সময়ে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে বলিয়াছিলেন, "মা, আমি আর এত বকতে পারি না, তুই কেদার, রাম, গিরিশ ও বিজয়কে একটু একটু শক্তি দে, যাতে লোকে তাদের কাছে গিয়ে কিছু শেখবার পরে এখানে আসে এবং দুই-এক কথাতেই চৈতন্যলাভ করে!"' (লীলাপ্রসঙ্গ, ৫।১৫৩)

শ্রীরামকৃষ্ণ নির্বাক হয়ে সব কথা শোনেন। কিছুক্ষণ সময় চলে যায়। কালীপদ এবার সুরেন্দ্র ও নিত্যগোপালের একটি প্রসঙ্গ তোলেন।

কালীপদ: 'আপনি সুরেন্দ্রবাবুকে (সুরেন্দ্রনাথ মিত্র) ছুঁলেন, নিত্যবাবুর অমনি উলঙ্গ হয়ে নৃত্য! একথা শুনে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যেন বিস্মিত হন, তিনি বলেন: 'কবে? কোথায়?'

কালীপদ: 'আজ্ঞে, রামবাবুর বাড়ীতে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ: 'তা কি হলো?'

কালীপদ: 'খোকা নাচছিল—সে সুরেন্দ্রর কোলে এসে পড়েছিল— নিত্যগোপাল সুরেন্দ্রর ঘাড়ে হাত দিয়ে নৃত্য করছিল।'

শ্রীরামকৃষ্ণ: 'এত খুব আশ্চর্য! আর সে অমন কথা বলত?' কিছুক্ষণ চুপচাপ। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গান্তরে যান, তিনি বলেন: 'আচ্ছা নরেন্দ্রর কি হ'ল?'

কালীপদ: 'নরেন্দ্রর সবই কিনা আশ্চর্য।'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পথ্যাহারের সময় হয়েছে। আহার্য আনতে দেরী হচ্ছে দেখে তিনি মাষ্টারকে বলেন: 'এখনও আনলে না!' খোঁজ নেবার জন্য মাষ্টার মশাই নীচে নেমে যান। সুজির পায়েস আনা হলে ঠাকুর তার অতি সামান্যই গ্রহণ করতে পারেন। এবার ভক্তেরা ঠাকুরকে প্রণাম করে নীচে নেমে যান। ঠাকুরের ইঙ্গিতে মাষ্টার শ্রীরামকৃষ্ণের পদসেবা করতে বসেন। আনন্দে তৃপ্তিতে মাষ্টারের মন আপ্লুত হয়। ঠাকুরের আদেশে তিনি নীচে যাবার জন্য প্রস্তুত হন। ঠাকুরের গায়ে লেপ ঠিক করে দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: 'থাক থাক।' মাষ্টার ঠাকুরের উদ্দেশে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে বিদায় নেন।

মাষ্টার মশাই নীচে নেমে দেখেন নরেন্দ্রনাথ একান্তে বসে আছেন। নরেন্দ্রর শুদ্ধসত্ত্ব মনে ঈশ্বরলাভের জন্য তীব্র আকুলতা, আজকাল সদা-সর্বদা তিনি ঈশ্বরভাবনায় ভাবিত। দরদী মাষ্টার মশাইকে নিকটে পেয়ে তিনি গতদিনের একটি দুর্লভ অভিজ্ঞতার বিষয় প্রকাশ করেন। নরেন্দ্র বলেন: 'রাম নাম ওঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) কুলের ইষ্টমন্ত্র, তাই আমায় দিলেন।'

মাষ্টার মশাই: 'হাঁ, তা বটে। ওঁদের গৃহদেবতা রঘুবীর, তাঁর নিত্য সেবাপূজা চলেছে।'

সেবক বুড়োগোপাল আজ একটি ভাণ্ডারার আয়োজন করেছেন। সম্ভবতঃ তিনি অল্পকয়েক-দিনের জন্য অদূরবর্তী তীর্থস্থানে গিয়েছিলেন[১]

১ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা' অনুসারে বুড়োগোপাল এই সময়ে তীর্থদর্শন করে এসে গঙ্গাসাগরযাত্রী সাধুদের কাপড় ও মালা দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। এই বছর গঙ্গাসাগরের স্নানের দিন ছিল ১২ই জানুআরি। আমরা গোপালকে কাশীপুরে দেখতে পাই ২৩শে ডিসেম্বর, তারপর ৭ই জানুআরি। এর মধ্যে অল্প সময়ের জন্য তিনি কোন তীর্থস্থানে সম্ভবতঃ গিয়েছিলেন।

এবং তদুপলক্ষে এই ভাণ্ডারা দিয়েছিলেন। সেবক ও উপস্থিত কয়েকজন গৃহীভক্ত মহানন্দে আহার করেন।

কালীপদ ঘোষ ও মাষ্টার মশাই একটি ঘোড়ার গাড়ীতে বাড়ী ফিরে যান। কাশীপুর বাগান হতে বেরুবার সময় মাষ্টার মশাই শোনেন সেবক লাটু তন্ময় হয়ে গান গাইছেন :

'শ্রীমন্নারায়ণ শ্রীমন্নারায়ণ' ইত্যাদি।[1]

পরদিন শনিবার, ৯ই জানুআরি, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ। দুপুরবেলা। বালক ভক্ত ক্ষীরোদ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট এসেছেন। ক্ষীরোদচন্দ্র মিত্র ও প্রতিবেশী সুবোধচন্দ্র ঘোষ (পরে স্বামী সুবোধানন্দ) ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অগস্ট[2] দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত মিলিত হয়েছিলেন। প্রথম দর্শনেই তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের বলেছিলেন, আমার এখন অসুখ, মাষ্টারের কাছে যেও। সে তোমাদের উপদেশ দেবে। আবার মাষ্টারকে বলেছিলেন, 'তুমি একটু যত্ন করো।' তদবধি ক্ষীরোদ প্রায়ই স্কুল পালিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসেন। আজও স্কুল পালিয়ে এসেছেন।

ক্ষীরোদ একটি খলে কবিরাজী ওষুধ মাড়ছিলেন। তাঁকে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে হবে। ওষুধ তৈরী হলে ক্ষীরোদ বলেন : 'ওষুধ হয়ে গেছে, এবার যাব ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ মৃদু হেসে বলেন : 'না'। ক্ষীরোদ ঠাকুরের কাছে এসে বসেন। ক্ষীরোদ বলেন : 'মাষ্টার মশাই বলেন, সংসারীর পক্ষে পাপপুণ্য, সন্ন্যাসীর পক্ষে নয়।' শ্রীরামকৃষ্ণ শোনেন, কোন মন্তব্য করেন না। কিছুক্ষণ সময় চলে যায়। ক্ষীরোদ বলেন : 'নিরঞ্জনবাবু (পরে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ) বলেছেন, স্কুল পালিয়ে আসা বঞ্চনা —তা আপনি কি বলেন ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ তূষ্ণীভাব অবলম্বন করেন। মুখে কোন কথা বলেন না।[3]

[ক্রমশঃ]

---

১ মাষ্টার মশায়ের ডায়েরী, পৃঃ ৭৮৯-৭৯০।

২ Prabuddha Bharata, August, 1974, p. 313, foot note.

৩ মাষ্টার মশায়ের ডায়েরী, পৃঃ ৭৯১।

আবির্ভাব-তিথি

শ্রীমা সারদাদেবী :	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী, ১৯শে পৌষ, শনিবার,	৪ঠা	জানুআরি	১৯৭৫
স্বামী শিবানন্দ :	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী, ২৩ পৌষ, বুধবার,	৮ই	"	"
স্বামী সারদানন্দ :	পৌষ শুক্লা ২য়া, ৪ঠা মাঘ, শনিবার,	১৮ই	"	"
স্বামী তুরীয়ানন্দ :	পৌষ শুক্লা চতুর্দশী, ১২ই মাঘ, রবিবার,	২৬শে	"	"
স্বামী বিবেকানন্দ :	পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী, ১৯শে মাঘ, রবিবার,	২রা	ফেব্রুআরি	"
স্বামী ব্রহ্মানন্দ :	মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া, ৩০শে মাঘ, বৃহস্পতিবার,	১৩ই	"	"
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ :	মাঘ শুক্লা চতুর্থী, ২রা ফাল্গুন, শনিবার,	১৫ই	"	"
স্বামী অদ্ভুতানন্দ :	মাঘ পূর্ণিমা, ১২ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার,	২৫শে	"	"
শ্রীরামকৃষ্ণদেব :	ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া, ১লা চৈত্র, শনিবার,	১৫ই	মার্চ	"
স্বামী যোগানন্দ :	ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী, ১৬ই চৈত্র, রবিবার,	৩০শে	"	"

শ্রীশ্রীষোড়শী মহাবিদ্যা

শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী

তৃতীয়া মহাবিদ্যা "ষোড়শী" শ্রীবিদ্যা নামেও অভিহিতা। তন্ত্রশাস্ত্রে ইনি সুন্দরী, ত্রিপুরা, ত্রিপুর-সুন্দরী, রাজরাজেশ্বরী, ললিতা, বালা, সুভগা, কামেশ্বরী প্রভৃতি নামে ও মূর্তিতে পূজিতা হইয়া থাকেন। শ্রীমৎশঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত মঠ-চতুষ্টয়ে শ্রীযন্ত্রে শ্রীবিদ্যা পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। এতদ্দ্বারা সমগ্র ভারতে ষোড়শী মহাবিদ্যার প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রয়াগে ললিতা দেবী পীঠদেবীরূপে বিরাজিতা। অন্যতম পীঠস্থানরূপে পরিচিত ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত উদয়পুরে ত্রিপুর-সুন্দরীর মন্দির অবস্থিত।

শ্রীবিদ্যাসম্প্রদায়—তন্ত্রশাস্ত্রমতে শ্রীবিদ্যার দ্বাদশ উপাসক প্রসিদ্ধ যথা (১) মনু, (২) চন্দ্র, (৩) কুবের, (৪) লোপামুদ্রা, (৫) মন্মথ (কামদেব), (৬) অগস্তি, (৭) অগ্নি, (৮) সূর্য, (৯) ইন্দ্র, (১০) স্কন্দ (কার্তিকেয়), (১১) শিব এবং (১২) ক্রোধ-ভট্টারক (দুর্বাসা মুনি)। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই আবার পৃথক্ পৃথক্ শাখা-সম্প্রদায় ছিল। শ্রীনটনানন্দকৃত "কামকলা-বিলাসে"র টীকা হইতে (শ্লোক ৫২) জানা যায় যে, শ্রীবিদ্যার দুই সন্তান সুপ্রসিদ্ধ—কামরাজ-সন্তান এবং লোপামুদ্রা-সন্তান। ইঁহাদের মধ্যে কামরাজ-সন্তানই অবিচ্ছিন্নরূপে বিদ্যমান, লোপামুদ্রা-সন্তান বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

কামরাজবিদ্যা (কাদি বিদ্যা)—ত্রিপুরা-রহস্য, মাহাত্ম্যখণ্ডে বর্ণিত আখ্যান হইতে অবগত হওয়া যায়, কামদেব কঠোর তপস্যা দ্বারা শ্রীবিদ্যার প্রসন্নতা লাভ করিয়া বহু দুর্লভ বর প্রাপ্ত হন এবং স্বোপাসিত "কামরাজ-বিদ্যা"র উপাসকের জন্যও বহুবিধ বর অর্জন করেন। তখন হইতেই কামরাজ-বিদ্যার বিশেষ প্রচার হইতে থাকে। কামরাজ-বিদ্যা ককারাদি পঞ্চদশ বর্ণাত্মক, এইজন্য ইহাকে "কাদি বিদ্যা" নামেও অভিহিত করা হয়।

লোপামুদ্রা বিদ্যা (হাদি-বিদ্যা)—লোপামুদ্রা ঋগ্বেদের অন্যতমা ঋষিকা রূপে প্রসিদ্ধা (ঋগ্বেদ ১।১৭৯।১-২)। ইনি ঋষি অগস্ত্যকে পতিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কঠোর সাধনায় শ্রীবিদ্যার আরাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করেন। যে মন্ত্র দ্বারা তিনি শ্রীবিদ্যার আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহা "লোপামুদ্রা বিদ্যা" নামে অভিহিত। হকারাদি পঞ্চদশ বর্ণাত্মক বলিয়া ইহা "হাদি-বিদ্যা" নামেও কথিত হইয়া থাকে।

শ্রীবিদ্যাসম্প্রদায়ের আচার্য-পরম্পরা ও তান্ত্রিক সাহিত্য:

ত্রিপুরা উপনিষৎ এবং ত্রিপুরাতাপিনী উপনিষৎ হইতে জানা যায়, শ্রীবিদ্যার উপাসনা বৈদিক উপাসনা বলিয়া স্বীকৃত ও প্রচারিত এবং বেদ হইতে উহা তন্ত্রে গৃহীত হইয়াছে। শ্রীবিদ্যা-সম্প্রদায়ের বিরাট তান্ত্রিক সাহিত্যভাণ্ডার ছিল। তাহার কিয়দংশ মাত্র উপলব্ধ হইয়াছে এবং মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

অগস্ত্য—শ্রীবিদ্যার অন্যতম আচার্য অগস্ত্য-কৃত "শক্তিসূত্র" কাশী সরস্বতীভবন গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইয়াছে। "অথাতঃ শক্তি-জিজ্ঞাসা" ইহার প্রথম সূত্র। এই নিগূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ ১১৩ সূত্রের এক অল্পাক্ষরা অসমাপ্ত বৃত্তিও প্রকাশিত হইয়াছে। বিস্তৃত ব্যাখ্যার অভাবে এই সকল সূত্রের রহস্য সম্যক্ বোধগম্য হয় না।

দুর্বাসা—ইনি রুদ্রাংশে জাত এবং 'ক্রোধ-ভট্টারক' নামেও অভিহিত। ইঁহার প্রণীত সূত্র-

গ্রন্থ অদ্যাপি উপলব্ধ হয় নাই। তৎকৃত "ত্রিপুরা-মহিম্নঃ স্তোত্র" নিত্যানন্দ-বিরচিত ব্যাখ্যা সমেত "কাব্যমালা"র (নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বে) একাদশ খণ্ডে এবং "ললিতা স্তবরত্ন" দশম খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। ত্রিপুরা-মহিম্নঃ স্তোত্রের পুষ্পিকাতে ইনি "সকলাগমাচার্য" নামে বর্ণিত হইয়াছেন।

দত্তাত্রেয় ও পরশুরাম—ত্রিপুরার উপাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে পরশুরাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। পরশুরাম দত্তাত্রেয়ের নিকট পরমেশ্বরী ত্রিপুরা-সুন্দরীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার উপাসনা-পদ্ধতি জানিতে আগ্রহান্বিত হন। দত্তাত্রেয় পরশুরামকে সংবর্তকথিত পরমার্থরহস্য ব্যাখ্যা করিয়া যেমন বুঝাইয়াছিলেন, তাহা "ত্রিপুরা-রহস্য, জ্ঞানখণ্ডে" বিবৃত হইয়াছে। ত্রিপুরা রহস্য মাহাত্ম্যখণ্ড এবং জ্ঞানখণ্ড কাশী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। দত্তাত্রেয় ত্রিপুরাতত্ত্বের রহস্য, বিবৃতির জন্য অষ্টাদশ-সাহস্রী "দত্তসংহিতা" রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। পরশুরাম ৫০ খণ্ডে ছয় হাজার সূত্রে ইহার সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন। তৎপর হারিতায়ন সুমেধা দশখণ্ডাত্মক "পরশুরাম-কল্পসূত্রে" ইহাকে আরও সংক্ষিপ্ত করেন। পরশুরাম-কল্পসূত্র (রামেশ্বরী বৃত্তিসমেত) বরোদা গায়কোয়াড় সংস্কৃত গ্রন্থমালাতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক যুগে শ্রীবিদ্যাসম্প্রদায়ের মধ্যে যে সকল আচার্যের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে গৌড়পাদ, শঙ্করাচার্য, পুণ্যানন্দনাথ, অমৃতানন্দনাথ, ভাস্কর রায়, উমানন্দনাথ এবং রামেশ্বর সূরির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গৌড়পাদ (খৃঃ ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দী)—আচার্য শঙ্করের পরমগুরু গৌড়পাদ শ্রীবিদ্যার উপাসক ছিলেন। ইহার রচিত 'সুভগোদয়-স্তোত্র' এবং 'শ্রীবিদ্যারত্নসূত্র' এতদ্‌বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। শ্রীবিদ্যারত্নসূত্রের উপর শঙ্করারণ্য-কৃত 'দীপিকা' নামক ব্যাখ্যা আছে; কাশী সরস্বতীভবন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

শঙ্করাচার্য (খৃঃ ৮ম-৯ম শতাব্দী)—ইনি শ্রীবিদ্যার উপাসনা করিয়াই অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। ইঁহার রচিত 'সৌন্দর্যলহরী' এবং 'আনন্দলহরী' স্তোত্রে এবং 'ললিতা-ত্রিশতী-ভাষ্যে' শ্রীবিদ্যা-তত্ত্ব প্রপঞ্চিত হইয়াছে। আনন্দলহরী স্তোত্রে অনুপম কবিত্বের সহিত সুগভীর তত্ত্বের অপূর্ব সমাবেশ রহিয়াছে। শঙ্করাচার্য স্বয়ং শৃঙ্গেরী মঠে প্রধান উপাস্যরূপে শ্রীবিদ্যার যন্ত্র স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠ-চতুষ্টয়ে গুরুপরম্পরাক্রমে অদ্যাপি শ্রীবিদ্যার উপাসনা প্রচলিত আছে।

পুণ্যানন্দনাথ—ইঁহার রচিত 'কামকলাবিলাস' এবং নটনানন্দকৃত চিদ্‌বল্লী ব্যাখ্যা ত্রিপুরা-সিদ্ধান্তের তাৎপর্য-প্রকাশক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

অমৃতানন্দনাথ—ইঁহার রচিত 'যোগিনী-হৃদয়-দীপিকা' বামকেশ্বরতন্ত্রের অংশবিশেষের উত্তম ব্যাখ্যা। ত্রিপুরাসিদ্ধান্তের তাৎপর্য প্রকাশে এই গ্রন্থ বিশেষ সহায়ক।

ভাস্কর রায়—অষ্টাদশ শতকের পূর্বার্ধে শ্রীবিদ্যাসম্প্রদায়ে প্রখ্যাতনামা শাক্ত দার্শনিক ভাস্কর রায় বা ভাসুরানন্দনাথের আবির্ভাব হয়। ইঁহার রচিত গ্রন্থসমূহ শাক্তমতের আধ্যাত্মিক রহস্য উদ্ঘাটনের পক্ষে একান্ত উপযোগী। ভাস্কর রায়ের গ্রন্থমধ্যে বরিবস্যা-রহস্য, সৌভাগ্য-ভাস্কর (ললিতাসহস্রনামভাষ্য), সেতু (নিত্য-ষোড়শিকার্ণবের টীকা), গুপ্তবতী (শ্রীশ্রীচণ্ডী-টীকা) এবং কৌল, ত্রিপুরা ও ভাবনা উপনিষদের টীকা সমধিক প্রসিদ্ধ।

উমানন্দনাথ ও রামেশ্বর সূরি—ভাস্কর রায়ের শিষ্য উমানন্দনাথ ১৭৫৫ খৃঃ 'নিত্যোৎসব' নামক পদ্ধতি রচনা করেন। রামেশ্বর সূরি ভাস্কর

রায়ের প্রশিষ্য। ইনি পরশুরাম-কল্পসূত্রের উপর 'সৌভাগ্য-সুধোদয়' নামক টীকা প্রণয়ন করেন (১৮৩১ খৃঃ)। ভাস্কর রায়ের শিষ্যসম্প্রদায় মহারাষ্ট্র তথা সুদূর দক্ষিণ ভারতে অদ্যাবধি সক্রিয় আছে।

শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়ে শ্রীবিদ্যার প্রভাব— মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অভিন্নহৃদয় সহযোগী পতিতপাবন অবধূত সন্ন্যাসী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবিদ্যার উপাসক ছিলেন, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। তাঁহার আরাধিত শ্রীবিদ্যার যন্ত্রটি (শ্রীচক্র) অদ্যাপি খড়দহের প্রভুপাদ গোস্বামীদের মন্দিরে সযত্নে রক্ষিত ও পূজিত হইতেছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহোদয়ের মতে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্তিত সম্প্রদায়গত সিদ্ধান্তের মূলেও শ্রীবিদ্যাসাধনার প্রভাব স্পষ্টতঃ অথবা অর্ধপ্রচ্ছন্নভাবে পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীষোড়শী-মহাবিদ্যা— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ উল্লেখ করিয়াছেন, ঠাকুর তন্ত্রসাধন-কালে (১৮৬২-৬৩ খৃঃ) দশভুজা হইতে দ্বিভুজা-পর্যন্ত কত যে দেবীমূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা হয় না। উঁহাদিগের মধ্যে কোন কোনটি তাঁহাকে নানা ভাবে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ মূর্তিসমূহের সকলগুলিই অপূর্ব সুরূপা হইলেও, শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বরী বা ষোড়শী-মূর্তির সৌন্দর্যের সহিত তাঁহাদিগের রূপের তুলনা হয় না। তিনি বলিতেন, "ষোড়শী বা ত্রিপুরা মূর্তির অঙ্গ হইতে রূপ-সৌন্দর্য গলিত হইয়া চতুর্দিকে পতিত ও বিচ্ছুরিত হইতে দেখিয়া-ছিলাম।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সন ১২৭৯ সালের (১৮৭২ খৃঃ) জ্যৈষ্ঠমাস অমাবস্যা ফলহারিণী কালিকাপূজার দিন দক্ষিণেশ্বরে স্বীয় পত্নী শ্রীসারদাদেবীতে শ্রীশ্রীষোড়শীমহাবিদ্যার পূজা করিয়াছিলেন। ঐ পূজাকালে তিনি এরূপ প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন,— "হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইহার শরীর মনকে পবিত্র করিয়া ইহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর।" অতঃপর শ্রীশ্রীমার অঙ্গে মন্ত্র সকলের যথাবিধানে ন্যাসপূর্বক ঠাকুর সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে তাঁহাকে ষোড়শোপচারে পূজা করিলেন। পূজান্তে ঠাকুর জপপূজাদি এবং জপের মালা প্রভৃতি শ্রীশ্রীদেবী-পাদপদ্মে বিসর্জন পূর্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন,— "হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে সর্বকর্মনিষ্পন্নকারিণি, হে শরণদায়িনি ত্রিনয়নি শিব-গেহিনি গৌরি, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম করি।"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ২৫৪-৫৮; শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ ৬৩)

শ্রীশ্রীষোড়শী মহাবিদ্যার ধ্যান

মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের সঙ্কলিত "তন্ত্রসার" নামক সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক নিবন্ধের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীশ্রীষোড়শী মহাবিদ্যার (শ্রীবিদ্যা) ধ্যানমন্ত্র দৃষ্ট হয়। এই বিস্তৃত ও কবিত্বময় ধ্যানটি 'মহাকালসংহিতা' হইতে গৃহীত। আগমবাগীশ মহোদয় শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালীন বা কিঞ্চিৎ পরবর্তী (ষোড়শ শতাব্দী)। তৎপ্রণীত "তন্ত্রসারে" সকল সম্প্রদায়ের তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড ও উপাসনা-পদ্ধতি অতীব বিচক্ষণতার সহিত সঙ্কলিত হইয়াছে।

"ষোড়শীদেবী (শ্রীবিদ্যা) পদ্মনিভা, প্রাতঃ-কালীন সূর্যকিরণের ন্যায় সমুজ্জ্বল কান্তিবিশিষ্টা এবং জবাকুসুম, দাড়িম্বপুষ্প, পদ্মরাগমণি এবং কুঙ্কুমের ন্যায় অরুণবর্ণা। উজ্জ্বল মুকুটস্থিত মাণিক্যময় কিঙ্কিণী (ঘুঙুর)-জালে ইহার মস্তক বিভূষিত। দেবীর শিরোদেশে কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমর-পঙ্ক্তির ন্যায় কুটিল অলকারাজি শোভা

পাইতেছে, বদনমণ্ডল নবোদিত সূর্যসদৃশ। পরমেশ্বরীর জটাজুটমণ্ডিত ললাটফলকে অর্ধচন্দ্র বিরাজমান, ভ্রূলতা হরধনুর ন্যায় কুটিল। দেবীর ত্রিনয়ন আনন্দভরে নিমীলিত ও উন্মীলিত হইয়া আন্দোলিত হইতেছে, তাঁহার সুবর্ণ কুণ্ডলদ্বয় স্ফুরৎ কিরণজালের ন্যায় উজ্জ্বল প্রভা-বিশিষ্ট। দেবীর সম্পূর্ণ মুগণ্ডস্থল যেন চন্দ্রের অমৃতমণ্ডলকে জয় করিয়াছে, সুস্পষ্ট নাসিকা যেন স্বয়ং বিশ্বকর্মা কর্তৃক বিনির্মিত, ওষ্ঠদ্বয় তাম্র বিদ্রুম ও বিম্বফল সদৃশ রক্তবর্ণ। ষোড়শীদেবী অমৃতোপমা, তাঁহার মৃদুহাস্যের মাধুর্য রসসাগরের মাধুর্যকেও পরাভূত করিতেছে। অনুপমগুণবিশিষ্ট চিবুক দ্বারা দেবী সুশোভিতা; ইনি কম্বুগ্রীবা, স্বীয় মৃণালতুল্য ভুজচতুষ্টয়ে রক্তোৎপলদল সদৃশ সুকুমার করপদ্ম ধারণ করিতেছেন। দেবীর রক্তাম্বুজতুল্য নখপ্রভায় আকাশমণ্ডল যেন বিতান-বিশিষ্ট হইয়াছে। তাঁহার সমুন্নত স্তনদ্বয়ের উপর মুক্তাহার বিলম্বিত, ত্রিবলি-রেখাযুক্ত মধ্যদেশ অতীব সুশোভিত, নাভিমণ্ডল লাবণ্য-সরিতের আবর্তের ন্যায় শোভমান। মহামূল্য রত্নগঠিত কাঞ্চীহার দেবীর নিতম্বোপরি বিরাজিত। ঈশ্বরীর উরুদ্বয় ললিত কদলীস্তম্ভের ন্যায় সুকুমার, জানুমণ্ডল লাবণ্যময় কুসুম সদৃশ। লাবণ্যপূর্ণ কদলী সদৃশ জঙ্ঘাযুগল দ্বারা দেবীর দেহ সুমণ্ডিত, চরণযুগলের গুল্‌ফদ্বয় অতিশয় গুপ্ত। ষোড়শীদেবীর পদাগ্রবিস্তৃত দীর্ঘ অঙ্গুলিসমূহে স্বচ্ছ নখরাজি শোভা পাইতেছে। দেবীর শ্রীচরণকমল-যুগল ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর শিরোরত্নে সদা মার্জিত হইতেছে। শত শত চন্দ্রের সুস্নিগ্ধ প্রভায় ষোড়শী মহাবিদ্যার দেহকান্তি সমুজ্জ্বল; স্বীয় অঙ্গের লোহিত প্রভায় সিন্দূর, জবা ও দাড়িম কুসুম পরাজয় মানিয়াছে। দেবী রক্তবস্ত্র-পরিহিতা, রক্তকমলোপরি উপবিষ্টা এবং রক্তবর্ণ আভরণে সমলঙ্কৃতা। চতুর্ভুজা ষোড়শী মহাবিদ্যা দুই হস্তে পাশ ও অঙ্কুশ এবং অপর দুই হস্তে পঞ্চবাণ ও ধনু ধারণ করিয়াছেন। ইঁহার বদন কর্পূরকণামিশ্রিত তাম্বূলরসে পরিপূরিত। ইঁহার সর্বাঙ্গ কস্তূরী ও কুঙ্কুমে অনুলিপ্ত হইয়া অরুণবর্ণ ধারণ করিয়াছে, সর্বপ্রকার শৃঙ্গারোপ-যোগী বেশ ও সর্ববিধ আভরণে দেবী সুসজ্জিতা। ষোড়শীদেবী জগতের আহ্লাদ উৎপাদনকারিণী, জগজ্জনের রঞ্জনকারিণী, জগৎ আকর্ষণকারিণী এবং জগতের কারণস্বরূপিণী। ইনি সর্বমন্ত্রময়ী, সর্বসৌভাগ্যসমৃদ্ধা সুন্দরী, সর্বলক্ষ্মীময়ী, সর্বশক্তি-ময়ী, নিত্যা এবং মঙ্গলময়ী।"

সংক্ষিপ্ত ধ্যান— তন্ত্রশাস্ত্রে ষোড়শী মহা-বিদ্যার নিত্য ব্যবহার্য নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্ত ধ্যানমন্ত্রও প্রচলিত ;—

"বালার্ক-মণ্ডলাভাসাং চতুর্বাহুং ত্রিলোচনাম্।
পাশাঙ্কুশ-শরাংশ্চাপং ধারয়ন্তীং শিবাং শ্রয়ে ॥"

ষোড়শী মহাবিদ্যার দেহকান্তি উদয়কালীন সূর্যমণ্ডল সদৃশ, ইনি চতুর্ভুজা, ত্রিনয়না, চারি হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, (পঞ্চ) শর এবং ধনু ধারণ করিয়াছেন। এই মঙ্গলময়ী দেবীকে আমি আশ্রয় করিতেছি।

"চতুর্বাহুং" স্থলে "চতুর্বাহাং" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়; ইহার অর্থ চারিবাহন-যুক্তা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও ঈশ্বর— এই চারি দেবতা ষোড়শী মহা-বিদ্যার পর্যঙ্কের চারিটি পাদরূপে অবস্থিত।

পঞ্চপ্রেতাসন – ষোড়শী মহাবিদ্যা (শ্রীবিদ্যা) পঞ্চপ্রেতাসনোপরি সংস্থিতা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিব ইঁহারা 'পঞ্চপ্রেত' সংজ্ঞায় অভিহিত। ব্রহ্মা বিষ্ণু, রুদ্র ও ঈশ্বর— ইঁহারা ষোড়শী মহাবিদ্যার পর্যঙ্কের চারিটি পাদ এবং সদাশিব উক্ত পর্যঙ্কের ফলক রূপে অবস্থিত। দেবীভাগবতে কথিত হইয়াছে,—

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
এতে মঞ্চখুরাঃ প্রোক্তাঃ ফলকস্তু সদাশিবঃ ॥
(দেবীভাগবতম্ ১২।১২।১২)

যামলতন্ত্রেও দেবীর সিংহাসনে পঞ্চমহাপ্রেত বা পঞ্চশিবের উল্লেখ দৃষ্ট হয়,—

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
এতে পঞ্চমহাপ্রেতাঃ সিংহাসন-পরিস্থিতাঃ।
এতে দেব্যাসনস্যাধঃ শিবাঃ পঞ্চ ব্যবস্থিতাঃ॥

ব্রহ্মাদি পঞ্চশিবকে পঞ্চ মহাপ্রেত বলিবার তাৎপর্য এই যে, শিব শক্তিযুক্ত হইলেই সৃষ্ট্যাদি কার্য করিতে সমর্থ হন, শক্তিরহিত হইলে তিনি নিষ্ক্রিয় প্রেততুল্য হইয়া থাকেন। শঙ্করাচার্য তাঁহার "আনন্দলহরী" স্তোত্রের প্রারম্ভেই এই তত্ত্ব ঘোষণা করিয়াছেন,—

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং,
ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।
(আনন্দলহরী ১)

শিব যদি শক্তিযুক্ত হন তাহা হইলেই তিনি প্রভাবশালী হইয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি সমুদয় কার্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হন, নচেৎ তিনি স্বয়ং স্পন্দিত হইতেও সমর্থ হন না।

নির্বিশেষ ব্রহ্মই স্বশক্তিবিলাস দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ইত্যাদি পঞ্চ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া বামাদি তৎতৎ শক্তির সান্নিধ্যহেতু সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ রূপ 'পঞ্চকৃত্য' সম্পাদন করিয়া থাকেন। যখন ব্রহ্মাদি পঞ্চশিব স্ব স্ব বামাদি শক্তি-রহিত হইয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া যান তখনই তাঁহাদিগকে "প্রেত" বলা হয়।

ষোড়শী মহাবিদ্যা (শ্রীবিদ্যা) রহস্য—শঙ্করাচার্য পঞ্চপ্রেতাসনসংস্থিতা ষোড়শী মহাবিদ্যার (শ্রীবিদ্যা) স্বরূপ সম্বন্ধে আলোকপাত করিয়া স্তুতি করিতেছেন,—

সুধাসিন্ধোর্মধ্যে সুর-বিটপি-বাটীপরিবৃতে,
মণিদ্বীপে নীপোপবনবতি চিন্তামণিগৃহে।
শিবাকারে মঞ্চে পরমশিব-পর্যঙ্কনিলয়াং,
ভজন্তি ত্বাং ধন্যাঃ কতিচন চিদানন্দলহরীম্॥
(আনন্দলহরী, ৮)

মাতঃ! তুমি সুধাসিন্ধু-মধ্যস্থিত কল্পবৃক্ষ-বাটিকা-পরিবৃত মণিময় দ্বীপে, কদম্ববৃক্ষসমূহ সুশোভিত উপবনমধ্যে চিন্তামণিগৃহে পঞ্চশিবোপরি স্থাপিত পর্যঙ্কের উপরে পরমশিবময় আসন করিয়া তাহাতে উপবিষ্টা রহিয়াছ। কোন কোন ধন্য সাধক তোমাকে চিদানন্দলহরীস্বরূপা জানিয়া তোমার এইরূপ মূর্তি ভজনা করিয়া থাকেন।

রাজরাজেশ্বরী ষোড়শী মহাবিদ্যা যে ব্রহ্মাদি পঞ্চেশ্বরের আরাধ্যা তাহা প্রকাশিত করিয়া মহাদেবীর স্তুতি করিতেছেন,—

জগৎ সূতে ধাতা হরিরবতি রুদ্রঃ ক্ষপয়তে,
তিরস্কুর্বন্নেতৎ স্বমপি বপুরীশঃ স্থগয়তি।
সদাপূর্বঃ সর্বং তদিদমনুগৃহ্ণাতি চ শিব-
স্তবাজ্ঞামালম্ব্য ক্ষণচলিতয়োর্ভ্রূলতিকয়োঃ॥
(আনন্দলহরী, ২৪)

মাতঃ! তোমার ঈষৎচালিত ভ্রূলতা দ্বারা আজ্ঞা-প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, বিষ্ণু তাহা রক্ষা করিতেছেন এবং যথাসময়ে রুদ্র আবার সেই সৃষ্ট জগৎ লয় করিতেছেন। ঈশ্বর সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কার্যে লিপ্ত না হইয়া যোগবলে আপনাকে স্থির করিয়া রাখিতেছেন এবং সদাশিব সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কার্যে অনুগ্রহ নিরত।

শাক্তদর্শন মতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র—এই মূর্তিত্রয় 'ঈশ্বর' তত্ত্বেরই অন্তর্গত। ভেদপ্রথা প্রকটিত হইলেই সৃষ্টি, পালন ও সংহারের প্রয়োজন হয়, তখন ঈশ্বরই এই তিন রূপে উক্ত ক্রিয়াত্রয় সম্পাদন করেন। "ঈশ্বরো বহিরুন্মেষো নিমেষোঽন্তঃ সদাশিবঃ" (ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞা, ৩।১।৩)। পরাশক্তির বাহ্য উন্মেষকে (চক্ষুঃ উন্মীলন) 'ঈশ্বর' এবং আন্তর নিমেষকে (চক্ষুঃ নিমীলন) 'সদাশিব' বলা হইয়া থাকে। (সদাশিব-তত্ত্বে অহংতার (Subjectivity) প্রাধান্য কিন্তু ঈশ্বরতত্ত্বে ইদংতার (Objectivity) স্ফূর্তি অধিকতর। সদাশিবতত্ত্ব হইতেই সত্তা অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্টির সূচনা হইয়া থাকে, এইজন্য ইহাকে 'সাদাখ্য'তত্ত্ব নামেও অভিহিত করা হয়। "সদাখ্যায়াং ভবং সাদাখ্যং যতঃ প্রভৃতি সদিতি প্রথা।" (ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞা বিমর্শিনী, ৩।১।২)।

অবতারপুরুষ যীশু

ডক্টর জলধি কুমার সরকার

[পূর্বানুবৃত্তি]

একদিন যীশু সারারাত্রি একটি পাহাড়ের উপর উপাসনা করার পরে প্রত্যুষে নেমে তাঁর শিষ্যদের ডাকলেন এবং তাঁদের মধ্যে দ্বাদশজনকে apostles বা ধর্মপ্রচারক প্রধান শিষ্যরূপে গ্রহণ করলেন। এঁরা কেউ লেখাপড়া-জানা লোক ছিলেন না। পরের দু'বৎসর এঁরা ছায়ার মত যীশুর সঙ্গে ছিলেন এবং সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এঁরা যাতে ভবিষ্যতে যীশুর বাণীর মর্ম জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন, তার জন্য যীশু এঁদের নানাভাবে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিতেন। তিনি শিষ্যদের— 'তিনি কে'— এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। তাঁর প্রধান শিষ্য সাইমনই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, তিনি সাক্ষাৎ ভগবান। তিনি শিষ্যদের বুঝিয়েছিলেন, অপরাধীকে ক্ষমা করা মহাগুণ, মন্দিরে প্রদত্ত ভক্তিহীনের শত স্বর্ণমুদ্রার চেয়ে, ভক্তিভরে নিবেদিত সামান্য অর্থও অনেক বেশী মূল্যবান এবং তাঁর উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে তাঁরা পাহাড়কেও উপড়ে ফেলতে পারবেন।

যীশুর শিষ্য- ও ভক্ত-সংখ্যা বাড়তে লাগল। কিন্তু অনেকসময়েই তিনি তখনকার প্রচলিত রীতি-নীতির বিরুদ্ধে বলতেন। ইহুদীদের মধ্যে ধর্ম তখন কতকগুলি শাস্ত্রীয় আচারে পরিণত হয়েছিল। কি খাওয়া উচিত বা উচিত নয়, বাসন কি ভাবে ধোওয়া উচিত -এই সব খুঁটিনাটি নিয়েই তারা তর্কাতর্কি করত। যীশু প্রচার করলেন যে, ধর্মের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক উন্নতি ও ভগবান লাভ। যখন তিনি জানালেন যে, পাপীরাও তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করলে মুক্তি পাবে, অনেকে তা ঈশ্বরবিরোধিতা বলে ধরে নিল। সেকালে ইহুদীদের মধ্যে লোকদেখান ঘটা করে উপাসনার প্রচলন ছিল,— যীশু উপাসনার সময় অন্ততঃ সাময়িক নির্জনবাসের উপদেশ দিলেন। তাঁর ইহুদী শিষ্যরা এই প্রথম শুনলেন যে, ধর্মগ্রন্থ পড়লেই ভগবান লাভ হয় না, তার জন্য আলাদা চেষ্টা করতে হয়। তখনকার দিনে মন্দির-প্রাঙ্গণে গবাদি পশুর কেনা-বেচা চলত এবং স্তূপীকৃত টাকা-পয়সা সামনে রেখে মহাজনী কারবার প্রচলিত ছিল। যীশু একদিন উত্তেজিত হয়ে হাতে চাবুক নিয়ে এই সব ব্যবসায়ীদের মন্দির-ত্যাগে বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রীভক্ত মেরি যখন তাঁর পদদ্বয় ধৌত ক'রে নিজ কেশ দিয়ে মুছিয়ে দামী আতর লেপন করেছিলেন, তখন সে খরচে তিনি আপত্তি করেননি। জনৈক শিষ্য আপত্তি করলে যীশু বলেছিলেন: গরীবদের তোমরা চিরকালই পাবে-- কিন্তু আমাকে চিরকাল পাবে না জন্মজন্মান্তরের সুকৃতির ফলে মেরি পেয়েছিলেন অবতারপুরুষের সেবার দুর্লভ সৌভাগ্য। যীশু ভক্তের ভগবান হয়ে তাঁকে সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করবেন কি করে!

এই ভাবে সাধারণ দরিদ্র লোক যেমন যীশুর কথায় ও কার্যে সম্পূর্ণ আস্থাস্থাপন করেছিল, অন্য অনেকে, বিশেষতঃ ধনী- ও পুরোহিত-সম্প্রদায় তাঁর বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে উঠল, কারণ তাদের স্বার্থে আঘাত পড়েছিল, আবার কারও কারও ভণ্ডামির মুখোস খুলে গিয়েছিল। যীশুর অনুরাগীর সংখ্যা যত বাড়তে লাগল, শাসকগোষ্ঠী তাদের ক্ষমতা হারাবার ভয়ে তত ভীত হয়ে পড়ল এবং

প্রজাদের না চটিয়ে যীশুকে হত্যা করার মতলব আঁটতে লাগল। কিন্তু তাঁকে কোন একটা নির্দিষ্ট অপরাধে অপরাধী করা সমস্যার ব্যাপার হোল, কারণ সত্যিকারের কোন অপরাধ তো তিনি করেননি।

এদিকে জনগণের মধ্যে একদল তাঁকে রাজার আসনে বসাতে চাইছিল, কিন্তু এ বিষয়ে যীশুকে কিছুতেই তারা রাজী করাতে পারেনি। আবার অন্য দল তাঁর—'আমি ও আমার পিতা (ঈশ্বর) এক'— এই উক্তিকে চরম ঔদ্ধত্য মনে ক'রে তাঁকে হত্যা করার কথা চিন্তা করতে লাগল। ঠিক এই সময় মার্থা ও মেরির ভাই মৃত ল্যাজারাসকে কবর থেকে তুলে বাঁচিয়ে দেওয়ার ঘটনা ল্যাজারাসের নিজ মুখে শুনে ও স্থানীয় লোকেরা বেশী করে যীশুর ভক্ত হয়ে যাওয়ায়, শাসকদল বেশী দিন যীশুকে জীবিত রাখা নিরাপদ মনে করল না।

জেরুসালেমের মন্দিরে ইহুদীদের বিশেষ উৎসব —ফিস্ট অফ দি পাসোভার (Feast of the Passover) সমাগতপ্রায়। যীশু জানতেন যে, তাঁর নরদেহ আর বেশী দিন থাকবে না। সেই-জন্য— তাঁর ভক্তদের অনুমতি দিলেন যে তারা তাঁকে ভক্তদের 'রাজা'র সম্মান দিতে পারে, তবে তিনি যে সাধারণ অর্থে রাজত্ব চান না, সেটা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন। ভক্তদের অনুরোধে একটি গাধার পিঠে চড়ে তাঁদের 'রাজা' হ'য়ে সদলবলে জেরুসালেমের মন্দির অভিমুখে যাত্রা করলেন। তাঁর বৃহৎ দল দেখে জেরু-সালেমের ধর্মযাজকগণ ঈর্ষায় কাতর হয়ে তাঁকে নানাপ্রশ্ন ক'রে প্রথমে অপদস্ত করতে চেষ্টা করল, কিন্তু কৃতকার্য না হয়ে আহত পশুর মতো হিংস্র হয়ে উঠল। কিন্তু অত ভক্তদের সামনে কিছু করতে সাহস পেল না। সন্ধ্যাসমাগমে যীশু শহরের বাইরে একটি পাহাড়ের ধারে আশ্রয় নিয়েছিলেন। শাসক ও পুরোহিতরা পরামর্শ ক'রে ঠিক করলেন যে, শুধু যীশু নয়, তাঁর স্বর্গীয় ক্ষমতার জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত ল্যাজারাসকেও পৃথিবী থেকে সরাতে হবে। এই ব্যাপারে অপ্রত্যাশিতভাবে সাহায্য এল, যীশুর দ্বাদশ শিষ্যের একজন—জুডাসের কাছ থেকে। সে অর্থলোভে এই ঘৃণ্য কাজে প্রবৃত্ত হ'ল।

এদিকে উৎসবের বিশেষ দিন সমাগত। যীশু সদলবলে একটি শিষ্যের বাড়ীতে গেলেন 'শেষ নৈশ ভোজন'-এর (Last Supper) জন্য। শিষ্যদের বিনয় ও দীনতা শিক্ষা দেবার জন্য ভোজনের আগে তিনি শিষ্যদের সকলের নিজ হাতে পা ধুইয়ে দিলেন, এমন কি জুডাস্‌কে পর্যন্ত বাদ দিলেন না, যদিও তিনি তার সব কার্যকলাপই জানতেন। ভোজনের পরে জুডাস্‌কে তার হীন কার্য সমাপ্ত করার জন্য অন্য শিষ্যদের না জানিয়ে চলে যেতে অনুমতি দিলেন। তারপরে সদলবলে শহরের বাইরে একটি পাহাড়ে এসে, অন্য শিষ্যদের পিছনে রেখে, সাইমন-প্রমুখ তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে আরও এগিয়ে চললেন। পরে ওই তিনজনকে অপেক্ষা করতে ব'লে তিনি আরও এগিয়ে গিয়ে মাটির উপর শুয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন। তাঁর মৃত্যুর দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল। যীশু প্রার্থনা করলেন, তিনি যেন সব সময় ভগবানকে স্মরণ ক'রে সব কষ্ট সহ্য করতে পারেন। প্রার্থনা শেষে ফিরে এসে শিষ্যত্রয়কে নিদ্রিত দেখে তিনি তাদের ডেকে তুললেন। ঠিক সেই সময় এগিয়ে এল জুডাসের নেতৃত্বে মশাল- ও তরবারি হস্তে রোমান সৈন্য ও মন্দিরের প্রহরীরা। জুডাস্‌ই চিনিয়ে দিল যীশুকে। অবশ্য যীশু এমনিতেই এগিয়ে আসছিলেন ধরা দেবার জন্য। প্রহরীরা যীশুর এই নির্ভীক ব্যবহার ও প্রশান্ত মূর্তি দেখে ভীত হয়ে প্রথমে পিছিয়ে পড়েছিল। যীশুর একজন শিষ্য পিটার ক্রোধে অন্ধ হয়ে তরবারির

আঘাতে একজন প্রহরীর কান কেটে দিলে, যীশু তাঁকে ক্ষান্ত করলেন এবং স্বহস্তে কাটা-কান জোড়া লাগিয়ে দিলেন। যীশুকে বেঁধে নিয়ে প্রহরীরা চলল প্রধান পুরোহিত কাইফাস-এর কাছে। আশ্চর্যের বিষয় যীশুর শিষ্যরা তার আগেই ভয়ে স্থানত্যাগ করেছিলেন। যীশু কাইফাসকে তাঁর অপরাধ কি একথা জিজ্ঞাসা ক'রে কোন সদুত্তর পেলেন না। তারপরে ইহুদীদের সর্বোচ্চ মন্ত্রণাপরিষদ (Supreme Council)-এর কাছে বিচার আরম্ভ হোল। তাদের বিচারের রায় আগে হ'তেই ঠিক করা ছিল, কিন্তু একটা বিচারের প্রহসনের প্রয়োজন ছিল। নিজেকে ভগবান বলে, এমন মানব-সন্তানকে তারা মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে পারে না এবং তাই হোল।

জুডাস্ লোকমুখে যীশুর প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে এই উপলক্ষে প্রাপ্ত অর্থ নিকটবর্তী মন্দিরে ফেলে দিয়ে উদ্বন্ধনে আত্ম-হত্যা করল।

যাই হোক, প্রাণদণ্ড ধার্য হবার পরে যীশুকে তারা রোমানশাসক পনটিয়াস পাইলেট-এর কাছে নিয়ে গেল। কারণ রোমান আইন অনুসারে ইহুদীদের অন্য শাস্তির আদেশ দেবার ক্ষমতা থাকলেও, প্রাণদণ্ডের আদেশ রোমানশাসকের অনুমতিসাপেক্ষ ছিল। পাইলেটের কাছে ইহুদী বিচারকরা যীশুর রাজদ্রোহিতার অপরাধের উপরই জোর দিয়েছিলেন, কারণ ধর্মদ্রোহিতার কথা ব'লে রোমানশাসককে হয়ত ততটা প্রভাবান্বিত করা সম্ভব হবে না ব'লে তারা মনে করেছিল। পাইলেট যীশুকে আলাদা ঘরে নিয়ে গিয়ে কথা ব'লে তাঁর মধ্যে রাজদ্রোহিতার কোন আভাস পেলেন না, বরং পেলেন তাঁর সারল্যের, সত্যের ও স্পষ্টবাদিতার পরিচয়। কিন্তু ইহুদীদের একথা বলায় তারা— যীশু অপরাধী এবং তিনি প্রাণদণ্ডের যোগ্য—এই কথারই পুনরাবৃত্তি করতে লাগল। পাইলেট অন্য উপায় না দেখে, যীশুকে যেখান রাজার কাছে নিয়ে যেতে বললেন, কারণ রাজা ঘটনাক্রমে সেই সময়ে জেরুসালেমে এসেছিলেন। বিরাট জনতা যীশুকে নিয়ে চলল রাজার কাছে। রাজা পশুপ্রকৃতির ছিলেন এবং তাঁরই আদেশে কিছুদিন আগে জন দি ব্যপটিস্টের শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল। রাজা যীশুকে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা দেখাতে বললেন। কিন্তু তাঁকে নিঃশব্দ ও নির্বিকার দেখে কৌতুক করে তাঁর মাথায় একটা লাল কাপড় জড়িয়ে দিয়ে পাইলেটের কাছে নিয়ে যেতে বললেন। অর্থাৎ যেন যীশুকে 'রাজা' সাজিয়ে দেওয়া হোল। সঙ্গে চলল, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আরও দুটি দুষ্ট-প্রকৃতির কয়েদী।

পাইলেট মুস্কিলে পড়লেন। জনতাকে খুসী করার জন্য যীশুর উপর বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন ; ভাবলেন এই নৃশংস শাস্তির পরে তারা আর প্রাণদণ্ড চাইবে না। কঠিন কশাঘাতে যীশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্তধারা বইতে লাগল, কিন্তু যীশু মানুষের অপরাধের বোঝা বইবার জন্য নিঃশব্দে সেই অসীম যন্ত্রণা সহ্য করলেন। শুধু তাই নয়, প্রহরীরা তাকে চেয়ারে বসিয়ে মাথায় লাল কাপড়ের উপর কাঁটা-গাছের লতার মুকুট এবং হাতে গাছের ভাঙ্গা ডালের রাজদণ্ড দিয়ে 'রাজা' সাজিয়ে বিদ্রূপ করতে লাগল। এই অবস্থায় তাঁকে পাইলেটের কাছে নিয়ে গিয়ে ক্রুশবিদ্ধ করে প্রাণদণ্ডের আদেশ দাবী করল। পাইলেট নিরুপায় হয়ে সেই আদেশই দিলেন। জনতা উল্লাসে চীৎকার করে উঠল।

রাজপ্রাসাদ হতে জনতা চলল ক্যাল্ভ্যারি নামে পাহাড়ের দিকে, কারণ সেখানেই ক্রুশবিদ্ধ হবার স্থান। অন্য দু'জন কয়েদীর মত যীশুর

কাঁধেও কাষ্ঠনির্মিত তাঁর নিজের ক্রুশ। যীশুর পরিধানের বস্ত্র খুলে নিয়ে সৈন্যরা তাঁকে ক্রুশের উপর শুইয়ে হাতে পায়ে পেরেক পুঁতে দিল। জনতার মধ্য হতে মাতা মেরি এই দৃশ্য দেখলেন, কিন্তু যীশুর দ্বাদশ শিষ্যের কেউ সেখানে ছিলেন না। ইহুদী যাজকরা ও রোমান সৈন্যরা, এমন কি ক্রুশবিদ্ধ একজন দস্যুও নানা বিদ্রূপবাক্য বর্ষণ করল যীশুর উপর। কেউ বলল যে যীশু যদি ভগবান বা তার পুত্র হন, তা হ'লে নিজেকে মুক্ত করছেন না কেন! যীশুর মুখে কেবল ধ্বনিত হোল, "ভগবান এদের ক্ষমা করুন। এরা জানে না যে, এরা কি করছে!" তারপরে বললেন, "আমার কাজ সমাপ্ত, আমায় নাও প্রভু"। রাত্রের অন্ধকার ঘনীভূত হোল। সেইসময় ভূমিকম্পে পৃথিবী কেঁপে উঠল এবং জনতার কয়েক জনকে বলতে শোনা গেল যে, যীশু বোধ হয় সত্যই ঈশ্বরের পুত্র। পরের দিন উৎসবের বিশেষ দিন। যাতে সেই শুভদিনের আগেই কয়েদীদের মৃত্যু হয়, সেইজন্য প্রহরীরা অন্য দু'জন কয়েদীর হাত-পায়ের হাড় ভেঙ্গে দিল। যীশুর দেহে সেরূপ করার দরকার হোল না, কারণ তার আগেই যীশুর আত্মা তাঁর নরদেহ ত্যাগ করেছে। তবুও নিশ্চিন্ত হবার জন্য একজন সৈনিক তাঁর বুকে বর্শাবিদ্ধ করে খানিকটা রক্ত বার ক'রে দিল।

যীশুর ভক্তদের কয়েকজন পাইলেটের কাছে যীশুর দেহ ভিক্ষা ক'রে নিয়ে যথাযথ নিয়ম পালন ক'রে নিকটবর্তী পাহাড়ের ধারে কবর দিয়ে একটা বড় পাথর চাপা দিয়ে বাড়ী ফিরে গেল।

যীশু একসময়ে বলেছিলেন যে, মৃত্যুর পরে তাঁর সমাধি হ'তে পুনরুত্থান (Resurrection) হবে। সেইজন্য যারা তাঁর মৃত্যুদণ্ডের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিল, তারা পাইলেটের অনুমতি নিয়ে যীশুর সমাধিস্থানের কাছে পাহারাদার নিযুক্ত করল। শুক্রবার শনিবার বেশ ভালই কাটল। রবিবার প্রত্যুষে অকস্মাৎ বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে সঙ্গে একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ এসে কবরের উপরকার পাথরটি সরিয়ে দিলেন। কিংকর্তব্য-বিমূঢ় প্রহরীদের যখন সম্বিৎ ফিরে এল, তখন কবর শূন্য। তারা ভীত হয়ে তাদের ওপরওয়ালা-দের কাছে এবিষয়ে মিথ্যা গল্প রটিয়ে দিল। এইরূপ একটা কাহিনী গিয়ে পৌঁছল যীশুর একাদশ শিষ্যের কাছে। তারা ছুটে এসে দেখল যে, কবরের মধ্যে কেবল মৃতদেহ-ঢাকা কাপড়-খানি পড়ে আছে।

তারপরের চল্লিশদিনের খবর বিস্ময়কর। যীশু এই সময় বহুবার সশরীরে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁর ভক্ত ও শিষ্যদের কাছে— তাঁদের সঙ্গে ভোজন করেছেন, তাঁদের শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাঁদের নানাভাবে পরিচালিত করেছেন। তাঁর ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে সন্দিগ্ধদের সন্দেহ দূর করেছেন। শেষদিন যীশু শিষ্যদের আশীর্বাদ করে তাঁদেরই সামনে আকাশে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কোন ব্যক্তিই যুগপৎ দুজন প্রভুকে সেবা করতে পারে না। কারণ হয় সে একজনকে ঘৃণা ক'রে অপরকে ভালবাসবে অথবা একজনের প্রতি অনুরক্ত হয়ে অপরকে অবহেলা করবে। তোমরা ঈশ্বর ও বিত্তদেবতাকে একসঙ্গে সেবা করতে পার না। —যীশু

এসো নারায়ণ

শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধান্তশাস্ত্রী

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করিয়া ধারণ
এসো দেব, এসো নারায়ণ,
জরাজীর্ণ ধরিত্রীর জরাভার করিতে লাঘব
এসো তুমি, পুনঃ এসো বাণী তব করিয়া স্মরণ।
পাপে পূর্ণ বসুন্ধরা, রক্ত-ঝরা হিংসা, অবিচার,
অধর্মের অভ্যুত্থানে নিরীহের আর্ত হাহাকার!
মর্মকথা কা'রে বলি? তুমি যদি না করো শ্রবণ,—
সহ্যসীমা অতিক্রান্ত, অশ্রু-হীন করুণ ক্রন্দন।
এসো তুমি, এসো ত্বরা করি, বার বার তোমারেই স্মরি
জুড়াইতে যত জ্বালা, মরমের অব্যক্ত বেদনা,—
বঞ্চিতেরে ক'রো না বঞ্চনা।
এসো দয়াময়, এখনও কি হয়নি সময়?
প্রতিজ্ঞা তোমার
অন্তরে আমার আলো জ্বেলে দেয়, নাশে অন্ধকার।
বসে আছি আসা-পথ চেয়ে,
তুলে নাও ক্রোড়ে তব, ভুলি সব তব স্নেহ পেয়ে।

জগজ্জননী

শ্রীধনেশ মহলানবীশ

বিবেক বৈরাগ্য মাগি তব পদে, মাতঃ
তামসী রজনী শেষে উষা সদ্যস্নাত
গৌরবে উদিল পূর্ব দিগন্ত ভেদিয়া।
কামনার বাসনার গুরুভার নিয়া
পারি না পারি না আর পথ চলিবারে —
ছুটিয়া এসেছি তাই তোমারি দুয়ারে।

সর্বাঙ্গ কর্দমে লিপ্ত, বসন মলিন,
অন্তর কালিমা পূর্ণ, প্রাণ তৃপ্তিহীন।
তুমি ছাড়া হে জননী, তব স্নিগ্ধ ক্রোড়ে
ধূলা ঝাড়ি সযতনে কে লইবে মোরে!
কে দিবে স্নেহের স্পর্শ, মধুমাখা বাণী,
কে নিবে পলকে মুছে অন্তরের গ্লানি!
কৃপা করে শ্রীচরণে দাও-গো আশ্রয়
তোমাতে সঁপিয়া প্রাণ হই মৃত্যুঞ্জয়।

'মির'

অধ্যাপিকা শ্রীমতী বেলা দত্তগুপ্ত

শব্দব্রহ্ম কথাটা শুনেছি
যেহেতু ভারতের আলোতে,
হাওয়ায়, ঐতিহ্যে,
আমার জন্ম, জীবন।
উপলব্ধির কথা মনে হয়নি,
কারণ, জেনেছিলাম
লোকাতীত বিভূতির প্রসাদ বিনা
উপলব্ধি নৈব নৈব চ।
তবু উপলব্ধি হ'ল,
লোকাতীত নয় লোকায়তে আশ্রিত
মানুষের ছোট্ট একটি কথায়,
'মির'-এ ;
'মির' বুঝি মীড়ের মূর্চ্ছনা পেয়েছে
রুশ-এ।
মির—গ্রাম ; মির—পৃথিবী ; মির—শান্তি।
এ যেন সুরের লোকায়ত হতে লোকাতীতে গতি !
এ যেন আশ্চর্য এক আলোক-বিন্দু
নিয়ত তার আলোর বৃত্ত ছড়িয়ে, বাড়িয়ে,
শেষে,
মেশে যেখানে দিগন্ত আকাশে লীন ;
যেখানে,
মাটিতে, মানুষে,
পশু, লতা পাতায়, উদ্ভিদে,
জীবনের উদ্ভাস
শান্তিরই উদ্ভাস হয়ে ওঠে।

সূর্য-প্রণাম

শ্রীমতী সুজাতা প্রিয়ংবদা

প্রশান্ত সাগর সম সুনীল আকাশ,
কেঁপে উঠে
হিমকণা-স্নাত দূর্বাদল,
অঙ্গন-উদ্যান প্রান্তে
পাপড়ি মেলিছে
শেফালিকার প্রবালনিন্দী কলি,
খেলে ওঠে পাপড়ির গায়ে তার
প্রভাতী কিরণের হাস্য-বন্যা ···

*

প্রকাশিছে উষার আলোক।

*

আমি প্রণাম করলাম,
নিরঞ্জনার নীরাঞ্জলিতে অর্চনা করলাম
প্রভাতের সৌম্য সূর্যকে।
অর্পিলাম অঞ্জলিভরা পুষ্পরাশি
সেই শূন্য পথের উদ্দেশে ···
আনন্দের জ্যোতিধারা
প্রতিনিত্য আসে যেই পথে
অবারিত অব্যক্ত আভার
সূক্ষ্ম দেহ ধরে।

*

নিরঞ্জনার তীরে দাঁড়িয়ে
আমি বার বার প্রণাম করলাম
সেই জবাকুসুমপ্রভ
কাশ্যপেয় মহাদ্যুতিকে।

শ্রীশ্রীসারদামণি-চর্চা

শ্রীমতী সুচরিতা সেনগুপ্তা

সংসারপথে চলতে চলতে মানুষ যখন নিজেকে অসহায় আর বড় দুর্বল মনে করে, তখনই খোঁজে প্রকৃত বন্ধুকে। ঈশ্বরের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়। প্রয়োজন বোধ করে সুহৃদের সাহায্য, সাহচর্য। দৈনন্দিন জীবনে বহু বিপদ বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হয়ে মূঢ় অজ্ঞ নাস্তিক ভ্রমাতুর মানুষের সুস্থ স্বাভাবিক বুদ্ধি ও চেতনা থাকে না। পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে চিন্তা পর্যন্ত করে না এমন অধম মানুষের সংখ্যাই পৃথিবীতে বেশী। এদের নারকীয় ক্রিয়াকলাপে ঈশ্বরের শান্ত সুন্দর সুশৃঙ্খল সৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটেছে বার বার। আর তখনই হয়েছে যুগে যুগে অবতাররূপে ঈশ্বরের আবির্ভাব। পরিত্রাণ পেয়েছে সংসারের ত্রিতাপে জর্জরিত মনুষ্যকুল। ইদানীং কালে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা সারদামণি— এই যুগ্মরূপে মায়াধীশ সগুণব্রহ্মের অবতরণ ঘটেছে আমাদেরই এই বাংলার বুকে।

সারদামায়ের আনুষ্ঠানিক পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। তাঁর মত মহীয়সী রমণী এ জগতে দুর্লভ। তাঁর সমগ্র জীবনখানি যেন স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত একটি অপরূপ পুষ্পমালিকা। বিচিত্রবর্ণাঢ্য অতি পবিত্র সেই মালাটি! তার সৌরভে মানুষ ধন্য হয়, কৃতার্থ হয়। মাতৃচরণে আত্মসমর্পণের আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা জাগে, অধ্যাত্মজগতের অনুসন্ধিৎসা উদ্রিক্ত হয়।

মা ছিলেন সাধারণ গৃহস্থকন্যা। শ্বশুরকুলও সাধারণ। আক্ষরিক বিদ্যায় অনভ্যস্তা হয়েও তিনি 'সাক্ষাৎ প্রজ্ঞা' 'জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী'। নিবেদিতার ভাষায় 'মহাশান্তিরূপিণী মহানুভব রমণী।... তাঁর অজস্র করুণা ও প্রেম, নিষ্ঠা ও ঔদার্য.. আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা ও বিশ্বৈক্যবোধ।'

ভোগময় সংসারে তপশ্চর্যার চেতনা সাধারণ মানুষের ধারণা ও আয়ত্তের বাইরে। অপরের কল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থ ত্যাগ প্রেম সেবাভাব শুধু মহামহিমান্বিত চরিত্রের পক্ষেই সম্ভব।

পরমপুরুষের অভূতপূর্ব সাধনযজ্ঞের তিনি ছিলেন শক্তিরূপা নেপথ্যসাধিকা। স্বামীর সান্নিধ্যে থেকেও তাঁর ব্রহ্মচর্যব্রতে পরম সহায়িকা। সেবারতা সাধ্বী পতিব্রতা নিরুপমা সহধর্মিণী। ব্রহ্মচারিণী সারদা অদ্বৈতস্বরূপকে দর্শন করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে। 'আবিরাবির্ম এধি'। হে সর্বব্যাপী পরমাত্মন! লোকচক্ষুর অন্তরালে তুমি আমার অন্তরে বিরাজ করছো। তুমি আমি অভিন্ন। সুতরাং এসো। আলো দাও। আমাকে সম্পূর্ণ কর -এই ছিল নিষ্কাম নিষ্ঠাবতী সারদার প্রার্থনা। "তিনি সাত্ত্বিক প্রকৃতির নারী না হইলে রামকৃষ্ণও রামকৃষ্ণ হইতে পারিতেন কিনা; সে বিষয়েও সন্দেহ করিবার কারণ আছে।"— মন্তব্য করেছেন মনীষী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

নীরব নিভৃত নহবতের ছোট্ট ঘরখানিতে নিঃসঙ্গ সারদামণি থাকতেন পরম নিশ্চিন্ত, চিরতৃপ্ত। ধ্যান-জপ পূজা-প্রার্থনায় সময় কোনদিক দিয়ে কেটে যেতো টের পেতেন না তিনি। দূর থেকে ভেসে আসতো রামকৃষ্ণ কণ্ঠের নামগান স্তবস্তুতি। তিনি তা' মন প্রাণ ভরে শ্রবণ করতেন, গলবস্ত্র হয়ে নিশ্চল প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে থাকতেন।—

'সব সমর্পিয়া প্রাণ মন লৈয়া / নিশ্চয় হইনু দাসী'—এই ছিল তাঁর অন্তরের ভাব। বলেছেন: দক্ষিণেশ্বরের ন'বত দেখেছো?

সেখানে থাকতুম।... কত মেয়েরা দেখতে আসতেন। দরজায় বাইরে থেকেই দুঃখ করে বলতেন, 'আহা! কি ঘরেই আমাদের সতীলক্ষ্মী রয়েছে গো! যেন বনবাস।' কিন্তু নহবতখানার সেই ছোট্ট ঘরটিই ছিল তাঁর তপস্যার পুণ্যপীঠ। রাত্রি তিনটার পর সকলের অলক্ষ্যে নীরবে নিঃশব্দে স্নানাদি সেরে জপ পূজা ধ্যানে বিভোর থাকতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নহবতের খুপরির ভিতর দিয়ে চেয়ে থাকতেন। দেখতেন ঠাকুরকে। শুনতেন নামগান। প্রাণমন ভরে উপভোগ করতেন স্বামীর ক্রিয়াকলাপ। দিনরাত লোক আসছে আর ভগবানের কথা হচ্ছে। অবিদিত আনন্দে তাঁর মন তখন ভরপুর! জ্যোৎস্নারাতে গঙ্গার ভিতর স্থির জলে চাঁদ দেখে ভগবানের কাছে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করতেন— 'চাঁদেও কলঙ্ক আছে, আমার মনে যেন কোন দাগ না থাকে।'

যিনি শিবগৃহিণী দুর্গা, তিনিই শ্রীরামের সীতা, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধা, শ্রীচৈতন্যের বিষ্ণুপ্রিয়া তিনি, শ্রীরামকৃষ্ণের তিনিই সারদা। পরিণীতার মধ্যে পরমপুরুষ শুধু জগন্মাতাকেই দেখেছেন। তাঁকে ষোড়শীপূজাও করেছেন।

নিঃস্বার্থ নিবিড় প্রেম মানুষকে অপার্থিব অনুভূতিতে অভিসিঞ্চিত করে। সেখানে অতৃপ্তি অপূর্ণতা দুঃখ বিক্ষোভ থাকে না। স্বামীর প্রতি সারদার প্রেম অপ্রমত্ত, পরিশুদ্ধ।

'আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী।
তার সাথে প্রভু মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি।'

স্বামীর অপার্থিব প্রেমের অমৃতময় স্পর্শে সারদামণি পরমপ্রাপ্তিতে চিরপরিতৃপ্ত। ঠাকুর কোনদিন তাঁর মনে কোনরকম দুঃখ কষ্ট বা ব্যথা দেননি। ফুলের ঘাটি পর্যন্ত লাগতে দেননি কখনো। ভুলক্রমে একদিন তাঁকে ভাইঝি মনে ক'রে 'তুই' ব'লে ফেলে শেষে কি অনুতাপ, কি দুঃখ! এ হেন স্বামীর দিব্যসঙ্গ ও নিঃস্বার্থ আদরযত্ন লাভে অনির্বচনীয় আনন্দে সদা উল্লসিত ছিল সারদামণির অন্তর। হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত ছিল, সর্বদাই এরূপ অনুভব করতেন।

স্বামীর দিব্যপ্রেম "তাঁহাকে চপলা না করিয়া শান্তস্বভাবা করিয়াছিল... এবং অন্তর হইতে সর্বপ্রকার অভাববোধ তিরোহিত করিয়া মানব-সাধারণের দুঃখকষ্টের সহিত অনন্ত সমবেদনাসম্পন্না করিয়া ক্রমে তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রতিমায় পরিণত করিয়াছিল।" শয়নে স্বপনে নিদ্রায় ও জাগরণে শ্রীশ্রীঠাকুর ছাড়া সারদার দ্বিতীয় চিন্তা ছিল না। স্বামীর উপদেশ ও শিক্ষাই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান।

দেবসেবা, স্বামিসেবা, ভক্ত আশ্রিত শরণাগত সন্তানগণের কল্যাণের জন্য তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেছেন। নানাস্থান থেকে ভক্তগণ আসতেন মাকে দর্শন করতে, প্রণাম করতে। মা কল্যাণ-স্মিতহাস্যে তাঁদের আশীর্বাদ করতেন— করতেন সস্নেহ সম্ভাষণে পরিতৃপ্ত।

বিরাট চৈতন্যসত্তায় শ্রীশ্রীমা ছিলেন চির-প্রতিষ্ঠিতা। শত শত সন্তানের জননী সারদামণি অন্তর্যামিনীর মতো তাদের ব্যথা-বেদনা আকাঙ্ক্ষা-আস্পৃহা অনুভব করে প্রয়োজনমত ব্যবস্থা করতেন। কৃপাধন্য হ'ত অসংখ্য স্ত্রীপুরুষ। 'বাপের চেয়ে মা দয়াল! বাপের চেয়ে মা দয়াল!'— বলতেন শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য সাধু নাগমহাশয়।

'যত্র জীব তত্র শিব' পরমপুরুষের এই মহামন্ত্র সারদার মনে অনুরণিত হ'ত সর্বক্ষণ। ঠাকুর বলেছিলেন: সংসার-ভরা অগুণতি ছেলেমেয়ে তোমার, সকলকে দেখবে, সেবা করবে। সারদা দুরূহ এই কর্তব্যভার গ্রহণ করেছিলেন সানন্দে। তাঁর কাছে এসেছে ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ পাপী

পুণ্যবান সকল সন্তান। তারা বলেছে 'মনে বড় জ্বালা, দূর করে দাও!' 'নির্বাণের পথ কি?' 'ব্রহ্মচর্যে মনস্থির হয় না কেন?' 'রোগ শোক থেকে রেহাই দাও মা!'— কত আকুতি, মিনতি, আবেদন নিবেদন। আবার দুরন্ত দুষ্ট ছেলেমেয়ে অন্যায় এবং রূঢ় ব্যবহারও করেছে। কিন্তু, 'কুপুত্র যদিও হয় কুমাতা কখনো নয়'। মা সর্বংসহা — সব সহ্য করেছেন। 'ক্ষমারূপা তপস্বিনী'।

সারদা-মা গুণাগুণ বিচার করে অনুগ্রহ করেননি। দুলে বাগদীর মনের দুঃখ দূর করে দিয়েছেন মিষ্ট সম্ভাষণে, আহার্য দিয়ে; 'আমার হৃদয়ে যিনি, দুলে বাগদী ডোমের মাঝেও তিনি।'

সারদা-মা অভয়া! দস্যুতস্করও তাঁর পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়েছে, কৃপাভিক্ষা করেছে। সকলকেই মা অভয় দিয়েছেন।

মা বলেছেন: যদি শান্তি চাও, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো। কেউ পর নয়— জগৎ তোমার। এই তাঁর শেষ বাণী—চরম ও পরম বাণী।

পবিত্র প্রদীপ-শিখাটির মত সারদামায়ের জীবন অপরকে আলোদান করে গেছে অবিরত। তাঁর তনুমন উৎসর্গিত হয়েছে সকলের সেবায়।

সারদা-মা অদ্বিতীয়া। কন্যারূপে জায়ারূপে গুরুরূপে সর্বরূপেই তিনি অনন্যা। তাঁর জীবন স্বামীর জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। তিনি ছিলেন পরমপুরুষের প্রতিচ্ছায়া, প্রতিনিধি! বিবেকানন্দ তাঁকে বলেছেন 'জ্যান্ত দুর্গা'।

মানবসেবাই ঈশ্বরোপাসনা

শ্রী এন. এন. ওয়াঞ্চু

ত্রিবান্দ্রম রামকৃষ্ণ আশ্রম দাতব্য চিকিৎসালয়ের নব-নির্মিত ভবনটির দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে আপনারা আমাকে যে পৌরোহিত্য করার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তার জন্য আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ। এই বাড়িটিতে বাইরের রোগীদের জন্য ডিস্পেনসরি ও বিভিন্ন ক্লিনিকের স্থান হওয়াতে সেবার নব সুযোগ হ'ল। আমিও বিশেষভাবে পরিতুষ্ট যে, এই শুভ অনুষ্ঠানে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের এখানে উপস্থিত থাকা সম্ভব হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন বিগত আশি বৎসর যাবৎ আমাদের অভাবগ্রস্ত ভাইবোনদের জন্য যে স্বার্থশূন্য সেবাকার্য করে এসেছে, আজকের দিনে এই সময়ে তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আমি অনাবশ্যক মনে করি। 'মানবসেবাই ঈশ্বরোপাসনা'- পরমহংসদেবের এই ভাবটিকে আদর্শরূপে বরণ করে মিশন তাকে বাস্তবে রূপ দিয়ে চলেছে। স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণা— যা এই মহান্ মিশনকে স্থাপিত করেছিল, তা এখনও এর কার্যাবলীকে পরিচালিত করছে ও মিশনের কর্মীদের পথকে আলোকিত করছে। এ-কথা স্মরণ করা উৎসাহোদ্দীপক যে, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ সমাজসেবা শুরু হয় ১৮৯৮ সালে বাংলায় প্লেগ নিবারণ অভিযানের মাধ্যমে। দুঃস্থ মানবসেবার যে ঐতিহ্যের তখন সূত্রপাত, বৎসরের পর বৎসর ধরে তা দৃঢ়তা লাভ করেছে আর এর ফলে, রামকৃষ্ণ মিশন দেশবাসীর হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও প্রীতির এক অনুপম স্থান অধিকার করেছে।

এ-কথা যে-কেউ সঙ্গতভাবেই জিজ্ঞেস করতে পারেন—রামকৃষ্ণ মিশন জাতীয় জীবনে যে-প্রভাব

বিস্তার করেছে তা' আর আর অনেক প্রতিষ্ঠান পারেনি কেন— রামকৃষ্ণ মিশনের এই আশ্চর্য সাফল্যের কারণ কি? আমার বিবেচনায় এই প্রশ্নের তিনটি উত্তর আছে। প্রথমতঃ, ঈশ্বরাদিষ্ট প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদত্ত দিব্যপ্রেরণা এবং 'সেবাই পূজা'— এই নীতিবাক্য। দ্বিতীয়তঃ মিশনের সদস্যদের একদিকে ধ্যানভিত্তিক আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ও অন্যদিকে সামাজিক কল্যাণকর কর্ম এই উভয়ের, অনন্যসাধারণ সম্মিলন। তৃতীয়তঃ এবং যা আরো বেশী উল্লেখযোগ্য তা' হ'ল এই যে, যদিও সামাজিক কল্যাণপ্রদ-কর্মে নিরত থাকায় মিশন ও তার সদস্যগণকে জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতে হয়েছে, তবু মিশন বরাবরই রাজনৈতিক ব্যাপারে অসংশ্লিষ্ট থেকেছে। এমন কি গত ২৫ বৎসর ধরে যখন দেশময় প্রবল রাজনীতিক উত্তেজনা চলেছে, তখনও রাজনীতিতে জড়িয়ে না পড়ে অনন্যসাধারণভাবে দূরে সরে থাকা— আমার বিবেচনায় মিশনের সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম।

বর্তমান যুগের বিশৃঙ্খল জীবনযাত্রার মধ্যে রাজনীতিতে জড়িয়ে না পড়ে সমাজকল্যাণমূলক কাজ করা রামকৃষ্ণ মিশনের সদস্যদের চরিত্রবলের শ্লাঘনীয় অভিজ্ঞান এবং আমার মনে হয়, এই চারিত্রিক দৃঢ়তার আদি উৎস হচ্ছে এই ভাবান্দোলনের ধ্যান- ও সেবন-রূপ মৌলিক বৈশিষ্ট্য। হাসপাতাল, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, গ্রন্থাগারাদি নিয়ে মিশন স্পষ্টতই বৈষয়িক ব্যাপারে জড়িত; তবু আমি আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, মিশন জেনেছে কি ভাবে তার পরিকল্পনাগুলির জন্য সাহায্য গ্রহণ করতে হয়—সাহায্যদানকারীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসমূহের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে।

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রদত্ত আদর্শের যথার্থ অনুগামী হয়ে অনুরাগের সঙ্গে মিশন যে অসাধারণ জনহিতকর কার্যাবলী করে চলেছে, তার প্রতি এই অবসরে আমি সর্বজনসমক্ষে আমার অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। সুতরাং আজকের এই অনুষ্ঠানের সংগে সংযুক্ত থাকতে পারা আমার পক্ষে আনন্দের বিষয়। আজকের এই অনুষ্ঠান আমাদের ভাই-বোনদের জন্য মিশনের সমাজসেবারূপ কার্যাবলীর পরিবিবিস্তারের প্রধাসপথে আরেকটি পদক্ষেপ।

বর্তমান সঙ্কিক্ষণে আমাদের দেশ নানাবিধ সঙ্কটের সম্মুখীন— অর্থনৈতিক সঙ্কট, চারিত্রিক সঙ্কট ও বিশ্বাসের সঙ্কট। আমার মনে হয় আমি যখন এই কথাগুলি বলছি, তখন আজকাল প্রত্যেকেই যা বলে তারই পুনরাবৃত্তি করছি। এই পরিস্থিতিতে রামকৃষ্ণ মিশন তার মহান আদর্শ, তার ধর্ম ও মানবসেবার সমন্বয়ের বাণী এবং স্বল্পসংখ্যক উৎসর্গীকৃত কর্মীদের নিয়ে অন্ধকারে প্রদীপ্ত আলোকের মত ভাস্বর হয়ে বর্তমান।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট, পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ এই হাসপাতালের বহির্বিভাগের যে নূতন ভবনটির দ্বারোদ্ঘাটন করবেন, তা' বেশ প্রশস্ত এবং পুরানো বাড়ীটি যে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক ছোট হয়ে পড়েছে, এই ঘটনাই প্রমাণ করছে যে, এই হাসপাতাল চারপাশের লোকদের যে-সেবা করছে, সেই সেবার সকৃতজ্ঞ ও সপ্রশংস স্বীকৃতি তাঁরা দিয়েছেন। এই হাসপাতালটি ১৯৩৮ সালে স্বর্গত রাও বাহাদুর ডাঃ কে. রামন থাম্পী শুরু করেন ছোট্ট একটি ডিস্পেনসরি হিসাবে। গত ৩৫ বৎসরে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে পরিণত হয়েছে মূলতঃ স্বামী তপস্যানন্দজীর সাংগঠনিক দক্ষতা ও আগ্রহপূর্ণ প্রচেষ্টার ফলে— তিনি ৩০ বৎসরেরও উর্ধ্বকাল রামকৃষ্ণ মিশনের ত্রিবান্দ্রম কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ছিলেন।

রোগীরা এই হাসপাতালে বর্তমানে যে বহুবিধ সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এখানে যে নার্সিং ও ধাত্রীবিদ্যার একটি শিক্ষা-কেন্দ্রও আছে, যেখানে ছাত্রীরা ঐ শিক্ষাও লাভ করছে এবং এই কেন্দ্রটি যে সরকারের স্বীকৃতি লাভ করেছে এতে আমি আনন্দিত। আমি মনে করি, আজকের ঘটনা রামকৃষ্ণ মিশন জনগণের যে-সেবা করছে তার সম্প্রসারণের আরেকটি দিকের স্বাক্ষর এবং যদি আরো অর্থ-সাহায্য আসে- আর তা আসবেই— তাহলে মিশনের লোকহিতকর কার্যাবলীর পরিধির অধিকতর সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা সফল হবে। আর এও এক মহানন্দের বিষয় যে, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট, পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ অনুগ্রহ করে এই ভবনটির উদ্বোধন করতে সম্মত হয়েছেন। এটি এই হাসপাতালের ভবিষ্যৎ সাফল্য ও উপযোগিতার একটি শুভ সূচক।*

* ৪ঠা জুন ১৯৭৪, ত্রিবান্দ্রম রামকৃষ্ণ আশ্রম হাসপাতালের সংযুক্ত নূতন ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠানে সভাপতি, কেরালার রাজ্যপালের অভিভাষণ। 'বেদান্ত কেশরী'র অগস্ট ১৯৭৪ সংখ্যা হইতে অনূদিত।—সং

জীবন ও কর্ম

শ্রীসুনীল কুমার দত্ত

শহর গ্রাম পর্বত নদী সমুদ্রে ভরা এই পুরাতন পৃথিবীতে মানুষ শরীর পরিগ্রহ করিয়া আসিতেছে, আবার কিছু দিন এই পৃথিবীতে বাস করিয়া পার্থিব শরীর ত্যাগ করিয়া বিদায় লইতেছে। এই শরীর পরিগ্রহ করার নামই জন্ম আর এই পার্থিব শরীর ত্যাগ করার নামই মৃত্যু, আর জন্মক্ষণ হইতে মৃত্যু পর্যন্ত যে কয়টি দিন আমরা পৃথিবীতে থাকি তাহাই আমাদের জীবন। অর্থাৎ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত যে সময়টুকু আমরা এই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকি সে সময়টুকুই আমাদের জীবনের সময়ের সীমারেখা। তবে এই সীমারেখা অতিক্রম করার অর্থ সব কিছুর পরিসমাপ্তি নয়, ঈশ্বরের সৃষ্টি হইতে একেবারে মুছিয়া যাওয়া নয়। গীতার অভয়বাণী আমরা শুনিতে পাই :

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

—যেমন দেহীর (আত্মার) এই দেহে কৌমার, যৌবন ও জরা ক্রমে উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহাতে দেহীর কোনও পরিবর্তন হয় না, সেইরূপ দেহান্তর-প্রাপ্তিতে (মৃত্যুতে) দেহী অবিকৃত থাকেন, মৃত্যু দৈহিক পরিবর্তন মাত্র— একটি অবস্থাবিশেষ মাত্র। এই জন্য দেহান্তরপ্রাপ্তি-বিষয়ে ধীর পুরুষগণ (জ্ঞানিগণ) মোহগ্রস্ত হন না। তাই মৃত্যুর কথা শুনিয়া বা চিন্তা করিয়া আমাদের ভীত বা উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নহে।

"কর্ম শব্দটি সংস্কৃত 'কৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, কৃ ধাতুর অর্থ করা; যাহা কিছু করা হয় তাহাই কর্ম।"

জীবনধারণ করিতে গেলে আমাদের কিছু না কিছু কর্ম করিতে হয়। কর্মকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়া আমরা এক মুহূর্তও বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। শারীরিক হউক বা মানসিক হউক, কিছু না কিছু কর্ম আমরা সর্বদা করিতেছি। আমাদের জীবনের সঙ্গে কর্ম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এখন

দেখিতে হইবে কর্মের মূলে কি আছে এবং কি কারণেই বা আমাদের দ্বারা কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আমাদের কর্মের মূলে রহিয়াছে প্রকৃতির ত্রিগুণ। ত্রিগুণের বশবর্তী হইয়াই আমরা কর্ম করিয়া থাকি। গীতায় একটি শ্লোকে ইহা পরিষ্কারভাবে বলা আছে :

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥"

—প্রকৃতির গুণত্রয় সমস্ত কর্মানুষ্ঠানের মূল। অহংকার দ্বারা যাঁহার চিত্ত বিমূঢ় হইয়াছে, তিনি মনে করেন, 'আমিই কর্মের অনুষ্ঠান করিতেছি'। প্রকৃতির ত্রিগুণ যাহা আমাদের সমস্ত কর্মের মূল তাহা হইতেছে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ। সত্ত্ব আমাদের মধ্যে আনে সমতা, রজঃ আনে ক্রিয়াশীলতা আর তমঃ আনে নিষ্ক্রিয়তা বা জড়তা। শ্রীঅরবিন্দ এই ত্রিগুণের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন :

"সত্ত্ব সাম্যের শক্তি ; তার প্রকাশ হয় শুভ ও সামঞ্জস্য ও সুখ ও আলোর গুণে; রজঃ গতির শক্তি আর তার প্রকাশ হয় সংঘর্ষ ও প্রচেষ্টা, উচ্চণ্ড ভাবাবেগ ও ক্রিয়ায় গুণে, তমঃ নিশ্চেতনা ও স্থিতির শক্তি আর তার প্রকাশ হয় অন্ধকার ও অসামর্থ্য ও নিষ্ক্রিয়তায় গুণে।" (যোগসমন্বয়, পূর্বার্ধ, পৃঃ ২১৮)।

আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এই ত্রিগুণ বর্তমান রহিয়াছে। যখন যে গুণটি আমাদের মধ্যে প্রবল হয় তখন আমরা সেই গুণ অনুযায়ী কর্ম করিতে বাধ্য হই। সাত্ত্বিক গুণের বশবর্তী হইয়া কখনও বা আমরা খুব উচ্চ ভাব ও সমতার নীতি গ্রহণ করিয়া কর্ম করিতে সক্ষম হই, আবার কখনও রাজসিক গুণের অধীন হইয়া কর্মফলের প্রতি আসক্ত হইয়া প্রচণ্ড ভাবাবেগের সহিত অত্যধিক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লইয়া কর্ম করিয়া থাকি; আবার যখন আমাদের মধ্যে তামসিক গুণের প্রাবল্য আসে তখন আমরা অলস ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ি এবং তখন কোন কাজই আমাদের দ্বারা সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না।

ইহাই হইল কর্মের সাধারণ রূপ; কিন্তু কর্মের ফললাভের জন্য যে কর্ম আমরা করি তাহা যতই সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হউক না কেন, তাহা কর্মের আদর্শ হইতে পারে না। কারণ ইহাতে কর্মফলের প্রতি আসক্তি থাকার দরুণ আমরা নিজেদের বদ্ধ করিয়া ফেলি এবং বন্ধন কখনই আমাদের জীবনের আদর্শ বা চরম লক্ষ্য হইতে পারে না। আসক্তি চিরদিনই দুঃখ আনয়ন করিয়া থাকে, আসক্তির দ্বারা কখনই দিব্য আনন্দ লাভ করা যায় না। তাই গীতাতে বার বার নিষ্কাম কর্মের কথা বলা হইয়াছে।

কর্মের ফলের প্রত্যাশা করিয়া কর্ম করিলে আমরা চিরদিনই দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিব, কখনই আমরা স্বাধীনভাবে কর্ম করিতে সক্ষম হইব না। দান ধ্যান তপস্যা পূজা যত সৎ কাজই আমরা করি না কেন, যদি নামযশের জন্য করি তবে তাহা মুক্তির কর্ম হইল না। কারণ নামযশের প্রতি আসক্তি থাকার দরুণ আমরা নিজেদের বদ্ধ করিয়া ফেলিলাম। স্মরণীয় স্বামী বিবেকানন্দের বাণী :

'কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষাই আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতিবন্ধক ; শুধু তাই নয়, পরিণামে উহা দুঃখের কারণ হয়। আর এক উপায় আছে, যাহা দ্বারা এই দয়া ও নিঃস্বার্থপরতা কার্যে পরিণত করা যাইতে পারে ; যদি আমরা সগুণ ব্যক্তি-ভাবাপন্ন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি তবে কর্মকে 'উপাসনা' বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে।'

স্বামীজী যাহা বলিয়াছেন তাহার নিষ্কর্ষ এই যে, সর্বপ্রথমে আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে আসক্তির মূলে কি আছে— আসক্তির উৎস কোথায়। আমাদের আসক্তির মূলে রহিয়াছে আমাদের 'অহংকার' ও 'মমকার' অর্থাৎ 'আমি' ও

'আমার' বুদ্ধি। এই দুইটি আমাদের সর্বপ্রকার আসক্তির উৎস। আমার কর্ম, আমি কর্মের কর্তা, আমার আত্মীয়স্বজন,— এই আমিত্ব-বোধই আমাদের বন্ধনের মূল কারণ। নিষ্কাম হইতে গেলে, আসক্তিশূন্য ভাব আনিতে গেলে কর্তৃত্বাভিমান সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে। এই কর্তৃত্বাভিমান সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইলে সকল কর্মকে 'উপাসনা' রূপে বুঝিতে হইবে, আর নিজেকে ভগবানের যন্ত্ররূপে জানিতে হইবে। অর্থাৎ পরমপুরুষ বিশ্ববিধাতার চরণে কর্ম, কর্মফল সবই উৎসর্গ করিতে হইবে এবং তাঁহার নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। আমি কেহই নই, আমার বলিয়া কিছুই নাই, সবই তাঁহারই—এইরূপ ভাব যখনই আমরা নিজেদের মধ্যে বদ্ধমূল করিতে পারিব, তখনই আমাদের 'অহংকার' ও 'মমকার' আপনাআপনি ক্ষীণ হইয়া বিলীন হইয়া যাইবে। আর যে মুহূর্তে আমরা ঐ দুই শত্রুকে জয় করিতে পারিব সেই মুহূর্তে বন্ধনের শৃঙ্খল আপনা হইতে খসিয়া পড়িবে এবং তখনই আমরা মানবজীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিব। অবশ্য ইহা বলা যত সহজ, প্রকৃতপক্ষে কাযে পরিণত করা তত সহজ নহে। খুবই কঠিন। কিন্তু ধৈর্য ধারণ পূবক অভ্যাসের দ্বারা আমরা নিশ্চয়ই ইহা করিতে পারি। পুনরায় স্মরণ করি স্বামীজীর বাণী:

'অভ্যাসই সিদ্ধির সমগ্র রহস্য। প্রথমে শ্রবণ, তারপর মনন, তারপর অভ্যাস - প্রত্যেক যোগ সম্বন্ধে ইহা সত্য।'

জগতে কোন কর্মই ছোট নয়। সব কর্মই সমান মহত্ত্বপূর্ণ। যে কোন একটি কর্ম বদ্ধ হইলে অন্য কর্মেতে তাহার প্রভাব পড়িতে পারে, এমন কি অন্য নৈক কর্ম অচল হইয়া যাইতে পারে। এইজন্য কোন কাজকেই আমাদের ঘৃণা করা উচিত নয়। ছোট বড় যে-কোন কর্ম আমরা করি না কেন, আমাদের সর্বদাই সচেষ্ট থাকিতে হইবে, যেন আমরা কায়মনোবাক্যে শুধুমাত্র উপাসনা-বুদ্ধিতে কর্মটি করিতেছি, কর্মফলের প্রতি আমাদের বিন্দুমাত্রও আকাঙ্ক্ষা নাই। তবেই আমাদের কর্ম সর্বাঙ্গীণ সুন্দর হইবে। তাহা হইলেই আমরা আশা-নৈরাশ্য, জয়-পরাজয়, সফলতা ও বিফলতা—এই সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইব, স্বাধীন হইব আর আমাদের কোন রিপুই আমাদিগকে প্রবৃত্তির ক্রীতদাস করিতে পারিবে না। ইহাই নিষ্কাম কর্মের রহস্য, ইহাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দের বজ্রোচ্চারিত দিব্য আহ্বান-বাণী জীবনের 'শত শত দুঃখ-দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে' আমাদের চির পাথেয় হউক: 'এস, আমরা কেবল কাজ করিয়া যাই। যে কোন কর্তব্য আসুক না কেন, তাহা যেন আমরা সাগ্রহে করিয়া যাইতে পারি— সর্বদাই যেন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রস্তুত থাকিতে পারি। তবে আমরা নিশ্চয়ই আলোক দেখিতে পাইব।'

সমালোচনা

বেদান্তের আলোকে খ্রীস্টের শৈলোপদেশ: স্বামী প্রভবানন্দ। অনুবাদক স্বামী চেতনানন্দ। উদ্বোধন কার্যালয় (১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০০০৩) হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৮২+১৬; মূল্য: সাধারণ সংস্করণ চার টাকা এবং শোভন সংস্করণ ছয় টাকা।

অবতার বা আচার্য প্রদত্ত শিক্ষা সাধারণত দু'রকমের হয় — সাধারণ মানুষের জন্যে এক রকম এবং একান্ত প্রিয় শিষ্যদের জন্যে আর এক রকম।

কারণ, সত্যের কোন গোপনীয়তা না থাকলেও অর্থী অথবা শ্রোতাদের অনুভূতি অভিন্ন নয়—প্রয়োজনবোধও এক নয়। শৈলোপদেশ বা Sermon on the Mount খ্রীষ্টের অন্তরঙ্গ শিষ্যদের জন্যে। এই জন্যেই বোধ হয় শৈলোপদেশ Lord's Prayer-এর মতো মোটেই জনপ্রিয় নয়। জনপ্রিয় না হবার আর একটি কারণ হ'লো, বাইবেল-ব্যাখ্যাতারা শৈলোপদেশের জনপ্রিয় ব্যাখ্যার প্রচেষ্টাই করেননি। এঁদের অনেকে আবার শৈলোপদেশকে বাইবেলে প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে করেছেন। অথচ স্বামী বিবেকানন্দের মতে, শৈলোপদেশ উপলব্ধি না করে খ্রীষ্টভক্ত হওয়াই যায় না।

এই উপলব্ধির সহায়তার উদ্দেশ্যেই স্বামী প্রভবানন্দ শৈলোপদেশ ব্যাখ্যার কায শুরু করেন Vedanta And The West পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত প্রবন্ধের মাধ্যমে। পরে এই প্রবন্ধগুলো প্রথমে ক্রিস্টোফার ইশারউড সম্পাদিত Vedanta for the West সংকলন-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্তি হয় এবং তারও পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। তখন নামকরণ করা হয় Sermon on the Mount according to Vedanta। আলোচ্য গ্রন্থখানি এরই বঙ্গানুবাদ। অনূদিত গ্রন্থে 'according to Vedanta'-এর বাংলা করা হয়েছে 'বেদান্তের আলোকে'। আক্ষরিক অনুবাদ না হলেও বাংলা নামটি বেশী সূক্ষ্মতার পরিচায়ক। কিন্তু 'শৈলোপদেশ' — 'শৈলশিখরে উপদেশ' বা ঐ রকম কিছু করলে বোধ হয় আরও ভাল হ'ত। 'শৈলোপদেশ' শব্দটি কিছুটা personification-এর ধারণা বহন করে।

এখন প্রশ্ন, 'বেদান্তের আলোকে (অথবা 'বেদান্তের অনুসরণে') শৈলোপদেশ'— এই রকম নামকরণের তাৎপর্য কি? বেদান্তের ন্যূনতম প্রতিপাদ্য বিষয়গুলো স্মরণ করলেই তাৎপর্য সহজেই অনুধাবন করা যাবে—যথা, (ক) মূলতঃ মানুষ দৈবী প্রকৃতির, (খ) মানবজীবনের লক্ষ্য হ'লো এই মৌল প্রকৃতিকে উপলব্ধি করা, এবং (গ) চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সকল ধর্মই এক। অতএব, যে কোন ধর্মকে অবলম্বন করেই মানুষ তার দৈবী প্রকৃতিকে উপলব্ধি করতে পারে। তবে সকলের পক্ষে তা সম্ভব নয়, সম্ভব মাত্র পবিত্রাত্মাদের পক্ষে। সুতরাং তাঁরাই ধন্য! কি করে আত্মাকে পবিত্র করে তুলতে হয় 'শৈলোপদেশ' তারই পথনির্দেশ। স্বভাবতই এ পথ বিশেষ কঠিন—ক্ষুরের ধারের মত - সকলের জন্যে পাকা সড়ক এ নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে যিশুখ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের নির্জন শৈলশিখরে নিয়ে গিয়ে কেন বিশেষ উপদেশ দেবেন তা সহজেই বোঝা যায়।

এই রকম বিশেষ উপদেশের ক্ষেত্রে সকল ধর্মই এক। ফলে হিন্দু সত্যদ্রষ্টাদের বাণীর সঙ্গে যিশুখ্রীষ্টের বাণীর যে তাৎপর্যগত সঙ্গতি দেখা পাওয়া যাবে তাতে আর আশ্চর্য কি? 'বেদান্তের আলোকে খ্রীস্টের শৈলোপদেশ'-এ স্বামী প্রভবানন্দ এই সঙ্গতিকেই সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এর ফলে তুলনামূলক ধর্মসাহিত্যে যে মাত্র একটি সার্থক সংযোজন হয়েছে তা' নয়, ধর্মীয় ঐক্যের পথও কিছুটা নির্মিত হয়েছে। ধর্মসাহিত্যের যুক্তিবাদী ও উদারনৈতিক যে কোন পাঠকই গ্রন্থখানি পাঠের পর বেদান্ত ও শৈলোপদেশ উভয়কেই নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে বাধ্য।

শৈলোপদেশে শুধু আধ্যাত্মিক উপদেশই বিতরণ করা হয়নি, সামাজিক ও নৈতিক উপদেশও প্রদান করা হয়েছে। এ জীবনেই যখন ভগবদ্-দর্শন সম্ভব তখন জীবনকে গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে বৈ কি! এবং জীবনকে গড়ে তোলার ব্যাপারে সামাজিক ও নৈতিক জীবনকে উপেক্ষা করা যায় কি করে?

এই বিষয়টি আলোকরশ্মির মধ্যে এনে প্রভবা-

নন্দজী সমাজদর্শনের ক্ষেত্রেও এক নতুন অধ্যায় সংযোজন করেছেন, বলা যায়। এই অনন্যসাধারণ পুস্তিকার বঙ্গানুবাদের আলোচনায় প্রথমেই যে বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হলো ভাষা—সর্বহৃদয়গ্রাহী ভাষা। "যিশু কহিলেন, 'হে পরিশ্রান্ত আত্মাসকল তোমরা আমার নিকট আইস। আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব'।"—বাইবেলের এই বাণেব অনুবাদ যখন পড়ি তখন তা মনে কোন দাগই কাটে না। অনেকে আবার মনে করেন যে, এ হল খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের জন্য আহ্বান। স্বভাবতই তাঁদের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে তুলনা করুন: (ক) "তুমি আমার আশা, আশ্রয় এবং আরামস্থল।··· তুমি ছাড়া এ জগতে যা কিছু দেখি সবই দুর্বল ও চঞ্চল।" (১০ পৃষ্ঠা)। (খ) "দেবতার বেদীর সম্মুখে নৈবেদ্য নিবেদন-কালে যদি তোমার মনে পড়ে যে তোমার ভাইয়ের তোমার বিরুদ্ধে কিছু বলবার আছে তবে নৈবেদ্য রেখে ভাইয়ের কাছে চলে যাও। প্রথমে ভাইয়ের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন কর এবং তারপর এসে নৈবেদ্য উৎসর্গ কর।" (২৫ পৃষ্ঠা)। (গ) "প্রেয়ের পথ অপ্রশস্ত, দ্বারও সংকীর্ণ। এ পথ শেষ হয়েছে অমরত্বে। খুব কম লোকই এ পথের সন্ধান পায়।" (১৬ পৃষ্ঠা)। আর উদাহরণ বাহুল্য মাত্র।

মোটকথা, মূলগ্রন্থের মত অনুবাদও এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলবার মত পাঠের পর অজ্ঞানান্ধকার বেশ খানিকটা দূর ত' হয়ই, মনও এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে ওঠে। এ হ'ল একত্বানুভূতির আনন্দ। এই আনন্দালোড়ন উঠলে স্পষ্টই বুঝতে পারা যাবে যিনিই কৃষ্ণ, তিনিই খ্রীষ্ট—গ্যালিলির পর্বতশিখরে এবং কুরুক্ষেত্রের পুণ্যভূমিতে উপদেশের মধ্যে পার্থক্য কিছু নেই। কারণ, ধর্মের প্রকারভেদ কোথায়? প্রকারভেদ আমাদের মনে, শুধু অনুভূতির পার্থক্য ও দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতার জন্যে।

অবশ্য দু'একটা বিষয়ে অনুবাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই: খ্রীষ্টের উপদেশাবলীর ক্ষেত্রে মূল ইংরেজী থাকলে বোধ হয় ভাল হ'ত—এটা পাদটীকাতেও দেওয়া চলত। আর সকল ক্ষেত্রে ইংরেজী গ্রন্থের ইংরেজী নামও দেওয়া হয়নি। যেমন ১০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "'খ্রীস্টের অনুসরণ' গ্রন্থে"। বন্ধনীর মধ্যে Imitation of Christ থাকলে নির্দেশ সুস্পষ্ট হ'ত।

হাইফেন ব্যবহারে সঙ্গতির কিছুটা অভাব চোখে পড়ল। যেমন, ৫০ পৃষ্ঠায় একই অনুচ্ছেদে 'ভগবৎ-কেন্দ্রিক' এবং সংযুক্তভাবে 'ভগবৎকেন্দ্রিক' উভয়ই ব্যবহার করা হয়েছে, আবার ৫৭ ও ৫৮ পৃষ্ঠায় 'দোষ-ত্রুটি' ও 'ভুলত্রুটি'—দু'রকমই আছে। একই পদ্ধতি অনুসরণ করলে বোধ হয় ভাল হ'ত। আরও জিজ্ঞাসা করা যায়: সার্বজনীন না সর্বজনীন বা সার্বজন।

এ অবশ্য সামান্য দোষত্রুটি, মোটেই ভুলত্রুটি নয়। যাই হোক, গীতা-বাইবেলের তুলনায় নয়, গীতা-বাইবেলের সঙ্গে একই ভাবে আলাদা করে রাখবার মত বই এটি। গীতাকে স্বামী বিবেকানন্দ উপনিষদের সংক্ষিপ্তসার বলে বর্ণনা করেছেন, স্বামী প্রভবানন্দ-কৃত 'বেদান্তের আলোকে খ্রীস্টের শৈলোপদেশ'-কে আমরা যদি বাইবেল বেদান্তের সংক্ষিপ্তসারের সমন্বয় বলে বর্ণনা করি, তবে বোধ হয় ভুল কিছু হয় না।

—ডক্টর শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়

ভ্রম-সংশোধন

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যার ৫১৯ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ৭ম পঙ্‌ক্তিতে এবং ৫২১ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ১২শ পঙ্‌ক্তিতে 'পিটে' স্থলে 'পিব টে' হইবে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

বেলুড় মঠে সাধু-সম্মেলন

গত ৬ই হইতে ৮ই নভেম্বর ১৯৭৪ পর্যন্ত তিন দিন ধরিয়া বেলুড় মঠে সাধু সম্মেলন হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও ভারতেতর দেশ-সমূহে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র হইতে ২০৯ জন সাধু আসিয়া সম্মেলনে যোগ দেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা

রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর সভাপতিত্বে গত ১০ই নভেম্বর ১৯৭৪, বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের ৬৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। বৈদিক মঙ্গলাচরণ, বিগত বৎসরের অধিবেশনের বিবৃতি পাঠ ও মিশনের পরলোকগত সভ্যগণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার পর মিশনের অন্যতম সহসম্পাদক স্বামী ভূতেশানন্দ মিশনের গভর্নিং বডির ১৯৭৩-৭৪ সালের প্রতিবেদন পাঠ করেন। (বিস্তৃত বিবরণ উদ্বোধনের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে)। আলোচ্য বৎসরের হিসাব পাঠ, ১৯৭৪-৭৫ সালের জন্য অডিটার (হিসাব-পরীক্ষক) নিয়োগ ও নূতন সদস্যদের নামের তালিকা পাঠ ও অনুমোদনের পর স্বামী তপস্যানন্দ, শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সভাপতি মহারাজ ভাষণ দেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীঅধীরকুমার মুখোপাধ্যায় এবং সমাপ্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীযুক্ত মৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

স্বামী তপস্যানন্দ বলেন: এই সম্মেলনে যোগ দিতে পারাকে আমি সৌভাগ্য জ্ঞান করি, কারণ এই স্থান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যপাদপীঠ, পবিত্র আবাসভূমি। তাঁরই আদর্শ অনুসারে আমরা সেবা করছি এবং এই সেবার প্রয়োজনীয়তা কোনদিন ফুরিয়ে যাবে না। বর্তমানকালে মানুষ জটিল সমস্যায় জর্জরিত। তাই সেবা করতে গিয়ে আমরাও বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। তাতেই পরিচয় ঘটছে আমাদের আদর্শের যথার্থতার। একটা জাতির জীবনের, ব্যক্তির জীবনের সম্যক্ পরিচয় আমরা তখনই পাই যখন সে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়— পরিচয় মেলে তার আদর্শানুসারী চরিত্রের বাস্তব রূপটির।

বর্তমান যুগ আমাদের সম্মুখে একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে এসে দাঁড়িয়েছে— তার বহুভঙ্গিম কাম-কাঞ্চন-সেবার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। আমরা সে-চ্যালেঞ্জকে প্রতিহত করছি, শ্রীরামকৃষ্ণদেব-প্রদর্শিত তিনটি জীবনাদর্শের দ্বারা। তিনটি মহান্ আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রে প্রকাশিত হয়েছে: ত্যাগ, উপলব্ধি ও বিশ্বপ্রেম। তাঁর জীবনে ত্যাগ, সংযম, পবিত্রতা যে-রূপ লাভ করেছে তা অভূতপূর্ব। এ-ব্যাপারে তাঁর কোন আপোষ ছিল না। গীতোক্ত নরকের দ্বার— 'কাম ক্রোধ লোভ' তাঁর জীবনে সম্পূর্ণ নির্জিত হয়েছিল। এগুলিই আজকে সমাজে প্রবল আকারে নানা রূপে দেখা দিচ্ছে।

দ্বিতীয়, তাঁর উপলব্ধি— ঈশ্বরীয় নানারূপ দর্শন, বিভিন্ন ভাবসাধনা প্রভৃতি তাঁর জীবনে অনন্যপূর্ব ঘটনারূপে পরিস্ফুট হয়েছে। এত বহুধা বৈচিত্র্য অধ্যাত্মজগতের ইতিহাসে আর দেখা যায় না। কিন্তু তাঁর অহংলেশশূন্যতা যেন সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে। অভিমানের সামান্যতম অংশও তাঁর মধ্যে ছিল না। সকলের কাছে

বিনয়ী, 'নাহং নাহং'-ভাব। বলতেন, 'আমি ঈশ্বরের দাস'— 'মায়ের সন্তান'; সর্বদা মাতৃমুখাপেক্ষী আবার 'আমি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ আত্মা'। ত্যাগ তাঁর অভিমানকে নিঃশেষে মুছে দিল তাতেই সকল উপলব্ধির দ্বার উন্মোচিত হল। বলেন তিনি: থেমো না একটু রূপ দর্শন করে বা একটা ভাবের একটু উপলব্ধিতে। এই দিব্য আনন্দধারাকে নিয়ে আরো এগোও, আরো এগোও, অবশেষে প্রতি মানুষে, প্রতি প্রাণীতে সে-দিব্য-চেতনায়, সে-একাত্মতার উপলব্ধি ঘটবে। এই তাঁর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য— বিশ্বপ্রেম। ঐ দিব্য-চেতনাতেই বিশ্বপ্রেম জাগবে। স্বামীজীকে তাই ধিক্কার দিয়েছিলেন ঠাকুর— কেবল সমাধিতে ডুবে থাকা কি!— সেই স্বরূপ সংকেতের মধ্যে দেখে সেবা— ঋষিদেরও সেই ভাবধারা। আর ঠাকুরের ঐ বিশ্বপ্রেমই ব্যাখ্যাত হয়েছে স্বামীজীর মাধ্যমে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'-রূপে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব অধ্যাত্মচেতনায় পাল্টে গেছে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় চেতনা— একক মুক্তির ধারণা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সকলকে নিয়ে মুক্ত হব— সকলের সাথে যুক্ত হব। সেবা ঐ দৃষ্টিকোণ থেকে করলে মুক্তি ও সমাজের মঙ্গল এক কোটিতে বিধৃত হবে। আর তবেই আমরা বর্তমান চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারবো।

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: গঙ্গা দুই তীর বন্ধনে প্রবাহিত। এই সভাগৃহের সঙ্গে গঙ্গার মিল আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-কৃপাগঙ্গার এক তীর সাধু এবং অপর তীর ভক্ত। যদিও সন্ন্যাসী ও গৃহস্থের মধ্যে তফাৎ মেরু ও সর্ষপের মতো, সূর্য ও খদ্যোতের মতো, তবু এই দুইয়ের মধ্য দিয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা প্রবাহিত। অতি সংগতভাবেই এই সংঘের নেতৃত্ব ঠাকুর নিজ হাতে তুলে দিয়েছেন স্বামীজীর মাধ্যমে সন্ন্যাসীদের হাতে। শ্রীশ্রীঠাকুর যে সংঘমূর্তি— এ-বোধ আমাদের করতে হবে।

আমাদের কাছে মঠ ও মিশন প্রায় সমার্থক। ঠাকুরকে কেন্দ্র করেই কর্ম। আগে ভগবদ্ভাব, ঠাকুর। তারপর সেই ভাবাশ্রয়ে কর্ম। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা তো বরাবরই আছে। তথাপি ঈশ্বর অবতীর্ণ হন এবং মানুষকে বিশেষ কিছু দেন। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান - নরলীলায় দেখান তিনি যেন সর্বশক্তিমান নন, কারণ তিনি তাঁর আশ্রিতকে ত্যাগ করতে পারেন না। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ এ কথাই বলেছেন 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে'-এর মাধ্যমে। গোপীদের কথা বলতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ঐ কথাই বলেছিলেন, 'ওরা নিজেরা ছেড়ে না দিলে আমার ছাড় পাবার উপায় নেই।' এই বিশ্বাস, তিনি এসেছিলেন আমার জন্য এবং আমাকে তিনি গ্রহণ করেছেন। ধর্মপথ কঠিন, ক্ষুরস্য ধারা, তবে শ্রীশ্রীমা আশ্বাস দিয়ে গেছেন— শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের— তাঁর শরণাগতদের কোলে করে রয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে আশ্রয় করে, অর্থাৎ মঠে থেকে বা মঠ-সংশ্লিষ্ট হয়ে মিশনের কাজ আমাদের করতে হবে।

আমরা যারা ভক্ত - ঠাকুরকে, তাঁর সংঘ-মূর্তিকে ভালবেসেছি— আমাদের ভালবাসার দায় পালন করতে হবে। আমরা যারা গৃহে থাকি, অর্থ রোজগার করি যারা মিশনে কাজ করি অর্থ নিয়ে বা না নিয়ে—প্রত্যেকের কাজ এখানে ব্যক্তিগত নয় -- স্বার্থের কাজ নয় এখানের কাজ সমগ্র জগতে আধ্যাত্মিক ভাবধারা ছড়ানোর। সাধুরা যে কাজ করছেন তা পুজো। সুতরাং যাঁরা সাধারণ কর্মী আছেন তাঁদেরও দায়িত্ব আছে। কাজের ঝামেলা তো আছেই— তখন সব দায় সাধুদের উপর ছেড়ে দিলে চলবে না। আমাদেরও সেই দায়ের অংশ নিতে হবে। আমরা জানি, এখানে কাজ একজনই করেন— সে তিনি। 'প্রভু, আমার মত চাকর তোমার লাখো লাখো রয়েছে,

কিন্তু, তোমার মত দয়াল আর নেই।'

সভাপতির অভিভাষণে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী বলেন :

সন্ন্যাসি- ও গৃহি-ভ্রাতৃবৃন্দ, বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র অস্বাভাবিক ও অনৈতিক ভাবধারা প্রবাহিত হয়ে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক সকল মূল্যবোধ অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে—এ-বিষয়ে আপনারা সকলেই সচেতন। গীতামুখে ভগবদ্‌ঘোষণা অনুসারে আসুর শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে ধর্মকে পুনঃস্থাপিত ও পৃথিবীতে দিব্যরাজ্য স্থাপন করতে ভগবান আবার শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। সেই মহান্ অবতারের জীবন ও বাণী আমাদের সম্মুখে রয়েছে আর আমরা তা বিনীতভাবে অনুসরণ করতে চেষ্টা করছি। একথা সুনিশ্চিত যে, তাঁর শক্তিতে সকল আসুরিক ভাব বিদূরিত হবে এবং পৃথিবীতে দিব্যরাজ্য স্থাপিত হবে। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুগামী আমাদের তাঁরই ভাবধারা অনুসরণ ক'রে চলতে হবে, যাতে অপরে তাদের সামনে বাস্তবায়িত আদর্শ-জীবন দেখতে পায়। এই ভাবধারা সমাজে প্রতিফলিত করা এবং সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তৃত করা—এ দায় আমাদেরই।

সুতরাং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা যেন আমাদের দায়িত্ব বিস্মৃত না হই, যেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবধারা অনুযায়ী চলতে চেষ্টা করি। স্বামীজী একবার বলেছিলেন : যদি ধর্ম ঠিক থাকে তো সব কিছু ঠিক থাকে। ধর্মই সমাজের ভিত্তি। আজ প্রয়োজন ধর্মের এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই ধর্মই আমাদের দিয়েছেন—যা এক নতুন সমাজের ও নবসভ্যতার ভিত্তিস্বরূপ। এই ধর্ম-সহায়ে এক নববিশ্বসংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে আর তার দায়ভার আমাদেরই উপর ন্যস্ত রয়েছে—এ-কথা যেন আমরা ভুলে না যাই। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের শক্তি দিন, যাতে আমরা তাঁর ভাবধারা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারি এবং যেন এই ভাবধারা প্রচার করতে পারি যাতে অপরেও উপকৃত হতে পারে আর এই ভাবে এই ভাবধারা যেন সমগ্র জগতে প্রচারিত হয়ে সকল অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করে এবং যা আগে বলেছি, পৃথিবীতে আবার দিব্যরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদ আপনাদের শিরে অজস্রধারে বর্ষিত হোক, শ্রীশ্রীমা আপনাদের আশীর্বাদ করুন, স্বামীজী প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ সন্তানগণ আপনাদের আশীর্বাদ করুন এই আমার প্রার্থনা।

উৎসব

বাগেরহাট রামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৩শে নভেম্বর ১৯৭৪ ভাবগম্ভীর পরিবেশে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় পাঁচ হাজার নরনারীর মধ্যে মিষ্টান্ন প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরদিন সান্ধ্য-আরাত্রিকের পর প্রতিমা নিরঞ্জনান্তে স্বামী গোকুলানন্দ শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

দেহত্যাগ

গভীর দুঃখের সহিত আমরা দুইজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ সংবাদ জানাইতেছি :

স্বামী ভূধরানন্দ গত ৬ই নভেম্বর রাত্রি ১০'৫০ মিনিটে রাঁচি টি. বি. স্যানাটোরিয়ামে ৭৫ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। দীর্ঘ কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি যক্ষারোগে ভুগিতেছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর নিকট দীক্ষা লাভ করেন; ১৯২৩ সালে বেলুড় মঠে যোগ দেন এবং ১৯২৯ সালে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। মাদ্রাজ মঠে ও উদ্বোধনে তিনি দীর্ঘকাল কর্মরত ছিলেন এবং বঙ্গদেশের ত্রাণ কার্যেও অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনাড়ম্বর ও শান্ত প্রকৃতির জন্য তিনি

অনেকেরই শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন।

স্বামী ধর্মানন্দ গত ২৪শে নভেম্বর সকাল ৯'৩৫ মিনিটে কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠানে ৮৯ বৎসর বয়সে বার্ধক্যজনিত ব্যাধিতে দেহত্যাগ করেন।

তিনি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর নিকট হইতে মন্ত্র-দীক্ষা লাভ করেন; ১৯১১ সালে কোয়ালপাড়া আশ্রমে যোগ দেন এবং ১৯১৮ সালে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা প্রাপ্ত হন। কিছুকাল তিনি বলিয়াটি (ঢাকা) আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং বেলুড় মঠের অফিসে ও ডিস্পেনসরিতে দীর্ঘকাল কাজ করেন। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি মঠে অবসর জীবন যাপন করিতেছিলেন। স্নেহমধুর স্বভাব ও ভক্তিময় জীবনের জন্য এই প্রাচীন সন্ন্যাসী সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

ইঁহাদের দেহনির্মুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

বিবিধ সংবাদ

সিড্‌নীতে রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি

৯ই জুন, ১৯৭৪ অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওএল্‌স্ প্রদেশের রাজধানী ও প্রসিদ্ধ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সিড্‌নীতে (Sydney) বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অন্যতম অছি ও রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালক-মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য এবং হায়দ্রাবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটির উদ্বোধন করেন। তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতার সার-সংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হইল:

'সিড্‌নীতে এই রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটির উদ্বোধন করিবার জন্য আমি এখানকার বন্ধুবর্গ-কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়াছি। তিন বৎসর পূর্বে আমি যখন এখানে আসিয়াছিলাম, তখন এইরূপ একটি বেদান্ত-কেন্দ্র গঠিত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু তখন উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয় নাই। সেই সময়ে আমি বলিয়াছিলাম, পৃথিবীর সর্বত্র যে সস্তা যোগ-সম্বন্ধীয় শিক্ষার প্রচলন দেখা যাইতেছে তাহা নহে, পরন্তু বেদান্ত নামে অভিহিত ভারতের বলিষ্ঠ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা উপলব্ধি ও সমাদর করিবার মতো অন্তর্মুখ ব্যক্তিদের যখন পাওয়া যাইবে, তখনই বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করার উপযুক্ত সময় আসিবে।

এইবার অস্ট্রেলিয়ায় আসিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, এখানে এখন এমন ব্যক্তিরা বিদ্যমান, যাঁহারা ঐ সকল সস্তা ভাবাবেগ ও ভারতের ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার নকলে বীতশ্রদ্ধ হইয়া বেদান্তের কার্যকরী দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা, যাহা সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক, যুক্তিপূর্ণ ও সার্বজনীন — তাহাই চাহিতেছেন।

যে কোন দেশেই হউক, বেদান্ত সোসাইটির প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আনন্দের বিষয়। কারণ, বেদান্ত এইরূপ একটি যুক্তিনিষ্ঠ প্রণালীবদ্ধ মতবাদ যে, উহাতে উত্তেজনাপূর্ণ ভাবাবেগ বা রহস্যবিষয় লইয়া কোন কারবার নাই। ধীর স্থির শান্ত প্রাণবন্ত ব্যক্তিগণই ইহা বুঝিতে ও ইহার দ্বারা লাভবান হইতে পারেন এবং আমি অতিশয় আনন্দিত যে, অস্ট্রেলিয়ায় এই ধরনের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আছেন।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বেদান্ত সোসাইটি গত ৭৫ বৎসর ধরিয়া সক্রিয় আছে এবং ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ইংলণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, শ্রীলঙ্কা ও অন্যান্য দেশেও বেদান্ত-কেন্দ্র আছে। অস্ট্রেলিয়ার

ন্যায় সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশও জীবনের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক দিকের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় আমি বিশেষখুশী এবং আমি আশা রাখি যে, এই আকর্ষণ অস্ট্রেলিয়াবাসীদের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিবে।

বেদান্ত আপনাদের আরেকটি নূতন ধর্ম প্রদান করিয়া যে-সকল ধর্ম বর্তমান রহিয়াছে তাহাদের সংখ্যা বাড়াইবে না—ইহা আপনাদের এমন একটি জীবন-দর্শন দিবে, যাহার দ্বারা জীবন ও ধর্ম সামগ্রিক অধ্যাত্ম-দৃষ্টিভঙ্গীতে সুসংহত হয়।

অস্ট্রেলিয়ার ন্যায় দেশের পক্ষে এই ধরণের অবদান অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য দেশের ইতিহাস ও এই দেশের ইতিহাসের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য—ইহা একটি নূতন দেশ; ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণা লইয়া বহু দেশ হইতে এখানে মানুষ সমাগত, কিন্তু এখনও এই দেশ নিজস্ব ব্যক্তিত্ব লাভ করে নাই—ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বই এই দেশের ব্যক্তিত্বে অদ্যাবধি প্রতিফলিত। এখন অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে নিজস্ব ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে—এখন একটি গভীর জ্ঞানপূর্ণ, যুক্তিপ্রতিষ্ঠ, ব্যবহারিক উপযোগিতা সম্পন্ন দর্শনেরও বিকাশের সময় উপস্থিত, যে-দর্শন প্রশাসনে, শিক্ষায়, বিভিন্ন বৃত্তিতে স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে সকল নাগরিককে সাহায্য করিবে।

বেদান্ত সোসাইটির উদ্বোধনের অর্থ ইহা নয় যে, এই সকল ব্যাপার অচিরেই সম্পাদিত হইবে। বেদান্তের চিন্তাধারা এত গভীর যে ইহার বিস্তার সময়-সাপেক্ষ, কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র বেদান্ত-কেন্দ্রগুলি দেখিয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে আপনাদের এই আশ্বাস আমি দিতে পারি যে, যে-কোন চিন্তাশীল, সূক্ষ্মদর্শী ও মানুষের ঊর্ধ্ব বিকাশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল অস্ট্রেলিয়াবাসী, যিনিই এই সোসাইটির কার্যাবলীর সংস্পর্শে আসিবেন, তিনিই মুগ্ধ ও অভিভূত হইবেন। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বেদান্তকে শ্রদ্ধা করেন, কারণ ইহা গভীর যুক্তিপূর্ণ মনন-শীলতার ফলশ্রুতি এবং আধুনিক বেদান্তের পশ্চাতে উপনিষদের প্রাচীন ঋষিগণ, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শংকর প্রমুখ মহামানবগণ এবং গত শতাব্দীর অমিত আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ—শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দও বিদ্যমান।

বেদান্তের কার্য হইতেছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মূল্যায়ন-পরীক্ষিত সাংস্কৃতিক সম্পদের আদান-প্রদানের দ্বারা সমগ্র মনুষ্যজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা। সমসাময়িক কালে মানুষের যত সমস্যা আছে তাহার সম্মুখীন হইতে এই ধরণের বৌদ্ধিক, আধ্যাত্মিক ও সামগ্রিক মানসিকতা আমরা পাই বেদান্তের মাধ্যমে—শ্রীরামকৃষ্ণের মাধ্যমে।

এই ভাবধারা অনুসরণ করিয়া অস্ট্রেলিয়া যদি অগ্রসর হইতে পারে এবং ভারতবর্ষের এই গভীর চিন্তারাশি, সেই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ, যাহা ভারতবর্ষের—শুধু তাহার নিজ সন্তানগণকে নহে, পরন্তু সমগ্র বিশ্বকেই দিবার আছে, তাহা হইতে অস্ট্রেলিয়া যদি উপকৃত হইতে পারে, তাহা হইলে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে উহা অশেষ সৌভাগ্যের বিষয় হইবে।'

সিড্‌নীর এই রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি অস্ট্রেলিয়ায় দ্বিতীয় বেদান্ত কেন্দ্র। প্রথম রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটির উদ্বোধন পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পার্থ (Perth) শহরে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ কর্তৃকই অনুষ্ঠিত হয়।

পরলোকে দক্ষিণারঞ্জন গুহ

গত ৩রা ডিসেম্বর ১৯৭৪, বেলা ১টায় শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য দক্ষিণারঞ্জন গুহ পরলোকগমন করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণচরণে তাঁহার বিদেহী আত্মার সদ্গতি প্রার্থনা করি।

উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৭৬তম বর্ষ

(মাঘ, ১৩৮০ হইতে পৌষ, ১৩৮১)

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'

সম্পাদক

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ

সংযুক্ত সম্পাদক

স্বামী ধ্যানানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭০০-০০৩

বার্ষিক মূল্য ৮৲ প্রতি সংখ্যা ৭৫প.

৮০/৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ স্থিত বসুশ্রী প্রেস হইতে
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়ের ট্রাস্টীগণের পক্ষে
স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত এবং
১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা ৭০০-০০৩ হইতে প্রকাশিত।

উদ্বোধন— বর্ষসূচী

৭৬তম বর্ষ

(মাঘ, ১৩৮০ হইতে পৌষ, ১৩৮১)

অন্যান্য :

চিত্রসূচী :